হুমায়ুন আজাদ

নির্বাচিত প্রবন্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডক্টর হুমায়ুন আজাদ বিপুল সংখ্যক শব্দ ও বাক্য, গত দু-দশকে, বিন্যাস করেছেন বিভিন্ন আঙ্গিকে; কবিতা, গবেষণা, সমালোচনা, ভাষাবিজ্ঞান, উপন্যাস, কিশোরসাহিত্য, এবং প্রবন্ধে। কবিতার দিকে চোখ রেখে তিনি বেরিয়েছিলেন তরুণ বয়সে, বাঙলা ভাষাকে ক'রে নিয়েছিলেন দ্বিতীয় ও অদ্বিতীয় স্বদেশ, তবে গদ্যের ঢেউই উঠেছে বেশি তাঁর জগতে। স্বপ্ন কল্পনা সৌন্দর্য কামনায় যেমন আলোড়িত তিনি, তেমনি আনন্দ পান মননশীলতায়; এর ফলই কবিতা, উপন্যাস, ও প্রবন্ধ। তিনি প্রথাগত নন কোনো এলাকায়; তাঁর সব ধরনের লেখায়, এবং প্রবন্ধে, এর পরিচয় রয়েছে। সাহিত্য, বিশেষ ক'রে কবিতা, নিয়ে লিখতেই তিনি সুখ পান; কিন্তু তিনি শুধু কবিতা নিয়ে লেখেন নি; ভাষা, বিশ্বাস, মানুষের অবস্থা, রাজনীতি প্রভৃতি নিয়েই লিখেছেন বেশি; এবং ভাষা তাঁর কাছে এক শিল্পকলা। হুমায়ুন আজাদের *নির্বাচিত প্রবন্ধ* বাঙলাদেশের একজন প্রধান মননশীল ও সৃষ্টিশীল লেখকের প্রবন্ধসংগ্রহ, যাতে এ-সময়ের শ্রেষ্ঠ চিন্তা ও সৃষ্টিশীলতার পরিচয় সংকলিত হলো। হুমায়ুন আজাদ বলেছেন, 'এ-বই হয়তো অনেকের প্রিয় ও সঙ্গী হবে; অনেকের হবে না।' কিন্তু সন্দেহ নেই এ-বই প্রিয় ও সঙ্গী হবে বর্তমান ও ভবিষ্যতের অসংখ্য মেধাবী চিত্তের।

প্রচ্ছদ সমর মজুমদার

ISBN 984 401 508 1

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ুন আজাদ বাঙলাদেশের প্রধান প্রথাবিরোধী ও বহুমাত্রিক লেখক; তিনি কবি, ঔপন্যাসিক, ভাষাবিজ্ঞানী, সমালোচক, যাঁর রচনার পরিমাণ বিপুল। জন্ম ১৪ বৈশাখ ১৩৫৪ : ২৮ এপ্রিল ১৯৪৭ বিক্রমপুরের রাড়িখালে। ডক্টর হুমায়ুন আজাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক, ও প্রাক্তন সভাপতি। তাঁর বইগুলোর মধ্যে রয়েছে– কবিতা: ১৯৭৩ অলৌকিক ইস্টিমার ১৯৮০ জ্বলো চিতাবাঘ ১৯৮৫ সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে ১৯৮৭ যতোই গভীরে যাই মধু যতোই ওপরে যাই নীল ১৯৯০ আমি বেঁচে ছিলাম অন্যদের সময়ে ১৯৯৩ হুমায়ুন আজাদের শ্রেষ্ঠ কবিতা ১৯৯৪ আধুনিক বাঙলা কবিতা ১৯৯৮ কাফনে মোড়া অশ্রুবিন্দু ১৯৯৮ কাব্যসংগ্রহ; কথাসাহিত্য: ১৯৯৪ ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল ১৯৯৫ সব কিছু ভেঙে পড়ে ১৯৯৬ মানুষ হিশেবে আমার অপরাধসমূহ ১৯৯৬ যাদুকরের মৃত্যু ১৯৯৭ শুভব্রত, তার সম্পর্কিত সুসমাচার ১৯৯৮ রাজনীতিবিদগণ; সমালোচনা: ১৯৭৩ রবীন্দ্রপ্রবন্ধ /রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা ১৯৮৩ শামসুর রাহমান/নিঃসঙ্গ শেরপা ১৯৮৮ শিল্পকলার বিমানবিকীকরণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ ১৯৯০ ভাষা-আন্দোলন : সাহিত্যিক পটভূমি ১৯৯২ নারী (নিষিদ্ধ : ১৯ নভেম্বর ১৯৯৫) ১৯৯২ প্রতিক্রিয়াশীলতার দীর্ঘ ছায়ার নিচে ১৯৯২ নিবিড় নীলিমা ১৯৯২ মাতাল তরণী ১৯৯২ নরকে অনন্ত ঋতু ১৯৯২ জলপাইরঙের অন্ধকার ১৯৯৩ সীমাবদ্ধতার সূত্র ১৯৯৩ আধার ও আধেয় ১৯৯৭ আমার অবিশ্বাস ১৯৯৭ পার্বত্য চট্টগ্রাম : সবুজ পাহাড়ের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হিংসার ঝরনাধারা ১৯৯৮ দ্বিতীয় লিঙ্গ; ভাষাবিজ্ঞান: ১৯৮৩ Pronominalization in Bengali ১৯৮৩ বাঙলা ভাষার শত্রুমিত্র ১৯৮৪ বাক্যতত্ত্ব ১৯৮৪ বাঙলা ভাষা (প্রথম খণ্ড) ১৯৮৫ বাঙলা ভাষা (দ্বিতীয় খণ্ড) ১৯৮৮ তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান; কিশোরসাহিত্য: ১৯৭৬ লাল নীল দীপাবলি বা বাঙলা সাহিত্যের জীবনী ১৯৮৫ ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না ১৯৮৭ কতো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী ১৯৮৯ আব্বুকে মনে পড়ে ১৯৯৩ বুকপকেটে জোনাকিপোকা ১৯৯৬ আমাদের শহরে একদল দেবদূত; অন্যান্য: ১৯৯২ হুমায়ুন আজাদের প্রবচনগুচ্ছ ১৯৯৪ সাক্ষাৎকার ১৯৯৫ আততায়ীদের সঙ্গে কথোপকথন ১৯৯৭ বহুমাত্রিক জ্যোতির্ময় ১৯৯৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রধান কবিতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ুন আজাদ

নির্বাচিত প্রবন্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ুন আজাদ

নির্বাচিত প্রবন্ধ

আগামী প্রকাশনী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ষষ্ঠ মুদ্রণ বৈশাখ ১৪১৯ মে ২০১২

প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪০৫ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯
দ্বিতীয় মুদ্রণ বৈশাখ ১৪০৭ : মে ২০০০
তৃতীয় মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮ : মে ২০০১
চতুর্থ মুদ্রণ চৈত্র ১৪১০ : এপ্রিল ২০০৪
পঞ্চম মুদ্রণ ফাল্গুন ১৪১৩ : ফেব্রুয়ারি ২০০৭

স্বত্ব মৌলি আজাদ, স্মিতা আজাদ, অনন্য আজাদ

প্রকাশক ওসমান গনি আগামী প্রকাশনী ৩৬ বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০ ফোন ৭১১-১৩৩২, ৭১১-০০২১

প্রচ্ছদ সমর মজুমদার

মুদ্রণে স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স ১৮/২৬/৪ শুকলাল দাস লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৪০০.০০ টাকা মাত্র।

ISBN 978 984 401 062 8

Nirbacita Prabandha : Selected Essay :: Humayun Azad.

Published by Osman Gani of Agamee Prakashani
36 Bangla Bazar, Dhaka 1100, Bangladesh

Sixth Print : May 2012

Price : Tk 400.00 only

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

মনন ও স্বপ্নশীল

তরুণতরুণীদের হাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূ মি কা

বিপুল সংখ্যক শব্দ ও বাক্য, গত দু-দশকে, আমি বিন্যাস করেছি, বিভিন্ন আঙ্গিকে; কবিতা, গবেষণা, সমালোচনা, ভাষাবিজ্ঞান, উপন্যাস, এবং প্রবন্ধে। কবিতার দিকে চোখ রেখে ভাষা নিয়ে বেরিয়েছিলাম তরুণ বয়সে, আজো-আঞ্চলিক বাঙলা ভাষাকে ক'রে নিয়েছিলাম দ্বিতীয় ও অদ্বিতীয় স্বদেশ, আজ দেখছি গদ্যের ঢেউই উঠেছে বেশি আমার জগতে। স্বপ্ন কল্পনা সৌন্দর্য কামনায় যেমন আলোড়িত হই আমি, তেমনি আনন্দ পাই মননশীলতায়; এর ফলই কবিতা ও উপন্যাস, এর ফলেই প্রবন্ধ। আমি প্রথাগত থাকি নি কোনো এলাকায়; বাঙালি প্রথায় সুখ ও স্বস্তি পায়, আমি পাই নি। আমার সব ধরনের লেখায়, এবং প্রবন্ধে, তার পরিচয় রয়েছে। সাহিত্য, বিশেষ ক'রে কবিতা, নিয়ে লিখতেই সুখ পাই; কিন্তু আমি শুধু কবিতা নিয়ে লিখি নি; ভাষা, বিশ্বাস, মানুষের অবস্থা, রাজনীতি প্রভৃতি নিয়েই লিখেছি বেশি; এবং সব সময়ই মনে রেখেছি আমি লিখছি ভাষায়, ভাষা নিজেই এক শিল্পকলা। আমার লেখা নিয়ে নানা বিতর্ক বাধে, নিষিদ্ধও হয়; এগুলো সুখকর নয় প্রথার কাছে। *নির্বাচিত প্রবন্ধ*-এর কল্পনা বা পরিকল্পনাটি আমার নয়, প্রকাশকের; আমি শুধু প্রবন্ধগুলো বেছে দিয়েছি। প্রথম প্রবন্ধটি আমার কোনো বইতে নেই; এটি সাহিত্য, রাজনীতি, বিশ্বাস, ভাষা প্রভৃতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েও নয়, কিন্তু এটিকেই বইয়ের শুরুতে দিতে ভালো লাগলো। প্রবন্ধ বিন্যাসেও কোনো কালক্রম রক্ষা করি নি, যেমন আমি আমার কোনো লেখার নিচে সময় উল্লেখ করি না; প্রবন্ধগুলো বিন্যস্ত হয়েছে লেখার কাল এলোমেলো ক'রে দিয়ে; কোন বই থেকে নেয়া হয়েছে, তাও উল্লেখ করা হলো না। এ-বইটিকেই মনে করা যেতে পারে একটি নতুন বই। মাত্র কয়েকটি বই থেকেই প্রবন্ধগুলো নিয়েছি; আমার যে-একগুচ্ছ সংক্ষিপ্ত রাজনীতিক প্রবন্ধের বই রয়েছে, সেগুলো থেকেও কোনো প্রবন্ধ নেয়া হলো না। নির্বাচিত প্রবন্ধগুলো প্রধানত ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক; এগুলো নির্বাচন করতেই ভালো লাগলো। এ-বই হয়তো অনেকের প্রিয় ও সঙ্গী হবে; অনেকের হবে না।

হুমায়ুন আজাদ

১৪ই ফুলার রোড
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা
২৫ কার্তিক ১৪০৫ : ৯ নভেম্বর ১৯৯৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূ চি প ত্র

আমার পাখিরা ১৩
শিল্পকলার বিমানবিকীকরণ ১৯
মধ্যাহ্নের অলস গায়ক : রোম্যান্টিক বহিরস্থিত রবীন্দ্রনাথ ৩৩
পাকিস্তানবাদী সাহিত্যতত্ত্ব : প্রতিক্রিয়াশীলতার বিষবৃক্ষ ৪৭
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রধান কবিতা : অবতরণিকা ৫৯
বাঙলা গদ্যচর্চা ও বিদ্যাসাগর ৬৮
ধর্ম ৮০
মেরি ওলস্টোনক্র্যাফ্‌ট্‌ : অগ্নিশিখা ও অশ্রুবিন্দু ১০৩
বিশ্বাসের জগত ১১৫
আদিম দেবতারা ও সন্ততিরা ১৩৫
নামপরিচয়হীন যে-কোনো একজন নিহত মুক্তিযোদ্ধার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা ১৪৮
শহীদ মিনার : কাফনে মোড়া অশ্রুবিন্দু ১৫৪
বাক্য ১৬০
বাঙলা ভাষাতত্ত্ব ১৭৮
ধর্ষণ ১৯৮
নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনা ২০৯
নারীদের নারীরা : নারীদের উপন্যাসে নারীভাবমূর্তি ২২৭
বাঙালি : একটি রুগ্ন জনগোষ্ঠি ২৫৪
মাইকেল মধুসূদন : প্রথম বিশ্বভিখারি ও ত্রাতা ২৬৬
একুশের চেতনা ও তিন দশকের উপন্যাস ২৭১
স্বাধীনতা ও বিশ্ববিদ্যালয় ২৮০
বইয়ের বিরুদ্ধে ২৮৮
নারী, তার বিয়ে ও সংসার ২৯৯
আমার ইন্দ্রিয়গুলো ৩১২

হুমায়ুন আজাদের গদ্যগ্রন্থপঞ্জি ৩২০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্বাচিত প্রবন্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার পাখিরা

যা কিছু সুন্দর ও স্মরণীয় ও স্বপ্নের মতো, তার সবই আমি দেখেছি ছেলেবেলায়, যখন আমি মেঘ-মাছ-পাখি-ঘেরা গ্রামে ছিলাম। তারপর যেই শহরে এলাম, চারপাশে দেখতে শুরু করলাম ছাইপাশ; তিন দশক ধ'রে যা দেখে দেখে চোখ দুটি একেবারে প'চে গেছে। এখন আর কিছুই দেখতে ইচ্ছে করে না। তাকালেই দেখি শয়তান ও ভাঁড়ের মুখ। আমার চোখ বোঝাই হয়ে গেছে আবর্জনায়; কেতুরের মতো দু-চোখ ভ'রে জ'মে উঠছে নগর, নেতা ও অভিনেত্রী। এসবে একেবারে অন্ধই হয়ে যেতাম, যদি না চোখে অদৃশ্য আঁখিতারার মতো জ্বলতো ছেলেবেলায় দেখা একরাশ অমর দৃশ্য : পাখি, নদী, মাছ, ধানের গুচ্ছ, মেঘ, কুমড়ো ফুল, গাভী, ঘাস, ঢেউ...। এসব এখন আর আমি দেখি না; কিন্তু চোখ বুজলেই দেখতে পাই পাখি উড়ছে, নদী বইছে, কুমড়ো ফুল হলদে হয়ে উঠছে নতুন বউর করতলের মতো। পাখিদের বেশ মনে পড়ে; কিন্তু আমার জগতে কোনো বিখ্যাত পাখি নেই। আমার পাখিরা আমার ছেলেবেলার মতোই অখ্যাত ও অন্তরঙ্গ; কিন্তু কী যে মনোরম! ওই সব পাখিদের আমি অনেক বছর দেখি না, কিন্তু দেখতে খুবই ইচ্ছে হয়, তাই চোখ বুজে অতীত দেখার একটি অভ্যাস হয়ে গেছে আমার। যখন আমার চারপাশের বাস্তবকে দেখতে ঘেন্না লাগে, লাগে মাঝেমাঝেই, তখনি আমি চোখ বুজি, এবং রহস্যের মতো দেখতে পাই ছেলেবেলার স্বর্গের টুকরোগুলো।

AMARBOI.COM

প্রথমেই দেখতে পাই ছোট্ট টুনটুনি দুটিকে। ওদের গলার আওয়াজের মতোই ছোটো পাখি দুটি আমাদের উঠোনের কোণার শাদা বেগুনের ডালে একবার বসছে, উড়ে গিয়ে বসছে আরেকটি ডালে; আবার উড়ছে, বসছে, ঠোকর দিচ্ছে, আর শব্দ ক'রে চলেছে টুন টুন টুন টুন। শিশুর মুঠোর মতো ছোট্টো, আর মিষ্টি পাখি : ঘোলাটে রঙ ডানায়, বুক শাদাটে। ওরা কি বিবাহিত? বেগুন গাছটি কেনো এতো পছন্দ ওদের? ডানায় জোর নেই ব'লে উড়ে গিয়ে বসতে পারে না উদ্ধত খেজুরগাছটিতে, বা আমের ডালে? একটি নিঃসঙ্গ পাখিকে দেখতাম আমাদের বাড়ির উত্তর ধারের নতুন আম গাছটিতে। পাখিটাকে আমরা বলতাম দইকুলি, বুকটা কী ফরশা, আর পিঠটি কী মসৃণ কালো! কালো তো? আমার এখনো চোখে ওই কালোই ভাসে; ওর বুক এতো শাদা যে অন্য যে-কোনো রঙকেই তার পাশে কালো মনে হবে। আমি অনেক বছর জানি নি যে ওটাকেই বলা হয় দোয়েল। দোয়েলের থেকে দইকুলি নামটি আমার অনেক বেশি পছন্দ। পাখিটাকে দেখলেই মনে হতো ও কোনো স্বপ্ন দেখছে। ওর ডানায় চঞ্চলতা কম, কোমল ঘন সৌন্দর্যের মতো পাখিটা। বেশি চাঞ্চল্যে সৌন্দর্য ঝ'রে যেতে পারে, তাই ঘনীভূত রূপসীর মতো স্থির থেকে দূরের দিকে তাকিয়ে ও শুধু স্বপ্ন দেখে। ওই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাখিটাকে ছোঁয়ার জন্যে আমার হাতের ত্বক ব্যাকুল হয়ে উঠতো, আঙুল কাঁপতে থাকতো, কিন্তু আমি কোনো দিন ওই পাখিটিকে ছুঁতে পারি নি, যেমন পারি নি আমার স্বপ্নে দেখা সুন্দরকে স্পর্শ করতে।

আমাদের বাড়ির পশ্চিমের পুকুরটি ফাগুন মাসেই শুকিয়ে আসতো, তার এপার থেকে ওপার পর্যন্ত জাজিমের মতো বিছিয়ে থাকতো সবুজ কচুরিপানা। তার ওপর দিয়ে দ্রুত চঞ্চল পায়ে হাঁটতো অতীন্দ্রিয় ডাহুকেরা। পুকুরের পাড়েই ছিলো ঝোপঝাড়, তাতে থাকতো লম্বা গলার লম্বা পায়ের ডাহুকেরা। দুপুরে বা রাতে তারা ডাকতো মত্ত বাউল লালন ফকিরের মতো; অদ্ভুত তাদের গলার আওয়াজ। কচুরিপানার ওপর দিয়ে তাদের হাঁটার ভঙ্গিটা ছিলো দেখার মতো। কাউকে যেনো বিশ্বাস করতে পারছে না ওই পাখি, ভয় পাচ্ছে এখনই হয়তো কারো জাল ছড়িয়ে পড়বে তার ওপর। তবে জাল দিয়ে নয়, ফাঁদ পেতে আমরা অনেকেই ডাহুক ধরার সাধনায় থাকতাম। ওই ফাঁদের নাম ছিলো মারলি। বাঁশ কেটে গম্বুজের মতো মারলি বানাতাম, তাতে ঢোকার জন্যে থাকতো কয়েকটি দরোজা। দরোজায় থাকতো সরু সুতোর ফাঁদ, মারলির মাঝখানে ঝুলতো ধানের গুচ্ছ। খুবই সতর্ক পাখি ডাহুক; তবু লোভ কাকে না আচ্ছন্ন করে? ধান খাওয়ার জন্যে মারলির ভেতরে ঢুকলেই ফাঁদে আটকে পড়তো ডাহুক। আমি দু-তিন বছর মারলি পেতে একবার একটি ডাহুক ধরতে পেরেছিলাম। একটা রহস্যময় পাখি শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ডাকতো ধান খেতে। চারদিকে সবুজ ধানখেত, নিচে দশহাত পানি, নিরাক পড়েছে দশদিক জুড়ে। নৌকো নিয়ে আমরা ধানখেতে ঢুকতাম। শুনতাম সেই পাখিটার থেকে থেকে 'ডুব, ডুব' গভীর আওয়াজ। মনে হতো নীরবতা ডেকে উঠছে থেকে থেকে। আমাদের কাজের ছেলেটি বলতো, পাখিটা পানির নিচে থাকে। তাই ওর শব্দ পানির শব্দের মতো গম্ভীর। ওরা পাখিটাকে বলতো কোরা। পরে বুঝেছি পাখিটার নাম পানকৌড়ি। হয়তো ভুলই বুঝেছি, যদি ভুল বুঝে থাকি সেটাই ভালো লাগবে আমার। ওর দেখা পাওয়াই ছিলো কঠিন। থাকতো ঘন ঘাসের মধ্যে, কীভাবে মিশে থাকতো কে জানে! আমি সম্ভবত এক কি দুবার দেখেছিলাম পাখিটাকে উড়ে যেতে। বেশ লম্বা গলার পাখি, পানির সঙ্গেই যার ছিলো ভালোবাসা।

চিল ছিলো অনেক, তবে দু কি তিন রকমের। লালচে ডানার চিলই বেশি ছিলো। বসতো হিজল গাছে, পুকুরের পাড়ের বউন্যা গাছে, বা কচুরিপানার স্তূপের ওপর। শুধু মাছ ছিলো তার স্বপ্ন। ট্যা ট্যা ক'রে ডেকে উঠতো, ঝাঁপিয়ে পড়তো পানিতে, নখে গেঁথে থাকতো ছোটোখাটো মাছ। ওই চিলের পা থেকে মাছ ছিনিয়ে এনেছি আমরা ছোটোরা অনেকবার। বেশ বড়ো মাছ ধরলেই ওই চিল বিপদে পড়তো। উড়তে কষ্ট হতো, আর আমরা পিছু নিতাম তার। এক সময় পা থেকে খ'সে পড়তো কাতল, ভেটকি বা ছোটো রুই। বড়ো চিলের নাম ছিলো কোড়ল। দেখতেও অনেকটা অন্য রকম, পাখির মধ্যে বাঘের মতো। কোড়ল ছোটো মাছের দিকে থাবা বাড়াতো না, বজ্রের মতো ঝাঁপিয়ে প'ড়ে পানির নিচে বড়ো বড়ো নখ ডুবিয়ে ঘাড়ে ধ'রে তুলে আনতো কাতলার মতো বড়ো মাছ। ধ'রেই গিয়ে বসতো সবচেয়ে উঁচু গাছের ডালে। ওর মহিমায় আমরা মুগ্ধ হতাম। খুব ভালো লাগতো অঘ্রান-পৌষের বিলের সেই মিষ্টি চিলগুলোকে। কী নাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলো ওগুলোর? শাদা রঙ, তার ওপর কালোর ফোঁটা। বেশ শান্ত। বেশি উড়তো না; বসতে ভালোবাসতো বোরোখেতের পাশে স্তূপ ক'রে রাখা ঘাসের ওপর। সবাই বলতো, ওই চিলগুলো যেখানে বসে তার নিচে রয়েছে গুপ্তধন। আমরা সেই চিলের পেছনে পেছনে কতো ছুটেছি ছোটোবেলায়, আর যেখানেই বসেছে ওই চিল তার নিচটা খুঁজেছি তন্ন তন্ন ক'রে। কোনো 'পাওয়া', গুপ্তধনের নাম ছিলো 'পাওয়া', আমরা কেউ পাই নি। অনেক মাটির নিচে কি ছিলো সেই গভীর গুপ্তধন, মোহরভরা সোনার কলসি? ওই চিলের নামই কি শঙ্খচিল? সেই চিল কি নিজেই খুঁজতো নিজের হারানো ধন, যার শোকে তার বুক থেকে বেজে উঠতো তীক্ষ্ণ কান্না?

শাদা বক দাঁড়িয়ে থাকতো এক পা তুলে মাছের আশায় আমাদের উত্তরের পুকুরে চোতবোশেখ মাসে। এক সময় কি ওই বকগুলোরই মাথায় গজিয়ে উঠতো লম্বা ঝুঁটি? খুবই চালাক বক, মাছের ধ্যানে থাকলেও চারপাশের বাস্তবতাকে ভুলতো না একবারও। আরেক রকম বক ছিলো আমাদের পুকুরে, উত্তরের আড়িয়ল বিলে– একটু ছোটো, পাখা ধূসর রঙের। দেখতে একটু গরিব। সন্ধ্যে হ'লে আমাদের বাড়ির গাছগুলোর মাথায় এসে ঝাঁকেঝাঁকে বসতো বকেরা। কেউ কেউ আস্তে ধীরে উঠতো বক ধরার জন্যে, কিন্তু ধরা অসম্ভব। শাদা বকগুলো ঠোকর দিতে ছিলো খুবই দক্ষ। একবার আমাদের গ্রামে একদল লোক বক শিকার করেছিলো। ডানাভাঙা একটি বক এক ঠোকরে তুলে নিয়েছিলো আমারই এক বন্ধুর ডান চোখ। সে থেকে আমরা সাবধান ছিলাম, বকের কাছেও ঘেঁষতাম না। বক মানুষের চোখেই ঠোকর দিতে ভালোবাসে। চোখ কি দেখতে মাছের মতো? একটু সন্ধ্যা হ'লে ওয়াক এসে বসতো আমাদের বাড়ির পশ্চিম ধারের বিশাল তেঁতুলগাছে। শিকারীদের প্রিয় পাখি ছিলো ওয়াক। দিনের বেলা ওরা যে কোথায় চ'লে যেতো জানতাম না; সন্ধ্যে হ'লেই আবার ফিরে আসতো। কিন্তু আমার ছেলেবেলায়ই এক সন্ধ্যেয় দেখলাম ওয়াকেরা আর ফিরে এলো না। তারপর আমাদের গ্রামের কোনো গাছ আর ওয়াকের শরীরের গন্ধ পায় নি। পাখিরা বুঝে গিয়েছিলো পৃথিবীতে বন্দুকের উৎপাদন বেড়ে গেছে।

আমি কোনোদিন বন্দুক ধরি নি, তবে একবার আড়িয়ল বিলে পাখি শিকারে গিয়েছিলাম। হয়তো সেটা ছিলো পৌষ মাস, আড়িয়ল বিলের পানি ঠাণ্ডা আর কোমর পর্যন্ত। এখানে সেখানে ঘন বোরো খেত। আমার বয়স বারো তেরো, আর যারা শিকার করবে, তাদের বয়স বাইশ তেইশ। কাদার ওপর দিয়ে আর ভেতর দিয়ে অনেক উত্তরে এসে দেখি পাখি আর পাখি। বালিহাঁস ভাসছিলো। কিন্তু গুলি করার আগেই তারা উড়ে চ'লে যায় দিগন্তে। আমরা পেয়েছিলাম কতোগুলো ছোটোছোটো পাখি। নাম নাকি ভুরভুরা পাখি। এক ছটাকও ওজন হবে না, দেখতেও ভালো নয়। বন্দুকে ছিলো ছররাগুলি– গুলি করলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তো অনেক জায়গা জুড়ে। ভুরভুরা এতো ছোটো পাখি যে মারা গেলেও ঘাসের ভেতরে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। আমার মনে আছে তরুণ শিকারীরা খুবই হতাশ হয়েছিলো। তারা গিয়েছিলো বালিহাঁসের মাংসের লোভে, কিন্তু জুটলো এমনি পাখি একটা ছররা লাগলেও যার শরীর ছিঁড়েফেড়ে একটু তুলোর মতো পালক ছাড়া আর কিছুই থাকে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একবার একটা মস্ত পাখি কোথা থেকে যেনো উড়ে এসে পড়েছিলো আমাদের পাশের গ্রামে। বিরাট পাখি। পাঁচ-ছজন ছাড়া তাকে ধ'রেই তোলা যায় না। আগে নাকি ওই পাখি আমাদের এলাকার কেউ দেখে নি। একটা উড়ন্ত উটের মতো পাখি, দেখতে কুৎসিত, কিন্তু তার বিরাটত্বই তার গৌরব। কেউ কেউ বললো ওটার নাম ধুপনি। ওই নামে কি কোনো পাখি আছে? আমাদের গ্রামে বা পাশের গ্রামে যেমন হিমালয় পর্বত থাকার কথা নয়, ঠিক তেমনি ওই পাখিও থাকার কথা নয়। থাকা কেনো, নামারও কথা নয়। কিন্তু ওটি কোনো আততায়ীর হাত এড়িয়ে চ'লে আসতে পেরেছিলো, কিন্তু তার বুলেটের হিংস্রতাকে এড়াতে পারে নি। একটা পা ভেঙে গিয়েছিলো তার, একটা ডানাও হয়তো বিকল হয়ে পড়েছিলো। হয়তো কয়েক হাজার মাইল সে উড়েছিলো ওই ভাঙা পা আর বিকল ডানা নিয়ে, এবং এসে পড়েছিলো আমাদের পাশের গ্রামে। আমার খুব দুঃখ হয়েছিলো ওর জন্যে। কেনো ওই আকাশের সম্রাট এসে পড়লো গৌরবহীন বালাশুরে? ওর মৃত্যুর যোগ্য স্থান তো ছিলো কোনো পর্বত বা মানস সরোবর। অথচ ওই মহান পাখি রান্না হয়ে ঢুকলো তাদের জঠরে, যারা তার নামও জানে না। পাখিদের জীবনেও রয়েছে নিয়তির নির্মম পরিহাস?

কোকিল আর ঘুঘুর কথা আমার একই সাথে মনে পড়ে। কোকিল তো খুব বিখ্যাত, আর শস্তা কবির মতো জনপ্রিয় পাখি,– এমন কি গ্রাহাম্যকেরাও কান্ পেতে একবার কোকিলের ডাক শোনে, আর বধিরেরাও প্রশংসা করে তার সুরের। হাইনের মতো আমারও কোনো কোনো সময় মনে হয় কোকিলের গান মুখস্থ গান মাত্র, তাতে আন্তরিকতার ছিটেটুকুও নেই। তবে কোকিল আমি পছন্দ করি, এক আধবার শ্রুতিও ধার দিই তাকে। কিন্তু বুক দিতে হয় ঘুঘুকে। চোত মাসে যখন চারদিক খা খা করতো, আর পশ্চিমের ছাড়াবাড়িটাতে বুক ভ'রে কাঁদতে শুরু করতো ধূসর ঘুঘুটি, আমার বুকে হাহাকার শুরু হতো। কামারগাঁয়ে ঘুঘুর কান্না ছিলো আরো করুণ। চোত-বোশেখের রোদে কামারগাঁয়ের বাঁশবন ঝা ঝা করতো, উদাস শব্দ উঠতে থাকতো ডালপালার মর্মর থেকে; আর তখন কেঁদে উঠতো শোকাকুল ঘুঘু। 'ঘুঘু..ঘু' যেনো চোতের বিষণ্ন সুর। একটা গল্প শুনেছিলাম ছোটোবেলায়;– ঘুঘু নাকি কেঁদে কেঁদে নিজের পুত্রের মৃত্যুর কাহিনী বলে। বিলাপ করে। ঘুঘু ছিলো রূপসী সতী– ঝড় আর প্লাবন থেকে বাঁচার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে নদীতে। বুকে নিয়েছিলো নিজের প্রিয় সন্তানকে, আর পিঠে নিয়েছিলো সতীনের সন্তানকে। নিজের সন্তানকে তো বুকে নেবেই সবাই, কিন্তু ওই নারী জানতো না বানের স্রোতে ভেসে যাবে বুকের সন্তান, আর বেঁচে থাকবে পিঠে-ভর-করা সতীনের সন্তান। শোকভারাতুর নারী জন্মায় ঘুঘু হয়ে, কিন্তু জন্মজন্মান্তর ধ'রে বুকে পুষে রাখে তুষের আগুনের মতো শোক। ঘুঘু কেঁদে কেঁদে বিলাপ করে। তার ধূসর রঙ, চোতের হাহাকার, বাতাসের বিলাপ সব মিলে ঘুঘু বুকের বেদনার মতো পাখি হয়ে আছে।

কাক বেশ চমৎকার পাখি, এবং আমার বেশ পছন্দ। অন্য পাখিদের দিকে তাকালে মনে হয় ওরা নিজেদের ছাড়া আর কিছু বোঝে না; ওরা মনে করে পৃথিবীটা ওদেরই জন্যে বানানো হয়েছে। কিন্তু কাক দেখলে তা মনে হয় না। কাকই একমাত্র পাখি যেটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের সাথে সক্রিয় সম্পর্কে জড়িত। কাক জানে পৃথিবীটা মানুষের অধিকারে। আর কোন পাখি এসে দরোজায় দাঁড়ায়, মানুষের সঙ্গে একটু খাবার ভাগাভাগি ক'রে নিতে চায়? এ-শহরে যদি উড়ন্ত কোনো প্রাণ দেখতে চাই, সে-সুখ কাক ছাড়া আর কে দেয়? আর সব পাখিরই রয়েছে একটু অন্যমনস্কতা, একটু বন্যতা, আর কাকের রয়েছে পুরোপুরি মনুষ্যত্ব বা বাঙালিত্ব, আর রাজনীতি। যেভাবে হঠাৎ এসে থালা থেকে ভাজা মাছ নিয়ে যেতো কাক, মুড়ি ছুঁড়ে দিলে মাটিতে পড়ার আগেই টপ ক'রে ঠোঁটে ধ'রে ফেলতো, তা আর কোন পাখি পারে? শীতকালে তো কাক হয়ে ওঠে মসৃণ সুন্দর। কাকের বাসাও চমৎকার, ডিমও সুন্দর নীল। চমৎকার তাদের সমাজতান্ত্রিক মনোভাব। কাকের বাসা থেকে ডিম পেড়ে, বা কাকের ছা নিয়ে এসে শান্তিতে থাকার উপায় ছিলো না। দলে দলে কাক এসে হাজির হতো, মাথায় ঠোকর দিতো ধারালো ঠোঁট দিয়ে। কাকের ন্যায়সঙ্গত প্রতিশোধস্পৃহাকে শ্রদ্ধা না ক'রে পারা যায় না। কাক শূদ্র হ'তে পারে, কিন্তু দাঁড়কাক ছিলো একেবারে ব্রাহ্মণ। বেশ বড়ো, চোখে বা ডানায় চাঞ্চল্য নেই; গভীর গলায় ডাকে 'কা, কা'। বেশি দেখতেও পাওয়া যেতো না। আমার এক হিন্দুবন্ধুর বাবা মারা গিয়েছিলো; একদিন দেখি সে ধুতি প'রে চুল কামিয়ে একটা পেতলের বাটিতে দুধ আর শবরি কলা নিয়ে এসে বসলো আমাদের বাড়ির পশ্চিমের বুনোবাড়িটির বড়ো আমগাছটির নিচে। সে-গাছের ডালে একটি দাঁড়কাক স্থির শান্তভাবে ব'সে তার নিজস্ব বৈদিকে আবৃত্তি ক'রে চলছিলো ধীরগম্ভীর বেদমন্ত্র। তার খেয়াল নেই নিচের বাস্তবতার দিকে; সে পৃথিবীটাকে কিছু দুরূহ গভীর বাণী শুনিয়ে যাচ্ছিলো। নিচে উৎকণ্ঠ হয়ে অপেক্ষা করছিলো আমার বন্ধুটি— কখন ওই পক্ষীব্রাহ্মণের চোখ পড়বে শবরি কলা আর ঘন দুধের দিকে। তারপর থেকেই দাঁড়কাক দেখলেই পাখিটিকে খুব মহান ব'লে মনে হতো আমার, মনে জন্ম নিতো অপার্থিব মহত্ত্বের বোধ। অ্যালান পোর ডানাঝাপটানো দাঁড়কাক নয়, শান্ত গম্ভীর দাঁড়কাক ছিলো আমার ছোটোবেলায়। এখন কি আছে ওই মহৎ পাখি, না কি বিদায় নিয়েছে গ্রাম থেকে?

শকুনও খুব খারাপ লাগতো না ছেলোবেলায়। বড়ো হয়ে এশিয়ার আকাশে আকাশে উড়িতেছে শকুনেরা ধরনের রূপকের সাথে পরিচয়ের পর মানসিক ঘেন্না ধ'রে গেছে শকুন সম্বন্ধে; কিন্তু ছোটোবেলায় এমন কোনো ঘেন্না ছিলো না পাখিটির প্রতি, যদিও কুৎসিত পাখিটিকে দেখলে শরীরটা কেমন কেমন করতো। আমাদের খেলার মাঠের ধারেই ছিলো একটা ভাগাড়। গরুও বেশ মরতো— শুকনো কালে প্রায়ই ছালতোলা মরা গরু প'ড়ে থাকতো ওই ভাগাড়ে। ছাল তুলতে আসতো ঋষিরা। মানুষের মধ্যে তখন ঋষিদের যেমন মনে হতো— খুব গরিব, গরু মরলেই দৌড়ে আসে, কারো সাথে কথা বলে না, কেউ কথা বলে না তাদের সাথে— শকুনকেও মনে হতো পাখিদের মধ্যে ঋষি ব'লে। ঝাঁকে ঝাঁকে আসতো, বসতো গরু ঘিরে। আমরা ঢিল ছুঁড়ে মারতাম, ডানা ধ'রে টেনে মাটির ওপর দিয়ে হেঁচড়াতাম। ভয়ংকর ছিলো না শকুনেরা, কামড় দিতো না; বরং ভীতু ছিলো একটু বেশি— আমাদের দেখলেই হেলেদুলে স'রে যেতো। তবে ওই দলে ছিলো গিন্নি বা গৃধ্নী ব'লে এক রকম শকুন। গলায় কোনো লোম থাকতো না ওগুলোর, কান দুটিও ঢলঢল করতো। ওগুলো রাগী ছিলো, কাছে ঘেঁষতে পারতাম না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড়ো গরিব ব'লেই মনে হতো আমার শকুনদের; এবং মায়াও লাগতো ওদের জন্যে। পাখি বা কোনো জন্তুকে খারাপের রূপক হিশেবে দেখলে আমার খারাপ লাগে। যেমন, শকুনকে সাম্রাজ্যবাদ বা শোষকের রূপক হিশেবে দেখতে অশ্বস্তি লাগে আমার; কারণ ওই পাখি সাম্রাজ্যবাদ বা শোষকদের মতো কুটিল নয়। পাখিরা, জন্তুরা মানুষ ও মানুষের ক্রিয়াকলাপের মতো শোচনীয় জঘন্য অমানবিক খারাপ কখনো হয় না। জন্তুরাই বেশি মানবিক।

মাছরাঙা ছিলো রঙিন খেলনার মতো। মনে হতো ওটা আমাদের উড়ন্ত খেলনা; কোনো মেলা থেকে উড়ে চ'লে এসেছে আমাদের পুকুরের মাঝখানের আকাশে। সবুজ রঙটাই চোখে ঢুকতো বেশি। আজ মাছরাঙার সবুজ রঙের বিভাই জ্বলছে আমার চোখে, এবং তার ওই দীর্ঘ ঠোঁট। পুকুরে পোঁতা কোনো বাঁশের ওপর ব'সে থাকতো, এক সময় সবুজ লাটিমের মতো স্থির হয়ে উড়ন্তে থাকতো; তারপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। তুলে নিয়ে আসতো পাবদা, বা পুঁটি, এবং বসতো গিয়ে বাঁশের মাথায়। ছোটো মাছরাঙাগুলো ছিলো চঞ্চল, যতো ঝাঁপাতো ততো মাছ জুটতো না; কিন্তু বড়োগুলোকে কখনো বেহিশেবি লাফ দিতে দেখি নি। মাছরাঙা পাখিরা কতোটা নিচ পর্যন্ত দেখতে পায়? ওরা কি ক'রে হেলিকপ্টারের মতো উড়তে পারে একই জায়গায়?

ছেলেবেলায় আমার আরো কতো পাখি ছিলো। যখন আমি ট্রাকের শব্দে বধির হই, নগরের মুখ দেখে দেখে অন্ধ হই, তখন কান পেতে রই বাল্যকালের দিকে, চোখ মেলে ধরি ছেলেবেলার দিকে। পাখিদের ডানার রঙে, আর তাদের কলরবে আমার চোখ ঠাণ্ডা হয়, কান তৃপ্ত হয়। শুনতে পাই পাখি সব করে রব, শুনতে পাই পাখি সব করে রব; আমার কাননে কুসুমকলি ফোটে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিল্পকলার বিমানবিকীকরণ

আধুনিক শিল্পকলার সূচনা-দশকগুলোতে এ-অভিনবজাতকের মুখোমুখি অত্যন্ত অসহায় বোধ করে প্রথাগত শিল্পকলাভ্যস্ত জনগণ, যেনো তাদের চোখের সামনে হঠাৎ হাজির হয়েছে এক দুরূহ-দুর্বোধ্য-অভাবিত স্ফিংস, যার কবিতা দুরূহ, সঙ্গীত দুর্জ্ঞেয়, চিত্রকলা দুর্বোধ্য। এতোদিন তারা কবিতা-সঙ্গীত-চিত্রকলার মতো ব্যাপারগুলো সম্ভোগ ক'রে এসেছে বেশ আরামে; কেউ কোনো বাধা দেয় নি। কিন্তু আধুনিক শিল্পকলা নিজের আর সম্ভোগলিপ্সু জনগণের মধ্যে তুলে দেয় এক নিষ্ঠুর দেয়াল, যার নাম দুরূহতা। সাধারণ সম্ভোগীরা আধুনিক শিল্পকলার উদ্ধত দুরূহতায় প্রথমে অসহায়-আক্রান্ত-বিব্রত বোধ করে, পরে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। কেননা এ-শিল্পকলা তাদের বোধ-বোধি-মেধা-অনুভূতিকে যারপরনাই অপমান করেছে। আধুনিক শিল্পকলার উন্মেষবিকাশের দশকগুলোতে যখন নতুন দেবতারা সৃষ্টি ক'রে চলেছিলেন তাঁদের নতুন স্বর্গনরক, আর তার বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে উঠছিলো সাধারণ শিল্পসম্ভোগীরা, তখন আধুনিক শিল্পকলার চারিত্র্য–তার দুরূহতার ব্যাকরণ–ব্যাখ্যা ক'রে এক অনন্য অতুলনীয় দীর্ঘ রচনা লিখেছিলেন স্পেনীয় দার্শনিক সমালোচক হোসে অর্তেগা ঈ গাসেৎ। তাঁর রচনাটি আজো অপরিচিত বাঙলা ভাষাঞ্চলে, অন্তত আমি যতোটা জানি 'শিল্পকলার বিমানবিকীকরণ' নামী ওই রচনাটি আজো অনুবাদিত হয় নি বাঙলা ভাষায়, এমনকি আধুনিক শিল্পকলার দুরূহতা সম্পর্কে গাসেতের ব্যাখ্যাও চোখে পড়ে নি বাঙলা ভাষার লেখা কোনো রচনায়। ছ-দশক আগে প্রকাশিত গাসেতের রচনাটির সাথে পরিচয় না থাকা দুর্ভাগ্যের কথা। খুব ভালো হতো যদি এ-দীর্ঘ রচনাটির একটি বিশ্বস্ত অনুবাদ প্রকাশ করা যেতো, কিন্তু সে-উদ্যমের বিশেষ অভাব আমার। তাই এখানে আমি অর্তেগার বক্তব্য-ব্যাখ্যার সারাংশ লিপিবদ্ধ ক'রেই তৃপ্তি পেতে চাই। এ-সারাংশও হবে আমার রুচি-অনুসারী, হয়তো অর্তেগার ব্যক্তিগতভাবে প্রিয় অনেক অংশ বাদ প'ড়ে যাবে, এবং কোথাও কোথাও প্রবল হয়ে উঠবে আমার নিজেরই ব্যাখ্যা। তাই এটিকে মনে করা যেতে পারে অর্তেগাভিত্তিক একটি নতুন রচনা।

সব রকমের আধুনিক শিল্পকলাই অজনপ্রিয়। আধুনিক কবিতা বা নাটক বা সঙ্গীত বা চিত্রকলা বা শিল্পকলার অন্য যে-কোনো শাখার কথাই ধরা যাক না কেনো, দেখা যাবে এরা অজনপ্রিয়। এদের অজনপ্রিয়তা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং তা অবধারিত ও নিয়তিবশ্য। কেউ কেউ হয়তো বলবেন যে শিল্পকলার জগতে যে-কোনো নবাগতকেই যাপন করতে হয় একটা সঙ্গরোধতার কাল। এ প্রসঙ্গে অনেকেরই মনে পড়বে *এরনানি*কে ঘিরে কলহের কথা, রোম্যান্টিসিজমের উদ্ভববিকাশের সময়ের নানা গোলযোগের কাহিনী। তবে আজকালকার শিল্পকলার অজনপ্রিয়তা ভিন্ন রকমের। কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনপ্রিয় আর কি অজনপ্রিয় তার মাঝে একটা স্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করা দরকার। একটা নতুন রচনা-বা শিল্প-রীতি জনপ্রিয়তা আয় করতে সাধারণত কিছুটা সময় নিয়ে থাকে। এ-সময়ে এটা জনপ্রিয় নয়, তবে একে অজনপ্রিয়ও বলা চলে না। রোম্যান্টিসিজমের উদ্ভব ও বিকাশের সময়ের পরিস্থিতির সম্পূর্ণ বিপরীত পরিস্থিতি বিরাজ করছে আজকাল। রোম্যান্টিসিজম বেশ তাড়াতাড়িই জয় ক'রে নিয়েছিলো জনগণকে, যাদের কাছে পুরোনো ধ্রুপদী শিল্পকলা কখনোই কোনো আবেদন জাগাতে পারে নি। রোম্যান্টিসিজমের শত্রুরা ছিলো মুষ্টিমেয়। মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের পর প্রথম বহুসংস্করণ জুটেছিলো রোম্যান্টিকদের ভাগ্যেই। রোম্যান্টিসিজম ছিলো জনপ্রিয় শিল্পরীতির আদিরূপ। রোম্যান্টিসিজম, গণতন্ত্রের প্রথম সন্তান, জনতা বা জনগণের আদর পেয়েছে ভালোভাবেই।

অন্যদিকে আধুনিক শিল্পকলা জনতা বা জনমণ্ডলিকে সব সময়ই পাবে বিরোধীরূপে। কারণ, তা অনিবার্যভাবেই অজনপ্রিয়, উপরন্তু তা জনপ্রিয়তাবৈরী। আধুনিক যে-কোনো শিল্পকর্মই সাধারণ জনমণ্ডলির মনে জন্ম দেয় এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া। এ-শিল্পকলা জনমণ্ডলিকে ভাগ ক'রে দেয় দু-গোত্রে: পাওয়া যায় একটি ক্ষুদ্র গোত্র, যা গঠিত মুষ্টিমেয় অনুরাগীতে, এবং একটি বড়ো গোত্র, যাতে যূথবদ্ধ শত্রুতাপরায়ণ সংখ্যাগরিষ্ঠরা। তাই এ-শিল্পকলা কাজ করে এক সামাজিক অনুঘটকের মতো, যা নিরবয়ব নিরাকার অসংখ্যকে বিভক্ত করে দুটি পৃথক মানবগোত্রে। তবে কি সেই সূত্র বা নীতি, যা এ-দুটি পরস্পরবৈরী গোত্রের জননী? প্রতিটি শিল্পসৃষ্টিই জাগায় মতপার্থক্য:– কেউ কেউ তা পছন্দ করে, কেউ কেউ করে না। কেউ কেউ বেশি পছন্দ করে, কেউ কেউ কম। তবে এমন মতপার্থক্যের মূলে কোনো নীতি বা সূত্র নেই, বিভিন্ন ব্যক্তির আকস্মিক রুচি অনুসারে কোনো শিল্পকর্ম পছন্দ হয় বা হয় না। কিন্তু আধুনিক শিল্পকলার ব্যাপারে যে-গোত্রভাগ ঘটে, তা ব্যক্তিগত রুচিভিন্নতার থেকে অনেক গভীর স্তরীয় ব্যাপার। এমন নয় যে সংখ্যাগরিষ্ঠরা তরুণদের শিল্পকলা পছন্দ করে না, আর সংখ্যালঘিষ্ঠরা পছন্দ করে। আসল ব্যাপার হচ্ছে অধিকাংশ মানুষ, জনমণ্ডলি, এ-শিল্পকলা বুঝতে পারে না। সমস্যাটি বোঝা ও না বোঝার, ব্যক্তিগত বা গোত্রগত রুচি বা নীতির নয়। উগোর *এরনানির* বিরুদ্ধে যারা হৈচৈ করেছিলো, তারা নাটকটি ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলো, এবং বুঝতে পেরেছিলো ব'লেই তারা অপছন্দ করেছিলো নাটকটি।

সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আধুনিক শিল্পকলার যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটি চোখে পড়ে সহজে, তা হচ্ছে এ-শিল্পকলা জনগণকে ভাগ ক'রে দেয় দু-ভাগে। একভাগ বুঝতে পারে এ-শিল্পকলা, আরেকভাগ বুঝতে পারে না। এর মানে একটি গোত্রের রয়েছে অনুধাবনের এমন শক্তি, যা নেই অন্য গোত্রটির। তাই তারা মানবপ্রজাতির দুটি ভিন্ন উপগোত্র। আধুনিক শিল্পকলার লক্ষ্য রোম্যান্টিসিজমের মতো সমগ্র জনমণ্ডলি নয়; বরং বিশেষ শক্তিসম্পন্ন সংখ্যালঘু একটি গোত্রকে লক্ষ্যে রেখেই সৃষ্টি করা হয় আধুনিক কবিতা বা নাটক বা চিত্রকলা। তাই এ-শিল্পকলার প্রতি রুষ্ট হয়ে ওঠে জনমণ্ডলি। যখন কেউ কোনো একটি শিল্পকর্ম বুঝতে পারে, বুঝেসুঝে অপছন্দ করে, তখন সে নিজেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উন্নততর বোধ করে শিল্পকর্মটি ও তার স্রষ্টার থেকে। তাই তার ক্রোধ জাগার কোনো কারণই ঘটে না। কিন্তু যখন সে শুধু বুঝতে না পারার জন্যেই অপছন্দ করে কোনো শিল্পসৃষ্টি, তখন সে অপমানিত বোধ করে গোপনে; তার মনে জন্ম নেয় হীনমন্যতা, আর ওই হীনমন্যতাবোধটুকু লুকোনোর জন্যে সে ব্যবহার করে তার ক্রোধকে। একজন বন্দে আলী মিয়ার রচনা হয়তো অপছন্দ করে অনেকেই, কেননা তারা ওই রচনা ভালোভাবেই বুঝতে পারে, এবং বুঝতে পারে যে ওই রচনা তুচ্ছ। এতে পাঠক সহজেই একরকম আত্মতৃপ্তি বোধ করে, নিজেকে অধিকতর প্রতিভাবান গণ্য করে ওই লেখকের চেয়ে; কেননা ইচ্ছে করলে তারাও সহজে ওই রচনার চেয়ে উৎকৃষ্ট কিছু লিখতে পারতো। কিন্তু একজন সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মুখোমুখি পাঠকের এমন তৃপ্তির অবকাশ ঘটে না। পাঠক তাঁর মুখোমুখি নিজেকে বোধ করে অসহায় ও সামান্য, যেনো তার মস্তিষ্কের কোনো অংশ রয়ে গেছে এখনো অবিকশিত। তখন একরকম হীনতাবোধ দ্বারা আক্রান্ত হয় সে, এবং ক্রমশ সুধীন্দ্রনাথকে গণ্য করতে থাকে নিজের শত্রু ব'লে। আধুনিক শিল্পকলা অধিকাংশ মানুষকে বুঝতে বাধ্য করে তারা কি, অর্থাৎ তারা নিখাদ সাধারণ মানুষ—এমন এক ধরনের প্রাণী, যারা শিল্পকলার মন্ত্র অনুধাবনের শক্তিরহিত, বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের কাছে যারা অন্ধ ও বধির। কিন্তু জনগণ কেনো সহ্য করবে এমন অপমান, যারা শতবর্ষ ধ'রে লাভ ক'রে আসছে নানা রকম স্তব আর স্তুতি? তারা তো শতবর্ষ ধ'রে শাসন ক'রে আসছে সব কিছু, আর এখন বহিষ্কৃত হবে সে-অধিকার থেকে? তাই জনগণ বোধ করতে থাকে যে এ-নতুন শিল্পকলা, যা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ানুভূতিসম্পন্ন একটি ক্ষুদ্র গোত্রের শিল্পকলা, মানুষ হিশেবে তাদের অধিকারকেই বিপন্ন ক'রে তুলেছে। তাই যেখানেই একটু আত্মপ্রকাশ করে নতুন শিল্পকলা, সেখানেই শোনা যায় জনমণ্ডলির কোলাহলচিৎকার।

আধুনিক শিল্পকলা যে আপামর সাধারণ উপভোগ করতে পারে না এতে বোঝা যায় এর প্রেরণাপুঞ্জ সর্বজনীনভাবে মানবিক নয়। সকলের জন্যে এ-শিল্প নয়, বরং একটি বিশেষ গোত্রের জন্যে। এ-গোত্রটি উৎকৃষ্টতর নাও হ'তে পারে, তবে সুস্পষ্টভাবে স্বতন্ত্র। একটি বিষয় এখানে পরিষ্কার ক'রে নেয়া দরকার। নান্দনিক সুখানুভূতি বা আনন্দ বলতে কি বুঝে থাকে অধিকাংশ মানুষ? যখন তারা কোনো একটি শিল্পকর্ম, কবিতা বা গ্রন্থ বা নাট্যাভিনয়, 'পছন্দ' করে, তখন কি ঘটে তাদের চিত্তে? এর উত্তর কঠিন নয়, বরং বেশ সহজ। সাধারণ জনমণ্ডলি কোনো নাটক বা উপন্যাস তখনি পছন্দ করে, যখন ওই নাটকে বা উপন্যাসে উপস্থাপিত মানবিক নিয়তি আকর্ষণ করে তাদের। যখন পাত্রপাত্রীদের প্রেম-ঘৃণা, আনন্দ-বেদনা তাদের চিত্তকে আলোড়িত করে, এবং তারা নিজেরা তাতে এমনভাবে অংশ নেয় যেনো ওই সব ঘটনা সত্যিকার বাস্তব জীবনে ঘটছে। তখনই তারা কোনো একটি নাটক বা উপন্যাসকে 'ভালো' বলে, যখন তাদের কাছে এমন প্রতিভাস সৃষ্টি হয় যে ওই নরনারীরা বাস্তবেরই পাত্রপাত্রী। কবিতায় তারা খোঁজে কবির আড়ালে আছে যে-ব্যক্তিটি, তার ব্যক্তিগত বেদনা ও সংরাগ। সে-সব চিত্রকলা পছন্দ করে তারা, যাতে তারা পায় এমন সব নরনারীর প্রতিকৃতি, যাদের সাক্ষাৎ পেলে বাস্তব জীবনে তারা আনন্দ পেতো। তাই অধিকাংশ মানুষ নান্দনিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুখানুভূতি বলতে বোঝে চিত্তের এমন এক অবস্থা, যা তাদের প্রাত্যহিক আচরণের সাথে অভিন্ন। শিল্পকলায় তারা খুঁজে ফেরে বাস্তব জীবনকেই–বাস্তব জীবনের সুখদুঃখ, আনন্দবেদনা, ভাবাবেগভাবালুতা। অর্থাৎ যার প্রতি তাদের সমস্ত মানসিক সক্রিয়তা চালিত হয়, তা দৈনন্দিন জীবনের সাথে অভিন্ন। তা হচ্ছে মানুষ ও তাদের সংরাগ। শিল্পকলা তাদের কাছে এমন এক সামগ্রী, যা তাদের সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দেয় আকর্ষণীয় মানবিক ক্রিয়াকলাপের সাথে। কিন্তু যেই শিল্পকলায় প্রাধান্য ছড়াতে থাকে নান্দনিক উপাদানরাশি, অন্তর্হিত হয় প্রাত্যহিক জীবনের উপভোগ্য ব্যাপারস্যাপার, অমনি অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করে তারা, এবং বিমূঢ় হয়ে পড়ে কিছু বুঝতে না পেরে। যেহেতু তাঁরা ব্যবহারিক প্রবণতা ছাড়া আর কিছুই কখনো চর্চা করে নি, তাই সে-শিল্পকর্ম, যা তাদের ভাবাবেগ-ভাবালুতা জাগিয়ে তোলে না, তাতে তারা খেই হারিয়ে ফেলে। অধিকাংশ মানুষ গ্রন্থের পাত্রপাত্রীদের বেদনায় অশ্রুভারাতুর হ'তে ভালোবাসে আর সুখ পায়, এবং পাত্রপাত্রীদের আনন্দে হয়ে ওঠে উল্লসিত। তবে এ-আনন্দবেদনা প্রকৃত শৈল্পিক সুখানুভূতি থেকে অত্যন্ত পৃথক। শিল্পকলার মানবিক উপাদানে আবিষ্ট থাকা অসমঞ্জস প্রকৃত নান্দনিক আনন্দানুভূতির সাথে। তাই অধিকাংশ মানুষ নান্দনিক সুখানুভূতি উপভোগে ব্যর্থ হয়, আনন্দ আহরণ করে শুধু মানবিক উপাদানের ভাবাবেগ থেকে। জনপ্রিয় উপন্যাস বা নাটক বা কবিতায় তারা মানবিক উপাদানের স্বাদ পায় প্রাণ ভ'রে, আর শিল্পকলা উপভোগের নামে ভোগ করে শুধু স্বল্পমূল্য আবেগ।

এখানে রয়েছে একটি সহজ সরল দৃক-সমস্যা। কোনো কিছু দেখার জন্যে বিশেষভাবে পাত করতে হয় আমাদের দৃষ্টি। ঠিক মতো দৃষ্টিপাত না করলে বস্তুটি হয়তো দেখা যাবে অস্পষ্টভাবে বা দেখাই যাবে না। ধরা যাক কাচের জানালার ভেতর দিয়ে দেখা কোনো বাগানের কথা। বাগানটি দেখার জন্যে চোখ এমনভাবে ফেলতে হবে, যাতে জানালার ভেতর দিয়ে দৃষ্টিরশ্মি অবলীলায় চলতে পারে, এবং অবিলম্বে গিয়ে পড়ে বাগানের লতাগুল্ম পুষ্পরাশির ওপর। যেহেতু বাগানটিকে দেখতে চাই এবং আমাদের চোখ নিপতিত ওটিরই ওপর, তাই আমরা জানালাটিকে দেখি না। জানালার ভেতর দিয়ে দেখি বাগানটিকে। তবে ইচ্ছে করলে আমরা বাগানটিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারি, দৃষ্টি ফেলতে ও দেখতে পারি জানালাটিকে। তখন আমাদের চোখের সামনে থেকে হারিয়ে যায় বাগানটি; শুধু জানালার কাচে লেগে থাকে বাগানের উদ্ভিদপুষ্পের অস্বচ্ছ বর্ণালি। তাই বাগান আর জানালা দেখা দুটি ভিন্ন ব্যাপার; কারণ তাতে দরকার দৃষ্টির দু-রকম বিন্যাস। একইভাবেই যখন কেউ কোনো শিল্পকর্মে শুধু দেখতে চায় জন ও মেরি বা ট্রিস্টান ও ইজোলডের হৃদয়-মন-অভিভূত করা ভাগ্য, তখন সে এমনভাবে তার দৃষ্টি বিন্যস্ত করে যে তার চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যায় শিল্পকর্মটি। তার মন দখল ক'রে থাকে শুধু ওই পাত্রপাত্রীদের আনন্দবেদনা। ট্রিস্টানের বেদনা যতোটুকু সত্য বা বাস্তব ব'লে মনে হয় তার কাছে, শুধু সেটুকুই তার মনে জাগিয়ে তোলে আলোড়ন। কিন্তু কোনো শিল্পকর্ম ততোটুকুই শৈল্পিক, তার যতোটুকু অ-বাস্তব বা অ-সত্য। টিশিয়ানের আঁকা অশ্বারোহী পঞ্চম চার্লসের চিত্রটি উপভোগ করতে হ'লে আমাদের ভুলে যেতে হবে যে ওটি পঞ্চম চার্লসের চিত্র। এটিকে মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে হবে একটি প্রতিকৃতি বা চিত্র অর্থাৎ সৃষ্ট সামগ্রী। চিত্রিত ব্যক্তি ও তার চিত্র দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিশ। আমরা এ-দুটির যে-কোনো একটির প্রতি আকর্ষণ বোধ করতে পারি। যদি ব্যক্তির প্রতি আকর্ষণ বোধ করি, তাহলে আমরা জীবন যাপন করি তারই সাথে, আর যদি আকৃষ্ট হই চিত্রটির প্রতি, তাহলে আমরা অবলোকন করি একটি শিল্পকর্ম। বেশি লোক বাগানকে এড়িয়ে জানালার ওপর নিবদ্ধ করতে পারে না তাদের দৃষ্টি, অর্থাৎ তারা শিল্পকে দেখতে পায় না। তার বদলে তারা এর ভেতর দিয়ে সরাসরি তাকায় এবং শিল্পকর্মটির মানবিক উপাদানে জড়িয়ে পড়ে। যখন তাদের ওই মানবিক উপাদানটুকু বাদ দিয়ে শিল্পকলার ওপর চোখ ফেলতে বলা হয়, তারা জানায় যে অমন কিছু দেখতে পায় না তারা। সত্যিই তারা দেখতে পায় না; কারণ তার সবটাই শৈল্পিক স্বচ্ছতা–যা দেখা যায় না; কারণ তার ভেতর দিয়ে দৃষ্টি অন্যত্র চ'লে যায়–এবং বিষয়বস্তুহীন।

সারা উনিশশতক ভ'রে শিল্পীরা এগিয়েছিলেন অবিশুদ্ধ রীতিতে। তাঁরা শিল্পকর্মে নান্দনিক উপাদান কমিয়ে এনেছিলেন চরমভাবে, এবং মানবিক উপাদানে ভ'রে দিয়েছিলেন প্রায় তার সবটা। এ-অর্থে উনিশশতকের সমস্ত স্বাভাবিক শিল্পকলাই বাস্তবধর্মী। বিটোফেন ও হ্বাগনার বাস্তবধর্মী, আর শ্যাতোব্রায়াঁ ও জোলাও তাই। এ-ধরনের রচনা শুধু অংশত শিল্পকর্ম বা শৈল্পিক বস্তু। এগুলো ভোগ করার জন্যে খাঁটি শৈল্পিক সংবেদনশীলতার দরকার হয় না; যা দরকার, তা হচ্ছে মানবিক সংবেদনশীলতা ও আমাদের প্রতিবেশীদের সুখদুঃখে সহানুভূতি জানানোর ইচ্ছে। তাই উনিশশতকী শিল্পকলা জনপ্রিয় হয়েছিলো, তা তৈরী হয়েছিলো জনমণ্ডলির জন্যে। তা যতোখানি জীবনখণ্ড ছিলো, ততোখানি শিল্পকলা ছিলো না। মনে রাখা ভালো যদি কোনো কালে দেখা দেয় দু-ধরনের শিল্পকলা, যার একটি সংখ্যালঘুদের অপরটি সংখ্যাগুরুদের জন্যে, তাহলে সংখ্যাগুরুদের জন্যে রচিত শিল্পকলাকে অবশ্যই হতে হবে বাস্তবধর্মী। এখানে প্রশ্ন উঠবে–বিশুদ্ধ শিল্পকলা কি সম্ভব? হয়তো সম্ভব নয়। তবে বিশুদ্ধ শিল্পকলা যদি অসম্ভবও হয়, তাহলেও একটি প্রবণতা থাকতে পারে, যার লক্ষ্য শিল্পকলার বিশুদ্ধিসাধন। এ-প্রবণতা ক্রমিকভাবে কমিয়ে আনে শিল্পকলায় মানবিক উপাদানের প্রাধান্য। অথচ রোম্যান্টিক ও প্রাকৃতবাদী শিল্পকলায় ছিলো মানবিক উপাদানেরই প্রাবল্য প্রাধান্য। এ-প্রক্রিয়ায় এমন হ'তে পারে যে শিল্পকলা থেকে মানবিক আধেয় এতো কমে যেতে পারে যে তা আর চোখেই পড়বে না। এর ফলে জন্ম নিতে পারে এমন শিল্পকলা, যা বোধগম্য শুধু সেই স্বল্পসংখ্যকের কাছে, যারা শৈল্পিক সংবেদনশীলতাঋদ্ধ। এ-শিল্পকলা জনমণ্ডলির জন্যে নয়, শিল্পীদের জন্যে।

এভাবেই আধুনিক শিল্পকলা জনসাধারণকে ভাগ করে দেয় দু-শ্রেণীতে–যারা এ-শিল্পকলা বোঝে ও যারা বোঝে না; অর্থাৎ যারা শিল্পী ও যারা শিল্পী নয়। নতুন শিল্পকলা শৈল্পিক শিল্পকলা। এর প্রশংসা আর পুরোনো শিল্পকলার নিন্দে করা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি চাই শুধু তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে। নতুন শিল্পকলা এখন একটি বিশ্বজনীন ব্যাপার। এর স্রষ্টারা বুঝতে পেরেছেন যে প্রথাগত শিল্পকলা তাঁদের জন্যে নয়। উপরন্তু তাঁরা বিরক্ত প্রথাগত শিল্পকলার প্রতি। এ-তরুণ শিল্পীদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা খুন করতে পারি বা পারি অনুধাবনের চেষ্টা করতে। যেই আমরা তাঁদের বোঝার বা অনুধাবনের উদ্যোগ নিই, তখন ধরা পড়ে যে তাঁরা পোষেণ এক সুস্পষ্ট, সুসমঞ্জস ও যৌক্তিক শিল্পবোধ। শিল্পকলায় পুনরাবৃত্তির কোনো মূল্য নেই। প্রতিটি শৈল্পিক ধারা একসময় নিঃশেষ হয়ে যায়। যখন কোনো পুরোনো ধারা নিঃশেষ হয়ে যায় তখন নতুন ধারার উদ্ভবকে ভাগ্য বলেই মানা উচিত। আধুনিক শিল্পকলার বিশ্লেষণ করলে ধরা পড়ে যে এর একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর বিমানবিকীকরণ প্রক্রিয়া।

এখন একটু প্রপঞ্চবিজ্ঞান চর্চা করতে চাই। মনে করা যাক একজন বিখ্যাত ব্যক্তি মারা যাচ্ছেন। তাঁর পাশে ব'সে আছেন তাঁর শোকাতুরা স্ত্রী, আর একজন চিকিৎসক পরীক্ষা করছেন নাড়ি। এছাড়াও আছেন আরো দু-ব্যক্তি : পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্যে সেখানে উপস্থিত একজন সংবাদদাতা, এবং আকস্মিকভাবে সেখানে উপস্থিত রয়েছেন একজন চিত্রকর। তাঁরা চারজন–স্ত্রী, চিকিৎসক, সংবাদদাতা, চিত্রকর–দেখছেন একই ঘটনা, তবু একই ঘটনা তাঁদের চারজনকে নাড়া দিচ্ছে বিভিন্নভাবে। শোকাতুরা বিহ্বল স্ত্রীর কাছে এ-ঘটনার, বিখ্যাত ব্যক্তিটির মৃত্যুর, যে-তাৎপর্য, তার সাথে সামান্যই মিল আছে চিত্রকরের কাছে প্রতিভাত তাৎপর্যের। স্ত্রী ঘটনাটিকে দেখছেন ব্যক্তিকভাবে আর চিত্রকর দেখছেন নৈর্ব্যক্তিকভাবে। তাঁদের দৃষ্টি এতো ভিন্ন যে সন্দেহ হ'তে পারে তাঁরা দুজন একই ঘটনাস্থলে উপস্থিত কিনা। তাই একই বাস্তবতা বা সত্য বিভিন্ন বাস্তবতা বা সত্যে বিশ্লিষ্ট হয়ে যেতে পারে যখন তার প্রতি তাকানো হয় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। তাই মনে প্রশ্ন জাগে–এসব বাস্তবতার মধ্যে কোনটিকে গ্রহণ করবো সত্য ও প্রামাণিক ব'লে? এর উত্তর হবে স্বেচ্ছাচারী। নিজ নিজ খেয়াল অনুসারেই আমরা কোনো একটিকে সত্য ব'লে মেনে নেবো। এ-বাস্তবতারাশি সমতুল্য; তবে এদের প্রতিটি প্রকৃত বা প্রামাণিক বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিকোণের নিকট। কথিত বিখ্যাত ব্যক্তিটির মৃত্যুশয্যায় চারজন ব্যক্তি চার দৃষ্টিকোণ নিয়ে উপস্থিত। তাঁদের চারজনের দৃষ্টিকোণের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করার জন্যে প্রয়োগ করতে পারি একটি মানদণ্ড। তা হচ্ছে মৃত্যুর ঘটনাটির সাথে তাদের আবেগিক দূরত্বের মাত্রা। ওই ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনা ও তাঁর শোকাতুরা স্ত্রীর মধ্যে কোনো আবেগিক দূরত্ব নেই,–ঘটনাটি তাকে এতোটা পীড়ন করছে, তাঁর মনকে এতোটা নিমগ্ন ক'রে রাখছে ঘটনার মধ্যে যে তিনি অভিন্ন হয়ে উঠেছেন মৃত্যুপথযাত্রীর সাথে। তিনি ওই ঘটনার অংশ। কোনো কিছু দেখতে হ'লে তার থেকে দর্শককে থাকতে হয় একটু দূরে। কিন্তু এখানে স্ত্রী ঘটনা থেকে দূরস্থিত নন;–তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত নন, তিনি অবস্থিত ঘটনার অভ্যন্তরে। তাই তিনি ঘটনাটি দেখছেন না; তিনি 'যাপন' করছেন ঘটনাটি।

চিকিৎসক অবস্থিত বেশ কিছুটা দূরে। তিনি পেশাগত দায়িত্ব পালন করছেন, তিনি ওই শোকভারাতুর মহিলার মতো ঘটনার অংশ হয়ে পড়েন নি। তবে চিকিৎসক হিশেবে দায়িত্ব পালনের জন্যে, আপন পেশার মহিমা রক্ষার জন্যে তিনিও কিছু পরিমাণে অংশ নেন ওই ঘটনায়। তিনি ওই ঘটনায় হৃদয়াবেগের সাথে জড়িত নন, তবে পেশাগতভাবে জড়িত। তিনিও কিছুটা 'যাপন' করেন ওই ঘটনা, তবে আবেগে নয়, পেশাগতভাবে। সাংবাদিকটির দিকে তাকালে দেখি তিনি সুদূরে অবস্থিত ওই বিয়োগান্তক ঘটনা থেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর মনে কোনো আবেগ নেই। সাংবাদিক এ-ঘটনাস্থলে কোনো মানবিক উৎসাহে নয়, পেশাগত কারণেই হাজির হয়েছেন ঘটনাস্থলে। তবে চিকিৎসকের সাথে তাঁর পার্থক্য আছে। চিকিৎসকের পেশা চিকিৎসককে ঘটনার অংশ হ'তে বাধ্য করে, আর সাংবাদিকের পেশা সাংবাদিককে বাধ্য করে দূরে থাকতে, পর্যবেক্ষকের ভূমিকা নিতে। তাঁর কাছে এটি একটি ঘটনামাত্র, যা সম্পর্কে তিনি পত্রিকায় প্রকাশ করবেন একটি প্রতিবেদন। ঘটনায় তিনি আবেগিক অংশ নেন না, আবেগগতভাবে মুক্ত তিনি; ঘটনাস্থলে তিনি একজন বহিরস্থিত। তিনি ঘটনাটি 'যাপন' করেন না, পর্যবেক্ষণ করেন। তবে পাঠকের মনে কিছুটা আবেগবেদনা সঞ্চারিত সংক্রামিত ক'রে দেয়ার বাসনা আছে তাঁর মনে। তিনি পাঠকদের আকৃষ্ট, আলোড়িত, এমনকি অশ্রুভারাতুরও ক'রে দিতে চান যেনো তাঁরা একজন প্রিয়জনের বিয়োগবেদনা বোধ করতে পারে। হোরেসের বিখ্যাত পরামর্শটি তাঁর জানা যে কাউকে কাঁদাতে হ'লে প্রথমে নিজে কাঁদতে হবে। তাই সাংবাদিক আবেগাভিনয় করেন এ-আশায় যে এতে তাঁর প্রতিবেদন সাহিত্যরসসমৃদ্ধ হবে। যদিও তিনি ঘটনাটি 'যাপন' করেন না, তবুও তিনি ভান করেন ঘটনাটি 'যাপনের'।

চিত্রকর ওই ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকলেও তিনি ওই ঘটনা থেকে যেনো শতক্রোশ দূরবর্তী। ঘটনার আবেগ তাঁকে আলোড়িত করে না, তিনি একজন নিরাসক্ত নৈর্ব্যক্তিক দর্শক। ঘটনার বিয়োগান্তক আন্তর তাৎপর্য তাঁর চোখে পড়ে না; তাঁর সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ শুধুমাত্র দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তুরাশির ওপর, বর্ণ, আলো ও ছায়ার ওপর। তাই চিত্রকর ওই ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকলেও ঘটনা থেকে তিনি সবচেয়ে দূরবর্তী ও সবচেয়ে কম আবেগে আলোড়িত।

ওপরে চেষ্টা করা হয়েছে বাস্তবতা ও আমাদের মধ্যে দূরত্বের মাত্রা নির্ণয়ের। আবেগগতভাবে কোনো ঘটনায় আমরা যতোটা অংশ নিই ততোটা অংশ হয়ে পড়ি ঘটনার, আর যতোটা দূরে থাকি আবেগগতভাবে ততোটাই নিজেদের মুক্ত ক'রে নিই ঘটনা থেকে। তখন আমাদের কাছে বাস্তব ঘটনাটি হয়ে ওঠে পর্যবেক্ষণের বস্তু। এর এক দিকে আছে বাস্তব জগত—ব্যক্তি, বস্তু, পরিস্থিতি, অর্থাৎ যাপিত বাস্তবতা, আর অন্য দিকে রয়েছে পর্যবেক্ষিত বাস্তবতা। বিভিন্ন ধরনের বাস্তবতার মূলে রয়েছে যাপিত বাস্তবতা; অন্যান্য বাস্তবতা এ-যাপিত বাস্তবতা থেকেই উৎসারিত। যাপিত বাস্তবতার সাথে যদি পরিচয় না থাকতো তাহলে তার কোনো বর্ণনা বা প্রতিকৃতিই বোধগম্য হতো না আমাদের। যে-চিত্রে বা কবিতায় যাপিত বাস্তবতার সামান্য চিহ্নও নেই, তা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অবোধ্য ও অর্থহীন। তাই বাস্তবতার মাত্রারাশির মধ্যে যাপিত বাস্তবতাই প্রধান, আর একেই আমরা গণ্য করি 'বাস্তবতা' রূপে। যাপিত বাস্তবতাকে মানবিক বাস্তবতাও বলা যায়। যে-চিত্রকর নৈর্ব্যক্তিকভাবে মৃত্যুদৃশ্য দেখেন, তাঁকে 'অমানবিক' ব'লে মনে হবে।

আধুনিক শিল্পকলা বিস্ময়কর দ্রুততায় এগিয়ে চলেছে বিচিত্র পথে, তবে তার রয়েছে এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য। আধুনিক শিল্পকলায় প্রধান হয়ে উঠছে এক নতুন শৈল্পিক সংবেদনশীলতা। যখন আধুনিক শিল্পকলার সবচেয়ে সাধারণ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য শনাক্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে উদ্যোগী হই, তখন দেখতে পাই যে এতে বড়ো হয়ে উঠেছে বিমানবিকীকরণপ্রবণতা। ১৮৬০-এর একটি চিত্রের দিকে তাকালে ধরা পড়ে যে চিত্রকর চিত্রটিতে আঁকা বস্তুসমূহকে এমনভাবে উপস্থাপিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন যাতে তা অবিকল তেমন থাকে, যেমন ছিলো যাপিত বা মানবিক বাস্তবতায়। অর্থাৎ তিনি চেষ্টা করেছেন অবিকল সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠার। ওই চিত্রের মানুষ, গৃহ, পাহাড় মুহূর্তের মধ্যে চেনা যায়, অনেক দিনের বান্ধব তারা আমাদের। কিন্তু একটি আধুনিক চিত্রে ওগুলোকে চিনতে কষ্ট হয়। আধুনিক শিল্পী বাস্তবকে অবিকল আঁকতে পারেন নি ব'লে যে এমন হয়, তা নয়, বরং এমন হয় কারণ তিনি যাত্রা করেছেন বাস্তবের বিপরীত অভিমুখে। বাস্তবের দিকে যাওয়ার বদলে যাচ্ছেন তিনি বাস্তবের বিপরীতে। তিনি বাস্তবকে ভাঙছেন, চুরমার করছেন তার মানবিক উপাদান, করছেন বাস্তবের বিমানবিকীকরণ। প্রথাগত চিত্রকলায় উপস্থাপিত অনেক কিছুর সাথেই কাল্পনিক সম্পর্ক পাতাতে পারি আমরা, প্রেমে পড়তে পারি কারো কারো; কিন্তু আধুনিক চিত্রে উপস্থাপিত কারো সাথে এমন সম্পর্ক পাতানো অসম্ভব। কারণ আধুনিক শিল্পী তাদের সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন ক'রে এনেছেন যাপিত বাস্তবতা থেকে, তাই তাদের আশ্রয় ক'রে আমরা কিছুতেই পৌঁছোতে পারি না চেনাজানা প্রাত্যহিক মানবিক জীবনে। আধুনিক শিল্পী আমাদের বন্দী করেন এক দুর্বোধ্য বিশ্বলোকে, যেখানে ছড়িয়ে আছে এমন সব বস্তুরাজি, যাদের সাথে মানবিক যোগাযোগ অকল্পনীয়। তাই তাদের সাথে গ'ড়ে তুলতে হয় যোগাযোগের ভিন্ন রীতি, যা বস্তুর সাথে আমাদের প্রথাগত সম্পর্করীতি থেকে আপাদশির ভিন্ন। এই যে নতুন জীবনরীতি, যাতে লুপ্ত হয়ে যায় স্বাভাবিক স্বতস্ফূর্ত জীবন, তাকে বলা যেতে পারে শিল্পবোধ ও শিল্পসম্ভোগ। এ-জীবনে যে আবেগ ও সংরাগ নেই, তা নয়, তবে এ-আবেগ ও সংরাগ আমাদের মানবিক জীবনের আবেগসংরাগ থেকে ভিন্ন। এ-অতিবস্তুরাশি আমাদের আন্তর শিল্পীর মনে জাগায় দ্বিতীয় এক ধরনের সংরাগ। ওগুলোই বিশেষভাবে নান্দনিক আবেগঅনুভূতি।

কেউ কেউ বলতে পারেন এ-ফলাফল লাভের সহজ উপায় তো মানবিক রূপ-আকার-আকৃতি–মানুষ, গৃহ, পাহাড়, অরণ্য প্রভৃতি একেবারে বাদ দেয়া, এবং এর বদলে গ'ড়ে তোলা সম্পূর্ণরূপে অভিনব মৌলিক আকার-আকৃতি-রূপ। কিন্তু তা সম্ভব নয়। এমনকি চরম বিমূর্ততম রেখায়ও লেগে থাকে কোনো-না-কোনো স্বাভাবিক আকার-আকৃতির ইশারা। তাছাড়া আধুনিক শিল্পকলা যে অমানবিক, তা শুধু এ-কারণে নয় যে এতে কোনো মানবিক উপাদান নেই, বরং এ-কারণে যে এটি এক সুস্পষ্ট বিমানবিকীকরণ ক্রিয়া। শিল্পী মানুষ, পাহাড়, গৃহ থেকে একেবারে ভিন্ন কিছু আঁকছেন বা আঁকবেন, এটা বড়ো কথা নয়, কথা হচ্ছে তিনি আঁকছেন এমন মানুষ, যার সাথে মানুষের সাদৃশ্য যথাসম্ভব স্বল্প, আঁকছেন এমন গৃহ বা পাহাড়, যাদের সাথে বাস্তব গৃহ ও পাহাড়ের রয়েছে ক্ষীণতম সাদৃশ্য। আধুনিক শিল্পী মানবিক উপাদানের ওপর এমন আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ক'রেই আহরণ করেন নান্দনিক সুখানুভূতি। অনেকের কাছে মনে হ'তে পারে যে বাস্তবতাকে এমনভাবে জয় করা বেশ সহজ, কিন্তু আসলে তা নয়। সম্পূর্ণ নিরর্থক ছবি আঁকা বা কথা বলা কঠিন কাজ নয়; আসক্তিহীন শব্দ ও এলোমেলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেখা সাজালেই তা হ'তে পারে। কিন্তু এমন কিছু সৃষ্টি করা, যা 'প্রকৃতি'র নকল নয় অথচ বহন করে তার সারবত্তা, তার জন্যে দরকার প্রতিভা।

উনিশশতকের অনুগ্রহ পাওয়া শিল্পকলা সব সময়ই ধারণ করেছে যাপিত বাস্তবতার এমন একটি শাঁস, যা কাজ করেছে নান্দনিক সুখানুভূতির মূলরূপে। অধিকাংশ মানুষের কাছে মানবিক উপাদান উপভোগ করাই হচ্ছে নান্দনিক সুখানুভূতি। তাদের কাছে শিল্পকলা হচ্ছে প্রতিফলিত জীবন, বিশেষ মেজাজে প্রকৃতিকে দেখা বা মানবভাগ্যের উপস্থাপন। কিন্তু নবশিল্পীরা বিশ্বাস করেন এর বিপরীতে। যাপিত বাস্তবকে উপভোগ করা প্রকৃত শিল্পসম্ভোগ নয়; তা একরকম প্রতারণা, অথচ উনিশশতক তার মাঝেই ঘোরাফেরা করেছে। শিল্পকলার সমস্ত মহৎ যুগই চেষ্টা করেছে যাতে তাদের শিল্পসৃষ্টি মানবিক উপাদানকে ঘিরেই আবর্তিত না হয়। আধুনিক শিল্পীরা ওই জীবন ছেড়ে চলেছেন শিল্পের মহিমামণ্ডিত সরণীতে। আর এ-জন্যেই তাঁরা ভাঙছেন বাস্তবকে, এবং চালাচ্ছেন বিমানবিকীকরণ প্রক্রিয়া।

আধুনিক সম্প্রদায় নিষিদ্ধ ক'রে দিয়েছেন শিল্পকলায় মানবিক উপাদানের অনুপ্রবেশ। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বস্তুরাশিতে গ'ড়ে ওঠা মানবিক উপাদান সৃষ্টি করে তিন স্তরের এক স্তরক্রম। প্রথমে আছে মানুষের জগত; তারপর সপ্রাণ বস্তুরাশির জগত; আর তৃতীয়ত রয়েছে অজৈব বস্তুরাশি। এ-স্তরক্রমে যা যতো ওপরে আধুনিক শিল্পকলা তাকে ততো নিষিদ্ধ মনে করে। তাই প্রথম স্তরটি, অর্থাৎ মানুষের জগতটিকে তাঁরা এড়িয়ে চলেন সবচেয়ে বেশি; কারণ তা সবচেয়ে মানবিক। এ-ব্যাপারটি সঙ্গীত ও কবিতায় চোখে পড়ে স্পষ্টভাবে। বিটোফেন থেকে হ্বাগনার পর্যন্ত সঙ্গীত প্রধানত ব্যাপৃত ছিলো ব্যক্তিক আবেগানুভূতির উৎসারণে। সুরকার ধ্বনির মহাকাঠামোতে পরিবেশন করতেন আত্মজীবনী। শিল্পকলা, কম-বেশি, ছিলো স্বীকারোক্তি। সংস্পর্শ- সংক্রমণ ছাড়া শিল্পভোগের আর কোনো উপায় ছিলো না তখন। 'সঙ্গীতে সংরাগরাশি সম্ভোগ করে নিজেদের', ঘোষণা করেছিলেন নিটশে। 'ট্রিস্টান ও ইজোল্‌ড়্'-এ হ্বাগনার ঢেলে দিয়েছিলেন মাথিলডা হ্বেসেনডংকের সাথে তাঁর ব্যভিচারকে। এ-সঙ্গীত উপভোগ করার জন্যে আমরাও কতিপয় ঘণ্টার জন্যে হয়ে উঠি অস্পষ্টভাবে ব্যভিচারী। ওই সঙ্গীত আমাদের কাঁদায়, কাঁপায়, ইন্দ্রিয়াতুরভাবে বিগলিত করে। বিটোফেন থেকে হ্বাগনার পর্যন্ত সব সঙ্গীতই মেলোড্রামা। কিন্তু একে প্রতারণা ব'লে মনে হয় আধুনিক শিল্পীর কাছে। কারণ এটা সুযোগ নেয় মানুষের সে-সহজাত মহৎ দুর্বলতার, যা মানুষের মধ্যে সংক্রামিত করে তার প্রতিবেশীর আনন্দবেদনাকে। হাসি ও অশ্রু, নান্দনিকভাবে, প্রতারক। সৌন্দর্য কখনো বিষণ্ন বা প্রসন্ন স্মিতহাসির অধিক ইশারা করে না। নান্দনিক সুখানুভূতি হওয়া উচিত দৃষ্টিসুখানুভূতি। সুখানুভূতি হ'তে পারে অন্ধ বা দৃষ্টিসম্পন্ন। মাতালের সুখ অন্ধ। তার সুখের মূলে আছে মদ্য, কিন্তু এর কোনো উদ্দেশ্য বা প্রেরণা নেই। যে-লোক কোনো বাজি জেতে, সেও সুখী, কিন্তু কিছুটা ভিন্নভাবে। সে কোনো কিছু পাবে ব'লে সুখী। মাতালের সুখ তাঁর ভেতরেই আবদ্ধ, সে জানে না কেনো সে সুখী। কিন্তু বাজিজয়ী জানে তার সুখের কারণ। সে জানে এমন কিছু ঘটেছে, যা সুখকর। কোনো ঘটনা যখন যান্ত্রিক না হয়ে মানসিক হয়ে উঠতে চায়, তখন তার থাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরকার এ-বোধ, এ-উদ্দেশ্যে। রোম্যান্টিক শিল্পকলায় উপভোগীরা শিল্পকর্মটি উপভোগ না ক'রে উপভোগ করে তাদের আবেগপুঞ্জ, ওই শিল্পকর্মটি হচ্ছে তাদের আনন্দের অ্যালকোহল। শিল্পকলা যখন কেবল যাপিত বাস্তবতারই সমাবেশ হবে, তখন এমন হবেই। যাপিত বাস্তবতার শক্তি এতো বেশি যে তা শিল্পের সৌন্দর্য ভোগে বাধা দেয়।

দেখার জন্যে দূরত্ব দরকার। প্রতিটি শিল্পকলা ব্যবহার করে একটি যাদুবাতি, যা তার বিষয়বস্তুকে দূরে সরিয়ে নেয় ও রূপান্তরিত করে। তার পর্দায় বিরাজ করে তারা সুদূর, অগম্য বিশ্বের অধিবাসীর মতো, পরম দূরত্বে। যখন তা না ঘটে তখন আমরা অভিভূত হই এক কিম্ভূত বিহ্বলতায়,– বুঝে উঠতে পারি না ওই বস্তুরাশি 'যাপন' করবো, না 'পর্যবেক্ষণ' করবো। এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ে মাদাম তুসোর মোমের পুতুলগুলোর কথা। ওগুলো মনে জাগায় একরকম অদ্ভুত অস্বস্তি। ওগুলো যে অস্বস্তি জাগায়, তার কারণ ওগুলো বাধা দেয় ওগুলো সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি নিতে। ওগুলোকে সজীব প্রাণী মনে করার সাথে সাথে ওগুলো রটিয়ে দেয় তাদের গোপন কথা। আবার পুতুল হিশেবে গণ্য করার সাথে সাথে ওগুলো যেনো প্রতিবাদী শ্বাস ফেলতে থাকে। পরিশেষে ওই সবগুলো ক্লান্ত, অসুস্থ করে আমাদের। নতুন সংবেদনশীলতা শিল্পকলায় মানবিক উপাদানের প্রাধান্যকে ততোটা অরুচিকর মনে করে যেমন অরুচিকর অনুভূতি জাগে সংস্কৃত মানুষের মনে মাদাম তুসোর মোমের পুতুল দেখে, যদিও জনতা সব সময়ই আনন্দ পাচ্ছে এ-জঘন্য মোমের ধোঁকা দেখে। জীবন ও শিল্পকে মিশ্রিত হ'তে দেখা খুবই বিরক্তিকর।

হ্বাগনারে মেলোড্রামা হয়ে ওঠে শিখরস্পর্শী। তাই তাঁর পর দেখা দেয় এক মৌল পরিবর্তন। সঙ্গীতকে ব্যক্তিক আবেগানুভূতি থেকে মুক্তি দেয়ার দরকার হয়ে পড়ে। প্রয়োজন হয়ে পড়ে তার বিশুদ্ধিকরণ। দেবুস্সি তাই করেন। তাঁর কারণেই এখন মূর্ছা আর অশ্রু ছাড়া প্রশান্তভাবে সঙ্গীত শোনা সম্ভব হয়ে উঠেছে। দেবুস্সি সম্পন্ন করেছেন সঙ্গীতের বিমানবিকীকরণ, তাই তিনি সূচনা করেছেন সঙ্গীতকলার নবযুগ।

একই ঘটনা ঘটেছে কবিতায়। কবিতাকেও মুক্ত করতে হয়েছে সব দায় থেকে। মানবিক উপাদানে বোঝাই হয়ে হাওয়া-ক'মে-যাওয়া বেলুনের মতো কবিতা গড়াচ্ছিলো, টুঁ খাচ্ছিলো গাছ আর গৃহচুড়োয়। এখানে মালার্মে দেখা দেন ত্রাতারূপে। তিনি গীতিকবিতাকে ফিরিয়ে দেন তার স্বর্গীয় গুণ ও উড়ালের শক্তি। সম্ভবত তিনি গন্তব্যে পৌঁছোতে পারেন নি, তবে তিনিই এর সূচনাকারী। রোম্যান্টিক শতকে কবিতার বিষয় কি ছিলো? কবিরা আমাদের জানাতেন তাঁদের উচ্চমধ্যবিত্ত ব্যক্তিক আবেগরাশি; তাঁদের প্রধানঅপ্রধান বেদনাপুঞ্জ, কামনাবাসনা, ধর্মীয় ও রাজনীতিক বিশ্বাস। তাঁদের দৈনন্দিন সত্তাকে প্রবল ক'রে তোলাই ছিলো তাঁদের অভিলাষ। তাঁরা চাইতেন খুব মানবিক হ'তে।

আধুনিক কবি চান শুধুমাত্র কবি হ'তে। সমস্ত নতুন শিল্পকলাই বিশ্বাসী স্বায়ত্তশাসনে, সুনির্দিষ্ট সীমানায়। তাঁর কাছে জীবন এক জিনিশ শিল্পকলা অন্য জিনিশ, তাই তিনি দুটিকে পৃথক রাখারই পক্ষপাতী। যেখানে ব্যক্তিমানুষটির শেষ সেখানেই শুরু কবির। ব্যক্তির নিয়তি হচ্ছে মানবিক জীবন যাপন করা, আর কবির নিয়তি যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অস্তিত্বহীন, তা উদ্ভাবন করা। কবি জগতকে ঋদ্ধ করেন বাস্তবতার সাথে তাঁর কল্পনাপ্রতিভার মহাদেশ যোগ ক'রে।

উনিশশতকে মালার্মেই প্রথম কবি, যিনি হ'তে চেয়েছিলেন আর কিছু নন, শুধু কবি। তিনি বর্জন করেছিলেন, তাঁর নিজের ভাষায়, 'প্রকৃতিদত্ত উপাদানরাশি' এবং রচনা করেছিলেন ক্ষুদ্র গীতিময় একগুচ্ছ বস্তু, যা মানবিক প্রাণী ও পুষ্প থেকে ভিন্ন। তাঁর কবিতা 'অনুভবের' জন্যে নয়। এ-কবিতায় যেহেতু নেই কোনো মানবিক উপাদান, তাই এর আবেগ অনুভবের কোনো সূত্রও নেই এতে। কবিকে তিনি মুক্ত করেছেন পেছনের ব্যক্তিটি থেকে। যে-দিকে তাকাই সে-দিকেই দেখতে পাই মানবিকতা থেকে পলায়ন। বিমানবিকীকরণ প্রক্রিয়ার কৌশল নানাবিধ। মালার্মের কৌশল থেকে আজকালকার কৌশল অনেক ভিন্ন। তবে আধুনিক সঙ্গীত যেমন শুরু হয়েছে দেবুস্সি থেকে, তেমনি সমস্ত আধুনিক কবিতা এগিয়ে চলেছে মালার্মের নির্দেশিত পথ ধ'রেই। এখন কবিতা হয়ে উঠেছে রূপকের উচ্চতর বীজগণিত।

আধুনিক কবিতা রূপকখচিত, আর রূপকই হচ্ছে বিমানবিকীকরণ প্রক্রিয়ার প্রধান অস্ত্র। রূপকই সম্ভবত মানুষের সবচেয়ে ফলবান সম্ভাবনার এলাকা। আমাদের আর সমস্ত শক্তি সীমাবদ্ধ ক'রে রাখে আমাদের বাস্তব জগতে, যা কিছু আছে তারই মাঝে। আমরা বড়োজোর পারি বিভিন্ন বস্তুকে মেলাতে বা ভাঙতে; শুধু রূপকই দিতে পারে মুক্তি। বাস্তবের মাঝে রূপক সৃষ্টি করতে পারে কাল্পনিক শিখর, ভাসমান দ্বীপপুঞ্জ। তবে রূপক বিমানবিকীকরণের বড়ো অস্ত্র হ'লেও এটিই একমাত্র নয়। আরো বহু আছে। প্রেক্ষাপট বদলে দিয়ে সহজেই এ-কাজ করা যায়। প্রাত্যহিক জীবনে সব কিছুই আমরা বিন্যস্ত দেখি এক স্বাভাবিক ক্রমে, সুনির্দিষ্ট স্তরক্রমে। কিছু কিছু জিনিশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিছু কিছু জিনিশ কিছুটা কম গুরুত্বপূর্ণ, আর কিছু জিনিশ একেবারেই তুচ্ছ। বিমানবিকীকরণের জন্যে বস্তুরাজির স্বাভাবিক স্বভাব বদলানোর দরকার নেই। শুধু মূল্যবিন্যাস বদলে দিয়ে এমন শিল্প সৃষ্টি সম্ভব, যাতে জীবনের তুচ্ছ ব্যাপারগুলো মহাআকার ধ'রে আবির্ভূত হয়।

এখানেই খুঁজে পাই আধুনিক শিল্পকলার দুটি আপাতবিষম রীতির মধ্যে—রূপকের পরাবাস্তবতার মধ্যে—সম্পর্কের সূত্র। এরা উভয়েই পরিতৃপ্ত করে বাস্তবকে এড়ানোর আকাঙ্খা। কাব্যিক উর্ধ্বলোকে উড়াল না দিয়ে শিল্পকলা ডুব দিতে পারে স্বাভাবিক প্রেক্ষাপটের নিম্নতলে। জীবনে যে-সব জিনিশ থাকে আমাদের চোখের আড়ালে, সেগুলোকে বড়ো করে তুলে সাধন করা যায় শিল্পকলার বিমানবিকীকরণ।

নিজ অধিকারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে রূপক এখন কমবেশি প্রধান ভূমিকা নিচ্ছে কবিতাসৃষ্টিতে। অর্থাৎ নান্দনিক লক্ষ্য বদলে গেছে, তা চলছে এখন বিপরীত অভিমুখে। আগে বাস্তবতাকে সাজিয়েগুজিয়ে দেয়া হতো রূপকালঙ্কারে, আর এখনকার প্রবণতা হচ্ছে কবিতাবহির্ভূতকে বা বাস্তবকে পরিত্যাগ করা। রূপককেই 'বাস্তবায়িত' করা, তাকেই কবিতায় পরিণত করা এখনকার লক্ষ্য। নান্দনিক প্রক্রিয়ার এ-উৎক্রম শুধু রূপকের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। এ-উৎক্রম ছড়ানো আধুনিক শিল্পকলার সমস্ত কলাপ্রকৌশলেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের মন ও বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক এখানে যে আমরা বস্তুসমূহকে ভাবি ও তাদের সম্বন্ধে ধারণা সৃষ্টি করি। বাস্তবতার ততোটুকুই আয়ত্তে আমাদের তার যতোটুকু সম্পর্কে আমরা ভাবনাধারণা তৈরি করতে সক্ষম হই। এ-ভাবনাধারণাগুলো মিনারের মতো, যেখান থেকে আমরা দেখি বিশ্বকে। প্রতিটি নতুন ভাবনাধারণা, গ্যেটে বলেছেন, নতুন বিকশিত প্রত্যঙ্গের মতো। ভাবনাধারণা দিয়ে আমরা দেখি বিশ্বজগতকে, কিন্তু মনের স্বভাব হচ্ছে যে ভাবনাধারণাগুলো দেখতে পাই না আমরা। যেমন চোখ দেখার সময় দেখতে পায় না নিজেকে। বলতে পারি, চিন্তা হচ্ছে ভাবনাধারণার সাহায্যে বাস্তবকে আয়ত্ত করার প্রচেষ্টা। তবে এক ধ্রুবদূরত্ব বিরাজ করে ভাবনা ও বস্তুর মধ্যে। বস্তু সব সময়ই তার সম্পর্কিত ধারণার পাত্রটিকে ভ'রে দিয়ে উপচে পড়ে, কারণ বস্তুটি তার সম্পর্কিত ভাবনাধারণা থেকে বেশি কিছু, অন্য কিছু। তাই ভাবনাধারণা থেকে যায় এমন এক মাচানের মতো যার সাহায্যে আমরা পৌঁছোতে চাই বাস্তবতায়। তবুও আমাদের স্বভাব হচ্ছে আমরা যাকে বাস্তবতা ভাবি তাকেই বাস্তবতা ব'লে গণ্য করি, এবং ভাবনাকে বস্তু ব'লে মেনে নিই। বাস্তবতার জন্যে আকুলতা আমাদের নিয়ে যায় বাস্তবতার এক আদর্শায়িতরূপে। এই হচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি। এখন যদি বদলে দিই এ-প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক অভিমুখ, তাকে ক'রে তুলি বিপরীতমুখি, বাস্তবের দিকে পিঠ ফিরিয়ে ভাবনাধারণাগুলোকে সজীব করে তুলি ভাবনাধারণারূপেই, অর্থাৎ যদি আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে 'বাস্তবায়িত' ক'রে তুলতে চাই আমাদের ভাবনাধারণাগুলোকে, তাহলে আমরা সম্পন্ন করি সেগুলোর বিমানবিকীকরণ ও বিবাস্তবায়ন। কারণ ভাবনাধারণা বাস্তবিকই অবাস্তব। তাদের বাস্তব রূপে গ্রহণ করা এক রকম আদর্শায়ন, অসত্যায়ন। অভিব্যক্তিবাদ, ঘনক্ষেত্রবাদ প্রভৃতি বাস্তবায়িত করতে চায় ভাবনাধারণাকে। এ-শিল্পীরা বস্তুর ছবি না এঁকে আঁকেন ভাবনাচিন্তার চিত্র। তাঁরা বাহ্যজগতের দিকে চোখ বন্ধ ক'রে দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ করেন অন্তর্লোকের মন্ময় চিত্রপুঞ্জের ওপর।

কেনো এ-বিমানবিকীকরণ? কেনো এ-বিরাগ মানবিক উপাদানের প্রতি? অন্যান্য ঐতিহাসিক প্রপঞ্চের মতো এরও মূলে রয়েছে নানা জটিল কারণ। তার সবগুলো বর্ণনা খুবই দুরূহ ও অসম্ভব। এর একটি কারণ প্রথাগত শিল্পকলার সাথে নতুন শিল্পীর সংঘর্ষ। নতুন প্রতিভার চিত্রে এতোদিন চলে-আসা শিল্পকলা সৃষ্টি করতে পারে ধনাত্মক বা ঋণাত্মক প্রতিক্রিয়া। তিনি খাপ খাওয়াতে পারেন অতীতের সাথে, মনে করতে পারেন অতীত তাঁর ঐতিহ্য, এবং তার উৎকর্ষসাধনে আত্মনিয়োগ করতে পারেন তিনি। বা হ'তে পারেন তিনি অতীতের প্রতি বিরূপ, প্রথাগত প্রতিষ্ঠিত গৃহীত শিল্পকলার প্রতি তাঁর থাকতে পারে স্বতস্ফূর্ত বিরাগ। অতীত-অনুরাগী শিল্পী খুশি থাকবেন প্রথাগত আধারআধেয় নিয়েই, পুনরাবৃত্তি করবেন তিনি কতিপয় পবিত্র রীতির, আর অতীতবিমুখ শিল্পী প্রথাগত ঐতিহ্য থেকে শুধুমাত্র স'রেই যাবেন না, সাথে সাথে তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করবেন কালপরম্পরায় মাননীয় আদর্শের প্রতি তাঁর প্রতিবাদ। কোনো কালের শিল্পকলা যদি গ'ড়ে ওঠে তার আগের কোনো কালের শিল্পকলার ওপর ভিত্তি ক'রে, তবে তা বুঝতে বিশেষ কষ্ট হয় না, বেশ সহজেই তা বোধগম্য হয়। কিন্তু অতীতের ঋণাত্মক প্রভাব বুঝতে, বিশেষ একটি শিল্পরীতি যে গ'ড়ে উঠেছে প্রথাগত রীতির সাথে সচেতন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরোধিতায়, তা বোঝার জন্যে দরকার বিশেষ উদ্যম। আধুনিক শিল্পকলার অনেক কিছুই জন্মেছে অতীতের, রোম্যান্টিসিজমের ঋণাত্মক প্রভাবে। বদলেয়ার কালো ভেনাসের স্তব করেছেন, কারণ প্রথাগতটি শাদা। তখন থেকেই শিল্পকলা প্রথাগত খাত থেকে দূরে স'রে আসতে শুরু করে, এবং এখন পুরোপুরি জন্ম নিয়েছে এমন এক শিল্পকলা, যা অতীতের বিরোধিতায় মুখর। এর কারণ খুবই সহজ। অতীতের ভার এখন বড়ো বেশি হয়ে পড়েছে, এতে রুদ্ধ হয়ে পড়েছে সমকালীন অনুপ্রেরণা। অন্যভাবে বলা যায়, প্রথাগত প্রণালিরাশি বাধা দেয় শিল্পী ও তাঁর চারপাশের জগতের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগে। এমন ক্ষেত্রে দুটি ব্যাপার ঘটতে পারে। অতীত শ্বাস রোধ করতে পারে নতুন সৃষ্টিপ্রতিভার, যেমন ঘটেছে মিশরে, বাইজানটিয়ামে, এবং সাধারণভাবে প্রাচ্যে। বা ধীরে ধীরে নতুন সৃষ্টিপ্রতিভা নিজেকে মুক্ত করতে পারে অতীতের ঘাতক হাত থেকে, এবং বিকশিত করতে পারে নতুন শিল্পকলার পর্ব। এটা ঘটেছে ইউরোপে। ইউরোপ চিরকালই ভবিষ্যমুখি, আর প্রাচ্য আক্রান্ত এক অসংশোধনীয় দুরারোগ্য প্রথাবাদে।

বিমানবিকীকরণ ও মানবিক উপাদানে বিরাগের মূলে বিশেষভাবেই রয়েছে বাস্তবতার প্রথাগত ভাষ্যের প্রতি বিরূপতা। আক্রমণের তীব্রতা ততো বেশি হয় লক্ষ্যস্থল হয় যতো সন্নিকট। উনিশশতকই আমাদের সবচেয়ে সন্নিকট, তাই উনিশশতকি রীতিনীতির প্রতি বিরাগবিরূপতা আধুনিক শিল্পকলায় সবচেয়ে প্রবল। অন্যদিকে আধুনিক সংবেদনশীলতা স্থানকালগতভাবে দূরস্থিত শিল্পের প্রতি পোষে সন্দেহজনক উৎসাহ। আদিমতা বা প্রাগৈতিহাসিকতার প্রতি আগ্রহ তার প্রবল। আসলে আদিম শিল্পের শৈল্পিক উৎকর্ষে মুগ্ধ নন আধুনিক শিল্পীরা, তাঁরা আকৃষ্ট ওই শিল্পকলার ঐতিহ্যহীনতার প্রতি। ঐতিহ্য, আধুনিক শিল্পীর কাছে, একটি অশ্লীল শব্দ।

অর্তেগা ঈ গাসেতের প্রবন্ধটি বেরোনোর পর কেটে গেছে ছটি দশক, এবং এ-গ্রহের পুবেপশ্চিমে নতুন কাল সৃষ্টি ক'রে বিকশিত হয়ে গেছে আধুনিক শিল্পকলা–কবিতা, উপন্যাস, সঙ্গীত, চিত্রকলা প্রভৃতি। এখন জেগে উঠছে প্রতিক্রিয়া, এবং আবার মানবিক উপাদানরাশি–বস্তু, মানুষ, মানুষের কামনা-বাসনা-আবেগ–দেয়াল ভেঙে ঢুকছে শিল্পকলায়। বাঙলায় আধুনিকতা এসেছিলো এক সময়, এখন চলছে তার বিদায়ের পালা। বাঙলা সাহিত্য সব সময়ই সাধারণত বোঝাই থেকেছে মানবিক উপাদানে, এবং এর দিকে তাকালে বারবার মনে হয় এ যতোখানি জীবনসৃষ্টি ততোখানি শিল্পসৃষ্টি নয়। এখানে জীবনের প্রাবল্য খুবই বেশি। মানবিক উপাদান এখানে এতো শস্তা ও সুলভ যে দু-হাতে ছানতে কে উৎসাহ বোধ করবে না! তাই এ-সাহিত্য মানবিক উপাদানে অনেক সময় এতোটা বোঝাই হয়ে ওঠে যে সমস্ত ব্যাপারটিকে মনে হয় ঘিনঘিনে, যদিও সাধারণ উপভোগীরা ভালোবাসেন ওই মানবিক নোংরার মধ্যে ডুবে থাকতেই। বাঙলা সাহিত্য ভাবালুতাপ্রাণ। ভাবালুতাই শিল্পকলা ব'লে গণ্য এখানে। আমাদের দুটি নোংরা শব্দ 'সুখদুঃখ'। মধ্যবিত্ত বাঙালির মনে রয়েছে একটি দুরারোগ্য দাদ, যা চুলকোলে পাওয়া যায় বিশেষ আনন্দ। ওই দাদটির নাম 'সুখদুঃখ'। যে-লেখক বাঙালিচিত্তের ওই দাদটি চুলকোনোর যতো বেশি প্রতিভা রাখেন, তিনিই ততো বেশি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদরণীয়। তিরিশের দশকে কবিতায়, ও কিছুটা গদ্যে, এসেছিলো আধুনিকতা, এখন পুনরায় ফিরে যাচ্ছি অনাধুনিকতায়। এটা স্বাভাবিক। দীর্ঘকাল ধ'রে একই রকম চলতে পারে না। তাছাড়া জীবন শিল্পসাহিত্যে উপস্থাপিত করা সহজ। যে-কোনো নির্বোধ আবেগ-বেদনা-অশ্রুচাপ পরিবেশন করলেই পায় শিল্পকলার ছদ্মবেশ, আর তাতে মানবিক সহানুভূতিবশত আলোড়িত হয়ে উঠতে পারে উপভোগীরা। তাই হচ্ছে এখন বাঙলা গদ্যেপদ্যে–স্রষ্টা শিল্পকলাঅন্ধ, উপভোগী শিল্পকলাঅন্ধ, অন্ধকারে দু-অন্ধ সৃষ্টি ও সম্ভোগ ক'রে চলেছে অশিল্প।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যাহ্নের অলস গায়ক : রোম্যান্টিক বহিরস্থিত রবীন্দ্রনাথ

সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি-মাঝে বহুকাল করিয়াছি বাস
সঙ্গীহীন রাত্রিদিন; তাই মোর অপরূপ বেশ,
আচার নূতনতর; তাই মোর চক্ষে স্বপ্নাবেশ,
বক্ষে জ্বলে ক্ষুধানল।– যেদিন জগতে চলে আসি,
কোন্ মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাঁশি।
'এবার ফিরাও মোরে', *চিত্রা*

একজন কবির জন্য সমাজ /রাষ্ট্র বরাদ্দ করে কোন স্থান? সামাজিক স্তরক্রমের কোন স্থানটি নির্ধারিত থাকে সে-সব মানুষের জন্য, যাঁদের দেয়া হয় 'কবি' অভিধা? বিভিন্ন ব্যক্তির বিচিত্র বিন্যাসে গ'ড়ে ওঠে সমাজসংগঠন, যাতে প্রত্যেকে কাজ ক'রে থাকে অপরিহার্য উপাদানের মতো। সমাজ হচ্ছে বিভিন্ন ব্যক্তি-এককের সমবায়ে গ'ড়ে-ওঠা সংগঠন। ওই সংগঠনে কেউ হ'তে পারে সামান্য, কেউ অসামান্য; কিন্তু তারা সবাই অপরিহার্য। তাই শাসক থেকে দাস পর্যন্ত প্রত্যেকের জন্যে স্পষ্ট স্থান ও ভূমিকা স্থির ক'রে রাখে সমাজ। সামাজিক স্তরক্রমের নির্দিষ্ট স্থলে তারা বিন্যস্ত হয়, পালন করে নির্ধারিত দায়িত্ব, আর ওই দায়িত্ব পালনের জন্যে সমাজ প্রতিপালন করে তাদের। কিন্তু সে-সব মানুষ, স্বপ্ন-আবেগ-উপলব্ধি ও আরো অজস্র ব্যাপার শব্দে বিন্যস্ত ক'রে যাঁরা 'কবি' নাম পান, তাঁদের জন্য সমাজ বরাদ্দ করে কোন স্থান? তাঁদের ওপর অর্পণ করে কোন দায়িত্ব?

মানুষ-প্রজাতিটির বিকাশ ঘটতে ঘটতে যে-দিন এতোটা বিকাশ ঘটে যে তাদের মধ্যে কেউ কেউ স্বপ্ন আবেগ উপলব্ধি শব্দে ন্যস্ত করতে শুরু করে–লৌকিক প্রতিবেশে দেখা দিতে থাকে অলৌকিক অনুপ্রাণিত কবি–সে-দিন জন্ম নেয় একটি দুর্মর সমস্যা : সমাজ ও এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে স্থাপিত হয় এক অস্বস্তিকর সম্পর্ক। ওই মানুষেরা কবি। সমাজ কোন স্থানে বিন্যস্ত করবে তাঁদের, দেবে কোন ভূমিকা পালনের দায়িত্ব? কবি কি অপরিহার্য সমাজের জন্যে, যেমন অপরিহার্য একজন আমলা বা অধ্যাপক বা চিকিৎসক বা কৃষক? কবিকে কি দেয়া সম্ভব এমন কোনো দায়িত্ব, যা শুধু তিনিই পালন করতে পারেন, এবং তিনি পালন না করলে অচল হয়ে পড়বে সমাজ? এ-সব প্রশ্নের স্পষ্ট সদুত্তর দিতে সাধারণত বিব্রত বোধ করে মানবসমাজ। সোজাসুজি ব'লে দিতে পারে না যে সমাজে কবি সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়, আবার এও স্বীকার করতে পারে না যে সামাজিক স্তরক্রমে কবির জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট জায়গা এবং নির্ধারিত রয়েছে নির্দিষ্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দায়িত্ব। তাই শুরু থেকেই—কবি ও কবিতার উন্মেষকাল থেকেই কবিরা সমাজের মধ্যে রয়েছেন সামাজিক স্তরক্রমে বিন্যস্ত না হয়েই। তাঁরা যেনো সেই নিয়তি ও সমাজদণ্ডিত মানবগোত্র সমাজে বাস ক'রেও যাঁদের সমাজের ভেতরে প্রবেশাধিকার নেই। সমাজে বাস ক'রেও তাঁরা যেনো সমাজবহিরস্থিত।

প্রথম যখন দেখা দিয়েছিলেন কবিরা, গান গেয়ে ফিরছিলেন মুগ্ধ শ্রোতাদের মধ্যে, তখন সমাজ তাঁদের কোনো বাস্তব দায়িত্ব দিতে পারে নি। কিন্তু তাঁদের কথা ও সুর মধুর ব'লে মনে হয়েছিলো অনেকের কাছে, তাই সমাজ তাঁদের মেনে নিয়েছিলো চিত্তবিনোদনকারী চারণ রূপে। ক্রমশ তাঁদের মহিমা বাড়তে থাকে, তাঁদের কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হ'তে থাকে এমন সব বাণী, যা শুধু চিত্তবিনোদন ক'রেই নিঃশেষ হয়ে যায় না, বরং মানুষকে দিতে থাকে বিভিন্ন রকম শিক্ষা। পৃথিবীর নানা প্রান্তে ধর্মগ্রন্থগুলো রচিত হওয়ার আগে কবিরাই গণ্য হন সমাজের নীতিশিক্ষকরূপে। তবে কবিদের নীতি কারো কারো কাছে দুর্নীতিরূপেই গণ্য হয়, এবং আদর্শ রাষ্ট্র থেকে বহিষ্কৃত হ'তেও তাঁদের বিশেষ সময় লাগে নি। তবুও কালে কালে কবিদের শির ঘিরে মহিমার জ্যোতিশ্চক্র পরিয়ে দিতে কবিরা ও অনুরাগীরা কোনো দ্বিধা করে নি। উনিশ শতকেও 'শূন্যতায়-ডানা-ঝাপটানো ব্যর্থ রোম্যান্টিক দেবদূত' শেলি দাবি করেছিলেন যে কবিরা মানবজাতির অস্বীকৃত বিধানকর্তা। এসব সত্ত্বেও একটি সত্য অটল থেকে গেছে যে কবিরা সামাজিক স্তরক্রমে বিন্যস্ত নন। তাঁদের নেই কোনো নির্দিষ্ট ভূমিকা পালনের দায়িত্ব; অর্থাৎ তাঁদের স্থান সমাজসংগঠনের অভ্যন্তরে নয়, তাঁরা বহিরস্থিত।

তাই শুরু থেকেই কবিরা সমাজে থেকেছেন প্রবাসীর মতো;—সমাজে বাস করেছেন, কোনো-না-কোনো সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন; কিন্তু কবি হিশেবে সামাজিক স্তরক্রমে গৃহীত হন নি। বহু কবি অবশ্য বন্দনা ক'রে গেছেন সে-সমাজকাঠামোর, যাতে বাস করেছেন তাঁরা, তবে একটু ভালোভাবে তাকালে চোখে পড়ে একজন আমলা, বা সমাজ-গৃহীত-ব্যক্তির থেকে ওই কবিও অনেক পৃথক—সমাজের সাথে খাপ-খাওয়ার মাত্রায়। আর বহু কবি—দেশে দেশে ও কালে কালে—যাপন ক'রে গেছেন সমাজচ্যুতের, নির্বাসিতের, দণ্ডিতের জীবন; তবে রোম্যান্টিসিজমের উদ্ভবের আগে কবি ও সমাজের সম্পর্কটি কখনো প্রচণ্ডভাবে অস্বস্তিকর ও সংকটপূর্ণ হয়ে ওঠে নি। ইউরোপে যখন রোম্যান্টিক ঝড় বইতে শুরু করে, তখন দেখা যায় যে কবি ও সমাজের মধ্যে এতোদিন যে-সম্পর্ক ছিলো অস্বস্তিকর, তা হয়ে উঠেছে সংকটপূর্ণ ও বিপজ্জনক। রোম্যান্টিসিজম চেতনালোকে ঘটিয়ে দেয় এক বড়ো রকমের বদল, তা ইউরোপীয় প্রথাগত চিন্তাধারার মেরুদণ্ডেই ধরিয়ে দেয় চিরকালের জন্য এক মস্ত ফাটল। যুক্তিই ছিলো আঠারোশতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত ইউরোপীয় চিন্তাপ্রণালির শিরদাঁড়া। ওই চিন্তাপ্রণালির এমন একটা বিশ্বাস ছিলো যে সব কিছু চমৎকারভাবে বোঝা সম্ভব যুক্তিশৃঙ্খলার সাহায্যে। তাদের কাছে সব কিছুই ছিলো নিউটনীয় সৌরলোকের মতো সুশৃঙ্খল, যেখানে কোনোক্রমেই ব্যত্যয় ঘটে না একটিও সূত্রের। রোম্যান্টিকেরা কড়া প্রশ্ন তোলেন এ-সম্পর্কে; এবং তাকে ত্যাগ ক'রে গ্রহণ করেন নতুন মানদণ্ড ও মূল্যবোধ, এবং সূচিত হয়ে যায় ইউরোপীয় চৈতন্যের মহাসংকট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুটি বৈশিষ্ট্যকে প্রধান ক'রে তোলেন রোম্যান্টিকেরা;– একটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, অন্যটি কল্পনাপ্রতিভা। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মূল হচ্ছে অহংবোধ;–এমন এক বোধ যাতে ব্যক্তিই হয়ে ওঠে তার বিশ্বের কেন্দ্র। রোম্যান্টিক কবি তাঁর সৌরলোকে সূর্যের মতো– তাঁকে ঘিরেই আবর্তিত হয় সব কিছু। আর কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ শুধু তিনি নিজে। রোম্যান্টিক কবির সৌরলোক ভ'রে বিরাজ করে এক মহা 'আমি'– সব কিছু ওই আমিরই বিচ্ছুরণ। তাই রোম্যান্টিক কবির চোখে পান্নার কোনো রঙ নেই, কোনো রঙ নেই চুনির, শুধু তাঁরই চেতনার রঙে পান্না সবুজ আর চুনি রাঙা হয়ে ওঠে। গোলাপ সুন্দর হয়ে ওঠে তাঁরই কথায়। ব্যক্তির ওপর এতোটা গুরুত্ব আরোপ পালাবদলের সূচনা করে সমাজ ও শিল্পকলার ইতিহাসে। মধ্যযুগে সামন্তবাদী সমাজে প্রতিটি মানুষের লক্ষ্য ছিলো সমাজসংগঠনের সাথে খাপ খাওয়ানোর। তারা আত্মসমর্পণ করতো সমাজের অভিলাষের কাছে। এ-আত্মসমর্পণের পুরস্কারস্বরূপ তারা গৃহীত হতো সমাজে;– তা যতো নিম্নস্তরেই হোক-না-কেনো। গৃহীত হওয়ার মধ্যেই স্বস্তি। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সমাজের সাথে খাপ-খাওয়ার প্রথাগত আদর্শের বিরোধী, কেননা এতে, সমাজ নয়, ব্যক্তিই প্রধান। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ব্যক্তিকে দেয় স্বাধীনতা, তবে এ-স্বাধীনতা অনেক দামে কেনা। বিশেষ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত থাকার মধ্যে আছে যে-স্বস্তি ও নিশ্চয়তা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী বাতিল ক'রে দেয় তাকে; অর্থাৎ সে স্বস্তি-নিরাপত্তা-নিশ্চয়তার মূল্যে কেনে তার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা। একবার মানুষ যখন ছেড়ে দেয় প্রতিষ্ঠিত স্থির আশ্রয়স্থল, তখন সে নিশ্চয়তা ও আশ্রয় খোঁজে নিজেরই অভ্যন্তরে। রোম্যান্টিক কবি সেই মানুষ, যিনি পরিত্যাগ করেন নিশ্চিত আশ্রয়ভূমি, প্রতিষ্ঠিত সমাজকাঠামো, এবং হয়ে ওঠেন নিরাশ্রয়, নিরবলম্ব। তাই রোম্যান্টিক কবি বাহ্যজগতে আশ্রয় না খুঁজে, যুক্তিশৃঙ্খলার শরণ না নিয়ে আশ্রয় খোঁজেন নিজেরই মনোবিশ্ব ও কল্পনাপ্রতিভার মধ্যে। অস্থিরতা তাঁকে সারাক্ষণ কাঁপায়, এক অদৃশ্য আগুন তাঁকে সারাক্ষণ পোড়ায়। রোম্যান্টিক কবি ও নায়ক আকাশের চাতকের চেয়েও অস্থির;– এক গোপন যন্ত্রণা কুরেকুরে খায় তাদের আনন্দ ও যৌবন।

১৭৭৪ অব্দে বেরোয় গ্যেটের উপন্যাস *তরুণ হ্বের্টেরের দুঃখ*। এ-গ্রন্থে জন্ম নেয় এক হতভাগ্য, আপন-অহমিকা-বন্দী, সমাজবিলগ্ন রোম্যান্টিক নায়ক, যে হয়ে ওঠে রোম্যান্টিক নায়কদের আদিপুরুষ ও প্রতিভূ। এরপর, গত দু-শো বছর ধ'রে, জন্মেছে তার অজস্র উত্তরাধিকারী, যারা নানাভাবে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছে সমাজ থেকে, বন্দী থেকেছে নিজেদের মনোবিশ্বে, এবং হয়ে উঠেছে সমাজের সাথে খাপ-না-খাওয়া মানুষের উদাহরণ। এরা প্রায় সবাই, গ্যেটের হ্বের্টেরের মতো, উৎকৃষ্টতম জীবন যাপনের জন্যে সর্বাংশে উপযুক্ত ছিলো, কিন্তু তারা সে-পথে যায় নি, বরং বেছে নিয়েছে যন্ত্রণা, এমনকি মৃত্যু। হ্বের্টেরের নানা গুণ ছিলো, সেগুলো কাজে খাটালে সে যাপন করতে পারতো চমৎকার সামাজিক জীবন, কিন্তু তার স্বভাব তাকে ওইগুলোর সদ্ব্যবহার থেকে বিরত রাখে। সে বান্ধবদের থেকে ও প্রতিবেশ থেকে আত্মকেন্দ্রের দিকে গুটিয়ে নিতে থাকে নিজেকে, এবং বোধ করতে থাকে যে বাস্তব জগত তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এমন বোধের পরিণতি আত্মহত্যা–হ্বের্টের আশ্রয় নেয় আত্মহত্যারই। হ্বের্টের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম রোম্যান্টিক বহিরস্থিত– সমাজের সাথে খাপ-না-খাওয়া মানুষ। সে ও তার উত্তরাধিকারীরা নিজেদের অন্তরেই বহন করে খাপ-না-খাওয়ার বীজ, আর সমাজ ওই বীজকে নানারকমভাবে লালন ক'রে পরিণত করে বিষবৃক্ষে। হ্বের্টেরের পথ ধ'রে এসেছে আরো অনেক রোম্যান্টিক নায়ক– বহিরস্থিত, খাপ-না-খাওয়া, আপন অন্তর্লোকে কারারুদ্ধ। দেখা দেয় শাতোব্রিয়াঁর রেনে, ম্যুসসের অকটেভ, বায়রনের ম্যানফ্রেড, নোভালিসের অফটারডিংগেন, শেলির আলাস্টর, যারা স্বেচ্ছায় নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছিলো সমাজ থেকে। তারা সবাই সমাজে শীতল আগন্তুক– আউটসাইডার– বহিরস্থিত। এ-নায়কদের মতো তাদের স্রষ্টারাও মর্মমূলে বহিরস্থিত।

রোম্যান্টিক কবিরা বাস্তব সত্যের চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক'রে তোলেন কল্পনাপ্রতিভাকে; রামের জন্মভূমির চেয়ে বহুগুণে সত্য হয়ে ওঠে তাঁদের কাছে নিজেদের মনোভূমি। এ-কল্পনাপ্রতিভার সাহায্যেই তাঁরা সৃষ্টি করেন আপন বিশ্বলোক। তাঁরা যে-বিশ্বলোক সৃষ্টি করেন, তার ভিত্তি হচ্ছে অহমিকা, সেখানে মূল্যবান শুধু ওই ব্যক্তি-অহমের আবেগ-অনুভূতি-বোধি। অন্যরা যেখানে পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে বস্তুগতভাবে অনুধাবন করে সব কিছু, রোম্যান্টিক কবিরা সেখানে সব কিছু উপলব্ধি করেন নিজেদের কল্পনাপ্রতিভার সাহায্যে। কারণ, রোম্যান্টিকদের কাছে বস্তু তাঁদের অহমিকার চেয়ে অনেক কম মূল্যবান; তাই তাঁরা সব কিছুকে কল্পনাপ্রতিভার সাহায্যে সৃষ্টি ক'রে নেন নতুন রূপে। তাঁরা, বস্তুজগতকে অনেকটা বর্জন ক'রে, অধিবাসী হয়ে ওঠেন তাঁদের কল্পনাপ্রতিভার সৃষ্ট কল্পজগতের। বাস্তব ও কল্পজগতের মধ্যে রচিত হয় যে-বৈপরীত্য, তাতে তারা নেন কল্পজগতেরই পক্ষ। অহমিকা তাঁদের সরিয়ে নেয় বাস্তব থেকে, কল্পনাপ্রতিভা তাদের সুদূরে নিয়ে যায় বাহ্য প্রতিবেশপৃথিবী থেকে, এবং রোম্যান্টিক কবির সমাজ-বহিরস্থিততা পরিগ্রহ করে চরম রূপ। তবে রোম্যান্টিক কবিরা শুধু সমাজ থেকে স'রে যাওয়া মানুষই নন, তাঁদের অনেকেই সমাজদ্রোহী। প্রথাগত প্রতিষ্ঠিত সমাজকে আমূল বদলে দেয়ার স্বপ্ন তাঁরা অনেকেই দেখেছেন। সমাজের সাথে খাপ-না-খাওয়ার ব্যাপারটি আরো এগিয়ে নিয়ে যান রোম্যান্টিকদেরই উত্তরসূরী প্রতীকী কবিরা। প্রতীকীরা ঠাণ্ডাভাবে নীরবে নিঃশব্দে নিজেদের গুটিয়ে নেন জীবন ও সমাজ থেকে, চারপাশের স্থূল ঘৃণ্য জীবনজগতের বিরুদ্ধে কোনো ক্ষোভ প্রকাশ না ক'রে তাকে ঠাণ্ডা অবহেলায় অস্বীকার ক'রে তাঁরা ঢোকেন নিজেদের অন্তর্লোকে। সমাজ-বহিরস্থিত প্রতীকী নায়কের প্রতিভূ ভিলিয়ের দ্য লিজল্-আঁদের নায়ক অ্যাকজেল। অ্যাকজেল স্বেচ্ছায় নিজেকে সমাজ থেকে সরিয়ে নিয়ে বাস করে অরণ্যের মধ্যে এক পুরানো প্রাসাদে। সে যে-জীবন যাপন করে, তা বিশুদ্ধরূপে ধ্যান ও কল্পনার, যাতে স্থূল জীবনের কোনো ছোঁয়া নেই। যে-মুহূর্তে সে প্রেমে পড়ে, সে-মুহূর্তেই তার জীবন কানায়কানায় ভ'রে ওঠে, এবং জীবনের সমস্ত দরকার নিঃশেষ হয়ে যায়। তার সব কিছুই ছিলো–যৌবন, প্রেম, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, শক্তি ও সাড়ে তিনশো মিলিয়ন মুদ্রা, যা দিয়ে সে জীবন সম্ভোগ করতে পারতো দু-হাতে ছেনে। কিন্তু সে তা চায় না; প্রেমের চরম মুহূর্তে সে চায় মৃত্যু; কেননা চরম মুহূর্ত কেটে গেলে জীবন হবে এক স্থূল ক্লান্তির নামান্তর। সে তাই জীবন যাপনের দায়িত্ব অর্পণ করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যান্য নোংরা দায়িত্বের মতো, তার গৃহভৃত্যদের ওপর। প্রতীকী নায়কেরা চরম স্বাপ্নিক ও চরম সমাজ-বহিরস্থিত। লাফর্গের লোহেগ্রিন বাসররাতেই নববধূর দিকে পিঠ ফিরিয়ে বুকে বালিশ চেপে ধ'রে স্বপ্ন দেখে তার সালোমের। মালার্মের *ইগতুর* নাটকের নায়ক, যে নাটকের একমাত্র চরিত্র, কোনো কাজ করে না, শুধু স্বগতোক্তি করে, আর উ্যসম্যঁর দ্য এসিয়েন্তে এমন এক জীবন যাপন করে, যা বাহ্যজগতের সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্করহিত : সে দিনের বেলা ঘুমোয় আর রাতে জেগে থেকে পড়ে দুরূহ গ্রন্থ। রোম্যান্টিকেরা যে-বহিরস্থিত জীবনযাপনের সূচনা করেছিলেন, প্রতীকীরা তাকে চূড়ান্তে নিয়ে যান। অর্থাৎ কবি– রোম্যান্টিক ও প্রতীকী– হয়ে ওঠেন খাপ-না-খাওয়া মানুষ;– বহিরস্থিত।

কবি ও কবিতার আবির্ভাবকাল থেকেই সমাজের সাথে কবির যে-অস্বস্তিকর সম্পর্ক চ'লে এসেছে, তাই রোম্যান্টিসিজমের উদ্ভবের ফলে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কবি সমর্থ হন সমাজকে পরিচ্ছন্নরূপে অস্বীকার করতে, অবহেলা করতে, এবং পরিত্যাগ করতে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ ঘটা ছাড়া এমন অস্বীকার ও পরিত্যাগ সম্ভব হতো না। কবিরা চিরকালই বোধ ক'রে এসেছেন যে বাস্তবনিষ্ঠ সামাজিকদের কাছে তাঁদের সৃষ্টির মূল্য খুবই সামান্য; কিন্তু সামন্তবাদী, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-স্বীকার-না-করা সমাজে সামাজিকদের পৃষ্ঠপোষকতা, করুণা, স্নেহকেই সম্বল ক'রে চলতে হয়েছে তাঁদের। রোম্যান্টিসিজমের উদ্ভববিকাশের সময় ইউরোপে সংঘটিত হয় শিল্পবিপ্লব, এবং উদ্ভববিকাশ ঘটে পুঁজিবাদী বুর্জোয়াদের। বুর্জোয়ারা সমাজসংগঠনকে এক ধাপ এগিয়ে দেয়, স্বীকার ক'রে নেয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, কিন্তু সব কিছুকেই তারা পরিণত করে পণ্যে। সব কিছু মূল্যায়নের জন্যে তারা স্থির ক'রে দেয় একটি মানদণ্ড, তা হচ্ছে উজ্জ্বল ঝলমলে মুদ্রা। আর ওই মুদ্রাকেই সবচেয়ে ঘৃণা করেন রোম্যান্টিকেরা। মুদ্রানিয়ন্ত্রিত সমাজকাঠামোতে, রোম্যান্টিকেরা বুঝতে পারেন– যা আরো ভালো ক'রে বোঝেন প্রতীকী কবিরা– যে তাঁদের, ও তাঁদের সৃষ্টির কোনো দাম নেই। পুঁজিবাদী বুর্জোয়া সব কিছুকেই পুঁজি ক'রে তোলে– শিশির আর সূর্যাস্ত, প্রিয়ার মুখ আর ওষ্ঠও তার কাছে পুঁজি। তার আরাধ্য দেবতার নাম মুদ্রা। তার চোখে মুদ্রার চেয়ে সুন্দর আর কিছু নেই। কিন্তু রোম্যান্টিক কবি এ-মানদণ্ড ও মূল্যবোধের সম্পূর্ণ বিরোধী; তাঁর আরাধ্য হচ্ছে সৌন্দর্য। যা কিছু মুদ্রা দিয়ে আয়ত্ত করতে হয়, তাই ঘৃণার বস্তু তাঁর কাছে। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেন পুঁজিবাদী সমাজে একখণ্ড লোকোত্তর গীতাঞ্জলির চেয়ে অনেক দামি এক জোড়া চটিজুতো। তবে বুর্জোয়া সমাজকাঠামোতেই, যেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত, তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় সমাজকে অস্বীকার ক'রে আন্তর বিশ্বলোক সৃষ্টি। সমাজ যারা চালায়, তাদের সাথে মেলা কি সম্ভব ছিলো ওই অতিসংবেদনশীল, সৌন্দর্যআলোড়িত, স্বপ্নচালিত কবিদের? তা সম্ভব ছিলো না। চিরকালই সমাজ শাসন ক'রে আসছে তৃতীয় মানের প্রায়-বর্বর, সংবেদনাশূন্য, স্থূল মানুষেরা। তাই তাদের সাথে মেলার কোনো পথ ছিলো না। একদিকে সংবেদনশীল স্বাপ্নিক, আরেক দিকে স্থূল, গৃধ্নু সমাজনিয়ন্ত্রক;– তাদের মিলনের কোনো উপায় ছিলো না। তাই তাঁরা স্থূল, শক্তিমান, গৃধ্নুদের হাতে বাস্তব ও সমাজকে ছেড়ে দিয়ে নিজেদের জন্য বেছে নেন স্বপ্নকে, অবাস্তবকে, সৌন্দর্যকে। সমাজে থেকেও থাকেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজ-বহিরস্থিত।

রোম্যান্টিক বহিরস্থিতদের কথা মনে হ'লে বাইবেলের জোসেফকে মনে পড়ে : জোসেফ হ্যাড এ কোট অফ মেনি কালারস, অ্যান্ড হি ওয়াজ এ ড্রিমার অফ ড্রিমস। রোম্যান্টিক বহিরস্থিতদের পরিধেয় বস্ত্রও বহু রঙের, আর তাঁরা ড্রিমার অফ ড্রিমস : স্বপ্নের স্বাপ্নিক। প্রিরাফায়েলাইট উইলিয়ম মরিস তাঁর *পার্থিব স্বর্গ* (১৮৬৮-১৮৭০) কাব্যের 'প্রস্তাবনা'য় এ-রোম্যানটিক বহিরস্থিতদের চরিত্র তুলে ধরেছিলেন চমৎকারভাবে। তাঁরা 'স্বপ্নের স্বাপ্নিক, যথাসময়ের আগেই জন্ম হয়ে গেছে তাঁদের।' মরিস 'প্রস্তাবনা'য় চারণের মতো গেয়েছেন এমন গান : 'স্বর্গ ও নরকের গান গাওয়ার কোনো শক্তি আমার নেই, আমি মুছিয়ে দিতে পারি না তোমাদের চোখের জল, অথবা দ্রুত আসন্ন মৃত্যুকে থামিয়ে দিতে পারি না আমি; বা পারি না ফিরিয়ে আনতে ফেলে-আসা নানান রঙের দিনগুলোর প্রমোদ।' এ-স্বাপ্নিক এসব অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন না; কারণ তিনি রোম্যান্টিক বহিরস্থিত–'শূন্য দিনের অলস গায়ক'–'দি আইডল সিঙ্গার অফ অ্যান এম্প্‌টি ডে।' তাঁরা সঙ্গীতনির্মাতা। এ-প্রসঙ্গে মরিসেরই সহযাত্রী ও'শনেসির একটি স্তবক স্মরণযোগ্য : 'We are the music makers,/And we are the dreamers of dreams,/Wandering by lone sea-breakers,/And sitting by desolate streams;_/World-losers and world-forsakers,/On whom the pale moon gleams:/Yet we are the movers and shakers/Of the world for ever, it seems.' [প্রবন্ধটি লিখিত, পঠিত ও প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার বছর খানেক পর অন্যমনে রবীন্দ্রনাথের *The Religion of Man* উল্টাতে গিয়ে চমকে উঠি, দেখি এর অষ্টম অধ্যায়ের নাম 'The Music Maker'। সন্দেহ থাকে না যে কবিতাটির অংশ বিশেষ তিনি উদ্ধৃত করবেন এ-অধ্যায়ে, এবং দেখতে পাই পরিচ্ছেদের মধ্যভাগে তিনি উদ্ধৃত করেছেন কবিতাটির দুটি পংক্তি। তিনি বলেন, 'কবি মানুষের শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা দেন, যখন তিনি বলেন : We are the music makers,/we are the dreamers of dreams.' তাই রবীন্দ্রদৃষ্টিতে শুধু কবি নয়; মানুষ মাত্রই স্বপ্নের স্বাপ্নিক। নাকি মানুষ মাত্রই কবি?]

তাঁরা সঙ্গীতনির্মাতা আর স্বপ্নের স্বাপ্নিক, নির্জন সমুদ্র ও বিজন স্রোতস্বিনীতীরে ভ্রমণচারী। তাঁরা পৃথিবীকে হারিয়েছেন, আর পৃথিবী হারিয়েছে তাঁদের। তাঁদের ওপর আলো ঢালে আকাশের ম্লান চাঁদ। 'স্বপ্ন' ও 'কল্পনা' শব্দ দুটি ধ্রুবপদের মতো ব্যবহার করেন রোম্যান্টিক বহিরস্থিতরা, এবং গ'ড়ে তোলেন এমন এক বিশ্ব, যা বিষণ্ন, অশ্রুময়, প্রকৃতির শ্বাসপ্রশ্বাসে স্নিগ্ধ, স্বপ্নরঞ্জিত ও সৌন্দর্যভারাতুর। তাঁদের জগতে ঢুকলে সুখ পাওয়া যায়, বুক ভ'রে নিশ্বাস নেয়া যায়। বিশশতকে যে-অস্তিত্ববাদী বহিরস্থিতরা দেখা দেয়, তাদের জগত রোম্যান্টিক বহিরস্থিতদের জগতের সম্পূর্ণ বিপরীত। অস্তিত্ববাদী বহিরস্থিতদের জগত শ্বাসরুদ্ধকর, তা বিবমিষা জাগায়, ওই জগতে বিরাজ করে না কোনো মূল্যবোধ। জীবনানন্দের ভাষা ধার ক'রে বলা যায়, অস্তিত্ববাদী বহিরস্থিতদের জগতে সব মূল্যবোধ প'চে প'চে শুয়োরের মাংস হয়ে যায়। রোম্যান্টিকদের জগত তেমন নয়; সেখানে বিরাজ করে মানবিকতা। তাই দেখা যায় রোম্যান্টিক বহিরস্থিত সাধারণত জীবন ও সমাজের চাপে ক্রমশ এগিয়ে যায় আত্মহত্যা বা মৃত্যুর দিকে–খুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে নিজেকে, আর অস্তিত্ববাদী বহিরস্থিত খুন করে অন্যকে। রোম্যান্টিক বহিরস্থিতরা সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয়; কেননা তাঁরা স্বভাবতই স্বাপ্নিক।

বাঙলা কবিতার সূচনা করেছিলেন সমাজ-বহিষ্কৃত একগোত্র কবি। কঠোরভাবে শ্রেণীবিন্যস্ত সমাজ বহিষ্কার করেছিলো তাঁদের, আর ওই তান্ত্রিক কবিরা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন সমাজকে। তাই বাঙলা কবিতার শুরু থেকেই লেগে আছে কবি ও সমাজের কলহ, ও পারস্পরিক সংঘর্ষ। তারপর শতাব্দীপরম্পরায় বাঙলা ভাষার বহু কবি সমাজচ্যুত থেকেছেন, বহিরস্থিতের জীবন যাপন করেছেন, কিন্তু বাঙলা ভাষার প্রথম রোম্যান্টিক বহিরস্থিত কবির আবির্ভাব ঘটে উনিশশতকের ষাটের দশকে। বাঙলা ভাষার প্রথম রোম্যান্টিক ও প্রথম আধুনিক কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী; আর তিনিই বাঙলা ভাষার প্রথম রোম্যান্টিক বহিরস্থিত। ইউরোপে যে-চেতনাবদল ঘটেছিলো, নতুন সংবেদনশীলতা দেখা দিয়েছিলো আঠারোশতকের দ্বিতীয়ার্ধে, তা বাঙলাদেশে– বাঙলা ভাষায়– দেখা দেয় উনিশশতকের দ্বিতীয় ভাগে। ওই চেতনাবদল ঘটিয়েছিলেন বিহারীলাল চক্রবর্তী। তিনিই বাঙলা ভাষায় প্রথম আপাদমস্তক স্বপ্নের হাতে ধরা দেন, ব্যর্থ হন প্রতিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে, বড়ো ক'রে তোলেন স্বপ্ন-কল্পনা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে; গ'ড়ে তোলেন একান্ত ব্যক্তিগত, ভূগোলহীন ও স্বপ্নরঞ্জিত, এক মনোবিশ্ব। তাঁর কবিতা পড়ার সময় মনে হয় বাস্তবকে তিনি রূপান্তরিত করেছিলেন স্বপ্নলোকে, এবং তাঁর ভেতর দিয়ে চলেছিলেন স্বপ্নচালিতের মতো। ইউরোপীয় অর্থে তখন কোনো শিল্পবিপ্লব দেখা দেয় নি বাঙলায়; উত্থানও ঘটে নি ইউরোপীয় ধরনের বুর্জোয়াদের; কিন্তু রোম্যান্টিসিজমের আবির্ভাব, চৈতন্যের সংকট ও চেতনাবদল, অবধারিত ছিলো ব'লে শতবর্ষ বিলম্বে বাঙলায় দেখা দেয় এ-নতুন সংবেদনশীলতা। দেখা দেন রোম্যান্টিক বহিরস্থিত– 'বিজনবাসী ভাবনিমগ্ন কবি'– বিহারীলাল চক্রবর্তী। শুরু থেকেই তাঁর কবিতায় বিকশিত হয় ধনের সাথে বিরোধ ও কল্পনার সাথে সন্ধি, আর মানুষ ও প্রতিবেশের সাথে খাপ-না-খাওয়ার প্রবণতা। বারবার বলেন তিনি, 'ভুলিব না কমলার কাম-রূপ দেখে,' বা 'কমলার ধন-মানে নহি অভিলাষী', এবং 'যাও লক্ষ্মী অলকায়/যাও লক্ষ্মী অমরায়/এস না এ যোগিজন-তপোবনে আর' ব'লে প্রত্যাখ্যান করেন বুর্জোয়াদের আরাধ্য দেবীকে। প্রচণ্ড অস্বস্তি বোধ করেন তিনি জনতার মাঝে, কেননা জনতার ভিড় ধ্যান ভেঙে দেয় তাঁর;– 'জনতার কলকল', বা 'কলরবপূর্ণ মানবসমাজ' তাঁকে পীড়িত করে স্বপ্নলোক থেকে টেনে এনে। মনুষ্যসমাজে তিনি হয়ে ওঠেন স্বপ্নস্বর্গলোকচ্যুত দেবদূত বা বোদলেয়ারের আলবাট্রসের মতো, নিজের মহান কল্পনাডানার ভারে পদে পদে যার গতি রুদ্ধ হয়ে আসে। স্পষ্ট বলেছেন বিহারীলাল : 'যে অবধি স্বপনের মায়াময়ী পুরী,/ছেড়ে এসে পড়েছি যথার্থ লোকালয়ে,/সে অবধি আমার সন্তোষ গেছে চুরি,/সদা এক তীক্ষ্ণ জ্বালা জ্বলিছে হৃদয়ে।' রোম্যান্টিকদের বড়ো সম্পদ ও সমস্যা তাঁদের হৃদয়। বিহারীলালও চিৎকার ক'রে উঠেছেন, 'সুদুর্ভর হৃদয় বহিয়ে,/কত যুগ রহিব বাঁচিয়ে।' ওই হৃদয়লোকে সারাক্ষণ ঝড়ঝঞ্ঝা, অসন্তোষ, ও বিষাদ। *বঙ্গসুন্দরীর* প্রথম স্তবকেই হাহাকার বেজে উঠেছে তাঁর বুক থেকে : 'সর্বদাই হুহু করে মন,/বিশ্ব যেন মরুর মতন।' সমাজসংগঠনের সাথে সুন্দরভাবে খাপ খেয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনকে প্রথাগতভাবে সার্থক ক'রে তোলা অসম্ভব তাঁর পক্ষে। তাই হয়ে উঠলেন তিনি রোম্যান্টিক বহিরস্থিত, 'শূন্যময় নির্জন শ্মশান' বা 'নিস্তব্ধ গম্ভীর গোরস্থান' তাঁকে তৃপ্তি দেয়; তিনি ছুটে যেতে চান কোনো বহুকাল-আগে-বিধ্বস্ত লোকালয়ে, যার ওপর দিয়ে বয়ে যায় বিষাদ বায়ু। তাই বাস্তবকে প্রত্যাখ্যান ক'রে শরণ নেন তিনি স্বপ্নকল্পনার। 'হোগ্‌গে এ বসুমতী যার খুশী তার' ব'লে তুচ্ছ বস্তুর মতো ছুঁড়ে ফেলে দেন সমাজকাঠামো, ও তার সমস্ত প্রতিযোগিতাকে। বলেন, 'তপোবনে ধ্যানে থাকি এ নগর-কোলাহলে' এবং পরিব্রাজক হয়ে ওঠেন স্বপ্নলোকের– 'ভ্রমিব স্বপন-নগরে– /চিরজীবন ভ্রমিব স্বপন-নগরে।' তাঁর আগে বাঙলায় দেখা দেয় নি এমন কোনো স্বপ্নগ্রস্ত বহিরস্থিত; তাই বিহারীলালই আমাদের প্রথম রোম্যান্টিক বহিরস্থিত।

রবীন্দ্রনাথের যে-ভাবমূর্তি গ'ড়ে উঠেছে গত কয়েক দশকে, তাতে তাঁর কবিসত্তাটি গৌণ হয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে অন্যান্য সত্তা; এবং তাঁকে খাপ-না-খাওয়া মানুষ বা রোম্যান্টিক বহিরস্থিত মনে তো হয়ই না, বরং সমকালীন সভ্যতা-সমাজ- জীবনের একজন প্রধান নিয়ন্ত্রক ব'লেই মনে হয়। এটা মিথ্যে নয় যে নিজেকে নানাভাবে সংস্কৃত সংশোধিত রূপান্তরিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ; বয়স্ক হওয়ার সাথে সাথে ঢুকেছিলেন ও খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করেছিলেন বাস্তব ও সমাজের সাথে, কিন্তু আশি বছর বয়স্ক অবস্থায়ও তাঁর মধ্যে এমন কিছু ছিলো, যা স্মরণ করিয়ে দেয় যে রবীন্দ্রনাথ কবি– রোম্যান্টিক কবি, যিনি চারপাশের সাথে মিলতে গিয়েও বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকেন। গান্ধির সাথে তুলনা করলেই বোঝা যায় ওই রাজনীতিক, বাস্তবকে দখল করা যাঁর লক্ষ্য, তাঁর পায়ের নিচে ব্যাপক শক্ত মাটি; কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথ, ওই রাজনীতিকের চেয়ে বহুগুণে মহত্তর হওয়া সত্ত্বেও, বারবার বোধ করেন যে তাঁর পায়ের নিচের মাটি থরথর ক'রে কাঁপছে। এ-বাস্তব বিশ্বে একজন তৃতীয় মানের রাজনীতিক অনেক শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠিত একজন অমর প্রথম শ্রেণীর কবির থেকে। কবিদের নিয়তি এই। কবি রবীন্দ্রনাথের জীবন শুরু হয়েছিলো এক তীব্র প্রবল রোম্যান্টিক বহিরস্থিতরূপে, এবং দীর্ঘ জীবনব্যাপী তিনি যে অজস্র কবিতা রচনা ক'রে গেছেন, তার একটি বড়ো অংশকেই বলতে পারি 'মধ্যাহ্নের অলস সঙ্গীত'। উইলিয়ম মরিস *পার্থিব স্বর্গ*-এ নিজেকে চিহ্নিত করেছিলেন 'শূন্য দিনের অলস গায়ক' অভিধায়, আর রবীন্দ্রনাথ নিজেকে দেখেছিলেন– *চিত্রার* 'এবার ফিরাও মোরে' নামী কবিতায়– 'ছিন্নবাঁধা পলাতক বালকের' রূপকে, 'মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ন তরুচ্ছায়ে/দূরবনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্ত বায়ে' যে সারাদিন বাঁশি বাজায়। একজনের গায়ক ও আরেকজনের বাঁশরিয়া প্রকৃতিতে অভিন্ন;– দু-জনই বহিরস্থিত। রবীন্দ্রনাথ আবাল্য স্বপ্নের স্বাপ্নিক ও সঙ্গীতনির্মাতা, যে-স্বপ্ন ও সঙ্গীত বাস্তব মানুষের কাছে আলস্যের নামান্তর। উল্লেখযোগ্য যে পৃথিবীর অধিকাংশ উৎকৃষ্ট কবিতাই স্বপ্ন ও অলস সঙ্গীত–সক্রিয় পদ্যের চেয়ে সেগুলোর আবেদন অনেক ব্যাপক ও গভীর। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবন শুরু হয়েছিলো প্রবল আবেগ-স্বপ্ন-কল্পনার আধিপত্যের মধ্যে, আর এ-তিন রোম্যান্টিক বৈশিষ্ট্য তাঁকে সমাজসংসার থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলো মধ্যযৌবন পর্যন্ত। *জীবনস্মৃতিতে* তিনি জীবনের ওই সময়টির দিকে তাকিয়েছেন একরকম অপরাধবোধে আক্রান্ত হয়ে; মৃদু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিরস্কার করেছেন বাল্য-কৈশোর-যৌবনের স্বপ্নাচ্ছন্ন সময়কে। 'ভগ্নহৃদয়' পরিচ্ছেদে বলেছেন, 'আমার পনেরো-ষোলো হইতে আরম্ভ করিয়া বাইশ-তেইশ বছর পর্যন্ত এই যে একটা সময় গিয়াছে, ইহা একটা অত্যন্ত অব্যবস্থার কাল ছিল।...অপরিণত মনের প্রদোষালোকে আবেগগুলো সেইরূপ পরিমাণ বহির্ভূত অদ্ভুতমূর্তি ধারণ করিয়া একটা নামহীন, পথহীন, অন্তহীন অরণ্যের ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত।' এ-'নামহীন পথহীন অন্তহীন অরণ্যের ছায়া'টি রোম্যান্টিক বহিরস্থিতের বিশ্ব। তিনি বলেছেন, 'তখন আমারই বয়স আঠারো ছিল তা নয়– আমার আশপাশের সকলের বয়স যেন আঠারো ছিল। আমরা সকলে মিলেই একটা বস্তুহীন ভিত্তিহীন কল্পনালোকে বাস করতেম। সেই কল্পনালোকের খুব তীব্র সুখদুঃখও স্বপ্নের সুখদুঃখের মতো।' ওই সময়ে তাঁর মনে যে-আবেগ জেগে উঠেছিলো, বাহ্যপৃথিবীর সাথে তার কোনো সম্পর্ক রচিত হয় নি; তাই তা ছিলো ব্যাধির মতো পীড়াদায়ক। যদিও রবীন্দ্রনাথ এক প্রবল বিশাল বিস্তৃত হৃদয়াবেগের নাম, তবুও *জীবনস্মৃতি* রচনার কালে তিনি ওই হৃদয়াবেগকে তিরস্কার করেছেন। এতে বোঝা যায় কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন সামাজিকদের সাথে তখন তিনি অনেকখানি খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন। এ-বোধ থেকেই সম্ভবত তিনি তাঁর ওই সময়ের রচনাবলিকে অস্বীকার করেন, বর্জন করেন *রবীন্দ্র-রচনাবলী* থেকে। এখন এই রচনাবলী স্থান পায় শুধু 'অচলিত সংগ্রহ'-এ।

তাঁর প্রথম পর্যায়ের কয়েকটি কাব্যগ্রন্থে পাওয়া যায় যে-রবীন্দ্রনাথকে, তিনি আবেগ-স্বপ্ন-কল্পনাতুর এক বহিরস্থিত, বাস্তব ও সমাজ থেকে সুদূরে অবস্থিত, স্বরচিত এক মনোবিশ্বের অধিবাসী। *কবি-কাহিনী* (প্রপ্র ১৮৭৮), *বন-ফুল* (প্রপ্র ১৮৮০), *ভগ্নহৃদয়* (প্রপ্র ১৮৮১), *রুদ্রচণ্ড* (প্রপ্র ১৮৮১), *শৈশবসঙ্গীত* (প্রপ্র ১৮৮৪), *বাল্মীকিপ্রতিভা* (প্রপ্র ১৮৮১) প্রভৃতি প্রথম পর্যায়ের কাব্য ও কাব্যনাট্যে স্তবকে স্তবকে পাওয়া যায় এ-রবীন্দ্রনাথকে, এবং এর পরবর্তী *কড়ি ও কোমল* (প্রপ্র ১২৯৩), ও *মানসী*তে (প্রপ্র ১২৯৭) ধারাবাহিকভাবে নয়, কিন্তু মাঝেমাঝেই দেখা দিয়েছে তাঁর অন্তরবাসী বহিরস্থিত সত্তাটি। এ-সত্তার শেষ, স্পষ্ট, বিখ্যাত পরিচয় পাওয়া যায় *চিত্রায়*– 'এবার ফিরাও মোরে' (১৩০০), ও 'আবেদন' (১৩০২) কবিতায়। *বন-ফুল* রচনার সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স পনেরো-ষোলো; *কবি-কাহিনী* রচনার সময় ষোলো-সতেরো; আর *ভগ্নহৃদয়* রচনার সময় আঠারো। 'এবার ফিরাও মোরে' রচিত হয় বত্রিশ বছর বয়সে, আর 'আবেদন' চৌত্রিশ বছর বয়সে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের পনেরো থেকে তেইশ বছর পর্যন্ত সময়কে 'অব্যবস্থার কাল' আখ্যা দিয়েছেন। এ-সময়টা তাঁর চরম রোম্যান্টিক বহিরস্থিততার কাল; কিন্তু তাঁর এ-প্রবণতাটি এ-বয়সেই লোপ পায় নি। চৌত্রিশ বছর পর্যন্ত তা ছিলো তীব্রভাবেই, যদিও ধারাবাহিকভাবে নয়, এবং একটু সাহসী হ'লেই বলা যায়, এ-প্রবণতাটি ছিলো তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত;– সংগোপনে, অবচেতনে।

কবির অস্তিত্বের ব্যাপারটি জীবনের শুরুতেই ভাবিয়েছিলো রবীন্দ্রনাথকে;–নির্ণয় ক'রে নিতে চেয়েছিলেন তিনি কবির স্বরূপ ও ভূমিকা, সমাজের ও স্বপ্নের সাথে কবির সম্পর্কের মাত্রা। তাই শুরু থেকে তিনি শুধু কবিতা লিখে কবি হয়ে ওঠেন নি, তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিখেছেন কবিরই কথা। তাঁর প্রথম পর্যায়ের কাব্য ও নাটকগুলো কাহিনীকাব্য, এবং প্রায় প্রতিটিতেই মূল চরিত্র রূপে রয়েছে একজন কবি। *কবি-কাহিনী* চার সর্গে এক কবির কাহিনী; *বন-ফুল*-এর নায়ক নীরদ কবি; *ভগ্নহৃদয়*-এর প্রধান চরিত্রটি কবি; *রুদ্রচণ্ড*-এর অন্যতম প্রধান চরিত্র চাঁদ একজন কবি; *শৈশবসঙ্গীত* ভ'রে আছে কবির উল্লেখ, আর *বাল্মীকিপ্রতিভা* ভারতীয় আদি মহাকবির কবিপ্রতিভা লাভের উপাখ্যান। কেনো কাব্যপরম্পরায় ফিরেফিরে আসে কবিচরিত্র? একি নিজেকেই সৃষ্টি করা, নির্ণয় করা নিজেরই ভূমিকা? বাল্যেই সম্ভবত সচেতন হয়ে উঠেছিলেন রবীন্দ্রনাথ যে কবি সুবিন্যস্ত নয় সমাজসংগঠনে, বরং অনেকটা বহিরস্থিত; কিন্তু তাঁর নিয়তি ওই কবিই হয়ে ওঠা। কবি হয়ে উঠছিলেন তিনি কৈশোরেই এবং এমন কবি হয়ে উঠছিলেন, যাঁর সম্পর্ক ছিলো না প্রতিবেশ ও সমাজের সাথে। স্বপ্ন আর কল্পনায় গ'ড়ে তুলছিলেন এক মনোবিশ্ব– সুদূর, বিজন, আবেগকাতর ও বিষাদভারাতুর। বিহারীলাল চক্রবর্তীর সাথে একটি বিষয়ে তাঁর বেশ পার্থক্য; বিহারীলালের কবিতায় বারবার ঘোষিত হয় বাস্তব সমাজপ্রতিবেশের সাথে কবির সংঘর্ষের ও স্বপ্নলোকে আশ্রয় নেয়ার কথা, কিন্তু কিশোর-যুবক কবি রবীন্দ্রনাথ সমাজপ্রতিবেশকে সম্পূর্ণ অস্বীকার ক'রে যান, যেনো সমাজ প্রতিবেশের কোনো অস্তিত্বই নেই, আছে শুধু এক কল্পবিশ্ব। এর কারণ তখনো তাঁর কোনো সামাজিক অভিজ্ঞতাই হয় নি, তখন পর্যন্ত তাঁর সমস্ত অভিজ্ঞতাই স্বাপ্নিক, কিন্তু যেই তিনি সামাজিক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হ'তে শুরু করেন *মানসীর* কবিতাগুচ্ছ রচনার কালে, তখন সংঘর্ষ শুরু হয় বাস্তবের সাথে, এবং বুঝতে পারেন যে তিনি পৃথক পয়ে প'ড়ে আছেন অন্যদের থেকে।

কবি-কাহিনীর শুরুতেই পাওয়া যায় এক রোম্যান্টিক বহিরস্থিত কবি ও তাঁর বিজন ভুবনকে : 'শুন কল্পনা বালা, ছিল কোন কবি/বিজন কুটীর-তলে। ছেলেবেলা হোতে/তোমার অমৃত-পানে আছিল মজিয়া।/তোমার বাণীর ধ্বনি ঘুমায়ে ঘুমায়ে/শুনিত, দেখিত কত সুখের স্বপন।' *কবি-কাহনী* এ-বিজনবাসী ভাবনিমগ্ন কবির কাহিনী। বাস্তব জীবনের সাথে কোনো সম্পর্ক ঘটে নি তার। বিহারীলাল যে-'সুদুর্ভর হৃদয়'ভার বহনের যন্ত্রণার কথা বলেছেন, এ-কবি তার ভারে ও যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত। তার বাল্য কেটেছে 'সুখময় ঘুমঘোর স্বপনের মত', আর যৌবনে 'প্রকৃতি আছিল তার সঙ্গিনীর মত।' তার কাছে 'নিশাই কবিতা আর দিবাই বিজ্ঞান।' সে দিবা নয় রাত্রিরই প্রেমিক, কারণ রাত্রি তার চোখের সামনে মেলে দেয় রহস্য, আর 'সমস্ত জগৎ যেন স্বপ্নের মতন' মনে হয়। কিন্তু তাকে পীড়িত করার জন্যে রয়েছে তার 'সিন্ধু-হৃদয়', যেখানে তার অন্তরের আর্তির মতো দিনরাত বাতাস বয়ে যায়। রোম্যান্টিক বহিরস্থিতকে আকাশের চাতকের চেয়েও চঞ্চল আর আগুনের চেয়ে ভয়ংকরভাবে দগ্ধ করে তার হৃদয়। ওই হৃদয় কোনো শান্তি জানে না, তৃপ্তি জানে না– এ-কবির সমস্যাও হার্দিক : 'আমার এ হৃদয়ের মাঝে/অনন্ত-অতৃপ্তি-তৃষ্ণা জ্বলিছে সদাই,/তাই দেবি পৃথিবীর পরিমিত কিছু/পারে না গো জুড়াইতে হৃদয় আমার।' তার কল্পনা তাকে যতো ওপরে উঠোয় তার শরীর ততোটা আরোহণ করতে না পারলেও মাঝে মাঝেই সে এক 'তুষারমণ্ডিত সমুচ্চ পর্ব্বতশিরে' একলা আরোহণ করে। কিন্তু তার হৃদয় ও স্বপ্নের যৌথ চক্রান্তে বাতিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে যায় তৃপ্তি, শান্তি, এবং সে বারবার চিৎকার হাহাকার ক'রে ওঠে–'এত কাল হে প্রকৃতি করিনু তোমার সেবা,/তবু কেন এ হৃদয় পুরিল না দেবি', বা 'মনের অন্তর-তলে কি যে কি করিছে হুহু', বা 'রাক্ষসী স্বপ্নের তরে ঘুমালেও শান্তি নাই।' তার দেখা হয় নলিনীর সাথে, যে দেখা মাত্রই তার প্রেমে পড়ে। তবে ওই প্রকৃতি আর নলিনীর প্রেম মোচন করতে পারে না রোম্যান্টিক বহিরস্থিতের প্রাণের শূন্যতা। তার মনে হয়, 'স্বাধীন বিহঙ্গ-সম, কবিদের তরে দেবি/পৃথিবীর কারাগার যোগ্য নহে কভু।' একটিই হয়ে ওঠে তার সমস্যা, কিছুতেই ঘোচে না তার প্রাণের শূন্যতা। হাহাকার করতে থাকে সে– 'প্রাণের শূন্যতা কেন ঘুচিল না বালা', 'এখনও পুরিল না প্রাণের শূন্যতা', 'প্রাণের শূন্যতা তবু ঘুচিল না কেন?' প্রকৃতির যতো অতুল সৌন্দর্য, প্রণয়ের যতো সুধা আর কল্পনার যতো তরল স্বর্গীয় গীতি আছে, সবই সে হৃদয়ে ঢেলে দিয়েছে, তবু দুর্ভর হৃদয়ের শূন্যতা ঘোচে নি। কিন্তু তার মন যতোই মরুভূমি হোক-না-কেনো, সে তার হৃদয়কে হত্যা করবে না, যেমন টেনিসন ধ্বংস করতে চান নি তাঁর 'প্যালেস অফ আর্ট'। তারপর কবি, প্রেমিকার সব আবেদন উপেক্ষা ক'রে, বেরিয়ে পড়ে পৃথিবী পর্যটনে– 'কত দেশ দেশান্তরে ভ্রমিল সে কবি!' তুষারস্তম্ভিত পর্বত, কণ্টকময় অরণ্য পেরিয়ে গেলো, কিন্তু কিছুই তার হৃদয়কে জুড়োতে পারে নি। সে নিঃসঙ্গ থেকে নিঃসঙ্গতর হয়ে বৃদ্ধ হয়, এবং 'একদিন হিমাদ্রির নিশীথ বায়ুতে/কবির অন্তিম শ্বাস গেল মিশাইয়া।' বিজন কবি বিজনেই ঝ'রে যায়।

বন-ফুল-এর বিজন বনফুলের নাম কমলা, যে জানে না 'সংসার, মানুষ কাহারে বলে।' কমলাকে বিজন অরণ্য থেকে সমাজ-সংসারে নিয়ে আসে বিজয়, এবং মানুষের সংস্পর্শে এসেই সে টের পায় নিজের হৃদয় ও তার অনির্বাণ দহনকে। *বন-ফুল* এ-কমলারই ঝ'রে যাওয়ার উপাখ্যান, তবে সংসারলোকে আসার পর যার সাথে জড়িত হয়ে চিত্তকে যে বিশেষভাবে দগ্ধ করতে সমর্থ হয়, তার নাম নীরদ, যে 'আপনার ভাবে আপনি কবি/রাত দিন আহা রয়েছে ভোর!' নীরদও রোম্যান্টিক বহিরস্থিত–মোহিনী কল্পনার মোহিনী বীণার ধ্বনি শুনে কাটে তার দিনরাত্রি। হৃদয়ের আগুন ও বিষাদ ঘিরে আছে তাকে। ওই আগুন ও বিষাদ থেকে সে মুক্তি পায় প্রতিহিংসাপরায়ণ বন্ধুর ছুরিকাঘাতে– মৃত্যুতে।

ভগ্ন-হৃদয়-এর প্রধান চরিত্রটি কবি;–সেও দগ্ধ *কবি-কাহিনী* ও *বন-ফুল*-এর কবি দুজনের মতো। তারও সমস্যা তার বিশাল হৃদয়ের ভার। কল্পনা ও স্বপ্ন দ্বারা সেও বিশদভাবে আবৃত। 'জীবন্ত স্বপ্নের মতো' সে একা একা বেড়ায় অন্ধকারাচ্ছন্ন অরণ্যে, একমনে শোনে 'স্তব্ধতার মুখ হোতে কথা কত শত!' তার অন্তর এক 'অশান্তি আলয়', তার হৃদয় নবজাত গরুড়ের মতো অস্থির, বিশ্রামহীন ও ক্লান্ত। কল্পনার বিষ সে প্রাণ ভ'রে পান করেছে, তাই তার মন অবসন্ন। সে হাহাকার ক'রে ওঠে– 'আর কত দিন সুখহীন শান্তিহীন/হাহা কোরে বেড়াইব নিরাশ্রয় মন লোয়ে!/ পারি নে, পারি নে আর– পাষাণ মনের ভার/বহিয়া পড়েছি, সখি, অতি শ্রান্ত ক্লান্ত হোয়ে।' তার জীবন মরুভূমির মতো, বুকের ভেতর নিরাশার বিষশ্বাস। একলা বিজনে ব'সে সে কাঁদে। *ভগ্নহৃদয়*-এর কবির সমস্যা তার হৃদয়ের সমস্যা– কাউকে সে ভালোবাসতে পারছে না। কারণ, তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনের মধ্যে যে-আদর্শ সৌন্দর্য জেগে আছে, পৃথিবীতে তা দুর্লভ। দীর্ঘ কাব্যের শেষে রোম্যান্টিক বহিরস্থিত এ-কবি যার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়, সে মৃত্যুপথযাত্রী;– বিবাহের সাথে সাথেই সে পৃথিবীকে বিদায় জানায়। তাই রোম্যান্টিক বহিরস্থিত কবি বিবাহিত হয় যেন মৃত্যুর সাথেই।

রুদ্রচণ্ড-এও আছে এক কবি, যার নাম চাঁদ কবি। রবীন্দ্রনাথের কবি-চরিত্রদের মধ্যে সে-ই একমাত্র সক্রিয় চরিত্র। অন্যরা নিষ্ক্রিয়, অপর জগতের স্বাপ্নিক, কিন্তু সে সক্রিয়, আর বাস্তবকে নিয়ন্ত্রণ করে অনেকখানি। যুদ্ধের মতো ব্যাপারকেও সে ভয় পায় না, বরং তাতে পালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। কিন্তু পৃথ্বীরাজের পতনের পর সেও স্থির করে–'ভ্রমিব সন্ন্যাসী বেশে শ্মশানে শ্মশানে।' তারও হৃদয়ের অসম্পূর্ণ কথা অকথিতই থেকে যায়। *বাল্মীকিপ্রতিভায়* যে-আদিকবির আবির্ভাব ঘটে, আকস্মিক অনুপ্রেরণায় যে-দস্যু কবি হয়ে ওঠে, সেও হয়ে ওঠে এক রোম্যান্টিক বহিরস্থিত। সেও শূন্য মনে অস্থিরভাবে বিচরণ করে বনে বনে : 'ব্যাকুল হয়ে বনে বনে/ভ্রমি একেলা শূন্য মনে!/কে পুরাবে মোর শূন্য এ হিয়া,/জুড়াবে প্রাণ সুধাবরিষণে!' সুদুর্ভর হৃদয়ভার পীড়িত করে তাঁকেও : 'শূন্য হৃদয় আর বহিতে যে পারি না,/পারি না গো পারি না আর।' এমন এক সময়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা থেকে জন্ম নেয় বাল্মীকি, যখন অসম্ভব ছিলো প্রাচীন কবির ধ্রুপদী বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা, তাই ধ্রুপদী বাল্মীকির মধ্যে রোম্যান্টিক বহিরস্থিত রবীন্দ্রনাথ সংক্রামিত ক'রে দেন নিজেকেই। তাই এ-গীতিনাট্যের গোপন নাম হ'তে পারে *রবীন্দ্রপ্রতিভা*। এ-নাটকেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম সংঘর্ষে আসেন লক্ষ্মীনিয়ন্ত্রিত সমাজের সাথে, এবং বিহারীলাল চক্রবর্তীর পংক্তি ঋণ ক'রে প্রত্যাখ্যান করেন লক্ষ্মীকে : 'যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়,/এ বনে এস না, এস না, এস না এ দীনজন-কুটীরে!'

এর মাঝে তাঁর জীবনের দু-দশক কেটে গেছে, এবং নানা বাস্তব চাপে ঘোর কেটে যেতে শুরু করেছে স্বপ্নের, স্পষ্ট সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে 'আকাশকুসুমবনে স্বপন চয়ন' ব্যাহত হওয়ার। এতোদিন ধ'রে তিনি যে প্রতিবেশ ও বাস্তবকে সম্পূর্ণ ভুলে স্বপ্ন-ও মনো-বিশ্বকেই নিজের বিশ্ব ক'রে নিয়েছিলেন, তা যেনো প্রতিবেশের আক্রমণে ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। *কড়ি ও কোমল*-এ তাই দেখা দেয় স্বপ্ন ও বাস্তবের সংঘর্ষ। সংঘর্ষ সব সময়ই পীড়াদায়ক, এবং সে-পীড়া ভোগ করতে শুরু করেছেন রোম্যান্টিক কবি। দেখতে পাচ্ছেন তিনি 'দূর হতে আসিছে ঝটিকা', যাতে 'স্বপ্নরাজ্য ভেসে যাবে খর অশ্রুজলে।' এ-কাব্যের প্রথম কবিতায়ই তিনি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে বেঁচে থাকার তীব্র অভিলাষ ব্যক্ত করেন আর 'মরীচিকা' কবিতায় মানুষের সাথে সুখেদুঃখে মিলেমিশে জীবনযাপনের উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। কিন্তু তা কি সম্ভব স্বপ্নান্ধের পক্ষে, যে বাস্তবের সাথে বিনিময় ক'রে নিয়েছে রহস্যলোককে? 'স্বপ্নরুদ্ধ' কবিতায় তাই ওই উদ্যোগের ব্যর্থতা ঘোষিত হয় স্বীকারোক্তিতে : 'নিষ্ফল হয়েছি আমি সংসারের কাজে,/লোকমাঝে আঁখি তুলে পারি না চাহিতে।' নিজের স্বপ্নঘোরাচ্ছন্ন অবস্থা মূর্ত করে তুলেছেন এক অসামান্য চিত্রকল্পে : 'আমি গাঁথি আপনার চারি দিক ঘিরে/সূক্ষ্ম রেশমের জাল কীটের মতন।/মগ্ন থাকি আপনার মধুর তিমিরে,/দেখি না জগতের প্রকাণ্ড জীবন।' আপন বহিরস্থিততা বুঝতে শুরু করেছেন তিনি এ-সময়ে, মুক্তিও চান তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওই অবস্থা থেকে, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে বারবার গ্লানি-নির্বেদে দগ্ধ হ'তে থাকেন এ-সময়ে। দু-মুখো সংকটও দেখা দেয় তীব্রভাবে;– নিজের 'অভিশপ্ত প্রেতের পিপাসা' থেকে যেমন বেরিয়ে আসতে পারছেন না, আবার বেরিয়ে কোনো মতে মনুষ্যমণ্ডলিতে পৌঁছোলে 'সহস্রের কোলাহলে হয় পথহারা।' বাস্তব-ঘোড়ার লাগাম ধরার বাসনা তাঁর তাই বারবার ভেঙে যায়, এবং খুঁজে ফেরেন নিজের বিজন স্বপ্নলোককেই। *মানসী*র 'কবির প্রতি নিবেদন'-এ বাস্তববিতৃষ্ণ হয়ে আন্তর কবিকে প্রশ্ন করেছেন, 'হেথা কেন দাঁড়ায়েছ, কবি,/যেন কাষ্ঠপুত্তলছবি?/...কোথা তব বিজন ভবন/কোথা তব মানসভুবন?' বাস্তবতা তাঁর কাছে হয়ে উঠলো বিদেশ, যার 'ধূলি আর কলরোল-মাঝে' কবিকে মানায় না।

এ যে স্বপ্ন-কল্পনা-সৌন্দর্য-বিষাদ-ঘেরা জগত- বহিরস্থিত জগত ও জীবন-বহিরস্থিত জীবন, তার দিকে রবীন্দ্রনাথ মধ্যযৌবন থেকেই বস্তুগত দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন বারবার। আত্মকেন্দ্রিক ওই জগত-জীবন কখনো দেখা দিয়েছে রেশম-কীটের রূপকে, কখনো 'সুখরৌদ্রমরীচিকা' রূপে। রোম্যান্টিক বহিরস্থিত কবি অবিস্মরণীয় হয়ে আছে দুটি আকর্ষণীয় রূপকে– *চিত্রা*র 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় 'ছিন্নবাধা পলাতক বালক'-এর রূপকে, যে 'মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ন তরুচ্ছায়ে/দূরবনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্ত বায়ে' সারাদিন বাঁশি বাজায়; আর 'আবেদন'-এ কর্মভীরু অলস মালাকররূপে। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় কবি হয়ে উঠেছেন পলাতক রাখাল বাঁশরিয়া, যাঁর চারদিকে আলস্য-বিষণ্নতা ও সুরগুঞ্জন। এ-জগত বহিরস্থিতের, আর সেখান থেকে স'রে যেতে চান কবি, প্রবেশ করতে চান সে-বাস্তবে, যেখানে সবাই সারাক্ষণ শতকর্মে রত। এ-কবিতাটিতে স্বপ্নলোক ও বস্তুলোকের বৈপরীত্য আঁকা হয়েছে ব্যাপকভাবে। স্বপ্নলোকের যে-ছবি পাওয়া যায়, তা নিম্নরূপ : সেখানে বিষণ্ন তরুচ্ছায়ে দূর বনের গন্ধভরা ক্লান্ত তপ্ত বাতাস বয়ে যায় ধীর গতিতে, রঙ্গময়ী কল্পনা কবিকে 'সমীরে সমীরে তরঙ্গে তরঙ্গে' দুলিয়ে মোহিনী মায়ায় ভুলিয়ে রাখে, আর বসিয়ে রাখে 'বিজন বিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্জচ্ছায়ায়'। সেখানে সন্ধ্যায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বন কেঁদে ওঠে। এ-স্বপ্নলোককে 'সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি' ব'লে তিরস্কার করেছেন তিনি, কেননা সেখানে একাকী সঙ্গীহীন থাকতে হয়, এবং সেখানে থেকেছেন তিনি বহুকাল। তাই তাঁর বেশ অপরূপ, আচার ভিন্ন, চোখে স্বপ্নাবেশ আর বুকে ক্ষুধার আগুন। জন্মের মুহূর্তেই তাঁর হাতে উঠে আসে একটি বাঁশি, যা 'বাজাতে বাজাতে তাই মুগ্ধ হয়ে আপনার সুরে/দীর্ঘদিন দীর্ঘরাত্রি চলে গেনু একান্ত সুদূরে/ছাড়ায়ে সংসারসীমা।' এ-অদ্ভুত কল্পবিশ্বের বিপরীতে আছে বাস্তবলোক, যাকে তিনি বলেন 'সংসার'। ওই সংসার কি আকর্ষণীয়? ওই সংসারকে যে-সমস্ত রূপকে বর্ণনা করেছেন, তাতে তা হয়ে উঠেছে ভয়াবহ : 'আগুন লেগেছে কোথা। কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি/জাগাতে জগৎ-জনে! কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে/শূন্যতল!' আগুন, আর শঙ্খ আর ক্রন্দন এবং আরো এমন অজস্র বাস্তবতার মধ্যে কি ফিরে যেতে পারে রোম্যান্টিক বহিরস্থিত? এর উত্তর একটি বিশাল 'না'। তাই দেখা যায় 'এবার ফিরাও মোরে'র অপরিচিত, যে জনতাকে ডেকে বলে–'আমি নহি পরিচিত, মোর পানে ফিরিয়া তাকাও', সে আবার অপরিচিতলোকেই ফিরে যায়। তবে এবার আর রোম্যান্টিকের সৌন্দর্য-কল্পনা-স্বপ্নময়

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বে নয়, এবার যায় মিস্টিকের জগতে এমন এক সত্যের সন্ধানে, যে-সত্য এক বিরাট মিথ্যা।

'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় তবু একটি বড়ো অংশ জুড়ে আছে দ্বন্দ্ব-অস্বস্তি, কিন্তু 'আবেদন'-এ লোপ পেয়েছে সব দ্বন্দ্ব ও অস্বস্তি; রোম্যান্টিক বহিরস্থিত শান্ত শোণিতে ফিরে গেছে তার নিষ্ক্রিয় সৌন্দর্য ও হৃদয়ের জগতে। 'আবেদন' রবীন্দ্রনাথের 'অবসরের গান', রাজ্য– জয়– সাম্রাজ্যের কথা ভুলে একদা-কর্মী এ-কবিতায় হ'য়ে ওঠে 'খ্যাতিহীন, কর্মহীন স্বেচ্ছাবন্দী দাস'– মালঞ্চের মালাকর। রাণীকে সে জানায় : 'অবসর/লব সব কাজে। যুদ্ধ-অস্ত্র ধনুঃশর/ফেলিনু ভূতলে, এ উষ্ণীষ রাজসাজ/রাখিনু চরণে তব– যত উচ্চ কাজ/সব ফিরে লও দেবী।' সব সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থেকে অবসর নিয়ে স্থান ক'রে নিতে চায় রূপবতী কুমারী রানীর বিজন বিরল বাতায়নতলের মালঞ্চে, হ'য়ে উঠতে চায়, রাণীর ভাষায়, 'কর্মভীরু অলস কিঙ্কর'। এ-ভৃত্য নিশ্চয়ই এতোদিন রানীর সাম্রাজ্যের সীমা ও গৌরব বাড়িয়েছে, সাধন করেছে বীর্যময় অনেক রাজকীয় কর্ম, এবং এখন নিতে চায় 'অকাজের কাজ যত,/আলস্যের সহস্রসঞ্চয়'-এর মতো নিষ্ক্রিয় দায়িত্ব। রানী তাকে বরণ ক'রে নেয় খ্যাতিহীন কর্মহীন স্বেচ্ছাবন্দী দাসরূপে। এ-কবিতার আবেদনকারী বহিরস্থিত, কিন্তু প্রশান্ত, তৃপ্ত, যেনো অনেক কীর্তির পর বুঝতে পেরেছে কীর্তিতে শান্তি নেই, সুখ নেই যশের গৌরবে; বরং জীবন সোনায় ভ'রে ওঠে এমন কারো স্পর্শে, এমন কাউকে স্পর্শ ক'রে যাকে আলিঙ্গনে পাওয়া যাবে না কখনো। 'আবেদন'-এ পাই রোম্যান্টিক বহিরস্থিত রবীন্দ্রনাথকে, যিনি আর হৃদয়ভার-কল্পনা-স্বপ্নের দ্বারা পীড়িত নন, বাস্তবের সাথে দ্বন্দ্বরত নন, বরং বাস্তবকে জয় ক'রে তাকে তুচ্ছ ব'লে পরিহার করতে পারেন, এবং স্বপ্ন-কল্পনা-হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করেন অধিপতির মতো। এ-বহিরস্থিত অতৃপ্ত, অশান্ত, চঞ্চল নয়, বরং পরিতৃপ্ত, প্রশান্ত, সুস্থির।

স্থূল বাস্তবতা-ও জীবন-বাদী শিল্পকলাবিরোধীদের কাছে রোম্যান্টিক বহিরস্থিত শুধু সমস্যা নয়, শত্রু, এবং তাঁর সৃষ্টি তিরস্কৃত। কিন্তু পলায়নের ও নিষ্ক্রিয়তার কবিতাও অসামান্য হ'তে পারে, এবং সাধারণত সক্রিয় ক্রুদ্ধ কবিতার চেয়ে নিষ্ক্রিয়, আলস্যের কবিতাই শিল্পগুণে উৎকৃষ্টতর হয়। বহিরস্থিতরা তিরস্কারযোগ্য নয়, বরং তারা আমাদের চোখের সামনে রহস্যময় মানুষের অনেক রহস্য মেলে ধরে। রবীন্দ্রনাথ চৌত্রিশ বছর পর্যন্ত ছিলেন স্পষ্টত বহিরস্থিত, তারপর হ'য়ে ওঠেন প্রচ্ছন্ন বহিরস্থিত–কোলাহলপূর্ণ সংসারকে নানাভাবে আয়ত্তে আনেন, নিয়ন্ত্রণ করেন, কিন্তু অন্তরে থেকে যান সে-রোম্যানটিক কবি, বাস্তব যাঁর কাছে বিদেশ, আর স্বপ্ন-রহস্য-কল্পনা স্বদেশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তানবাদী সাহিত্যতত্ত্ব : প্রতিক্রিয়াশীলতার বিষবৃক্ষ

মধ্যযুগ থেকে শুরু ক'রে বিশশতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঙালি মুসলমান যে-বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টি করে, কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম বাদে সে-সাহিত্য শৈল্পিকভাবে উন্নত নয়; তবে তাতে বিকশিত হয় তাদের সীমাবদ্ধ সৃষ্টিশীলতা ও ধরা পড়ে তাদের স্বাতন্ত্র্য ও সাম্প্রদায়িক চারিত্র্য। বাঙলা সাহিত্যের প্রধান স্রোতের পাশে বাঙালি মুসলমানের সৃষ্ট সাহিত্য একটি ক্ষীণ শাখাস্রোতের মতো প্রবাহিত হয়। তাতে জীবনের পরিচয় যেমন সংকীর্ণ, তেমনি শৈল্পিক নৈপুণ্যও দুর্লভ। উন্নত শিক্ষা উনিশ ও বিশশতকে বাঙালি হিন্দু কবি-ঔপন্যাসিক-নাট্যকারদের যেমন উন্নত সাহিত্য সৃষ্টিতে সমর্থ করেছিলো, সে-উন্নত শিক্ষা বাঙালি মুসলমান লেখকেরা বিশশতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত পান নি; তাই তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্য প্রধানত স্বতস্ফূর্ত প্রতিভার প্রকাশ। বিশশতকের তৃতীয় দশকে যে-আধুনিকতা দেখা দেয় বাঙলা সাহিত্যে, বাঙালি মুসলমানেরা শিক্ষাগত কারণে তার থেকে দূরে থেকে যান। মুসলমান লেখকদের সামাজিক অবস্থান, তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সমকালীন রাজনীতি তাঁদের আধুনিকতা আয়ত্ত করা থেকে বিরত রাখে। তাঁরা যে-সাহিত্যশাখা-স্রোতটি সৃষ্টি করেছিলেন, সেটিকেই এ-সময়ে সজীব রাখার চেষ্টা করেন তাঁরা, এবং উনিশশো চল্লিশের পর সেটি বেশ তীব্র হয়ে ওঠে। ১৯৩০-এর দ্বিজাতিতত্ত্ব ও ১৯৪০-এর পাকিস্তান প্রস্তাব বাঙালি মুসলমানকে সাম্প্রদায়িকতায় উৎসাহী ক'রে তোলে, এবং সাহিত্যক্ষেত্রে পড়ে তার প্রবল প্রভাব। ১৯৪০-এর পর থেকে বাঙালি মুসলমান লেখকেরা উদ্যোগী হয়ে ওঠেন সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানবাদী সাহিত্যসৃষ্টিতে, যাতে শিল্পকলা ও জীবনের থেকে সাম্প্রদায়িকতার পরিমাণ অনেক বেশি।

পাকিস্তানবাদী সাহিত্য সৃষ্টির প্রত্যক্ষ প্রেরণা ছিলো পাকিস্তান প্রস্তাব; এবং যাঁরা এতে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁদের অধিকাংশ সৃষ্টিশীল লেখক ছিলেন না। কেউ ছিলেন সাংবাদিক–সাংবাদিকই ছিলেন অধিকাংশ, কেউ রাজনীতিক বা রাজনীতিপ্রবণ, কেউ প্রাবন্ধিক; এবং তাঁদের পরবর্তী জীবন প্রমাণ করেছে যে তাঁরা সবাই ছিলেন প্রগতিবিমুখ। তাঁরা সবাই মুসলিম লিগের রাজনীতিক দর্শন বিনাপ্রশ্নে গ্রহণ করেছিলেন; এবং উগ্রভাবে তাতে বিশ্বাসী ছিলেন। পাকিস্তানবাদী সাহিত্যসৃষ্টি ও সাহিত্যে পাকিস্তানবাদ প্রচারের জন্যে তাঁরা দু'টি সংঘও গ'ড়ে তুলেছিলেন,–একটি কলকাতায়, অপরটি ঢাকায়। এ-সংঘ দুটি আলোচনা-অনুষ্ঠান ও সাহিত্যসম্মেলন আয়োজন ক'রে মুসলমান সমাজে বিশেষ এক ধরনের সংস্কৃতি ও সাহিত্যচেতনা গ'ড়ে তোলার উদ্যোগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেয়। তাঁদের তত্ত্ব বা দর্শন প্রচারে ব্যবহৃত হয় *মাসিক মোহাম্মদী* নামক সাময়িকপত্রটি। পরে, পাকিস্তানপর্বে, সরকারি *মাহে-নও* সাময়িকপত্রটি পাকিস্তানবাদী সাহিত্যতত্ত্ব প্রচারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

১৯৪২-এ কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি'। যে-এগারোজন প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য 'পরাণুকরণমুক্ত সুস্থ সাহিত্যসংস্কৃতি-সাধনার' জন্যে সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁরা কেউই সৃষ্টিশীল লেখক ছিলেন না। সোসাইটির সদস্যরা ছিলেন : আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মুহম্মদ হাবীবুল্লাহ বাহার, মুজীবর রহমান খাঁ, সৈয়দ সাদেকুর রহমান, মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ, মোহাম্মদ মোদাব্বের, আবদুল হাই, জহুর হোসেন চৌধুরী, আনোয়ার হোসেন, ফজলুল করিম খাঁ ও মোশাররফ হোসেন। কিছু পরে রেনেসাঁ সোসাইটিতে যোগ দেন আবুল মনসুর আহমদ। রেনেসাঁ সোসাইটির সদস্যরা পাকিস্তান-আন্দোলন দ্বারা প্রবলভাবে প্ররোচিত অনুপ্রাণিত ছিলেন; এবং সাহিত্যকে পরিণত করতে চেয়েছিলেন পাকিস্তানবাদের প্রচারমাধ্যমে। সোসাইটির মূলনীতিগুলো ছিলো : (১) জাতীয় রেনেসাঁর উদ্বোধক পাকিস্তানবাদের সাহিত্যিক রূপায়ণ; (২) পাকিস্তানবাদ সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক ও মননমূলক বক্তৃতা, বিতর্কিকা, বৈঠকী রচনাপাঠ, তথ্যানুসন্ধান ও সংগ্রহ, গবেষণা ও আলোচনা, পুস্তক ও পুস্তিকা প্রচার প্রভৃতি কাজের আয়োজন ও উৎসাহ দান; (৩) সাহিত্যিক, সাহিত্যামোদী, মহিলা ও ছাত্রদের মধ্যে বিশেষভাবে পাকিস্তানী ভাবধারা সম্প্রসারণ; (৪) জাতীয় তমদ্দুনের উন্মেষক ও সহায়ক আন্দোলনের সাথে টডটঢণবধড যোগ সংরক্ষণ; (৫) সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমানের আন্তর্জাতিক সম্প্রীতিমূলক আবেদনের রূপায়ণ; (৬) সাহিত্যে পাকিস্তানবাদবিরোধী সর্বপ্রকার প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারা, ফ্যাসিবাদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে মনোভাব সৃষ্টি। সোসাইটির গঠনতন্ত্রের (৭)-সংখ্যক বিধিটি যদিও ছিলো যে 'সর্বপ্রকার সক্রিয় রাজনীতি হতে সোসাইটি দূরে থাকবে', তবুও বোঝা যায় রেনেসাঁ সোসাইটি শুধু সাহিত্যিক সংঘ ছিলো না; মুসলিম লীগের রাজনীতি এ-সোসাইটিকে পরিচালিত করতো। ১৯৪৩-এ ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ'। এটি গঠনে প্রধানত উদ্যোগ নিয়েছিলেন সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ও সৈয়দ আলী আহসান। রেনেসাঁ সোসাইটির সাথে সাহিত্য সংসদের কোনো নীতিগত পার্থক্য ছিলো না, শুধু পার্থক্য ছিলো যে রেনেসাঁ সোসাইটি জীবনের সমস্ত ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করতে উৎসাহী ছিলো, আর সাহিত্য সংসদ উৎসাহী ছিলো শুধু পাকিস্তানি সাহিত্য নিয়ন্ত্রণে। দুটি সংঘই ছিলো সাম্প্রদায়িক ও প্রগতিবিমুখ। পাকিস্তানবাদ ছিলো উভয় সংঘেরই মূলমন্ত্র।

পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ ও পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি ১৯৪৩ ও ১৯৪৪-এ যে-সম্মেলনের আয়োজন করে, তাতে প্রদত্ত সভাপতি ও অন্যান্যের ভাষণে পাকিস্তানবাদী সাহিত্যের রূপ কী হবে, তা বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। রেনেসাঁ সোসাইটি শুধু সাহিত্যের রূপ নির্দেশ ক'রেই তৃপ্ত থাকে নি, মুসলমানদের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রের রূপই সোসাইটি নির্দেশ করার চেষ্টা করে। পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা মুসলিম হল মিলনায়তনে, ১৯৪৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ্রিস্টাব্দে; এবং পরের বছর এর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির প্রথম অধিবেশন হয় ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে, কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ হলে। এ-অধিবেশনগুলোতে পাকিস্তানবাদী সাহিত্যের যে-রূপ নির্দেশ করা হয়, তা মুসলমান লেখকমণ্ডলিতে সাড়া জাগিয়েছিলো। এর ফলে সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের একটি সচেতন ধারা বিকশিত হয়, এবং পাকিস্তান লাভের পর ওই ধারাটি প্রবল হয়ে ওঠে। সাম্প্রদায়িক সাহিত্যতত্ত্ব বেশ ক্ষতি করেছিলো বাঙালি মুসলমান সাহিত্যের : চল্লিশের দশকে সুস্থ একটি আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের ধারা তাঁরা সৃষ্টি করতে পারতেন যদি না পাকিস্তানি রাজনীতি ও পাকিস্তানবাদী সাহিত্যতত্ত্ব তাঁদের রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতো। এ-নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তির জন্যে দরকার হয়েছিলো বায়ান্নোর ভাষা-আন্দোলন।

পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে (১৩৪৯ : ১৯৪৩) উদ্বোধন-ভাষণ দেন কায়কোবাদ। কায়কোবাদ বলেন, 'সেকালে হিন্দু লেখকগণ আমাদিগকে বিশেষ ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, তাঁহারা বলিতেন, 'মুসলমানেরা বাংলা লিখিতে জানে না।" তিনি কেনো হিন্দু লেখকদের অনুকরণ করেছিলেন তা বর্ণনা ক'রে কায়কোবাদ নতুন লেখকদের স্বাতন্ত্র্যস্পৃহাকে অভিনন্দন জানান : 'আজ আপনাদের অনুকরণের কোন প্রয়োজন নাই। আজ আপনারা আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া মুসলিম বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিতে থাকুন, কোন বাধা নাই, বিঘ্ন নাই, নিন্দা করিবার কেহ নাই।' কায়কোবাদ যে-স্বাতন্ত্র্য কামনা করেন, তার মাঝে উগ্রতা নেই, সাম্প্রদায়িকতা নেই। নতুন সাহিত্যের রূপ কেমন হওয়া উচিত, সে-সম্পর্কেও কোনো মন্তব্য তিনি করেন নি। সৈয়দ এমদাদ আলী সাহিত্যের রূপ সম্পর্কে কিছুটা ইঙ্গিত দেন। তিনি বলেন, 'সর্বপ্রথমে ভাবের বিপ্লব ঘটাইবার জন্যই আপনারা সাহিত্য সৃষ্টি করিবেন, কিন্তু নিজেদের তালিম ও তমদ্দুনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই আপনাদের কাজ করিতে হইবে। কোরআনের শিক্ষা ও আদর্শ সর্বদা আপনারা সম্মুখে রাখিবেন। মনে রাখিবেন আপনারা মুসলমান।' সৈয়দ এমদাদ আলী তরুণ লেখকদের ধর্মীয় পরিচয়টি স্মরণ রাখতে বলেছেন, কিন্তু সাহিত্য সংসদের তরুণেরা স্মরণে রেখেই সন্তুষ্ট ছিলেন না, তাঁরা ওই পরিচয়টিকে উগ্রভাবে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন।

সাহিত্য সংসদের তাত্ত্বিক ছিলেন সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ও সৈয়দ আলী আহসান। তরুণ বয়স থেকেই তাঁরা প্রগতিবিমুখ। সভাপতির ভাষণে সাজ্জাদ স্বীকার ক'রে নেন যে বাঙলাই বাঙালি মুসলমানের ভাষা, এবং বাঙলা ভাষায়ই বাঙালি মুসলমান সাহিত্য চর্চা করবে। উর্দুর দাবিকে তিনি অস্বীকার করেন। তিনি বাঙালি মুসলমানের জন্যে একটি পৃথক সাহিত্য দাবি করেন। তাঁর মতে, 'এ-কথাকে অস্বীকার আমরা কিছুতেই করতে পারছিনে যে বাঙালী মুসলমানের মতো বিশিষ্ট সমাজের একটা স্বতন্ত্র সাহিত্য দাবি করার অধিকার আছে। সাহিত্যে আপনার চিত্র প্রতিবিম্বিত করে দেখবার আগ্রহ এবং আকুতি থাকা তার পক্ষে স্বাভাবিক।' তিনি তাঁদের আন্দোলনকে কেলটিক পুনর্জাগরণের সাথে তুলনা করেন। ইয়েট্স্ ও অন্যান্য লেখক যেমন আইরিশ ঐতিহ্য গ্রহণ করেছিলেন, তেমনভাবে মুসলমানেরাও নিজেদের ঐতিহ্য গ্রহণ করবে ব'লে তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মত দেন। কেলটিক পুনর্জাগরণের সাথে সাহিত্য সংসদের আন্দোলনের যে একটা বড়ো পার্থক্য রয়েছে, সেটা অবশ্য তাঁর চোখ এড়িয়ে যায়। ইয়েট্স্ ও অন্যান্য কেলটিক পুনর্জাগরণবাদী যেখানে নিয়েছিলেন স্বদেশি ঐতিহ্য সেখানে মুসলমান বাঙালি লেখকদের শরণ নিতে হয়েছে বিদেশি মুসলিম ঐতিহ্যের। এখানেই দেখা দিয়েছে সংকট। তাঁদের আন্দোলন যে পাকিস্তান-আন্দোলনেরই প্রভাবজাত এটা স্পষ্ট ক'রে তিনি বলেন, 'আমাদের মানসিক ক্লৈব্যের যুগ অতীত হয়ে গেছে, রাজনৈতিক জাগরণের সংগে সংগে একটা সাহিত্যিক জাগরণ আসাও অবশ্যম্ভাবী।' এ-আন্দোলন প্রাণশক্তি আহরণ করবে কোথা থেকে? তিনি অনুপ্রেরণার জন্যে 'মুসলমান জীবনের বিশিষ্ট ঐতিহ্য' অবলম্বনের কথা বলেন; এবং আরো বলেন, 'প্রয়োজন হলে আমরা ইসলামের ইতিহাস মন্থন করে আমাদের সাহিত্যের উপকরণ সঞ্চয় করবো।' আলী আহসান 'সম্পাদকের বিবৃতি'তে মুসলমানদের বিশিষ্ট স্বতন্ত্র সাহিত্যের কথা বলেন। রবীন্দ্রনাথের 'আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন বাতাসে' গানটি স্থূলভাবে ব্যাখ্যা ক'রে তিনি বলেন, 'এ ব্যর্থতার ক্লান্তি আমরা চাই নে। অনুপ্রেরণার জন্য যদি আমরা আমাদের জীবনের দিকে লক্ষ্য করি, তবে আমাদের ব্যর্থ হতে হবে না।' তিনি আলাওল থেকে শুরু ক'রে কায়কোবাদ পর্যন্ত মুসলমান লেখকদের রচনায় 'পূর্ণভাবে মুসলমান জাতির সংস্কৃত প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে নি' বলে মনে করেন। তিনি বলেন, 'বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এলেন নজরুল; মুসলমান জাতিকে নবপ্রাণচেতনায় উদ্বোধিত করবার প্রয়াস করা হয় তখনই। এ-প্রয়াস অর্থহীন হয় নি। নজরুলের সাহিত্যিক মূল্য যত তুচ্ছই হোক না কেন, এ-প্রয়াসের সত্যিকারের উদ্বোধক হিসাবে তাঁর স্থান আজও নিঃসংশয়ে অনেকের পুরোভাগে।' তিনি বলেন, 'যদি সমাজের পূর্ণ পরিচয় ফুটিয়ে তুলতে পারি আমাদের সাহিত্যে তবে তাতেই থাকবে অনিত্য-নিত্যের-সংযোগে এক সুষমামণ্ডিত আভা।' সাহিত্য সংসদের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে সাজ্জাদ হোসায়েন ও আলী আহসান বিশেষ উগ্র সাম্প্রদায়িকতা দেখান নি; কিন্তু পরে তাঁরা দু'জনেই উগ্র সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠেন যখন তাঁরা আরো একটু বয়স্ক ও পাকিস্তানবাদে ভালোভাবে দীক্ষিত হন।

'সভাপতির অভিভাষণ'-এ আবুল কালাম শামসুদ্দীন বলেন, 'বস্তুতঃ পাকিস্তান শুধু রাজনীতি ক্ষেত্রে নয়, সাহিত্য-ক্ষেত্রেও রেনেসাঁর বাণী নিয়ে এসেছে। মুখ্যতঃ পাকিস্তান এদেশের রাজনৈতিক সত্তাকে ঘা মেরে জাগিয়ে দেওয়ার জন্যে পরিকল্পিত হয়েছে সত্য, কিন্তু সে আঘাতের বেদনা জাতীয় সত্তার মর্মস্থল সাহিত্যেও সঞ্চারিত হয়েছে।' তিনি লক্ষ্য করেন যে বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যে লক্ষণীয় হচ্ছে 'মৌলিকতার অভাব এবং পরাণুকারিতার প্রভাব।' তাঁর মতে, 'মুসলমানের কৃষ্টি, মুসলমানের তমদ্দুন, মুসলমানের সমাজ-ব্যবস্থা, মুসলমানের জীবনযাত্রা প্রণালী সাহিত্যে রূপায়িত করতে হবে এবং তাতেই হবে মুসলমানের সাহিত্য সাধনার সার্থকতা।' তিনি মুসলমান লেখকদের সাহিত্যিক প্রেরণার একটি স্থূল নির্দেশ করেন, তা হচ্ছে পুথিসাহিত্য। তিনি বিশ্বাস করেন, 'মুসলমানের দানে বাংলা সাহিত্যে রেনেসাঁ' আসবেই।

১৯৪৪-এর জুলাই মাসের প্রথম ও দ্বিতীয় তারিখে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ হলে অনুষ্ঠিত হয় 'পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সম্মেলন'। রেনেসাঁ সোসাইটি শুধু সাহিত্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসাহী ছিলো না, তার লক্ষ্য ছিলো জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে পাকিস্তানবাদের রূপায়ণ। তাই রেনেসাঁ সম্মেলন বিভক্ত হয়েছিলো নানা শাখায় : সাহিত্য, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান, শিক্ষা, পুথিসাহিত্য, তহজিব ও তমদ্দুন, শিল্প ও সঙ্গীত, ভাষাবিজ্ঞান, ধর্মদর্শন, আনন্দ মজলিছ প্রভৃতি শাখায় বিভক্ত ক'রে তাঁরা মুসলমানের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে সংক্রামিত করতে চেয়েছিলেন পাকিস্তানচেতনা। সাহিত্য সংসদের সম্মেলনের চেয়ে এ-সম্মেলন ছিলো যেমন ব্যাপক, তেমনি উগ্র। তাঁরা পাকিস্তানবাদী যে-জীবন ও সাহিত্য কামনা করেছিলেন, তা সম্মেলনের প্রত্যেক শাখার সভাপতির ভাষণে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। তবে সব শাখা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। সম্মেলনের মূল সভাপতি (আবুল মনসুর আহমদ), সাহিত্য শাখার সভাপতি (সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন), পুথিসাহিত্য শাখার সভাপতি (আদমউদ্দীন), তহজিব ও তমদ্দুন শাখার সভাপতি (মুজিবর রহমান খাঁ), ভাষাবিজ্ঞান শাখার সভাপতি (আবুল হাসানাত) ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির (আবুল কালাম শামসুদ্দীন) ভাষণ থেকে পাকিস্তানবাদী সাহিত্যের রূপটি সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

রেনেসাঁ সম্মেলনের বিভিন্ন শাখার সভাপতি বক্তব্যে ও ভাষায় পাকিস্তানবাদী সাম্প্রদায়িকতাকে মূর্ত ক'রে তোলেন। 'হাজেরান বন্ধুগণ' বা হাজেরান মজলিস'-এর মতো সম্বোধন, এবং 'আমাকে সরফরাজ করেছেন', 'শুকরিয়া জানবেন', 'নিয়ত-মকসেদ সম্বন্ধে শুরুতেই কিছু আরজ', 'দুহ্‌রাতে চাই না', 'খোশ-আমদেদ জানাবার', 'জলসা আহুত হয়েছে', ধরনের মিশ্রভাষার ব্যবহার তাঁদের প্রবণতার স্পষ্ট পরিচয় বহন করে। বোঝা যায় তাঁরা এমন এক ধরনের সাহিত্য চাইবেন যা একান্তভাবেই–ভাব ও ভাষায়–ইসলামি বা পাকিস্তানি ও অনাধুনিক। আবুল কালাম শামসুদ্দীন দাবি করেন, 'আমরা পূর্ব-পাকিস্তানের অধিবাসীদের চিন্তারাজ্যে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আনতে চাই।' এ-বিপ্লব মধ্যযুগমুখি পাকিস্তানি বিপ্লব। তিনি যদিও তাঁর প্রবন্ধে বুদ্ধির মুক্তির কথা বলেছেন, তবে তা *শিখাগোষ্ঠির* বুদ্ধির মুক্তি নয়, বরং তার বিরোধী। তিনি বলেন, 'পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি আমাদের সাহিত্যে স্বস্থতা ও স্বকীয়তা ফিরিয়ে আনতে চায়।' কীভাবে ফিরিয়ে আনা যায় 'স্বস্থতা ও স্বকীয়তা'? তিনি তাও নির্দেশ করেন। তাঁর বক্তব্য 'পুঁথি ও লোকসাহিত্যে পুরাপুরি প্রত্যাবর্তনে সে-স্বস্থতা, স্বকীয়তা আসবে না– কারণ ওটা অতীতে প্রত্যাবর্তনেরই কথা,-রেনেসাঁর কথা নয়। তবে পুঁথি ও লোকসাহিত্যের ভিত্তিতে আমাদের সাহিত্যকে দাঁড় করাতে হবে নিশ্চয়ই। সে-ভিত্তির উপর বর্তমানের ব্যর্থ সাহিত্যিক কসরতের অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতের প্রয়োজনে আমাদের ভাবী সাহিত্যের সৌধ রচনা করতে হবে।' অর্থাৎ তিনি আধুনিক কোনো ভিত্তির বদলে পুথি ও লোকসাহিত্যের মতো বাতিল ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে চান পাকিস্তানবাদী সাহিত্যকে।

আবুল মনসুর আহমদ তাঁর মিশ্রভাষায় বলেন, 'রাজনীতিকের বিচারে 'পাকিস্তানের' 'অর্থ যাই হোক না কেন, সাহিত্যিকের কাছে তার অর্থ তমদ্দুনী আজাদী, সাংস্কৃতিক স্বরাজ, কালচারেল অটনমী।' তিনি উল্লেখ করেন যে অনেকের মতে, 'পাকিস্তান আন্দোলনটা প্রগতি বিরোধী। কারণ এতে জোর দেয়া হচ্ছে ধর্মোন্মাদনার দিকে।' তিনি এ-অভিযোগ খণ্ডন ক'রে এমন এক পাকিস্তানের কল্পনা করেন, যা পুরোপুরি বুলিসর্বস্ব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি বলেন, 'রেনেসাঁর পথে সে সর্বাংগীন জলজলা পয়দা হবে, তাতে এ-ডিক্টেটর বা ও-ডিক্টেটরের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে না– প্রতিষ্ঠিত হবে এক আল্লাহর রাজত্ব। সে রাষ্ট্রে তখন এ শাসক, ও শাসিত বলে কেউ থাকবে না, সবাই হবে স্বরাট, সকলে হবে সমান। সে রাজ্যে এ ধনিক আর ও শ্রমিক বলে কেউ থাকবে না। সব ধরনের মালিক হবে আল্লাহ।' এমন আল্লাহর রাজত্বে সাহিত্যও হবে আল্লাহ বা ধর্মকেন্দ্রিক। বাঙলা ভাষায় এতোদিন যে-সাহিত্য রচিত হয়েছে, তাকে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য বলতে অস্বীকার করেন। তাঁর মতে, 'পূর্ব-পাকিস্তান অর্থাৎ বাঙলা ও আসামের সাহিত্য বলতে আমরা যা বুঝি, তা বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্র যুগের সাহিত্যিকদের সাহিত্য। এটা খুবই উন্নত সাহিত্য। তবে এ-সাহিত্য পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্য নয়। কারণ এটা বাঙলার মুসলমানের সাহিত্য নয়। এ-সাহিত্যে মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য কোনো দান নেই, শুধু তা নয়, মুসলমানদের প্রতিও এ-সাহিত্যের কোনো দান নেই। অর্থাৎ এ-সাহিত্য থেকে মুসলিম সমাজ-প্রাণ প্রেরণা পায় নি এবং পাচ্ছে না। এর কারণ আছে। সে কারণ এই যে, এ-সাহিত্যের স্রষ্টাও মুসলমান নয়, এর বিষয়বস্তুও মুসলমান নয়; এর স্পিরিটও মুসলমানী নয়; এর ভাষাও মুসলমানের নয়।' অর্থাৎ হিন্দুর সাহিত্যকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন। তিনি নজরুল ইসলামকে 'পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় কবি' স্বীকার ক'রে পুঁথিসাহিত্য ভিত্তি ক'রে পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য সৃষ্টির কথা বলেন। তাঁর মতে, 'বাঙলার মুসলমানের যেমন একটা নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, তেমনি তাদের একটা নিজস্ব সাহিত্যও আছে। সে সাহিত্যের নাম মুসলমানী বাঙলা সাহিত্য বা পুঁথি-সাহিত্য।' তিনি বলেন, 'পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যিক রেনেসাঁ আসবে এই পুঁথি-সাহিত্যের বুনিয়াদে।' ওই সাহিত্য রচিত হবে কোন বাঙলা ভাষায়? তাঁর মতে, 'সে সাহিত্যের ভাষায়ও হবে মুসলমানেরই মুখের ভাষা।' অর্থাৎ তিনি আরবি ফার্সি উর্দু মিশ্রিত বাঙলা ভাষায় মুসলমানি বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টি হবে ব'লে মনে করেন। সে-ভাষা 'সংস্কৃত বা তথাকথিত বাঙলা ব্যাকরণের কোনো তোয়াক্কা রাখবে না।'

সাজ্জাদ হোসায়েনের মতে বাঙলা সাহিত্যে 'ইসলামী তমদ্দুনের রস'-এর বিশেষ অভাব, অন্য দিকে উর্দু সাহিত্যে এ-রস রয়েছে প্রবলভাবে। তাঁর মতে বাঙলা ভাষার অনৈসলামিক রূপই মুসলমান সাহিত্যিকদের সাহিত্য সাধনার প্রধান প্রতিবন্ধক। তিনি সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে ইসলামি শব্দ প্রয়োগের কথা বলেন, এবং বলেন, 'বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের যে সংস্কারের কথা আমি উপরে বললাম, তার জন্যে মালমসলা বহু কিছু আমাদের গ্রহণ করতে হবে পুঁথি-সাহিত্য থেকে।' তিনি পুথিসাহিত্যের ভাষাকেই মুসলমানের ভাষা হিশেবে গণ্য করেন। তাঁর মতে মুসলমানের সাহিত্যের 'বুনিয়াদ এই পুঁথির ভাষার উপরেই গড়ে তুলতে হবে।' এ কিউ এম আদমউদ্দীন বলেন, 'পুঁথি-সাহিত্যের পুরানো ধারা হুবহুভাবে আবার ফিরাইয়া আনা সম্ভবপর নয়–হয়ত তাতে বাঙ্গলার মুসলিম সাহিত্যকে প্রগতির দিক দিয়া কল্যাণকরও নয়। তবে পুঁথি সাহিত্যকে ভিত্তি করিয়া এবং বর্তমান পাঙক্তেয় বাঙলা সাহিত্যের অভিজ্ঞতাকে বরণ করিয়া লইয়াই তাকে পূর্ব-পাকিস্তানের সত্যকার সাহিত্য-রচনায় ব্রতী হইতে হইবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙ্গালার মুসলিম সাহিত্য-প্রতিভা এই পথ অনুসরণেই আপন নিজস্বতা খুঁজিয়া পাইবে বলিয়া মনে হয়।' আবুল হাসানাত পরিচয় দেন বানানে বাতিকগ্রস্ততার। তিনি এমন অদ্ভুত বানানে তাঁর রচনাটি লেখেন, যা গৃহীত হ'লে মুসলিম বাঙলা বানান হয়ে উঠতো ভয়াবহ ও সাহিত্য হতো অপাঠ্য।

সাহিত্য সংসদ ও রেনেসাঁ সম্মেলনের আগে থেকেই মুসলমানের সাহিত্যের রূপ সম্পর্কে পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ বেরোতে শুরু করে; এবং এর পরে, বিশেষ ক'রে পাকিস্তানি স্বাধীনতার পরে প্রচুর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কাজী মোহাম্মদ ইদরিস 'জাতীয় সাহিত্যের কথা' লেখেন ১৩৫১ সালে। তিনি মুসলমানের জাতীয় সাহিত্য দাবি করেন, যে-সাহিত্য হবে মুসলমানের সৃষ্টি ও মুসলমানের জীবনভিত্তিক। তিনি বলেন, 'যে মুসলমান সাহিত্যিক মুসলমান-মনের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করার কলাকৌশলে পারদর্শী, মুসলিম জীবনের বিশিষ্ট সমস্যার সন্ধান দিতে সমর্থ এবং মুসলিম চিত্তের ভাবাবেগে স্পন্দন সৃষ্টি করিতে সক্ষম একমাত্র তিনিই জাতীয় সাহিত্যস্রষ্টার দাবীদার বিবেচিত হতে পারেন।' মুজীবর রহমান খাঁ 'সাহিত্য ও জাতীয় ইচ্ছাপূরণ' প্রবন্ধে মুসলমানের সাহিত্যের দুর্বলতার কারণ হিশেবে উল্লেখ করেন 'মুসলমানের জাতীয় মনের সাথে তাঁদের পরিচয়ের অভাব।' তিনি মুসলমানের সাহিত্যে মুসলমানের জাতীয় ইচ্ছার প্রকাশ দেখতে চান। তাঁর মতে, 'মুসলমানের জাতীয় ইচ্ছাপূরণের অনেকখানি দৃপ্ত ও শক্তিমান বিকাশ এখন আমরা দেখতে পাই নজরুল ইসলাম ও জসীমুদ্দীনের রচনায়। নজরুল ইসলাম এবং জসীমুদ্দীনের শত দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এরা আমাদের জাতীয় সাহিত্যের এখন মুখপাত্র।' মোহাম্মদ আবদুল হক বলেন, 'বাংলা সাহিত্য জাতীয় সাহিত্য নয়, হিন্দু সাহিত্য।' তাঁর মতে 'মুসলমানের সাহিত্য মুসলমানকেই রচনা করিতে হইবে।' তিনি চান হিন্দু-সাহিত্য থেকে পৃথক মুসলমান সাহিত্য। তিনি বলেন, 'বাংলা সাহিত্যে শুধু হিন্দুয়ানী সুরই ফুটিয়াছে, এই একঘেয়েমি দূর করিয়া সাহিত্যে একটা নূতন সুর আনিতে হইবে, এবং সে সুর হইবে ইসলামী সুর। বাংলা সাহিত্যে এতদিন শুধু হিন্দু জীবনই প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহাতে এখন মুসলিম জীবন প্রতিফলিত করিতে হইবে।' তিনি ইসলামের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন, এবং ইসলামকেই মনে করেন মুসলমানের প্রকৃত প্রেরণা। তিনি বলেন, 'মুসলমানের সাহিত্যসৃষ্টির পেছনে এই 'নিজস্ব' প্রেরণার প্রয়োজন। এই প্রেরণা হইবে ইসলামী প্রেরণা। ইসলামী প্রেরণা ছাড়া মুসলমানের সাহিত্যসৃষ্টি মূল্যবান হইবে না, হয় নাই-এ শিক্ষা আমরা সাহিত্যের ইতিহাস হইতে পাইয়াছি।' তাঁর মতে ইসলামি সংস্কৃতির সাথে মুসলমানের ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই ব'লেই তাঁরা সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারেন নি। তাঁর মতে, 'আমাদের মধ্যে একটা প্রবল ইসলামী ভাব নাই। এই ইসলামী ভাব আমাদের মনে যতদিন না আসিবে ততদিন আমাদের সৃষ্ট সাহিত্যও একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হইবে না, একটা বিশেষ সুরে বাজিয়া উঠিবে না, ততদিন আমাদের সাহিত্যে হিন্দুয়ানী ভাবেরই বারবার আবির্ভাব হইবে, হিন্দুয়ানীর অনুকরণ আসিয়া পড়িবে, এবং আমাদের সৃষ্টি ব্যর্থ হইতে থাকিবে।' ইসলামি ভাব সৃষ্টির জন্যে তিনি ইসলামি শাস্ত্রগ্রন্থগুলোর অনুবাদের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। রেজাউল করিম

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পাকিস্তানের সংস্কৃতি ও পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য' প্রবন্ধে পাকিস্তানে বিশুদ্ধ ইসলামি সংস্কৃতি গ'ড়ে তুলতে চান, এবং পাকিস্তানি রাজনীতি ও পাকিস্তানি সাহিত্যকে একই ধারায় প্রবাহিত করতে চান। তিনি বলেন, 'আমাদের বিধান পরিষদের অবজেকটিব রেজুলেশন ও আমাদের সাহিত্য-পরিষদের অবজেকটিব রেজুলেশনের মূল কথা অভিন্ন হওয়া চাই। কারণ আমরা তওহীদের আমানতদার এবং তওহীদই আমাদের সংস্কৃতির শেষ কথা।'

এর মাঝে পাকিস্তান স্বাধীন হয়েছে। ১৯৪৯ থেকে ঢাকায় বিভিন্ন পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হ'তে শুরু করেছে। চারদিকে ইসলাম ও পাকিস্তানবাদ প্রচারিত হতে শুরু করেছে প্রবলভাবে। পাকিস্তানবাদী সাহিত্যতাত্ত্বিকেরা পাকিস্তানবাদে আরো বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন, এবং পাকিস্তানকে অবিনশ্বর ভাবতে শুরু করেছেন। বেড়েছে সব ধরনের সাম্প্রদায়িকতা, এবং বেড়েছে পাকিস্তানবাদীদের সাহিত্যিক সাম্প্রদায়িকতাও। যাঁরা পাকিস্তানবাদে বিশ্বাসী নন, তাঁদের মতামত প্রকাশিত-প্রচারিত হওয়ার পথ সে-সময় বন্ধ। তাই বিভিন্ন পত্রিকায় পাকিস্তানবাদী সাহিত্যতাত্ত্বিক প্রবন্ধই চোখে পড়ে। ১৯৪৯-এ আবুল কালাম শামসুদ্দীন 'পাকিস্তানে শিল্প ও সাহিত্যের ধারা' প্রবন্ধে পাকিস্তানবাদী সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর মত পুনরায় ব্যক্ত করেন। তাঁর বিশ্বাস, 'পাকিস্তান ক্ষণস্থায়ী জীবন নিয়ে আসে নি–বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহে জল-বুদ্‌বুদের জীবন তার নয়।' তিনি পাকিস্তানকে একটি 'বিপ্লব' ব'লে গ্রহণ করেন, এবং ঘোষণা যে পাকিস্তানি সাহিত্যও হবে বিপ্লবাত্মক। পাকিস্তানি সাহিত্যের সত্যিকার রূপটি কী হবে, তিনি তা স্পষ্ট নির্দেশ করতে না পারলেও, তাঁর মতে, 'বিজাতীয় ভাবধারা, বিজাতীয় উপমা রূপক শব্দ কোন কিছুই আর নতুন পোষাক পরে পাকিস্তান সাহিত্যে চালু হতে পারবে না। এই উপলব্ধির ভিত্তিতে যে সত্যিকার পাকিস্তানী সাহিত্য জন্ম নেবে তারই আয়োজনে আমাদের সাহিত্যিকগণ নিয়োজিত আছেন।'

নওবাহার (১৩৫৬) পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় 'আমাদের মত ও পথ' নামক সম্পাদকীয়তে পত্রিকাটির ও পাকিস্তানি সাহিত্যের পথ নির্দেশ করা হয়। সম্পাদকীয়তে বলা হয় যে এটি 'নিছক একখানি সাহিত্য-পত্র', এবং 'পাকিস্তান-বিরোধী কোন বিষয়বস্তুও 'নওবাহারে' স্থান পাইবে না।' পত্রিকাটির লক্ষ্য 'আমাদের (পাকিস্তানের) তাহজীব ও তমদ্দুনের রূপায়ণ।' বলা হয়, 'বাংলাদেশ বিভক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া গিয়েছে। পাকিস্তানের ওপারের সাহিত্য আর এপারের সাহিত্যে তাই এখন আর পূর্বের ধারাবাহিকতা রহিবে না।' পত্রিকাটি মারফতী ও মুর্শিদীগান, বেহুলার ভাসান, বেদে-বেদেনীর গান প্রভৃতি ইসলামবিরোধী ব'লে বর্জন করতে চায়। এমনকি পুথিসাহিত্যকেও ত্যাগ করতে চায়, কারণ 'সাচ্চা ইসলামী আদর্শ ও ভাবধারা ঐ সাহিত্যে খুব কমই আছে।' পত্রিকাটির মতে, 'বাঙালী মুসলমানের জাতীয় অধঃপতনের মূল কারণ হইল আমাদের আদর্শ-বর্জ্জিত বাংলা সাহিত্যের প্রভাব।' পত্রিকাটি প্রকৃত পাকিস্তানি সাহিত্য চায়, কিন্তু দুঃখের সাথে লক্ষ্য করে যে 'আমাদের একদল কবি-সাহিত্যিক এখনও প্রাক-পাকিস্তান যুগের আদর্শে বাংলা ভাষার চর্চা করিতেছেন।' *নওবাহার*-এর বিভিন্ন লক্ষ্যের একটি হচ্ছে-এটি 'কমিউনিজমকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুখিবে।' *নওবাহার*-এর প্রকৃত সম্পাদক ছিলেন গোলাম মোস্তফা, যদিও সম্পাদক হিশেবে মুদ্রিত হতো তাঁর স্ত্রীর নাম। কাজী মোতাহার হোসেন 'নতুন অবস্থায় সাহিত্য' প্রবন্ধে ভিন্ন স্বরে কথা বলেন। এই প্রথম দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ভিন্ন স্বর শোনা যায়। তিনি বলেন, 'যাঁরা ইসলামী সাহিত্য বলতে কেবল তউহীদের ব্যাখ্যা এবং হিন্দু-সাহিত্য বলতে তশরীকের কীর্ত্তন বোঝেন, আমার বোধ হয়, তাঁরা সাহিত্যকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ বলে মনে করেন।' তিনি পাকিস্তানি সাহিত্যের ভিন্ন চরিত্র নির্দেশ করেন। তাঁর মতে, 'পাকিস্তানী সাহিত্য হবে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির মিলন-ভূমি। রসমাধুর্য্যে সে সাহিত্য সকলেরই মনোহরণ করবে।' তিনি মৃদুভাবে সাবধান ক'রে দেন যে 'শিশুরাষ্ট্রে যাতে চিন্তার কণ্ঠ রোধ না হয়, সেদিক যেন রাষ্ট্রপতিদের লক্ষ্য থাকে।' এ-সাবধানবাণী থেকে বোঝা যায় শুরুতেই পাকিস্তানে চিন্তার কণ্ঠরোধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিলো।

দিলরুবা (১৩৫৬, ১:৩) পত্রিকাটি 'আমাদের ভাষা ও সাহিত্য' নামে 'পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ গতিপথ' সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখকের বক্তব্য প্রকাশ করে। মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের রচনা থেকে নিচের উদ্ধৃতিতে তখনকার পরিস্থিতির পরিচয় মেলে : 'আমাদের মধ্যে একদল ভাবছেন বাংলা ভাষাকে একেবারে বাদ দিয়ে উর্দুকে বরণ করা যখন সম্ভব হলো না তখন প্রচুর আরবী ফারসী তথা উর্দু শব্দ আমদানি করে, বাংলার বর্ণমালা পর্যন্ত পাল্টে দিয়ে বাংলাকে ধীরে ধীরে উর্দুর সমপর্যায়ে টেনে তুলতে হবে। এরা হলেন চরমপন্থী। নরমপন্থীরা মনে করেন বড় রকমের রাজনৈতিক বিবর্তন প্রতি দেশেরই জাতীয় জীবনে একটা পরিবর্তন এনে দেয়। তাই আমরা যখন পাকিস্তান অর্জনে সফলকাম হয়েছি তখন পূর্ব পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। তার জন্য আস্ফালনের প্রয়োজন নেই, ভাষাকে আজই ঢেলে সাজাবার তাগিদ নেই আর বাংলা বর্ণমালাকে গঙ্গা পার করে বাংলার 'কুফরস্থানে' ঠেলে দিয়ে হুরুফুল কোরাণের ভাঁওতায় উর্দু অক্ষর গ্রহণ করারও জরুরাত নেই। পাকিস্তান রাষ্ট্রের উন্নতির সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্যও ধীরে ধীরে পাকিস্তানী (পূর্ব পাকিস্তানী অবশ্য) ছাপ বহন করবে।' তিনি মিশ্র বাঙলা ভাষাকে গ্রহণযোগ্য ভাবেন না। তাঁর শ্লেষাত্মক একটি বাক্য 'কথা উঠেছে সাহিত্যকেও দীন ইসলামের কালেমা পড়াতে হবে'– থেকেই বোঝা যায় পাকিস্তানবাদী ইসলামী সাহিত্যেও তিনি বিশ্বাসী নন। মুহম্মদ আবদুল হাই মনে করেন, 'পাকিস্তানের সোনার কাঠির স্পর্শে বাঙালী মুসলমানের ঘুমন্ত অন্তরপুরীতে দোলা লেগেছে; সৃষ্টি প্রেরণায় সে আজ মশগুল। আজ তার ভুল করলে চলবে না। সে যে বাঙলার মানুষ। সুতরাং তার মুসলমানত্ব ও বাঙালীত্ব, তার পাকিস্তান ও পূর্ব বাঙলা– এই বৈশিষ্ট্যের উপরেই তার জীবন গাথা তার সাহিত্য তাকে রচনা করতে হবে।'

সাজ্জাদ হোসায়েন 'মাশরেকী পাকিস্তানের ভাষার স্বরূপ' প্রবন্ধে বাংলা ভাষার কাঠামো স্থির করতে উদ্যোগী হন উগ্র পাকিস্তানপন্থীরূপে। তিনি বলেন, 'বাংলাকে মুসলিম তমদ্দুনের উপযুক্ত বাহনে পরিণত করিতে হইলে আমাদের যে আরবী-ফারসী আলফাজ এস্তেমাল করিতে হইবে, তাহা অস্বীকার করা চলে না। এবং যে সমস্ত শব্দ বিজাতীয় তমদ্দুনের পরিচয় বহন করে, সেগুলিকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্য।' তাঁর মতে, 'ইসলামী তমদ্দুনের নামগন্ধবর্জিত বঙ্কিমী-বিদ্যাসাগরী ভাষা পাকিস্তানের তরুণ শিক্ষার্থীরা শিখিবে, ইহার চাইতে পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?' 'পাকিস্তানের সাহিত্যের আদর্শ' প্রবন্ধে আহমদ শরীফ সে-সময়ের পরিস্থিতি বর্ণনা করেন এভাবে : 'চারদিক থেকে ধ্বনি উঠছে– ইসলামী সাহিত্য চাই। ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে ইসলামী-তমদ্দুন-তাহজীব, ঐতিহ্য-আদর্শ প্রতিফলিত করাই হবে আমাদের সাহিত্যিকদের ব্রত। কিন্তু আমাদের কবির দল (দু'একজন ছাড়া) তবু কাস্তে, লাঙ্গল, ধানক্ষেত, লড়াই আর বুভুক্ষ নিয়েই গুরুদের সাগরেদি করছেন। প্রমাণ– সদ্য-প্রকাশিত নবীন কবিদের কবিতা-সংকলন 'নতুন কবিতা' বইখানি। খুঁজলে অতি সহজেই কারণের সন্ধান মিলবে। প্রথমতঃ আমাদের মনে বা মাথায় কোথাও ইসলাম নেই, যদিও আমরাই ইসলামকে আঁকড়ে ধরে রেখেছি সব চেয়ে শক্ত করে।' তিনি স্পষ্ট করে বলেন, 'অন্তরে বাইরে কোথাও আমরা ইসলামী আদর্শ দেখতে পাই না। তবু বলা হচ্ছে ইসলামী-আদর্শে সাহিত্য সৃষ্টি করে মুসলমানী তমদ্দুন ও তাহজীবের মর্যাদা রক্ষা করতেই হবে, দুনিয়ার বৃহত্তর মুসলিম-রাষ্ট্র পাকিস্তানে। উত্তম কথা। উদ্দেশ্যও সাধু। সুতরাং দ্বিমত অবাঞ্ছিত। তবু 'কিন্তু' না করে উপায় নেই।' তাঁর মতে, 'ইসলামী আদর্শ হচ্ছে দেশ-কাল-পাত্র-নিরপেক্ষ এবং সাহিত্যের প্রধান উপকরণ হচ্ছে মানুষ– ইসলামের মূলনীতির পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের জীবনের সমস্যা বিচার ও সমাধান প্রচেষ্টার মধ্যেই ইসলামী বা পাকিস্তানী সাহিত্য গড়ে উঠতে পারে।' মোস্তফা কামাল 'আগামী সাহিত্যের ভূমিকা'য় বলেন, 'পাকিস্তান লাভের পর আমাদের ভবিষ্যৎ সাহিত্যদর্শ কি হবে, এটা তাহলে পরিস্ফুট। সোজা কথায় বলতে গেলে, আজ পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্যে স্থান পাবে পাকিস্তানের লক্ষ্য ও আদর্শ, পাকিস্তানীদের জীবন-দর্শন ও তাদের সমাজ-জীবন।'

ইব্রাহীম খাঁ 'আমাদের সাহিত্য' প্রবন্ধে 'রুশীয় সাম্যে'র নিন্দা ক'রে সমাজ-সমালোচনামূলক সাহিত্যের বদলে 'জীবনের আনন্দধ্বনি– সংগ্রাম-মুখী মুক্তি অভিসারীর জয়যাত্রার প্রাণময়ী সঙ্গীত' শুনতে চান। তিনি বলেন, 'আমাদের মাসিক কাগজগুলিতে যে সব ছোট গল্প প্রকাশিত হয়, তার অনেকগুলিতে ধ্বনিত হয়ে ওঠে একটা বেদনার্ত হাহাকার। কেউ মরে জমিদারের জুলুমে, কেউ পথে ঢলে পড়ে অনশনের পীড়নে, কেউ জর্জরিত হয় কারখানার মালিকের নির্মম কষাঘাতে, কেউ হাসপাতালের দুয়ারে শুয়ে মহাযাত্রা করে, হাসপাতালে গেলে স্থান পায় না, স্থান পায় বড়লোকের চিকিৎসা-বিলাসী অপদার্থ নন্দনেরা, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার বক্তব্য, বাংলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের ছবি আমরা দেখেছি, তার বর্ণনা আমরা পড়েছি, বড়র অত্যাচারের কাহিনী নিয়ে যথেষ্ট আন্দোলন করেছি। আর নয়। আর মরণের হাহাকার শুনতে চাই না।' অর্থাৎ ইব্রাহীম খাঁ গণসাহিত্য চান না; কিন্তু আহমদ শরীফ 'গণসাহিত্য' প্রবন্ধে গণসাহিত্যেরই পক্ষাবলম্বন করেন। তিনি 'বেহেস্ত-দোজখের শাস্তি-শাস্তি-নিরপেক্ষ' জীবন ও সাহিত্য কামনা করেন।

পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের কাল থেকে সৈয়দ আলী আহসান পাকিস্তানবাদী সাহিত্যের নিষ্ঠাপরায়ণ প্রগতিবিমুখ ভাষ্যকারের দায়িত্ব পালন করেন। একগুচ্ছ প্রবন্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রচনা ক'রে পাকিস্তানি সাহিত্যের রূপ নির্দেশ করার তিনি চেষ্টা করেন; এবং ক্রমশ তিনি প্রগতিবিমুখ থেকে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠেন। 'আমরা যারা লিখছি' প্রবন্ধে তিনি 'পুথির ভাবধারা আমাদের পক্ষে আজ মিথ্যে হয়েছে' মনে করলেও পুঁথিকে নতুন সাহিত্যের প্রেরণা হিশেবে গ্রহণ করেন, এবং 'নজরুলকে জাতীয় কবি বলা নিজেদের প্রবোধ দেয়া মাত্র' ব'লে মনে করলেও তাঁকে স্বীকার ক'রে নেন, কারণ তাঁর মধ্যে 'ইসলামী ঐতিহ্যের অংশ ছিলো।' 'পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য' প্রবন্ধে তিনি 'নবলব্ধ আজাদীর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সাহিত্য কি রূপ নেবে' সে সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। তাঁর মতে দেশ বিভাগের আগে থেকেই স্থির হয়ে গেছে যে 'পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের ধারা সম্পূর্ণ বাংলা সাহিত্যের ধারা হতে হবে ভিন্ন।' কিন্তু ভিন্ন সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয়ে ওঠে নি, তবে 'একমাত্র কাব্যক্ষেত্রে ইসলামী ঐতিহ্যের অনুসরণ আরম্ভ হয়েছিলো।' তিনি এ-প্রবন্ধেও পুথিসাহিত্যকে ঐতিহ্য হিশেবে গ্রহণের কথা বলেন, কারণ তা 'উপাদানের দিক দিয়ে যথেষ্ট শক্তিশালী।' তাঁর মতে, 'যে-জীবন সাহিত্যিকের উপজীব্য হবে গ্রামের পত্রচ্ছায়ায় তা লালিত, তাই গ্রামকে বঞ্চিত করে শহরকে নিয়ে এখানকার সাহিত্য হতে পারে না।' ১৯৫১-তে বেরোয় তাঁর 'পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্যের ধারা' প্রবন্ধটি, যার জন্যে তিনি কুখ্যাতি অর্জন করেন। আয়ারল্যান্ডে যেমন নতুন সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিলো, পূর্ব পাকিস্তানেও তেমনি নতুন সাহিত্য সৃষ্টির কথা বলেন তিনি। তিনি বলেন, 'সাহিত্য সৃষ্টির পূর্বাহ্নে তিনটি আদর্শকে সামনে রেখে কাজে অগ্রসর হতে হবে। সে তিনটি আদর্শ হচ্ছে, প্রথমতঃ– ইসলামের প্রবহমান ঐতিহ্য থেকে উপাদান আহরণ, দ্বিতীয়তঃ– অধুনা অপাংক্তেয় মুসলমানী পুথিকে পরিমার্জিত করে শালীন সাহিত্যের অংগীভূত করা, এবং তৃতীয়তঃ –পূর্ব-পাকিস্তানের অস্বীকৃত গ্রাম্য জীবনকে আরো বেশী করে সাহিত্যের বিষয়ীভূত করা।' তবে ইসলামি তমদ্দুনই ছিলো তাঁর ও তাঁর গোত্রের লক্ষ্য। তিনি বলেন, 'পাকিস্তান আন্দোলনের শুরু থেকেই এই আশা সবার মনে জেগেছিলো যে, পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্য ইসলামি তমদ্দুনের বাহন হবে।' এ-উদ্দেশ্যে তাঁরা ইকবালের কবিতা অনুবাদের উদ্যোগ নিয়েছিলেন; কারণ 'তিনি প্রথম পাকিস্তান আন্দোলনের ভিত্তিভূমি রচনা করেন', এবং 'তাঁর ভাবধারা মূলতঃ ছিল ইসলামী।' সৈয়দ আলী আহসান কয়েক দশক পূর্ববর্তী প্রগতিশীল 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনকারীদের তিরস্কার করেন এভাবে : 'দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত মুসলমান সাহিত্যিকরা অনেকটা হিন্দু ভাবধারায় দীক্ষিত ছিলেন। এই দীক্ষার চরম নিদর্শন মেলে ঢাকার মুসলমান সাহিত্য সমাজের তথাকথিত মুক্তবুদ্ধির আন্দোলনে। ইসলামী নীতিবোধকে লাঞ্ছিত করে যে মুক্তবুদ্ধির প্রতিষ্ঠা তা বিকৃত মানসের সৃষ্টি, তাতে নতুনত্বের উন্মত্ততা আছে, কিন্তু স্থির বিবেচনার প্রশান্তি নেই।...এই মুক্তবুদ্ধির আন্দোলনকে বাংলার মুসলমান কখনও স্বীকার করে নেয় নি।' পাকিস্তানবাদীরা যেখানে ছিলেন প্রগতিবিমুখ সেখানে মুক্তবুদ্ধির আন্দোলনকারীরা ছিলেন প্রগতিশীল, এটা এতোদিনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আলী আহসানের পাকিস্তানবাদে দীক্ষা উগ্র হয়ে উঠেছে প্রবন্ধটিতে শেষাংশে : 'আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার জন্য এবং হয়তোবা জাতীয় সংহতির জন্য যদি প্রয়োজন হয়, আমরা রবীন্দ্রনাথকেও অস্বীকার করতে প্রস্তুত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রয়েছি। সাহিত্যের চাইতে রাষ্ট্রীয় সংহতির প্রয়োজন আমাদের বেশী।' কিন্তু বাঙলাদেশ ও সাহিত্য গেছে বিপরীত দিকে : রবীন্দ্রনাথ ও বাঙালিত্বের জন্যে বাঙালি মুসলমান পাকিস্তানকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

পাকিস্তানবাদী সাহিত্যতত্ত্ব (১৯৪৩-১৯৫১) ছিলো সামাজিক-রাজনৈতিকভাবে প্রগতিবিমুখ, এবং শৈল্পিকভাবে অনাধুনিক ও অনুর্বর। মুসলিম লিগের দ্বিজাতিতত্ত্ব ও পাকিস্তান-আন্দোলনে বিশ্বাসী এ-সাহিত্যতত্ত্বের প্রচারকেরা ভূমিকা পালন করেছিলেন পাকিস্তানি রাজনীতির প্রচারকের। পরবর্তী জীবনে তাঁরা প্রায় সবাই প্রতিক্রিয়াশীল হিশেবে নিন্দিত হন। যে-পাকিস্তানে তাঁদের অন্ধ বিশ্বাস ছিলো, সেটি তার স্বাধীনতার শুরু থেকেই জীর্ণ হ'তে শুরু করে, এটা তাঁরা বুঝে উঠতে পারেন নি; এবং অনুভব করেন নি যে বাঙালিরা পাকিস্তানকে অস্বীকার ক'রে অন্য দিকে অগ্রসর হ'তে শুরু করেছে। পাকিস্তানি আবহাওয়ায় পাকিস্তানবাদবিরোধী বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ বিশেষ ছিলো না; সাহসেরও অভাব ছিলো। তাই পাকিস্তানবিরোধী প্রবন্ধ বিশেষ পাওয়া যায় না। কিন্তু গল্প-কবিতায় গোপন বিরোধিতা চোখে পড়ে। বায়ান্নোর ভাষা-আন্দোলনে ঘটে তার স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ। শৈল্পিকভাবে এ-সাহিত্যতত্ত্ব আধুনিক ও উর্বর ছিলো না। বাঙলা সাহিত্যে বিশের দশকের দ্বিতীয়াংশেই যে-আধুনিকতা সূচিত হয়ে গেছে, তা তাঁরা পুরোপুরি ভুলে থেকেছেন; তার বদলে তাঁরা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন এমন এক সাহিত্য যা আধেয়তে মধ্যযুগীয় এবং আধারে অমার্জিত-অসংস্কৃত। তাঁরা সাহিত্যে নবজাগরণ আনতে চেয়েছিলেন ইসলামি ঐতিহ্য নির্ভর করে, যা আধুনিককালে শুধু অসম্ভবই নয়, হাস্যকরও। তাঁরা ভাষাকে ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন আরবি-ফারসি-উর্দুর মিশ্রণে অপরিস্রুত। তাঁদের তত্ত্ব অবলম্বন ক'রে বাঙলাদেশের সাহিত্যের মুক্তি ঘটা সম্ভব ছিলো না। তাই দেখা গেছে পাকিস্তানবাদী লেখকেরা, বিশেষ ক'রে কবিরা– এঁরাই ছিলেন উগ্র– কবিতা থেকে দূরে স'রে গেছেন, বা কালাতিক্রমণদুষ্ট পদ্য তৈরি করেছেন। তাঁরা পুথিসাহিত্যকে ঐতিহ্য হিশেবে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। তাঁরা যা প্রত্যাখ্যান করেছেন, বাঙলাদেশের সাহিত্য বিকশিত হয়েছে তা নির্ভর ক'রেই। পঞ্চাশ, বিশেষ ক'রে ষাটের দশকে, বাঙলা সাহিত্যের তিরিশি স্রোতের সাথে সংযুক্ত হয়ে এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুপ্রেরণায় বিকশিত হয় বাঙলাদেশের আধুনিক সাহিত্য। পাকিস্তানবাদী সাহিত্যতত্ত্ব নির্ভর ক'রে যা রচিত হয়েছে, তার কোন শিল্পমূল্য নেই। বাঙলাদেশের সাহিত্যে তা কলঙ্কের মতো। পাকিস্তান ও পাকিস্তানবাদী সাহিত্যতত্ত্ব বাঙালির জীবনের দু'টি দুর্ঘটনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রধান কবিতা : অবতরণিকা

প্রস্তুত হচ্ছি যখন পঞ্চাশ হওয়ার জন্যে, এবং খুব সুখী বোধ করতে পারছি না, তখন ঘটলো এ-অসামান্য অভিজ্ঞতাটি। ধীরশান্তভাবে প'ড়ে উঠলাম তাঁর চার হাজারের মতো কবিতা ও গান; মনে হলো ধন্য হচ্ছে আমার ভোর, দুপুর, সন্ধ্যা, রাত্রিগুলো; আমার মেঘ, শিউলি, জ্যোৎস্না, অন্ধকার; আমার প্রত্যেক মুহূর্ত, প্রতিটি তুচ্ছ বস্তু। পড়ছিলাম ও অনুভব করছিলাম ঢুকছি এমন এক বিশ্বে, বিশ্বের বদলে যাকে ভুবন বলতেই ভালো লাগে, যেখান থেকে আমি দূরে রয়েছি তিন দশক। বোধ করছিলাম এক বায়ুমণ্ডল থেকে আরেক বায়ুমণ্ডলে নামার চাপও; আমার শরীর ও হৃদয় অনুভব করছিলো নেমে আসছি আমি নিঃসঙ্গ শিখর থেকে আদিগন্ত ছড়ানো সমভূমিতে, যেখানে বাস করে এক বিস্ময়কর প্রাণী, মানুষ, যেখানে ঋতুর পর ঋতু আসে, ফুল ফোটে রঙিন ও সুগন্ধি হয়ে, পাতা সবুজ হয়, এক সময় ঝ'রে পড়ে, যেখানে নদী বয়, আকাশ জুড়ে মেঘ ঘনিয়ে আসে। তাঁর কবিতা পড়ছিলাম, এবং ঢুকছিলাম এক অসীম মানবিক বায়ুমণ্ডলে। আধুনিকতা ও আধুনিক কবিতার প্রতি আমার অনুরাগ অশেষ। আধুনিক বাঙলা ও বিশ্বকবিতার মধ্যে তিন দশক আমি বাস করেছি; তার অসামান্যতায় আমি মুগ্ধ। কিন্তু ওই কবিতা এক বিমানবিক বিশ্বের কবিতা; সেখানে লীলা নেই বসন্তশরতের, সেখানে আকাশ কালো হয়ে আসে না মেঘে মেঘে, বাজে না বৃষ্টির শব্দ, শিউলি প'ড়ে থাকে না ঘাসে, সেখানে মানুষও প্রায়-অনুপস্থিত। ওই কবিতা উপভোগ এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা; মানবিক অম্লজানের বদলে সেখানে নিশ্বাস নিতে হয় শৈল্পিক অম্লজান; বাস করতে হয় শিখর বা বদ্ধ মিনারের অপূর্ব নিঃসঙ্গতায়। যতোই পড়ছিলাম তাঁর কবিতা, সহজ হয়ে উঠছিলো আমার নিশ্বাস, সজীব হয়ে উঠছিলো ইন্দ্রিয়গুলো। তিনি কোনো 'সংবর্ত' বা 'অর্কেস্ট্রা' বা 'যযাতি' বা 'উটপাখি' বা 'বোধ' বা 'অন্ধকার' বা 'আট বছর আগের একদিন' বা 'আদিম দেবতারা' লেখেন নি; লিখেছেন 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', 'বধূ', 'অনন্ত প্রেম', 'মানসসুন্দরী', 'এবার ফিরাও মোরে', 'নিরুদ্দেশ যাত্রা', 'স্বপ্ন', 'পুরস্কার', 'বিদায়-অভিশাপ', 'শেষ বসন্ত'। তাঁর কবিতা পড়ছিলাম সুখে; কিছুই বুঝে নেয়ার জন্যে চেষ্টা করতে হচ্ছিলো না, যেমন শিউলি বা বৃষ্টি বা হাহাকার বুঝে নেয়ার জন্যে চেষ্টা করি না আমরা, ওগুলো বোঝার অনেক আগেই হৃদয়ে সংক্রামিত হয়; আলোড়িত হচ্ছিলাম, আমার অনুভূতিকোষে ঝ'রে পড়ছিলো প্রকৃতি ও প্রেমিকের আবেগ। পঞ্চাশের পূর্বাহ্নে তিনি মনে করিয়ে দিলেন আজো পারি আমি কাতর হ'তে, দীর্ঘশ্বাস আজো বেরিয়ে আসতে পারে আমার বুক থেকে, এমনকি চোখের পাতায়ও জ'মে উঠতে পারে একফোঁটা অতল জল। ভালো লাগছিলো যে সারল্যে মুগ্ধ হওয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো একটি মন আজো আমার বেঁচে আছে। তাঁর কবিতা ও গানগুলো প'ড়ে বারবার মনে পড়ছিলো তাঁরই কয়েকটি পংক্তি। পৌরাণিক এক পুরুষকে মনে রেখে তিনি একবার প্রশ্ন করেছিলেন, 'কে পেয়েছে সবচেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক?' তাঁর কবিতা পড়তে পড়তে আমার মনে হ'তে থাকে ওই পুরুষ কোনো পৌরাণিক পুরুষ নন, রাজা নন; তিনি কবি, কবিদের রাজা, তাঁর নাম রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মতো আর কেউ পায় নি, তাঁর মতো আর কেউ দেয় নি।

তাঁর কবিতায় যে-সংবেদনশীলতা উৎসারিত, যাতে নিরন্তর আলোড়িত আমরা, তার নাম রোম্যান্টিসিজম। রোম্যান্টিসিজম ও রোম্যান্টিক শব্দ দুটি আজ বিব্রত করে অনেককে, আজ আমরা কেউ রোম্যান্টিক হ'তে চাই না; কিন্তু ভুলে যেতে পারি না যে রোম্যান্টিসিজম মানবজাতির মহত্তম সৃষ্টিশীলতার নাম; আর রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সম্পূর্ণ রোম্যান্টিক, সম্ভবত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রোম্যান্টিক। আঠারোশতকের শেষ দিকে ইউরোপে দেখা দিয়েছিলো এই সংবেদনশীলতা, এবং মানবজাতি নিয়েছিলো এক বড়ো বাঁক। সেই থেকে মানুষের সভ্যতা হয়ে ওঠে রোম্যান্টিক, মানুষের পক্ষে আর সম্পূর্ণরূপে অরোম্যান্টিক থাকা হয়ে ওঠে অসম্ভব। বিশশতকের শিল্পকলা এড়িয়ে যেতে চেয়েছে একে, কিন্তু পারে নি। রোম্যান্টিসিজমকে বলা হয়েছে ইউরোপি চৈতন্যের সংকট; তবে এটা এমন সংকট, যা মানুষকে পৌঁছে দেয় এক অভিনব স্তরে। রোম্যান্টিসিজম মানবচেতনার এক মহাবদল, যা ভাঙন ধরিয়ে দেয় দেয় বিশ্বচিন্তাধারার মেরুদণ্ডে। এ-চিন্তাধারার মেরুদণ্ড ছিলো যুক্তি, বিশ্বাস ছিলো যে যুক্তির সাহায্যেই বোঝা যাবে মহাজগতকে; কিন্তু রোম্যান্টিকেরা এ-বিশ্বাসে ফাটল ধরিয়ে দেন। কবিতালোকে তাঁরা সৃষ্টি করেন অভিনব কবিতা; বলতে পারি যে প্রকৃত কবিতার সূচনাই করেন রোম্যান্টিকেরা। আগে কবিতা সাধারণত ছিলো ছন্দোবদ্ধ গদ্য, যা রচিত হতো প্রথাগত যুক্তি, নিয়মকানুন, সুষমা মেনে; তাঁরা বাদ দেন এসব। তাঁরা সৃষ্টি করেন নতুন আদর্শ, জোর দেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, কল্পনাপ্রতিভা, স্বতস্ফূর্ততা, ও আবেগের ওপর। কবিতা লেখার বিধিবদ্ধ নিয়মগুলো ভেঙে ফেলেন তাঁরা; তাঁরা আর কবিতা লেখেন না, রচনা করেন না, নির্মাণ করেন না, তাঁরা সৃষ্টি করেন কবিতা। ত্যাগ করেন তাঁরা আরিস্তলীয় অনুকরণবাদ; তাঁরা দর্পণ হ'তে চান না, হয়ে ওঠেন প্রদীপশিখা, যা আলোকিত করে অন্ধকারকে। আগের প্রথামানা সুরুচিকর সুশৃঙ্খল পদ্য বানানো ছেড়ে তাঁরা বইয়ে দেন নিজেদের মৌলিক প্রতিভার অবারিত সৃষ্টিশীলতা; আগের পরিশীলিত সৌন্দর্যকে লণ্ডভণ্ড ক'রে ঘটান আবেগের তীব্র গতিশীল উৎসারণ। এর ফলে যা ঘটে, তার নাম রোম্যান্টিক বিপ্লব। জোর দেন তাঁরা মৌলিকত্ব আর প্রতিভার ওপর। মৌলিকত্ব তাঁদের কাছে ছিলো উদ্ভিদস্বভাবের, যা স্বতস্ফূর্তভাবে জন্ম নেয় প্রতিভার মূলে। এটা জন্মে, তৈরি হয় না। প্রতিভা তাঁদের কাছে যাদুকর, স্থপতি নয়; স্থপতির মতো সে নানা কৌশলে কাঠামো নির্মাণ করে না, সে সৃষ্টি করে যাদুকরের মতো অদৃশ্য উপায়ে। রোম্যান্টিকেরা কবিতার পুরোনো আদর্শগুলো ছেড়ে দিয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, কল্পনাপ্রতিভা, মৌলিকত্ব, আবেগঅনুভূতি, অনুপ্রেরণার ওপর জোর দিয়ে সূচনা করেন কবিতার নতুন সময়; সৃষ্টি করেন এমন কবিতা, যা আগে কখনো ছিলো না, এবং যার মহাপ্লাবনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুখকররূপে প্লাবিত হয় বিশ্ব।

তাঁদের এক মূলমন্ত্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ একদিকে বেশ ভয়ঙ্কর। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ হচ্ছে নিজেকে বিশ্বে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ মনে করা; এ হচ্ছে অহমিকাবাদ। সামাজিক এলাকায় অবশ্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ খুবই চমৎকার, গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র লুকিয়ে আছে এর ভেতরেই; সামাজিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সমাজ ও রাষ্ট্রের থেকে বেশি গুরুত্ব দেয়া ব্যক্তির অধিকারকে। ব্যক্তির অধিকারবাদ থেকেই এসেছিলো স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব, সাম্যের ধারণা, যার ফলে ঘটেছিলো ফরাশি বিপ্লব। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের চরম রূপটি গ্রহণ করেন রোম্যান্টিক কবিরা, তাঁরা সমাজে তাঁদের অবস্থান বাতিল ক'রে দিয়ে নিজেদের মধ্যেই খোঁজেন আশ্রয়। তাই তাঁরা সাধারণত খাপ-না-খাওয়া মানুষ। রোম্যান্টিক কবির সৌরজগতের সূর্য তিনি নিজে, সব কিছুই আবর্তিত হয় তাঁকে ঘিরে; মহাজগত তাঁরই সত্তার প্রকাশ। রোম্যান্টিক সংবেদনশীলতায় ব্যক্তিই সবচেয়ে আকর্ষণীয়। রোম্যান্টিক কবি বাহ্যজগতকে দেখেন নিজের অহংবোধের ভেতর দিয়ে; তিনি মন্ময়, আমিময়; তিনি বস্তুগত দৃষ্টিতে জগতকে দেখেন না। কোনো কিছু কেমন, তার স্বরূপ কী, তা মূল্যবান নয় রোম্যান্টিকের কাছে; তাঁর কাছে মূল্যবান হচ্ছে বস্তুটি তাঁর কেমন মনে হয়। রোম্যান্টিকের আমিময়তার চরম ঘোষণা পাই রবীন্দ্রনাথেই : 'আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,/ চুনি উঠল রাঙা হয়ে।/ আমি চোখ মেললুম আকাশে-/জ্বলে উঠল আলো/ পুবে পশ্চিমে।/ গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর'- /সুন্দর হল সে।' কথাগুলো সুন্দর, কিন্তু এরই মধ্যে লুকিয়ে আছে রোম্যান্টিকের ভয়ঙ্কর আমিময়তা বা অহমিকা। তিনি কোনো কিছুকেই বস্তুগতভাবে মেনে নিচ্ছেন না, স্বীকার করছেন না কারো নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকেই; সব কিছুতে তিনি সঞ্চারিত ক'রে দিচ্ছেন নিজেকে। পান্নাচুনির নিজস্ব রঙ যেমন স্বীকার করছেন না, তেমনি স্বীকার করছেন না সূর্যকে ও গোলাপের সৌন্দর্যকে; তাঁর কাছে এসবই তাঁর নিজের সত্তার সম্প্রসারণ। রোম্যান্টিকের মহাবিশ্ব উৎসারিত তারই অহম থেকে।

এখানেই আসে কল্পনাপ্রতিভা; রোম্যান্টিক কবি বস্তুগতভাবে নয়, কল্পনাপ্রতিভার সাহায্যে উপলব্ধি করেন বিশ্বজগত। অহম তাঁর মহাজগতের কেন্দ্র। রোম্যান্টিক কবি বলেন, শোনো শুধু নিজেকে, চারপাশ থেকে ফিরিয়ে নাও দৃষ্টি, দেখো তোমার অভ্যন্তরকে, তোমার বাইরের কিছুই মূল্যবান নয়, মূল্যবান শুধু তুমি নিজে। আপন আন্তর সত্তাকে মুখ্য ক'রে রোম্যান্টিসিজম হয়ে ওঠে অহমিকাবাদ বা আত্মকেন্দ্রিকতাবাদ। তবে কোনো কোনো রোম্যান্টিক প্রচণ্ড অহমিকাপরায়ণ হ'লেও তাঁদের অনেকেই বিনয়ী ও গণতন্ত্রবাদী; এবং চারপাশের দিকে সব সময়ই মেলে রেখেছেন মুগ্ধ চোখ। বিলেতি রোম্যান্টিকেরা নিজেদের সাধারণ মানুষই মনে করতেন; কিন্তু যে-সব দেশে নিয়ন্ত্রণ বেশি ছিলো, যেমন, জর্মনি ও ফরাশিদেশে, সেখানকার রোম্যান্টিকেরা হন প্রচণ্ড, নিজেদের মনে করেন সাধারণ মানুষ থেকে ভিন্ন ও উন্নত। তাঁরা নিজেদের মনে করেন ঈশ্বর বা ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী। শ্লেগেল বলেছিলেন মানুষ অন্য প্রাণীদের কাছে যেমন, শিল্পী অন্য মানুষদের কাছে তেমন। তাঁদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রভাব পড়ে কবিতার সমস্ত দিকে। আগে শিল্পকলা গণ্য হতো একধরনের দক্ষতা. কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়মকানুন প্রয়োগের কৌশলরূপে; কিন্তু এখন তা হয়ে ওঠে রহস্যময়, কেননা তা উদ্ভূত হয় সংবেদনশীলতা থেকে, কবি অনুপ্রাণিত হয়ে সৃষ্টি করেন কবিতা। বদলে যায় কবির ভূমিকা; কবি আর জ্ঞানপ্রচারক ও কর্মী থাকেন না, কবি হয়ে ওঠেন কবি। তাঁদের আরাধ্য হয় স্বতস্ফূর্ততা; এবং তাঁরা গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েন প্রকৃতির সাথে। রোম্যান্টিক কবিতা হচ্ছে প্রকৃতির কবিতা, এমন ধারণা বড়ো হয়ে উঠেছিলো এক সময়। মিথ্যে নয় যে তাঁরাই প্রথম প্রকৃতিকে দেখেন প্রকৃতিরূপে, এবং উপস্থাপিত করেন জীবন্তভাবে। এর আগে প্রকৃতিকে মনে করা হতো যন্ত্র, যা পূর্বনির্ধারিত নিয়মে যান্ত্রিকভাবে চলছে। রোম্যান্টিকরা এই যান্ত্রিক প্রকৃতিধারণা বাদ দিয়ে নেন এক সজীব গতিময় প্রকৃতির ধারণা। তবে তাঁদের অনেকেই প্রকৃতিকে প্রকৃতি হিশেবে নেন নি, নিয়েছেন নিজেরই সত্তার সম্প্রসারণরূপে, শেলির 'পশ্চিমা বায়ুর প্রতি', বা রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ' যার ভালো উদাহরণ।

রোম্যান্টিক কবির মূলশক্তি কল্পনাপ্রতিভা, যা দিয়ে তিনি দেখেন ও পুনরসৃষ্টি করেন বিশ্বজগত। তিনি যেহেতু তাঁর সৌরলোকের সূর্য, আর অহম তাঁর কেন্দ্র, তাই তাঁর জীবনে মূল্যবান হচ্ছে ওই অহমের বোধ, প্রতিক্রিয়া ও অনুভূতিরাশি। তাঁর অহম সব কিছু উপলব্ধি করে কল্পনাপ্রতিভার সাহায্যে; তিনি অভিজ্ঞতাবাদীর মতো পাঁচ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিশ্বকে বোধ করেন না, করেন কল্পনাপ্রতিভার সাহায্যে। বাইরের চোখ দিয়ে তিনি দেখেন না, দেখেন আন্তর চোখ দিয়ে; যেমন ব্লেইক বলেছেন যে তিনি চোখ *দিয়ে* দেখেন চোখ *দ্বারা* দেখেন না; বা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'কবি, তব মনোভূমি,/ রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।' যা আছে তা সত্য নয় তাঁর কাছে, কল্পনাপ্রতিভা যাকে সত্য মনে করে তাঁর কাছে তাই সত্য। কল্পনাপ্রতিভাকে মূল্য দিয়ে একটি বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন তাঁরা। আগে কল্পনার কাজ ছিলো স্মরণ করা বা কবিতায় কারুকার্য করা, এখন তা হয়ে ওঠে শিল্পসৃষ্টির প্রাণ। প্লাতো থেকে আঠারোশতক পর্যন্ত মনকে মনে করা হতো আয়না, যার কাজ বাইরের জগতকে প্রতিফলিত করা; সেখানে রোম্যান্টিকেরা মন বা হৃদয়কে মনে করেন প্রদীপশিখা, যা উদ্ভাসিত করে মহাজাগতিক অন্ধকারকে। তাঁরা আরিস্ততলীয় অনুকরণ বাদ দিয়ে গ্রহণ করেন উদ্ভাসনকে, শিল্পকলার ইতিহাসে যা এক বিশাল ঘটনা। কল্পনাপ্রতিভার কী কাজ? রবীন্দ্রনাথ যা বিশ্বাস করতেন, এবং পশ্চিমের রোম্যান্টিকেরা যা ব্যাখ্যা করেছেন, তা হচ্ছে কল্পনাপ্রতিভা বিশৃঙ্খল উপাদানরাশিকে দেয় এক সমন্বিত রূপ। এর এক কাজ লৌকিক ও অলৌকিক জগতের মধ্যে সম্পর্ক পাতানো। কল্পনাপ্রতিভাকে তাঁরা পূর্ববর্তীদের মতো কারুকার্যরচনার কৌশল হিশেবে ব্যবহার করতে চান নি। তাঁরা শিল্পকলাকে এক পবিত্র কাজে পরিণত করেন, যার কাজ এক পরম সত্তার সাথে যোগাযোগসাধন। এ-বিশ্বাস দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথেও। তাঁরা দেখতে চেয়েছিলেন দৃশ্যমান বস্তুরাশির অন্তরালের অদৃশ্য বিন্যাস, তাই জোর দিয়েছিলেন প্রবৃত্তি ও বোধির ওপর। শেলি মনে করতেন কবির কাজ সত্য ও সুন্দরকে উপলব্ধি করা, যা বিশ্বাস করতেন রবীন্দ্রনাথও।

তাঁদের সঙ্গে জড়িত একটি ধারণা হচ্ছে অনুভূতি। 'রোম্যান্টিক' শব্দটি এখন অনেকটা ভাবালুতা বুঝিয়ে থাকলেও (তা হবেই, দুশো বছর ধ'রে বিভিন্ন মাধ্যম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবালুতাকে বড়ো পণ্য হিশেবে বিক্রি ক'রে লাভবান হচ্ছে), রোম্যান্টিকরাই প্রথম অনুভূতি বা ভাবাবেগ বা ভাবালুতাকে পরম মূল্য দিয়েছিলেন। তাঁরাই প্রথম দামি মনে করেছিলেন মানবিক আবেগানুভূতিকে, এর আগে যার বিশেষ মর্যাদা ছিলো না। তবে অনুভূতি রোম্যান্টিসিজমে গৌণ ব্যাপার। বিলেতে রোম্যান্টিসিজমের আগে দেখা দিয়েছিলো এক ভাবালুতার যুগ, যাতে বড়ো হয়ে উঠেছিলো হৃদয়ের যুক্তি। তাঁরাও তা গ্রহণ করেন, সতেরোআঠারো শতকের মননশীল যান্ত্রিকতার বদলে হৃদয়ের কাতরতাই তাদের বেশি টানে। অনুভূতির প্রবল প্রকাশ তাঁরা শুরু করেন নি, যদিও এর প্রশংসা ও নিন্দা আজো তাঁদের ভোগ করতে হচ্ছে। আঠারোশতকের মাঝামাঝি সময়ে চোখ থেকে দরদর ক'রে অশ্রু গড়িয়ে প'ড়ে বালিশভেজানো উপন্যাস বহু লেখা হয়, তবে রোম্যান্টিক অনুভূতি ও ভাবালুতার যুগের অনুভূতির মধ্যে অনেক অমিল। বালিশভেজানো উপন্যাসে মেলে ছকবাঁধা অশ্রু, আর রোম্যানিক অশ্রু উদ্গাত হয় একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে। তাঁরা প্রথাগত পৌরাণিক বীণাটিকে বাদ দিয়ে বাজান তাঁদের হৃদয়তন্ত্রি। হৃদয় তাঁদের এক বড়ো সম্পত্তি; হৃদয়কে তাঁরা ক'রে তোলেন বিশ্বখোলার চাবি। হৃদয় তাঁদের কাছে শুধু সুখদুঃখের উৎস হয়ে থাকে না, হৃদয় হয়ে ওঠে তাঁদের জ্ঞানের প্রত্যঙ্গ। আগে হৃদয় ছিলো না, ছিলো মন; মনকেই মনে করা হতো মানুষের নিয়ন্ত্রক; তাঁরা মনের জায়গায় স্থান দেন হৃদয়কে। তাঁদের হৃদয় থেকে স্বতস্ফূর্ত উঠে আসে আবেগানুভূতি, যাতে ভ'রে আছে তাঁদের কবিতা। ওয়র্ডসওঅর্থ কবিতার এক সংজ্ঞা দিয়েছিলেন যে কবিতা হচ্ছে তীব্র অনুভূতির স্বতস্ফূর্ত উদ্বেলন, যদিও নিজে এর চর্চা করেন নি; বরং তিনি মেনে চলতেন তাঁর আরেক সংজ্ঞা যে কবিতা হচ্ছে আবেগের প্রশান্ত পুনশ্চয়ন। আবেগ তীব্র ও স্বতস্ফূর্তভাবে উদ্বেলিত হবে, এটা সবচেয়ে বেশি মেনেছেন শেলি, যাঁর স্কাইলার্ক এমন এক সঙ্গীতমুখর কবি, যে নিজের পরিপূর্ণ হৃদয় ঢেলে দেয় অপূর্বপরিকল্পিত শিল্পকলা বা কবিতারূপে।

বিশ্বের মহত্তম রোম্যান্টিকদের একজন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মধ্যে পাই রোম্যান্টিসিজমের বৈশিষ্ট্যগুলোর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, যা পাই না পুবপশ্চিমের আর কারো মধ্যে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা অহমিকা, মৌলিকত্ব, কল্পনাপ্রতিভা, স্বতস্ফূর্ততা, আবেগানুভূতি ও আরো অজস্র ব্যাপার যেমন ব্যাপক, গভীর, তীব্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর কবিতা ও গানে, তা আর কোথাও হয় নি। তীব্রতায় তিনি অদ্বিতীয়, শেলির থেকেও অনেক বেশি তীব্র। বিলেতের পাঁচ রোম্যান্টিক– ওয়র্ডসওঅর্থ, কোলরিজ, শেলি, কীটস, বায়রন– মিলে যা ক'রে গেছেন, বাঙলায় একলা তিনি করেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি। এক বহিরস্থিত, খাপ-না-খাওয়া, রোম্যান্টিকরূপে শুরু হয়েছিলো তাঁর, যিনি কেউ নন সমাজরাষ্ট্রের; তাঁর বুড়ো বয়সের ছবিগুলো ও নানা নিরর্থক কর্মকাণ্ড যদিও আমাদের একথা ভুলে থাকতে বাধ্য করে, তবু বুঝি কতোটা বহিরস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কোনো কবির পক্ষেই সম্ভব নয় সমাজ ও রাষ্ট্রে শেকড় ছড়ানো। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর অভিমানক্ষুব্ধ হয়ে তিনি যে বলেছিলেন, 'যাঁরা জনসাধারণের নেতা, যাঁরা কর্ম্মবীর সর্ব্বসাধারণের সম্মান তাঁদেরই প্রাপ্য এবং জনপরিচালনার কাজে সেই সম্মানে তাঁদের প্রয়োজনও আছে। যাঁরা লক্ষ্মীকে উদ্ধার করবার জন্যে বিধাতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন্থনদণ্ডস্বরূপ হয়ে মন্দার পর্ব্বতের মত জনসমুদ্র মন্থন করেন, জনতাতরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে তাঁদের ললাটকে সম্মানধারায় অভিষিক্ত করবে, এইটেই সত্য, এইটেই স্বাভাবিক। কিন্তু কবির সে ভাগ্য নয়। মানুষের হৃদয়ক্ষেত্রেই কবির কাজ।',- তাঁর বেদনাহত এ-ক্ষোভ থেকেই বুঝি কতো বহিরস্থিত তিনি মনে করতেন নিজেকে তুচ্ছ রাজনীতিবিদদের সাথে নিজেকে তুলনা ক'রে। কিন্তু তিনি সুস্থ করতে চেয়েছিলেন অসুস্থ বিশ্বকে, উন্নত করতে চেয়েছিলেন সমাজকে, প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়, এসবই পণ্ডশ্রম; তাঁর যা মূল্যবান কাজ, তা তাঁর শিল্পসৃষ্টি;-কবিতা, গান, নাটক, ছোটগল্প, উপন্যাস। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছেন তিনি, তাঁর এই আপাতমহৎ কাজটিকে হাস্যকর লাগে আমার; বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কবির কাজ নয়, অজস্র বিশ্বভারতীর থেকে অনেক মূল্যবান একটি 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'। বিশ্ববিদ্যালয় যাঁরা চালান, আমি নিশ্চিত, তাঁদের কাছে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' নিরর্থক, বা তাঁদের কাছে খুবই আপত্তিকর *কড়ি ও কোমল*-এর কবিতার পর কবিতা। ওই মহাচালকগণ সমাজস্থিত, শিল্পবিরহিত সমাজপতি; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, কবিদের রাজা, কবিদের মতোই, বহিরস্থিত। এক বাঁশিঅলারূপে নিজেকে দেখেছেন তিনি চিরকাল, বারবার বলেছেন বাঁশি বাজানোর কথা, মধ্যাহ্নের অলস গায়কের মতো বাঁশি বাজানোই যাঁর আনন্দ, যে সমাজের নয়, যে সব সময়ই 'আগন্তুক'; যার ঢোকা হয় নি প্রথাগত সমাজে। *চিত্রার* 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় বলেছেন যে সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি-মাঝে বহুকাল সঙ্গীহীন রাত্রিদিন বাস করেছেন, যাঁর চোখে স্বপ্নাবেশ আর শরীরে অপরূপ বেশ, আর জগতে আসার দিন 'কোন্ মা' তাঁকে দিয়েছে 'শুধু খেলাবার বাঁশি।' এটা শুধু কাব্যিকতা নয়, এ-বোধ তাঁর আমৃত্যু ছিলো। কিশোর বয়সের যে কাব্যগুলোকে তিনি বাতিল করেছেন, সেই *কবিকাহিনী, বনফুল, ভগ্নহৃদয়, বাল্মীকিপ্রতিভা* ভ'রেই পাই এক সমাজবহিরস্থিত কবিকে, যিনি পরে বিব্রত বোধ করেছেন নিজের কৈশোরের বহিরস্থিততায়, কিন্তু অন্তরে শেষ দিনও তিনি থেকে গিয়েছিলেন আগন্তুক, বহিরস্থিত। কবির এই নিয়তি।

যেদিন স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিলো নির্ঝরের, সেটা ছিলো, শুধু বাঙালির জন্যেই নয়, মানুষের জন্যেই এক মহাশুভদিন। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি তাঁর ইশতেহারের মতো; এতে তিনি চরণে চরণে যা কিছু ঘোষণা করেছেন, সারাজীবন বাস্তবায়িত ক'রে গেছেন তাই। গুহার আঁধারে রবির কর আর প্রভাতপাখির গান পৌঁছোনোর পর ওই যে প্রাণ জেগে উঠলো, থর থর ক'রে কাঁপতে শুরু করলো ভূধর, তা আর থামে নি; সারাজীবন তিনি ঢেলে চললেন করুণাধারা, ভেঙে চললেন পাষাণকারা, জগৎ প্লাবিয়া গেয়ে চললেন গান, ঢেলে দিতে লাগলেন প্রাণ, আর দিকে দিকে ভ'রে উঠতে লাগলো বাঙলা কবিতা। তাঁর কবিতা এক বিশাল বা অসীম মানবিক ভুবন, যা তীব্রতম আবেগে আলোড়িত। কবিতার কোনো বিশেষ সংজ্ঞায় সীমাবদ্ধ ছিলেন না তিনি; অবলীলায় যেমন তিনি লিখেছেন অজস্র বিশুদ্ধ কবিতা, তেমনি লিখেছেন প্রচুর ছন্দোবদ্ধ রচনা; যেমন লিখেছেন তীব্রতম হাহাকার, তেমনি লিখেছেন আটপৌরে কাহিনী; লিখেছেন ব্যঙ্গ কবিতা, নীতিকথা, পৌরাণিক উপাখ্যান, ছোটোদের জন্যে কবিতা, এবং কী নয়। বহু রোম্যান্টিকের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন যে কবির মহান কাজ লৌকিকের সাথে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অলৌকিক পরম সত্তার সম্বন্ধ পাতানো। তিনি সেই সম্বন্ধ পাতানোর সাধনা করেছেন আমৃত্যু; তাই তাঁর কবিতা দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বাসের ভিত্তির ওপর। যারা অবিশ্বাসী কোনো পরম সত্তায়, যাদের কাছে হাস্যকর ওই ভাবালুতা, তারাও উপভোগ করে তাঁর কবিতা, কেননা তাঁর কবিতা মানবিক ও প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ, তীব্র আবেগে কম্পিত, এবং অসামান্য উপমারূপকচিত্রকল্পের সৌন্দর্যে শোভিত। তাঁর কবিতার বৈচিত্র্য ও মানবিকতার মূলে রয়েছে আরেকটি জিনিশ; তা হচ্ছে বিচিত্র ধরনের কথকের উপস্থিতি। কবিতার থাকে অন্তত একজন কথক, কবি নানা মুখোশ প'রে আবির্ভূত হন কথকরূপে; রবীন্দ্রনাথ অজস্র মুখোশ প'রে আবির্ভূত হয়েছেন। আধুনিক কবিতার সমস্যা হচ্ছে কবিরা সাধারণত নিজেরাই কথক, কিন্তু কবিতায় তিনি কখনো নির্ঝর, কখনো চাষী, অজস্রবার ব্যথিতা নারী, এবং আরো বহু কিছু। তাই তাঁর কবিতায় পাই বিচিত্র জীবন ও তার আবেগ। জীবনের শেষ দিকে তিনি রোম্যান্টিকতা থেকে স'রে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কর্কশ গদ্যে সাধনা করেছিলেন অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি প্রকাশের, তবে তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা রচিত হয়েছে তখনই, যখন তিনি রোম্যান্টিক।

জীবন, শিল্প, ও কবিতার চিরপ্রধান বিষয় প্রেম– হৃদয়শরীরের সেই অবর্ণনীয় আলোড়ন। তাঁর কবিতায়ও প্রধান প্রেম; শুধু তাই নয়, এমন তীব্র কাতর নিরন্তর অহমিকাহীন নিবেদিত প্রেমিক বাঙলায় আর জন্মে নি। রোম্যান্টিকদের প্রধান সম্পদ ও সমস্যা হৃদয়; তাঁরা পীড়িত মহাজগতের থেকেও বৃহৎ হৃদয়ের ভারে, তাঁদের হৃদয় কোনো সুখ জানে না। তাঁর কিশোর বেলার কাব্যগুলোতে যেমন পাই হৃদয়ভারপীড়িত এক কিশোর কবিকে, তেমনি তাকে পাই যৌবনে ও বার্ধক্যে, যদিও সে আর ততো পীড়িত নয়। তিনি প্রথম প্রধান প্রেমের কবিতাটি লেখেন একুশ বছর বয়সে, যার নাম 'রাহুর প্রেম'। ওই কবিতাটি তাঁর একমাত্র অরাবীন্দ্রিক প্রেমের কবিতা, যাতে নির্মম প্রেমিক দিবসরজনী নিজের মুখ দেখতে চায় প্রেমিকার আঁখিনীরে। তবে ধীরেধীরে তিনি সংযত ক'রে নেন নির্মম প্রেমিককে, তাকে সংশোধন করেন 'সুরদাসের প্রার্থনা'য়, এবং তাকে চূড়ান্ত রোম্যান্টিক রাবীন্দ্রিক রূপ দেন 'অনন্ত প্রেম'-এ। *কড়ি ও কোমল*-এ পাই প্রেমের তীব্র শরীরী কামনা, এবং এ থেকেও উঠে আসেন তিনি। তবু তাঁর প্রেমের কবিতা কখনো নিষ্কাম নয়; প্রেমিকা, প্রেমিক (নারীর ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন বারবার), এমনকি জীবনদেবতার সাথে যে-সম্পর্কের পরিচয় পাই, তাতে তাঁর প্রেমের কবিতাকে মনে হয় অন্তহীন অতৃপ্ত শৃঙ্গার। কিন্তু যতোই বয়স বেড়েছে, ততোই তিনি এর ওপর বিছিয়ে দিয়েছেন হৃদয়ের আবরণ। এক বিস্ময়কররূপে তাঁকে পাই গানে; সেখানে পুজো হয়ে ওঠে প্রেম, প্রেম হয়ে ওঠে পুজো; আর মনে হয় পুজোই তাঁর শ্রেষ্ঠ আবেগ। সব মিলে তিনি এমন মহান কবি, যিনি তাঁর সীমাবদ্ধ জাতিকে দিয়ে গেছেন অসীমাবদ্ধতার স্বাদ। তাঁর সমগ্র জাতি হৃদয় দিয়ে যা ধরতে পারে নি, তিনি একা তা ধারণ ক'রে রেখে গেছেন, যাতে তাঁর জাতি সব সময়ই খুঁজে পাবে আন্তর সম্পদ। তিনি তাঁর জাতির জন্যে রেখে গেছেন স্বপ্ন, কল্পনা, প্রেম, সুর, মহত্ত্ব, অজানা ফুলের গন্ধ, এবং কী নয়। আর সৃষ্টি ক'রে গেছেন এক অভিনব বাঙলা ভাষা, তার শব্দ ও বাক্যকে করেছেন জ্যোতির্ময়; তাকে নাচিয়েছেন ছন্দে, শিউরে দিয়েছেন মিলে;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাজিয়েছেন অপূর্ব অলঙ্কারে। তিনি মহাকবি, তাঁর মতো আর কেউ নেই।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার দুটি সংকলন রয়েছে– *চয়নিকা* (১৯০৯) ও *সঞ্চয়িতা* (১৯৩১); এর মধ্যে প্রথমটি বিলুপ্ত, দ্বিতীয়টি সুপরিচিত। *সঞ্চয়িতা* যদি পরিতৃপ্ত করতো আমাকে, তাহলে *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রধান কবিতা* সম্পাদনার দরকার হতো না। *সঞ্চয়িতা* রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভালো সংকলন, তবে এটি রবীন্দ্রপ্রতিভাকে ঠিকমতো ধারণ করে না। এটিতে বাদ পড়েছে বহু উৎকৃষ্ট কবিতা, এবং সংকলিত হয়েছে বহু সাধারণ কবিতা। তাই আমি তৈরি করতে চেয়েছি এমন একটি সংকলন, যা হবে *সঞ্চয়িতার* বিকল্প, যাতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের উৎকৃষ্ট নিদর্শনগুলো সব পাওয়া যাবে সহজে। এর নাম *প্রধান কবিতা* রেখেছি, *শ্রেষ্ঠ কবিতা* রাখি নি; কেননা শ্রেষ্ঠ কবিতা গুটিকয় হ'তে পারে, কিন্তু প্রধান কবিতা প্রচুর। প্রধান কবিতা বলতে বোঝাতে চেয়েছি তাঁর সে-সব কবিতাকে, যেগুলোতে তাঁর প্রতিভার উৎকৃষ্ট বিকাশ ঘটেছে। গানও বাদ দিই নি, কেননা কবিতা হিশেবে তাঁর গান অসামান্য। রবীন্দ্রনাথ বিব্রত ছিলেন তাঁর প্রথম দিকের কবিতা নিয়ে, *কড়ি ও কোমলকেই* তিনি স্বীকার করেছিলেন প্রথম প্রকৃত কাব্য হিশেবে। কিন্তু তিনি এর আগের চারটি কাব্য থেকে সাতটি কবিতা নিয়েছিলেন *সঞ্চয়িতায়*; আমি নিয়েছি আগের তিনটি কাব্য থেকে পাঁচটি, *সন্ধ্যাসংগীত* থেকে কোনো কবিতা নিই নি। এ-সংকলন শুরু হয়েছে, আমি সুখী, *প্রভাতসংগীত*-এর 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' দিয়ে। তার পরের কাব্যগুলো থেকে নেয়া হয়েছে বিপুল পরিমাণে কবিতা, *বিচিত্রিতায়* এসে সংখ্যা কমেছে, কিন্তু শেষ দিকে আবার বেড়েছে। *লিপিকার* গদ্য রচনাগুলোকে কবিতা হিশেবে প্রশংসা করা আমাদের অনেক দিনের স্বভাব, কিন্তু তাঁর কাব্যসংকলনে এর থেকে কবিতা নেয়া হয় না; আমি নিয়েছি তিনটি কবিতা, যদিও এগুলো গদ্যের মতো বিন্যস্ত; এবং শিশুদের জন্য লেখা কবিতাকেও আমি উপেক্ষা করি নি। পরের দিকের *ছড়ার ছবি* থেকে কোনো কবিতা নিই নি। রবীন্দ্রনাথ কিছু কবিতার গানরূপ দিয়েছেন একটু বদল ক'রে; এমন দুটি কবিতাকে (*বলাকার* 'আমার গান' ও গানরূপ 'গানগুলি মোর শৈবালেরই দল'; এবং *সানাই*-এর 'বাদল দিনের প্রথম কদমফুল' ও গানরূপ 'বাদল-দিনের প্রথম কদম ফুল করেছ দান') কবিতা ও গান দুরূপেই নিয়েছি, কেননা দুটি রূপই অপরিহার্য। তিনি অনেক কাব্যগ্রন্থে (যেমন– *গীতাঞ্জলি, নৈবেদ্য* প্রভৃতি) কবিতার নাম দেন নি, এসব ক্ষেত্রে কবিতার প্রথম বা অন্য কোনো পংক্তি বা পংক্তির অংশ দিয়ে কবিতার নাম রাখা হয়েছে, এবং নাম তির্যক অক্ষরে ছাপা হয়েছে। গানের বেলাও তাই করেছি, সংখ্যা দিয়ে গানগুলো নির্দেশ করতে আমার ভালো লাগে নি ব'লে।

কবিতা সংকলন করেছি আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রকাশিত *রবীন্দ্র-রচনাবলী* (কবিতা, ৩ খণ্ড, ১৯৮০-১৯৮৩) থেকে, এবং এর কাব্যক্রমই মেনে চলেছি। এ-রচনাবলীটি উপকারী, কিন্তু এর রয়েছে এক বড়ো ত্রুটি। রবীন্দ্ররচনায় [অ্যা]-ধ্বনির জন্যে শব্দের শুরুতে মাত্রাযুক্ত এ-কার (ে) ব্যবহারের রীতি রয়েছে, কিন্তু এ-রচনাবলীতে নির্বিচারে ব্যবহৃত হয়েছে মাত্রাযুক্ত এ-কার (ে)। *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রধান কবিতায়* [অ্যা]-ধ্বনির জন্যে শব্দের শুরুতে মাত্রাযুক্ত এ-কার (ে) ব্যবহার করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে। বিশ্বভারতীর ও পশ্চিম বঙ্গ সরকারের *রবীন্দ্ররচনাবলীর* কবিতার পাঠের সাথে নানা অমিল রয়েছে *সঞ্চয়িতার* কবিতার পাঠের। রবীন্দ্রনাথ *সঞ্চয়িতায়* কবিতা বদল করেছেন, স্তবকবিন্যাস বদলিয়েছেন, অজস্র ক্ষেত্রে যতিচিহ্ন বদল করেছেন; এবং প্রতি স্তবকের শেষে ব্যবহার করেছেন দু-দাঁড়ি (॥)। *রবীন্দ্ররচনাবলীর* কবিতার পাঠের থেকে নানাভাবেই *সঞ্চয়িতার* পাঠ উৎকৃষ্ট। এ-সংকলনের যেসব কবিতা *সঞ্চয়িতায়* রয়েছে, সেগুলোতে আমি *সঞ্চয়িতার* পাঠই গ্রহণ করেছি। যে-সব কবিতার স্তবকশেষে দু-দাঁড়ি (॥) দেখা যাবে, বুঝতে হবে সেগুলো *সঞ্চয়িতা* (এবং *গীতবিতান*) থেকে নেয়া। *রবীন্দ্ররচনাবলীর* কবিতার স্তবকবিন্যাস হাতেলেখা পাণ্ডুলিপির স্তবকবিন্যাস, যতিচিহ্নও বিশৃঙ্খল; আর *সঞ্চয়িতার* স্তবকবিন্যাস মুদ্রিত গ্রন্থের, যতিবিন্যাস সুশৃঙ্খল। রবীন্দ্রনাথ যদি তাঁর সমস্ত কবিতা এভাবে পরিমার্জিত ক'রে যেতেন, খুব ভালো হতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙলা গদ্যচর্চা ও বিদ্যাসাগর

যখন বলি বাঙলা ভাষা বা বাঙলা গদ্য, তখন অসচেতন কিন্তু দৃঢ়ভাবে পুষি এমন ধারণা যে একটি ভাষা রয়েছে, যার নাম বাঙলা; এবং তার, অন্যান্য ভাষার মতোই, রয়েছে বক্তব্য প্রকাশের একটি রীতি : গদ্য। বাঙলা ভাষা বা গদ্যের এক আদর্শ রূপের ধারণা যে খুব স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে বাঙালির মনে, তার মূলে যাঁর প্রতিভা কাজ করেছে সবচেয়ে বেশি, তাঁর নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। যে-ভাষাকে এখন বলি বাঙলা ভাষা, কয়েক দশক আগেও যাকে বলা হতো বঙ্গভাষা, বা বাঙ্গলা বা বাঙ্গালা ভাষা, রামমোহনের মতো অনেকে যাকে বলেছেনগৌড়ীয় ভাষা, উনিশশতকের শুরু দিকে যে-ভাষার কোনো নাম খুঁজে না পেয়ে অনেকেই যাকে বলতেন শুধৃভাষা , তার কি রয়েছে কোনো একক রৌপ পরিচয়? সেটি কি একটি ভাষা, নাকি বহু আঞ্চলিক ভাষার সমষ্টি? যে-ভাষায় সামাজিক যোগাযোগ সম্পন্ন বা ভাবপ্রকাশ করে বিক্রমপুরের, দিনাজপুরের, চট্টগ্রামের, যশোরের, সিলেটের, বীরভূমের, ঢাকার, কলকাতার, অর্থাৎ বাঙলা ভাষাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকার বাঙালি, সেগুলোই কি বাঙলা ভাষা, নাকি ওই সব আঞ্চলিক রূপ পেরিয়ে বাঙলা ভাষার রয়েছে একটি বা একাধিক সর্বজনীন ভাষিক রূপ, যাকে মনে করা হয়বাঙলা ভাষা ? আঞ্চলিক রূপগুলো অবশ্যই বাঙলা, ওই রূপগুলোর মধ্যে রয়েছে নানা মিল আর অমিল; কিন্তু যখন আমরা বাঙলা ভাষা বা গদ্যের কথা বলি, তখন বোঝাই না ওই আঞ্চলিক রূপগুলোকে, বোঝাই বাঙলা ভাষার দুটি মানরূপকে, যে-দুটি পেরিয়ে গেছে আঞ্চলিকতার সীমা; হয়ে উঠেছে সর্বজনীন, সর্ববঙ্গীয় বা বাঙলা ভাষা। ওই দুটি রূপের প্রথমটির, সাধুরূপটির, সুস্থিতিবিধানকর্তার নাম বিদ্যাসাগর। আজকের শিক্ষিত বাঙালির কাছে হয়তো চলতি রীতিটিই বাঙলা ভাষা; কিন্তু কয়েক দশক আগে শিক্ষিত বাঙালির কাছে বাঙলা ভাষা ছিলো সাধুভাষা, যে-ভাষা ছিলো সর্ববঙ্গীয়, যে-ভাষায় লেখার মাধ্যমে পরস্পরের সাথে জড়িত থেকেছে বাঙালি। বিদ্যাসাগরের প্রতিভা বাঙালিকে দিয়েছে অনেক কিছু, কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে বাঙলা ভাষার এক সর্ববঙ্গীয় সুস্থিত রূপ, যাকে একদা বাঙালি মনে করেছে বাঙলা ভাষা।

মানুষ ভাষিক প্রাণী; মানুষের প্রতিটি গোত্র সামাজিক যোগাযোগ বা ভাববিনিময়ের জন্যে ব্যবহার ক'রে থাকে কোনো-না-কোনো ভাষা ; তবে সব ভাষা সমান বিকশিত বামান সম্পন্ন নয়। বহু ভাষা আছে পৃথিবীতে, যেগুলো পালন করে সামাজিক যোগাযোগের প্রাথমিক দায়িত্ব; আর রয়েছে বেশ কিছু ভাষা, যেগুলো পালন করে ব্যাপক ভূমিকা। যে-সব ভাষা পালন করে ভাষার প্রাথমিক দায়িত্ব, সেগুলো হয়তো লেখাই হয় না, ব্যবহৃত হয় কোনো সংকীর্ণ অঞ্চলে। সে-সব ভাষাকে বলতে পারি উপভাষা । ব্যাপক দায়িত্ব পালন করে যে-সব ভাষা, যেগুলো পেরিয়ে যায় আঞ্চলিকতার সীমা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামাজিক যোগাযোগের প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও যেগুলো ব্যবহৃত হয় সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায়, সেগুলোকেই সাধারণত দেয়া হয়ভাষা র মর্যাদা। প্রশ্ন করতে পারি ভাষা কাকে বলে? কালকেন্দ্রিকভাবে অর্থাৎ এক বিশেষ সময়ে এক বিশেষ অবস্থা অনুসারে ভাষা হচ্ছে একটি বিশেষআদর্শ বারীতি , বা পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত ভাষিক আদর্শ বা রীতির সমষ্টি। কালানুক্রমিকভাবে ভাষা হচ্ছে এমন এক সাধারণ ভাষা, যার বিসংহতির ফলে জন্ম নেয় একাধিক উপভাষা, বা ভাষা হচ্ছে একাধিক উপভাষার সংহতির ফলে উদ্ভূত কোনো সাধারণ ভাষা। ভূমিকা অনুসারে ভাষা হচ্ছে এমন এক উপরিপন্ন মানরূপ, যা হয়তো প্রথম ও প্রাত্যহিক ভাষা নয় তার ভাষীদের। বিভিন্ন উপভাষীদের পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমই ভাষা। কোনো ভাষাই সহজাতভাবে দুর্বল নয়, পৃথিবীর সমস্ত মহৎ ভাষাই এক সময় অনুন্নত বা অবিকশিত ভাষা ছিলো। কোনো ভাষা যখন জাতি ও রাষ্ট্রের সাথে জড়িত হয়, তখনই সূচনা হয় তার উন্নতি বা বিকাশের। প্রত্যেক আত্মমর্যাদাশীল জাতিরই থাকতে হয় একটি নিজস্ব ভাষা, যে-ভাষা পরিপূর্ণরূপে বিকশিত। জাতীয়তাবাদের চরিত্র হচ্ছে জাতির জন্যে একটি বিশেষ ভাষা নির্ধারণ করা, দেশে প্রচলিত উপভাষাগুলোর মধ্য থেকে একটিকে বেছে নিয়ে সকলের কাছে সেটিকেই ভাষারূপে উপস্থিত করা। ওই ভাষাটি হয় একটি মানভাষা, যেটি পালন করে রাষ্ট্রের বা জাতির সমস্ত ভাষিক দায়িত্ব। উনিশশতকে বাঙালির জাতীয় চেতনা উদ্যোগ নিয়েছিলো এমন একটি ভাষা স্থির করার, অজস্র মানুষের সাধনায় গ'ড়ে উঠছিলো তার কাঠামো; ওই কাঠামোকে সুস্থিত করেছিলেন বিদ্যাসাগর। পাণিনি ব্যাকরণ লিখে সুস্থিত করেছিলেন সংস্কৃত ভাষা, আর বিদ্যাসাগর বাঙলা ভাষার একটি সর্ববঙ্গীয় মানরূপ সুস্থিত করেছিলেন গদ্য লিখে।

মানভাষা এমন এক বিধিবদ্ধ ভাষিক রূপ, যা গৃহীত কোনো বড়ো ভাষাসমাজে, এবং ব্যবহৃত হয় ভাষার আদর্শ কাঠামোরূপে। ওই ভাষা বিধিবদ্ধ, অর্থাৎ নির্দিষ্ট তার সমস্ত নিয়মশৃঙ্খলা, কোনো বড়ো ভাষাসমাজ সেটিকে মানে নিজের ভাষা ব'লে, এবং ওই রূপটিকেই গণ্য করে ভাষিক শুদ্ধতার নিয়ামকরূপে। মানভাষার থাকতে হয় দুটি বড়ো গুণ :নমনীয় সুস্থিতি , ওমননীকরণশক্তি । নমনীয় সুস্থিতি বোঝায় ভাষাটি ঠিকমতো বিধিবদ্ধ হয়ে সুস্থিত হবে, তার যাচ্ছেতাই প্রয়োগ চলবে না; তবে ওই বিধিগুলো বেশি কঠোর হবে না, হবে নমনীয়, যাতে সময়বদলের সাথে সম্ভব হয় তার উৎকর্ষসাধন। মননীকরণশক্তি ভাষাকে প্রাত্যহিক যোগাযোগের ভাষা থেকে উন্নীত করে জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার ভাষায়। মানভাষা একগুচ্ছ উপভাষা অঞ্চলকে সংহত করে একটি মানভাষাঞ্চলে, এবং প্রতিবেশী ভাষাসমাজের সাথে নির্দেশ করে নিজ অঞ্চলের স্বাতন্ত্র্য। মানভাষা তার ভাষীদের এনে দেয় মর্যাদা, তাদের প্রতিষ্ঠিত করে শক্তিমানমণ্ডলিতে, এবং নির্দেশ করে শুদ্ধতার মানরূপ। ভাষাসমাজ অনুগত থাকে তার মানভাষার প্রতি, গৌরব বোধ করে ওই ভাষা নিয়ে, এবং থাকে মানভাষাসচেতন। কোনো ভাষাকে মানভাষা হয়ে ওঠার জন্যে জয় করতে হয় দুটি সমস্যাকে : একটি বিধিবদ্ধকরণসমস্যা, আরেকটি বিশদীকরণসমস্যা । বিধিবদ্ধকরণ হচ্ছে 'ন্যূনতম রৌপ বৈচিত্র্য বা ভিন্নতা', আর বিশদীকরণ হচ্ছে 'সর্বাধিক ভূমিকাগত বৈচিত্র্য বা ভিন্নতা'। ন্যূনতম রৌপ বৈচিত্র্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হচ্ছে এমন এক বিশুদ্ধ ভাষারীতি, যার প্রতিটি শব্দের রয়েছে মাত্র একটি বানান ও উচ্চারণ, প্রত্যেক অর্থের জন্যে রয়েছে মাত্র একটি শব্দ, এবং সমস্ত উক্তির জন্যে রয়েছে মাত্র একটি ব্যাকরণিক কাঠামো। সুষ্ঠু যোগাযোগের জন্যে এমন ভাষাই আদর্শ বিধি, তবে এমন সুস্থিতি অর্জন করতে পারে শুধু সংস্কৃত বা লাতিনের মতো মৃত ভাষা, যাতে বিধিবিধানের ফলে থামিয়ে দেয়া হয়েছে ভাষিক বিবর্তন। অতি বিধিবদ্ধকরণের ফলে কোনো একটি ভাষারীতি চিরকাল বা খণ্ডকালের জন্যে স্থির অবিচল হয়ে ওঠে। এ-প্রক্রিয়ার বিপরীত হচ্ছে সর্বাধিক ভূমিকাগত বৈচিত্র্য : একটি পূর্ণবিকশিত ভাষার কাছে আশা করা হয় যে ভাষাটি মেটাবে তার ভাষাসমাজের সমস্ত ভাষিক প্রয়োজন। ওই ভাষা পালন করবে নানা দায়িত্ব, বহু জটিল ভূমিকা : সেটি যেমন পালন করবে ব্যক্তিগত ও সামাজিক যোগাযোগের দায়িত্ব, তেমনি সেটি দিয়ে চর্চা করা যাবে সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞান, চালানো যাবে রাষ্ট্র; সেটিকে ক'রে তোলা যাবে দীর্ঘনিশ্বাসের মতো কোমল আর বজ্রের মতো নির্মম। এমন কোনো বাঙলা ভাষা ছিলো না উনিশশতকের আগে; এমন একটি ভাষা সৃষ্টির প্রয়াস চলে উনিশশতকের প্রথম ছ-দশক ধ'রে। ওই প্রয়াসের পরিণতিদাতা বিদ্যাসাগর। তাঁর গদ্যে বাঙালি পায় একটি বিধিবদ্ধ ভাষাকাঠামো।

বাঙলা গদ্যচর্চা ও বিদ্যাসাগর সম্পর্কে আলোচনার শুরুতে ওপরের আলোচনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, কেননা বিদ্যাসাগরপরবর্তীদের গদ্য হচ্ছে ব্যক্তিগত রীতি বা স্টাইল সৃষ্টি, আর বিদ্যাসাগরের গদ্য হচ্ছে জাতির জন্যে একটি ভাষাকাঠামো সৃষ্টি। বিদ্যাসাগর একটি মান বা নর্ম্, আর তাঁর পরবর্তীরা ওই মান অর্জন বা ওই মান থেকে স'রে যাওয়ার সাফল্য বা ব্যর্থতা। বাঙলা ভাষা বলতে কয়েক দশক আগেও যে-আদর্শ কাঠামোটিকে বোঝাতো, তা চূড়ান্তরূপে বিধিবদ্ধ হয়েছিলো বিদ্যাসাগরের গদ্যে। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বিশ্লিষ্টীকরণের ফলে উদ্ভূত অপভ্রংশ থেকে একটি বাঙলা ভাষা জন্ম নেয় নি, নিয়েছিলো অনেক উপভাষা। ওই উপভাষাগুলোই, আদি, মধ্য ও উনিশশতকের কয়েক দশক জুড়ে, ছিলো বাঙলা ভাষা; তখন ছিলো না বাঙলা ভাষার কোনো মানরূপ। মধ্যযুগেই শুরু হয়েছিলো মানরূপের বিকাশ, তবে তা ঘটেছিলো অসচেতন প্রক্রিয়ায়, এবং অত্যন্ত ধীরে বিকশিত হচ্ছিলো একটি সর্ববঙ্গীয় ভাষারীতি, যা উনিশশতকে রূপ নেয় সাধুভাষার। উনিশশতকের আগে বাঙলা ভাষার ছিলো নানা আঞ্চলিক বৈচিত্র্য, তা ছিলো অনুন্নত অবিকশিত ভাষা; তার রূপ বিধিবদ্ধ হয় নি, ভূমিকাও বিশদ হয় নি। তখন তার ছিলো ব্যাপক রৌপ বৈচিত্র্য, কিন্তু ভূমিকাগত বৈচিত্র্য ছিলো সীমাবদ্ধ। উনিশশতকেই সচেতনভাবে বিকাশ ঘটানো হয় একটি বিধিবদ্ধ মান বাঙলা ভাষার। উনিশশতকীরা অবশ্য খুঁজেছিলেন একটি লেখ্য বাঙলা মানভাষারূপ, যাতে সৃষ্টি করা যাবে সাহিত্য, চর্চা করা যাবে জ্ঞানবিজ্ঞান, প্রচার করা যাবে সংবাদ, পালন করা যাবে লেখ্য সমস্ত দায়িত্ব। এরই ফলে উদ্ভূত হয় সাধুরীতিটি, যা শুধুই লেখ্য। উনিশশতকের বাঙলা মানভাষাসন্ধানীরা একটি সর্বগ্রাসী জীবন্ত মানভাষা সৃষ্টির বদলে উদ্ভাবন করেন সীমাবদ্ধ দায়িত্বপালনের উপযোগী একটি ভাষারীতি। এতে অবশ্য তাঁদের কৃতিত্ব অসামান্য : তাঁরা ভাষাটির ভূমিকা বিশদ করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না পারলেও বিধিবদ্ধ করতে পেরেছিলেন ভাষাটির মানরূপ। এ-মানরূপ বিধিবদ্ধকরণে যাঁর ভূমিকা প্রধান, তিনি বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর শুধু ব্যক্তিগত রীতি নন, তিনি বাঙলা ভাষার কাঠামো।

অনেক ভাষাঞ্চলে দেখা যায় এমন পরিস্থিতি : কোনো ভাষার একটি রূপ ব্যবহৃত হয় লেখায় ও সাহিত্যে, আরেকটি রূপ কথোপকথনে বা সামাজিক যোগাযোগে। এটা দ্বিরীতিক পরিস্থিতি, যাতে একটি রীতিকে মনে করা হয় উচ্চ অন্যটিকে নিম্ন। উচ্চরীতিটি পায় ভাষার মর্যাদা। উনিশশতকের প্রথমার্ধে মানভাষাসন্ধানীরা সৃষ্টি করেছিলেন একটি উচ্চরীতি, যার নাম সাধুভাষা বা রীতি। বাঙলা মানভাষা বিধিবদ্ধকরণপ্রক্রিয়ার একটি মহিমাময় পরিণতি সাধুরীতি। মধ্যযুগে কোনো মান বাঙলা ভাষা ছিলো না, ছিলো নানা আঞ্চলিক ভাষিক বৈচিত্র্য; তবে মধ্যযুগের সাহিত্যও এগিয়ে চলছিলো একটি ভাষিক আদর্শের দিকে, যাকে উনিশশতকের গদ্যলেখকেরা দেন সুসংবদ্ধ সুস্থিত মানরূপ। সাধুভাষায় বিধিবদ্ধকরণপ্রক্রিয়াটি সফলভাবে কাজ করে, তাই রীতিটি অর্জন করে সুস্থিতি; কিন্তু তাঁরা এর ভূমিকা বিশদ করতে পারেন নি, তাই এটি হয়ে ওঠে অর্ধেক দায়িত্ব পালনের উপযোগী, অর্থাৎ শুধুই লেখ্য। তবু সাধুরীতি উদ্ভাবন ও বিধিবদ্ধকরণ ঘটনা হিশেবে অসামান্য, কেননা বাঙালি এ-রীতিতেই প্রথম পায় তার ভাষার একটি সর্ববঙ্গীয় আদর্শরূপ; এবং এটিকেই মনে করে নিজের ভাষা। তাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন বাঙালির জন্যে একটি ভাষা, বিধিবদ্ধ করেছিলেন তার রূপ, এবং ওই রূপটি ব্যবহার করেছিলেন একটি আধুনিকতামনস্ক জাতির বাস্তব ও স্বপ্নকে ধরার জন্যে। উনিশশতকে বাঙলা ভাষা নিয়েছিলো সাধুরীতির রূপ, যার ব্যাপকতার সাথে পূর্ববর্তী বাঙলা ভাষাগুচ্ছের কোনো তুলনা হয় না। বিদ্যাসাগরের গদ্যে ওই রীতিটি পায় চূড়ান্ত রূপ; বিদ্যাসাগর বাঙালিকে উপহার দেন একটি ভাষা।

সাধুরীতি মনে পড়িয়ে দেয় বিদ্যাসাগরকে, আর বিদ্যাসাগর মনে পরিয়ে দেন সাধুরীতি, ও গদ্যকে। বিদ্যাসাগর, সাধুভাষা বা রীতি, গদ্য অবিচ্ছেদ্য; বিদ্যাসাগর অর্থই গদ্য বা সাধুভাষা। মধ্যযুগ থেকে উনিশশতক পর্যন্ত বাঙলা গদ্যের, সাধুভাষার, যে-বিকাশ ঘটে, তাতে চোখে পড়ে দুটি ব্যাপার : ওই গদ্য পড়ার সময় অবিরাম বোধ করতে হয় যে মধ্যযুগের বাঙালি চিন্তা করতে শেখে নি; তাই সৃষ্টিও করতে পারে নি চিন্তাপ্রকাশের উপযুক্ত ভাষার রূপ। ভাষা ও চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করে পরস্পরকে; বিকশিত ভাষা ঘটাতে পারে চিন্তার বিকাশ, এবং গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা ভাষাকে দিতে পারে গুরুত্বপূর্ণ রূপ। বাঙালি চিন্তা করতে শেখে উনিশশতকে, তাই উনিশশতকেই বিকাশ ঘটে গদ্যের। ষোড়শ থেকে উনিশশতকের ছ-দশক ধ'রে চলেছিলো বাঙলা গদ্যের আদর্শকাঠামোর খোঁজ : স্থির করতে হয়েছিলো বাঙলার শব্দসম্ভার, বিধিবদ্ধ করতে হয়েছিলো শব্দের রূপ ও বানান, সুস্থিত করতে হয়েছিলো বাক্যকাঠামো, এবং শব্দসম্ভারকে পূর্ণ করতে হয়েছিলো অভিনব বিভিন্ন অর্থে। সেটা ছিলো না গদ্যশিল্পসৌন্দর্য সৃষ্টির সময়, ছিলো গদ্যসৃষ্টির সময়, যার জন্যে দরকার ছিলো মূল্যবান সুশৃঙ্খল চিন্তা। যদি ষোলো বা সতেরো শতকে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা জাগতো বাঙালির মনে বা মস্তিষ্কে, গদ্যের বিকাশ ঘটতো সে-সময়েই, তখনই পাওয়া যেতো বাঙলা ভাষার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদর্শ কাঠামো। বাঙলা গদ্য প্রথম চিন্তা করতে শুরু করে বিদেশিদের রচনায়, আইনের অনুবাদে; বাঙালির লেখা উনিশশতকপূর্ব গদ্যের যে-উদাহরণ পাই, তা বেদনাদায়ক এজন্যে নয় যে ওই গদ্য অবিকশিত; তা শোকাবহ এ-কারণে যে বাঙালি চিন্তা করতে শেখে নি। বিদ্যাসাগরের *বেতালপঞ্চবিংশতির* (১৮৪৭) পূর্ব পর্যন্ত যে-গদ্য পাই, তার রূপ বিধিবদ্ধ হয় নি, শব্দসম্ভার অনির্ণীত ও শব্দের রূপ অবিধিবদ্ধ, বাক্য বিশৃঙ্খল; তবে এসবই বাইরের ব্যাপার, যা ভেতরের তা হচ্ছে বাঙালির মস্তিষ্কে জন্মে নি সুশৃঙ্খল ও মূল্যবান চিন্তা। ছিন্নবিচ্ছিন্ন আবেগ কবিতা জাগাতে পারে, কিন্তু গদ্যের জন্যে দরকার সুশৃঙ্খল চিন্তা।

সুশৃঙ্খল চিন্তা কতো দুরূহ, তা ভাষায় প্রকাশ কেমন দুরূহতর, তা বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তী সাধারণদের চেষ্টা থেকে নয়, এক অসাধারণের প্রয়াস থেকেই অনুমান করতে পারি। তিনি রামমোহন, যিনি বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ লিখেছিলেন, বাঙলা ভাষার প্রকৃতিও বুঝেছিলেন, কিন্তু বাঙলা ভাষাটিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেন নি। রামমোহন *বেদান্ত গ্রন্থ*-এর (১৮১৫) 'অনুষ্ঠান'-এ চিন্তা ও বাক্যের দ্বন্দ্ব মেটানোর জন্যে দিয়েছিলেন এমন পরামর্শ :

> প্রথমত বাঙগলা ভাষাতে আবশ্যক গৃহব্যাপার নির্ব্বাহের যোগ্য কেবল কথকগুলিন শব্দ আছে এ ভাষা সংস্কৃতের জেরূপ অধীন হয় তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে দ্বিতীয়ত এ ভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোনো শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে না ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাসপ্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থ বোধ করিতে হঠাৎ পারেণ না ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থবোধের সময় অনুভব হয় অতএব বেদান্তশাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ২ ইহাতে মনোযোগের নূন্যতা করিতে পারেণ এ নিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি। জাঁহাদের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো থাকিবেক আর জাঁহারা ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস দ্বারা সাধু ভাষা কহেন আর সুনেন তাঁহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক। বাক্যের প্রারম্ভে আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করতে উচিত হয়। জে২ স্থানে যখন জাহা জেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহা সেই রূপ ইত্যাদিকে পূর্ব্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন।

বিদ্যাসাগরপূর্ব বাঙলা গদ্যের প্রায় সব বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে উদ্ধৃতিটিতে : অনেক শব্দের রূপ ও বানান স্থির হয় নি, বাক্যের কাঠামো পায় নি নিশ্চিত অবয়ব, শব্দের ক্রম অস্থির; তবে এতে চিন্তার চেষ্টা স্পষ্ট। কিন্তু চিন্তা যে পদেপদে বিপন্ন এখানে, তা ধরা পড়ে, যা আরো বড়ো হয়ে ধরা পড়ে এরও আগের গদ্যে। শীর্ণ চিন্তা যেমন পাওয়া যায় সতেরোশতকের কড়চায় : 'তুমি কি। আমি জীব। তুমি কোন জীব। আমি তটস্থ জীব। থাকেন কোথা। ভাণ্ডে।', তেমনি পাওয়া যায় রামরাম বসুর *রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র*-এ (১৮০১) : 'সংপ্রতি সর্ব্বারম্ভে এ দেশে প্রতাপাদিত্য নামে এক রাজা হইয়াছিলেন তাহার বিবরণ কিঞ্চিত পারস্য ভাষায় গ্রন্থিত আছে সাঙ্গ পাঙ্গ রূপে সামুদাইক নাহি', পাওয়া যায় বিদ্যাসাগরপূর্ব সমগ্র গদ্যে। বিদ্যাসাগরপূর্ব গদ্যের সাথে এক দিকে চমৎকার মিল রয়েছে চর্যাপদের ভাষার; হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদের ভাষাকে যেমন বলেছিলেন সন্ধ্যাভাষা, বিদ্যাসাগরপূর্ব বাঙলা গদ্যকেও তেমনি বলতে পারি সন্ধ্যাভাষা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা সন্ধ্যাগদ্য, যার আলোআঁধারি জন্মেছে চিন্তার আলোআঁধারি থেকে। বিদ্যাসাগরে কেটে যায় আঁধারটুকু, জ্ব'লে ওঠে আলো। বিদ্যাসাগর পূর্ববর্তীদের থেকে পাওয়া ভাষার সমস্ত বিশৃঙ্খলাকে বিন্যস্ত করেন একটি সুশৃঙ্খল ভাষাকাঠামোতে, যার শব্দসম্ভার সুপরিকল্পিত, শব্দের রূপ বিধিবদ্ধ, বানান সুস্থির, এবং বাক্যকাঠামো সুস্থিত অবয়বসম্পন্ন। বিদ্যাসাগরই প্রথম বাঙালি, যিনি আয়ত্ত করেছিলেন সুশৃঙ্খল চিন্তা ও সুশৃঙ্খল বাক্য। মালার্মে বলেছেন কবির কাজ গোত্রের ভাষাকে পরিস্রুত করা; বিদ্যাসাগর কবি ছিলেন না, কিন্তু তিনি পরিস্রুত করেছিলেন তাঁর জাতির ভাষা। তিনি জাতিকে উপহার দিয়েছিলেন একটি ভাষাকাঠামো, যার স্থান ব্যক্তিগত গদ্যরীতি বা স্টাইলের অনেক ওপরে।

যে-কোনো ভাষা চারটি স্তরের : ধ্বনি, রূপ বা শব্দ, বাক্য ও অর্থের সৃষ্টিশীল সংশ্রয়। মানভাষাকে বিধিবদ্ধ হ'তে হয় চারটি স্তরেই, এবং লিখিত মানভাষার জন্যে দরকার সুস্থির বানানরীতি। বিদ্যাসাগর এ-চারটি স্তর ও বানানরীতিতে, প্রতি ক্ষেত্রেই, পরিচয় দেন তাঁর পূর্ববর্তী ও সমকালীনদের থেকে অনেক বেশি সুপরিকল্পনার ও সুস্থিরতার : তাঁর কোনো বানান বিশৃঙ্খল নয়, কোনো শব্দ অব্যবস্থিত নয়, যা অন্যদের লেখায় তখন ছিলো স্বাভাবিক; তাঁর কোনো শব্দে নেই 'গ্রাম্য বর্বরতার' ছাপ– হঠাৎ একটি অপভ্রষ্ট শব্দ ব্যবহার ক'রে তিনি বোধকে আকাশ থেকে আবর্জনায় নামিয়ে আনেন নি, তাঁর কোনো সমাসবদ্ধ পদ উৎকট নয়, এবং তাঁর বাক্য সুশৃঙ্খল চিন্তার সুস্থির প্রকাশ। বিদ্যাসাগরের গদ্যে প্রথমেই চোখে পড়ে বাঙলা ভাষার শাব্দ অবয়বের সুষ্ঠু পরিকল্পনা। বহু উপভাষার মধ্য থেকে একটিকে মান বাঙলা ভাষায় রূপ দিতে গিয়ে বাড়াতে হয়েছিলো শব্দসম্ভার, অনিবার্য হাত পাততে হয়েছিলো সংস্কৃতের কাছে। জাতির জীবনের সমস্ত লিখিত দায়িত্ব পালন সম্ভব ছিলো না তদ্ভব ও আঞ্চলিক, এবং কিছু বিদেশি শব্দে; তাই তৎসম শব্দের উদারতায় গ'ড়ে তুলতে হয়েছিলো অভিনব বাঙলা ভাষার শাব্দ অবয়ব। উনিশশতকের দ্বিতীয়াংশ থেকে, অনেকের মনে, এমন ধারণা জন্ম নিতে থাকে যে ফোর্ট উইলিয়মের ভেতর ও বাইরের পণ্ডিতদের ষড়যন্ত্রে বাঙলা ভাষা হয়ে ওঠে সংস্কৃতের উপনিবেশ; নইলে দেশি-তদ্ভব ও ইসলামি শব্দে বাঙলা হয়ে উঠতো একটি চমৎকার ভাষা। খুব ভুল ধারণা এটি; সংস্কৃতের সাহায্য ছাড়া বহু-আঞ্চলিক বাঙলা ভাষা আজকের বাঙলা ভাষা হয়ে উঠতে পারতো না। বিদেশি শব্দ সম্পর্কে বাঙলা ভাষাঞ্চলে অনেক দিন ধ'রেই চলছে একটি ভুল ধারণা : একদল বাঙলা ভাষায় বিদেশি শব্দের প্রাচুর্যকে সমৃদ্ধি ব'লে মনে করেন, তবে তা সমৃদ্ধি নয় দারিদ্র্য। বাঙলা ভাষায় বিদেশি শব্দ ঢুকেছে ভাষাসাম্রাজ্যবাদী প্রক্রিয়ায়, তার অধিকাংশই চাপিয়ে দেয়া হয়েছে বাঙলা ভাষার ওপর। বাঙলা ভাষা বিদেশি শব্দ নিজের প্রয়োজনে স্বেচ্ছায় নেয় নি, রাজনীতিক কারণে ওগুলো ঢুকেছে বাঙলা ভাষায়। সংস্কৃতের কাছে ঋণ করা ছাড়া বাঙলা ভাষার একটি শক্তিশালী কাঠামো বিধিবদ্ধ করা অসম্ভব, এটা বুঝেছিলেন বিদ্যাসাগর। তাঁর পরিমিতিবোধও ছিলো অসামান্য।

বাঙলা ভাষার শাব্দ অবয়ব পরিকল্পনায় বিদ্যাসাগর পরিচয় দিয়েছিলেন অন্যদের থেকে গভীর অন্তর্দৃষ্টির : তিনি তৎসম, তদ্ভব ও বিদেশি শব্দের অনুপাত স্থির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিলেন ঠিকভাবে, এবং করেছিলেন তার সুষ্ঠু প্রয়োগ। তাঁর গদ্যে প্রত্ন বা অপরিচিত শব্দ বেশি মেলে না; 'নির্বৃত, আস্যে, দুর্বিগাহ, একৈকের, প্রত্যানিত, ক্রব্যাদ, প্রত্যাহর্তা, রশ্মি (বল্গা), সংহিত, দীর্ঘায়ুরস্তু, দুষ্পরিহর '-এর মতো শব্দ কিছু মেলে, কিন্তু মনে হয় না উৎকট, কেননা তা বিষয়ের সাথে খাপ খেয়েছে চমৎকারভাবে। তাঁর সমাসও পীড়াদায়ক নয়, সাধারণত চারটির বেশি শব্দের সমাস করেন নি তিনি, যখন করেছেন তখন নিয়েছেন পরিচিত মনোরম শব্দ। তাঁর সমাসবদ্ধ শব্দ সাধারণত 'লোকান্তরপ্রাপ্তি, লক্ষযোজনবিস্তীর্ণ, বোধসুধাকর, নবমালিকাকুসুমকোমলা, গিরিতরঙ্গিণীতীরবর্তী ' ধরনের। বাক্যিক প্রয়োজনে তিনি বারবার ব্যবহার করেছেন 'পূর্বক'যুক্ত শব্দ : প্রাণসংহারপূর্বক, আহ্লাদপ্রদর্শনপূর্বক, অবগাহনপূর্বক, প্রবেশপূর্বক, পরিত্যাগপূর্বক, বিরাগপ্রদর্শনপূর্বক, অপত্যস্নেহবিস্মরণপূর্বক, রাজ্যাধিকারপরিহারপূর্বক, অতিদীর্ঘনি-শ্বাসভারপরিত্যাগপূর্বক' প্রভৃতি এবং 'সমভিব্যাহারে, কার্যান্তরব্যপদেশে, যৎপরোনাস্তি' প্রভৃতিও মেলে মাঝেমাঝে। তিনি 'মাদৃশ, এতাদৃশী, ঈদৃশ, এতাদৃশ' ধরনের সর্বনাম ও নির্দেশক ব্যবহার করেছেন, এবং তিনিই প্রথম ব্যবহার করেছেন দ্বিতীয় পুরুষের সম্মানসূচক সর্বনাম 'আপনি'। তাঁর আগে আত্মবাচক 'আপন' পাওয়া যায়, কিন্তু দ্বিতীয় পুরুষ সম্মানসূচক 'আপনি' প্রথম মেলে বিদ্যাসাগরেই। তিনি 'জিজ্ঞাসিলেন, সম্বোধিয়া'র মতো নামধাতু ব্যবহার করেছেন, বাঙলা ভাষার ক্রিয়ার অভাব কাটানোর জন্যে প্রচুর ব্যবহার করেছেন 'গমন করিলেন'-ধরনের যুক্ত ক্রিয়া, কিন্তু 'জন্ম গ্রহণ করে বা করিল' না লিখে 'জনে' ও লিখেছেন প্রচুর। তিনি সখে, শকুন্তলে, অনুসূয়ে, প্রিয়বন্ধো, কুলগুরো, হা পরমোপকারিন্ সখে, বিধে' ধরনের সম্বোধন ব্যবহার করেছেন প্রচুর। অনুপ্রাসের সুমিত ব্যবহার পাই তাঁর রচনায় : 'শীতল সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ মন্দ সঞ্চার, মধুকর মাধবীলতার অভিনব মুকুলে মধুপান করিতেছিল, গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমাণ জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত, এই সেই সিদ্ধ শবরী শ্রমণা'র সঙ্গীত যেমন পাই, তেমন পাই 'বুঝিলাম, আজ উদ্যানলতা, সৌন্দর্যগুণে, বনলতার নিকট পরাজিত হইল'র মতো কবিত্ব।

বিদ্যাসাগর সাধুভাষার কাঠামো বিধিবদ্ধ ও সুস্থিত করেছিলেন একটি, তবে বিষয় ও লক্ষ্য অনুসারে সৃষ্টি করেছিলেন তিনটি ব্যক্তিগত গদ্যরীতি বা স্টাইল। সাধুভাষার যে-কাঠামোটি চূড়ান্তরূপে সুস্থিতি পায় তাঁর প্রধান রচনাগুলোতে, অন্যদের বই থেকে জন্ম নেয়া তাঁর মৌলিক বইগুলোতে, সেটিই তাঁর প্রধান বা বিদ্যাসাগরী রীতি : ওই রীতিটি তিনি ব্যবহার করেন তাঁর কথাশ্রেণীর বইগুলোতে। *বেতালপঞ্চবিংশতি* (১৮৪৭), *শকুন্তলা* (১৮৫৪), *সীতার বনবাস* (১৮৬০), *ভ্রান্তিবিলাস*-এ (১৮৬৯) মুদ্রিত তাঁর এ-মহিমামণ্ডিত রীতিটি। এ-রীতিটিই কিছুটা কঠোর কর্কশ হয়ে ওঠে *বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব* [প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তক (১৮৫৫)], *বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার* [প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তক (১৮৭১, ১৮৭৩)], এবং কোমল হয়ে ওঠে ব্যক্তিগত শোকাকুল *প্রভাবতীসম্ভাষণ*-এ। তাঁর প্রধান রীতির একটি সরলিত রূপ ব্যবহার করেন তিনি পাঠ্যপুস্তকগুলোতে : *কথামালা* (১৮৫৬), *বোধোদয়* (১৮৫১), *বর্ণপরিচয়*-এ (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, ১৮৫৫)। তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর প্রধান রীতিটিতে কিছুটা সাধুচলতি মিশিয়ে, আরবিফারসি শব্দ ছড়িয়ে তৈরি করেন একটি লঘু পরিহাসপরায়ণ গদ্যরীতি, যার পরিচয় পাই *অতি অল্প হইল* (১৮৭৩), *আবার অতি অল্প হইল* (১৮৭৩), *ব্রজবিলাস* (১৮৮৪), *রত্নপরীক্ষা* (১৮৮৬) প্রভৃতিতে। তবে তাঁর তিনটি রীতি একই সাধুরীতির তিন রকম উৎসারণ।

বিদ্যাসাগরের গদ্য বাক্যকেন্দ্রিক, তাঁর গদ্যে লক্ষণীয় হচ্ছে বাক্যসৃষ্টির কৌশল। বিদ্যাসাগরের স্বভাবে চিন্তা বা ভাব পরস্পরসম্পর্কিত, পরম্পরাগ্রথিত। তিনি সুশৃঙখল পরম্পরায় প্রকাশ করেছেন চিন্তা বা ভাব, তাই সরল সংক্ষিপ্ত বাক্য সৃষ্টি করেছেন কম; তিনি রচনা করেছেন সাধারণত মিশ্রবাক্যসংগঠন। মিশ্রবাক্যসংগঠনের ভেতরে তিনি গেঁথে দিয়েছেন উপবাক্যের পর উপবাক্য; একাধিক মিশ্রবাক্যসংগঠনকে পরিণত করেছেন যৌগিক সংগঠনে, এবং যখনি কোনো পদ বা উপবাক্যের ভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে তাঁর, তিনি সেটি বসিয়ছেন কমার ভেতরে। এমনকি নিয়ে এসেছেন বাক্যের শুরুতে, এবং সেটিকে কমা দিয়ে বিচ্ছিন্ন ক'রে রেখেছেন বাক্যের পরবর্তী অংশ থেকে। তাঁর বাক্যে বিভিন্ন যতিচিহ্নের, কমা ও সেমিকোলনের, যে-প্রাচুর্য দেখা যায়, তা বিশেষবিশেষ ভাবকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়ার জন্যেই। কয়েকটি সরল বাক্য নিচ্ছি :

[ক] একদা, এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল।
[খ] এক কুকুর, মাংসের এক খণ্ড মুখে করিয়া, নদী পার হইতেছিল।
[গ] এক ব্যাঘ্র, পর্বতের ঝরনায় জলপান করিতে করিতে, দেখিতে পাইল, কিছু দূরে, নীচের দিকে, এক মেষশাবক জলপান করিতেছে।

WWW.AMARBOI.COM

প্রথম বাক্যে একটি, দ্বিতীয়টিতে দুটি, এবং তৃতীয়টি পাঁচটি কমা ব্যবহার করেছেন বিদ্যাসাগর, যেখানে আজ কোনো কমাই ব্যবহার করা হবে না। তিনি ব্যবহার করেছেন, কেননা প্রতিটি পৃথক ও গুরুত্বপূর্ণ ভাবকে তিনি পৃথক মূল্য দিয়েছেন। তাঁর কথাশ্রেণীর রচনাগুলোতে ভাব এসেছে একের পর এক, যেগুলোকে তিনি পৃথক সরল বাক্যে প্রকাশ না ক'রে দিয়েছেন মিশ্রবাক্যসংগঠনের রূপ। সরল বাক্য ভাষাকে সরল করে না, আবার মিশ্র বা যৌগিক বাক্যও ভাষাকে জটিল করে না; জটিলতা সৃষ্টি হয় যদি বাক্য থেকে লুপ্ত হয়ে যায় বাক্যের জন্যে আবশ্যিক উপাদান। বিদ্যাসাগর সংযোগ ও মিশ্রণ ঘটিয়েছেন বাক্যের, কিন্তু আবশ্যিক উপাদান লোপ করেন নি; তাই তাঁর বাক্য দুর্বোধ্য নয়। বিদ্যাসাগর কথাশ্রেণীর রচনাগুলোতে বিবৃত করেছেন ঘটনা ও অনুভবক্রম, ওই ক্রমের প্রয়োজনে তিনি ব্যবহার করেছেন এমন এক ধরনের বাক্যসংগঠন, যাকে বলতে পারি ক্রমিক বাক্যসংগঠন। এ-ধরনের সংগঠন তৈরি হয় 'ইয়া'- বা 'পূর্বক'-অন্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার বারবার ব্যবহারে। দুটি উদাহরণ :

[ক] রাজা, অমরফল বারাঙ্গনার হস্তগত *দেখিয়া*, বিস্ময়াপন্ন হইলেন; এবং, ফল লইয়া, পুরস্কারপ্রদানপূর্বক, তাহাকে বিদায় দিয়া, ভাবিতে লাগিলেন, এই ফল রাজ্ঞীকে দিয়াছি; ইহা কিরূপে বারাঙ্গনার হস্তগত হইল। পরে, সবিশেষ অনুসন্ধানদ্বারা, তিনি পূর্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন, এবং, সাংসারিক বিষয়ে নিরতিশয় বীতরাগহইয়া, বিবেচনা করিতে লাগিলেন, সংসার অতি অকিঞ্চিৎকর, ইহাতে সুখের লেশমাত্র নাই; অতএব, বৃথা মায়ায় মুগ্ধহইয়া, আর ইহাতে লিপ্ত থাকা, কোনও ক্রমে, শ্রেয়স্কর নহে [*বেতালপঞ্চবিংশতি*] ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[খ] সীতার ক্রন্দনশব্দ শ্রবণগোচরকরিয়া, সন্নিহিত ঋষিকুমারেরা শব্দ অনুসারে ক্রন্দনস্থানে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, এক অসূর্য্যম্পশ্যারূপা কামিনী, হাহাকার ও শিরে করাঘাতকরিয়া, অশেষবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন।দেখিয়া, তাঁহাদের কোমল হৃদয়ে যার পর নাই কারুণ্যরস আবির্ভূত হইল। তাঁহারা, ত্বরিত গমনে বাল্মীকিসমীপে উপস্থিতহইয়া, বিনয়নম্র বচনে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! আমরা, ফল কুসুম কুশ সমিধ আহরণের নিমিত্ত, ভাগীরথীসন্নিহিত অটবীবিভাগে পর্যটন করিতেছিলাম; অকস্মাৎ স্ত্রীলোকের আর্তনাদ শুনিতে পাইলাম, এবং ইতস্ততঃ অনুসন্ধানকরিয়া, কিয়ৎ ক্ষণ পরে দেখিতে পাইলাম, এক অলৌকিক রূপলাবণ্যে পরিপূর্ণা কামিনী, নিতান্ত অনাথার ন্যায়, একান্ত কাতরা*হইয়া,* উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন কমলা দেবী ভূমণ্ডলে অবতীর্ণা হইয়াছেন *[সীতার বনবাস]* ।

প্রথম উদাহরণে বিদ্যাসাগর কয়েকটি বাক্যকে নানাভাবে রূপান্তরিত ক'রে পরিণত করেছেন দুটি মিশ্রবাক্যে। প্রথম বাক্যটির শুরুতেই তিনি একটি সরল বাক্যের [রাজা বিস্ময়াপন্ন হইলেন] ভেতরে কর্মরূপে গ্রথিত করেছেন একটি উপবাক্য [অমরফল বারাঙ্গনার হস্তগত দেখিয়া (= দেখিলেন)], যার ক্রিয়াটি পেয়েছে অসমাপিকারূপ; তারপর ব্যবহার করেছেন সমাপিকা ক্রিয়া। এর ফলে বাঙলা বাক্যে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার ক্রম স্থির রয়েছে। এ-মিশ্রবাক্যটির সাথে যুক্ত করেছেন আরেকটি মিশ্র বাক্য, যাতে ক্রমিকভাবে এসেছে সংকুচিত উপবাক্য-'ফল লইয়া', 'পুরস্কারপ্রদানপূর্বক', 'তাহাকে বিদায় দিয়া', এবং শেষে বসিয়েছেন সমাপিকা ক্রিয়া, এবং এর সাথে সম্পূরক উপবাক্যরূপে গেঁথে দিয়েছেন একটি যৌগিক বাক্য– 'এই ফল রাজ্ঞীকে দিয়াছি; ইহা কিরূপে বারাঙ্গনার হস্তগত হইল' [= এই ফল *আমি* রাজ্ঞীকে দিয়াছি; *কিন্তু* ইহা কিরূপে বারাঙ্গনার হস্তগত হইল]। বাক্যটির শুরুতে আছে একটি মিশ্রবাক্য, তার সাথে 'এবং' দিয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে আরেকটি মিশ্রবাক্য, যেটি সাংগঠনিকভাবে জটিলতর। ভাবের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ বাক্যটি ঘটনা ও ভাবনার ক্রম। বিদ্যাসাগর ক্রমিক ভাবনা প্রকাশ করেছেন ক্রমিক মিশ্রবাক্যসংগঠনের সাহায্যে। দ্বিতীয় বাক্যটির শুরুতে একটি যৌগিক বাক্যকে [পরে *রাজা* সবিশেষ অনুসন্ধান করিলেন *এবং রাজা* পূর্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন] পরিণত করেছেন মিশ্রবাক্যে, এবং এর সাথে সংযুক্ত করেছেন সাংগঠনিকভাবে বেশ জটিল একটি মিশ্রবাক্য। মিশ্রণের ফলে বাক্যের ভাব দুর্বোধ্য হয় নি; তিনি ভাবের ক্রমকে গ্রথিত রেখেছেন পরস্পরের সাথে। তিনি প্রধান উপবাক্যের ভেতরে রূপান্তরিত উপবাক্যগুলোকে ঘিরে দিয়েছেন কমা দিয়ে, কেননা ওই বাক্যগুলো রূপান্তরের ফলে বাক্যের কাঠামো হারিয়ে ফেললেও বিদ্যাসাগর ভোলেন নি যে ওগুলো বাক্য, এবং বহন করে গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য। বাক্যগঠনে বিদ্যাসাগরের রীতি এই, এবং এ হচ্ছে বিদ্যাসাগরী গদ্যের প্রকৃতি। একাধিক মিশ্রবাক্যের যৌগিকরূপ বা যৌগিক বাক্যের মিশ্ররূপের সাহায্যে ভাবপ্রকাশ বিদ্যাসাগরের স্বভাব। সরল বাক্যসংগঠন তিনি ব্যবহার করেন এমন ভাবপ্রকাশের জন্যে, যা নিরপেক্ষ, অন্য কোনো ভাবের সাথে ক্রমিকভাবে সংযুক্ত নয়।

দ্বিতীয় উদাহরণটিতে প্রথম বাক্যটি মিশ্রবাক্য, যাতে একটি বাক্য রূপান্তরিত হয়েছে, এবং ক্রিয়াটি পেয়েছে অসমাপিকারূপ [সীতার ক্রন্দনশব্দ শ্রবণগোচর করিয়া], বিন্যস্ত হয়েছে বাক্যের শুরুতে। এর সাথে সংযুক্ত ক'রে দেয়া হয়েছে একটি জটিলতর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিশ্রবাক্যসংগঠন। এটি একটি যৌগিক বাক্য, তবে বিদ্যাসাগর 'এবং' দিয়ে সংযুক্ত করেন নি, তিনি সেমিকোলন ব্যবহার ক'রে লোপ ক'রে দিয়েছেন সংযোজকটি। এর পরের বাক্যটিও মিশ্রবাক্য, যাতে একটি উপবাক্য [তাঁহারা ইহা দেখিলেন] রূপান্তরিত হয়ে পেয়েছে 'দেখিয়া' অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ, এবং গেঁথে দেয়া হয়েছে একটি সরল বাক্যের গায়ে। তৃতীয় বাক্যটির শুরুতে একটি যৌগিক বাক্যকে [তাঁহারা ত্বরিত গমনে বাল্মীকিসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহারা বিনয়নম্র বচনে নিবেদন করিলেন] রূপান্তরিত করা হয়েছে একটি ক্রমিক মিশ্রবাক্যসংগঠনে [তাঁহারা, ত্বরিত গমনে বাল্মীকিসমীপে উপস্থিতহইয়া, বিনয়নম্র বচনে নিবেদন করিলেন], এবং তার গায়ে গেঁথে দেয়া হয়েছে একটি উক্তি, যা গ'ড়ে উঠেছে বিদ্যাসাগরী ধরনের দীর্ঘ মিশ্রবাক্যে। বিদ্যাসাগর ক্রমিক সংগঠনে একের পর এক ক্রিয়ার অসমাপিকারূপ ব্যবহার করেন না, সমাপিকার পর অসমাপিকা, তারপর সমাপিকা, এমন ক্রম মেনে চলেন [যেমন : শুনিতে পাইলাম...অনুসন্ধান করিয়া...দেখিতে পাইলাম...কাতরা হইয়া...করিতেছেন]।

বিদ্যাসাগরের গদ্য সুপরিকল্পিত মিশ্রবাক্যের গদ্য; তা দুর্বোধ্য নয়, কেননা তিনি কোনো উপাদান বাদ দেন নি বাক্য থেকে। মিশ্রবাক্যের ফাঁকেফাঁকে বিদ্যাসাগর বিন্যস্ত করেছেন সরল ও হ্রস্ব বাক্য, এবং ওই বাক্যের শব্দ অবয়ব গ'ড়ে তুলেছেন সুপরিকল্পিত তৎসম শব্দে, বাক্যে পদের ও উপবাক্যের ক্রমবিন্যাস করেছেন বাঙলা ভাষার প্রতিভা অনুসারে, এবং সৃষ্টি করেছেন বাঙলা ভাষার আদর্শ সাধুকাঠামোটি। তাঁর গদ্যে ইংরেজি বাক্যসংগঠনেরও প্রভাব পড়েছে, তবে তিনি তাকে খাপ খাইয়ে দিয়েছেন বাঙলা ভাষার স্বভাবের সাথে। সাধুকাঠামোটিকে তিনি চরমভাবে সুস্থিত করেন নি, কোনো জীবন্ত ভাষার কাঠামো চরমভাবে কেউ সুস্থিত করতে পারেন না; পাণিনি হওয়ার জন্যে দরকার একটি মৃতভাষা। সাধুকাঠামোটি নমনীয়ভাবে সুস্থিত, যার ফলে তাঁর কাঠামোর ওপর ভিত্তি ক'রেই পরে বিকাশ ঘটেছে নানা ধরনের ব্যক্তিগত গদ্যরীতি। বিদ্যাসাগর যে অবিচল ভাষিক কাঠামোতে বিশ্বাসী ছিলেন না, বিশ্বাসী ছিলেন নমনীয় কাঠামোতে, তার পরিচয় দিয়েছেন তিনি নিজেরই গদ্যে; তিনি ব্যবহার করেছেন একাধিক রীতি। তাঁর কাঠামোটিকে যুক্তিতর্কতথ্য দিয়ে ভ'রে তুললে জন্মে বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ-বিষয়ক পুস্তকগুলোর গদ্য, আর ব্যক্তিগত কাতরতা সংক্রমিত করলে সৃষ্টি হয় *প্রভাবতীসম্ভাষণ*-এর গদ্য :

> বৎসে প্রভাবতি! তুমি, দয়া, মমতা ও বিবেচনায় বিসর্জন দিয়া, এ জন্মের মত, সহসা, সকলের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়াছ। কিন্তু আমি, অনন্যচিত্ত হইয়া, অবিচলিত স্নেহভরে তোমার চিন্তায় নিরন্তর এরূপ নিবিষ্ট থাকে যে, তুমি, এক মুহূর্তের নিমিত্ত, আমার দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইতে পার নাই।

একটি লঘু রীতি তিনি তৈরি করেছিলেন *অতি অল্প হইল, আবার অতি অল্প হইল, ব্রজবিলাস, রত্নপরীক্ষা* য়। এগুলো বেরিয়েছিলো ছদ্মনামে, এগুলো থেকে মুছে ফেলা দরকার ছিলো বিদ্যাসাগরকে; নিজেকে মুছে ফেলতে পারাই ছিলো এগুলোর সাফল্য। এগুলো লেখার জন্যে দরকার ছিলো ব্যক্তিত্ববদল, আর বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব হচ্ছে তাঁর গদ্য, তাই তিনি স'রে গিয়েছিলেন নিজের ব্যক্তিত্ব বা রীতি থেকে। এগুলোতে মেলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধুচলতির মিশ্রণ : 'তাঁর/তাঁহার, হয়েছে/কহিতেছে, হয়ে/হইয়া, লিখেছেন/ লিখিয়াছিলেন'-এর মতো মিশ্রণ তিনি এগুলোতে ঘটিয়েছেন স্বেচ্ছায়, যেমন পরিকল্পিত বিভ্রান্তিসৃষ্টির জন্যে ব্যবহার করেছেন 'বেহুদা, ফেসাৎ, মেহনৎ, চালাকি খেলিয়াছেন ' প্রভৃতি। স্বেচ্ছাবিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্যে না হ'লে 'আমি যে কিস্তি দিয়াছিলাম, তাতেই খুড় মাৎ হয়েছেন'-এর মতো দূষিত বাক্য লিখতেন না তিনি। তাঁর এ-রীতিটি লঘু, মর্মান্তিক কৌতুককর, এবং স্বেচ্ছাদূষিত। এটা বোঝায় যে বিদ্যাসাগর বিশ্বাসী ছিলেন নমনীয়তায়।

বিদ্যাসাগরের প্রধান কাঠামোটি নির্ভার হয়ে উঠেছে তাঁর পাঠ্যপুস্তকে, বিশেষ ক'রে *বর্ণপরিচয়* ও *বোধোদয়*-এ। নির্ভার হওয়ার কারণ তাঁর লক্ষ্য-পাঠকেরা, যারা বিদ্যালয়ের ছাত্র। তিনি তৎসম শব্দ ও শব্দের ভার কমিয়ে, কথ্য ক্রিয়া বসিয়ে এগুলোর ভাষাকে ক'রে তুলেছিলেন মনোরম। সরল বাক্য এগুলোতে বেশি, কিন্তু মিশ্রবাক্য এড়িয়ে যান নি তিনি। যেমন :

[ক] সদা সত্য কথা কহিবে। *যে* সত্য কথা *কয়,* সকলে তাহাকে ভালবাসে। যে মিথ্যা কথা *কয়,* কেহ তাহাকে ভাল বাসে না, সকলেই তাহাকে ঘৃণা করে [*বর্ণপরিচয়* -দ্বিতীয় ভাগ, প্রথম পাঠ]।

[খ] আমি *যে* সময়ের *যে* কাজ, *সে* সময়ের *সে* কাজ করি। এজন্য *বাবা* আমাকে ভালবাসেন। আমি *তাঁর* কাছে যখন *যা* চাই, *তাই* দেন। যদি আমি এখন, পড়িতে না গিয়া, তোমার সহিত খেলা করি, *বাবা* আমাকে আর ভালবাসিবেন না [*বর্ণপরিচয়*-দ্বিতীয় ভাগ, পঞ্চম পাঠ]।

[গ] পারদ, রৌপ্যের ন্যায় শুভ্র ও উজ্জ্বল। এই ধাতু জল অপেক্ষা প্রায় চৌদ্দগুণ ভারী। ইহা আর আর ধাতুর মতন কঠিন নহে, জলের ন্যায় তরল; যাবতীয় তরল দ্রব্য অপেক্ষা অধিক ভারী; সর্বদা দ্রব অবস্থায় থাকে; কিন্তু মেরুসন্নিহিত দেশে লইয়া গেলে জমিয়া যায় [*বোধোদয়,* পারদ]।

উদাহরণ তিনটিতে সরল বাক্য আছে মাত্র দুটি। প্রথম উদাহরণ দুটিতে সাধুরীতি কথ্যের কাছাকাছি হয়ে উঠেছে; এ-দুটিতে শুধু 'কয়', 'যে', 'সে', 'বাবা', 'যা', 'তাই' প্রভৃতি চলতি রূপই নেই, সর্বনামের চলতি 'তাঁর' রূপটিও বসেছে। তৃতীয় উদাহরণটিতে বিদ্যাসাগরের প্রধান গদ্যরীতিটি হয়ে উঠেছে নির্ভার।

বিদ্যাসাগর সাধুরীতির যে-কাঠামোটি সুস্থিত করেন, উনিশশতকের মাঝভাগে সেটি হয়ে ওঠে বাঙলা ভাষা, মানকাঠামো, লেখ্য বাঙলার শুদ্ধতার নিয়ামক। তখন থেকে দেখা দেয় দুটি প্রবণতা : একটি ওই মান অর্জন, আরেকটি ওই মান থেকে স'রে যাওয়া। এ-সময়ে আরেকটি রীতি বা বাঙলা মানভাষার বিকাশ ঘটছিলো মৌখিকভাবে, যার নাম চলতি ভাষা। এটি তখন যদিও বিধিবদ্ধ হয়ে ওঠে নি, তবু উনিশশতকের মাঝ ভাগেই, অসময়ে, এটি লিপ্ত হয় সাধুরীতির সাথে সংঘর্ষে; এবং জয়ের জন্যে তাকে অপেক্ষা করতে হয় আরো আধশতকেরও বেশি সময়। বিদ্যাসাগরের সুস্থিত রীতির বিরুদ্ধে উনিশশতকের পঞ্চাশের দশকের বিদ্রোহ ওই রীতির রৌপকাঠামোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছিলো না, ছিলো তার শাব্দ অবয়ব ও ভঙ্গির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। বিদ্রোহীরাও সাধুরীতির রৌপ কাঠামো ছেড়ে দিতে চান নি, চেয়েছিলেন তার ভেতরে কথ্য কণ্ঠস্বর বাজাতে। বঙ্কিমচন্দ্রও ছাড়েন নি ওই রীতির রৌপ কাঠামো, তিনি তাতে সংক্রামিত করেন ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য। বিশশতকে অর্ধেক দায়িত্বপালনের উপযোগী সাধুরীতি হেরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায় পূর্ণ দায়িত্ব পালনের উপযোগী চলতির কাছে, বাঙালি পায় আরেকটি ভাষাকাঠামো। তবে এর সাথে বিদ্যাসাগরের রীতির প্রধান পার্থক্য ক্রিয়া ও সর্বনামের রূপে, গৌণ পার্থক্য শাব্দ অবয়বে; আর বাক্যিক পার্থক্য খুবই কম। বিদ্যাসাগর তাঁর জাতিকে শুধু গদ্য নয়, দিয়েছিলেন একটি ভাষিক কাঠামো; তাঁর পরবর্তীরা ওই কাঠামোর ওপর তুলেছেন বিচিত্র ব্যক্তিগত গদ্যের সৌধ, যার ভিত্তিতে প্রত্যক্ষপরোক্ষভাবে আছেন বিদ্যাসাগর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্ম

আদিম মানুষদের অন্ধ আদিম কল্পনা, আর পরবর্তী অনেকের সুপরিকল্পিত মিথ্যাচার, কখনো কখনো মত্ততা, নানাভাবে বিধিবদ্ধ হয়ে নিয়েছে যে-বিচিত্র রূপ, তাই পরিচিত ধর্ম নামে। বার্ট্র্যান্ড রাসেল, *আমি কেনো খ্রিস্টান নই* বইটি'তে, বলেছেন, 'সব ধর্মই ক্ষতিকর ও অসত্য।' কোনো অলৌকিক জগত থেকে কেউ ধর্ম পাঠায় নি, যদিও এটা বিশ্বাস করার নির্দেশ দিয়ে ভয় দেখানো হয়; কোনো অলৌকিক জগত নেই, মানুষ নিয়ে কোনো অলৌকিক সত্তার কোনো উদ্বেগ নেই। মহাবিশ্বে মানুষ খুবই ক্ষুদ্র। ধর্ম অলৌকিক নয়– বিধাতার বা দেবদেবীদের প্রণীত নয়; ধর্ম লৌকিক– মানুষের প্রণীত, এবং বেশ সন্ত্রাসবাদী, ব্যাপার। মানুষ উদ্ভাবনশীল; মানুষের অজস্র উদ্ভাবনের একটি, ও সম্ভবত নিকৃষ্টটি, ধর্ম। ধর্মকে শাশ্বত সর্বজনীন মনে করার একটা চাপ রয়েছে; তবে ধর্ম শাশ্বত নয়, সর্বজনীনও নয়। কোনো ধর্ম নেই, যা মানুষের শুরু থেকে চ'লে এসেছে, ও চিরকাল চলবে; কোনো ধর্ম নেই, যাতে বিশ্বাস করে সবাই। অনেক সত্য আছে, যা সবাই শুধু বিশ্বাস নয়, স্বীকার করে; কিন্তু বিশেষ একটি ধর্ম ও তার বিধাতায় বিশ্বাস করে শুধু ওই ধর্মের মানুষ। অন্য ধর্মের মানুষের কাছে তা হাস্যকর ও, অনেক সময়, ঘৃণার বিষয়। চারপাশে ধর্ম দেখে মনে হ'তে পারে যে মানুষ ধর্ম ছাড়া বাঁচতে পারে না; সত্য হচ্ছে ধর্মের মধ্যে মানুষ বেশিক্ষণ বাঁচতে পারে না। মানুষ মর্মমূলে ধর্মবিরোধী, মানুষের পক্ষে বেশি ধর্ম সহ্য করা অসম্ভব;– ধার্মিকেরাও যতোটা ধার্মিক তার থেকে অনেক বেশি অধার্মিক। মানুষের সৌভাগ্য মানুষ বেশি ধর্ম সহ্য করতে পারে না, তাই বিকাশ ঘটেছে মানুষের। বেশি ধর্মে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে, ধার্মিক মানুষ অসুস্থ মানুষ। মানুষ যদি আপাদমস্তক– চব্বিশ ঘণ্টা, তিরিশ দিন, বারোমাস– ধার্মিক প্রাণী হতো, আজো তাহলে থাকতো আদিম অবস্থায়। মানুষের মনের আদিম অংশটুকু ধর্ম। ধার্মিক মানুষকে প্রশংসা করার একটা রীতি প্রচলিত রয়েছে; বলা হয় যে প্রকৃত ধার্মিক মানুষ খুব ভালো মানুষ; কিন্তু সত্য তার উল্টো,– প্রকৃত ধার্মিক মানুষ প্রকৃত খারাপ মানুষ। সে অবিকশিত, এবং মানুষের বিকাশের বিরোধী। হিন্দু, ইহুদি, খ্রিস্টান, মুসলমান যদি সবাই হতো প্রকৃত হিন্দু, ইহুদি, খ্রিস্টান, মুসলমান, তবে তারা আজো বাস করতো পাঁচ থেকে দেড় হাজার বছর আগের সমাজে। ধর্ম মানুষকে এগিয়ে দেয় নি, ধর্ম থাকা সত্ত্বেও মানুষ এগিয়েছে; কেননা মানুষ কখনোই পুরোপুরি ধার্মিক নয়। মানুষ কখনো ধর্মের বিধান পুরোপুরি মানে নি। ধর্মের কোনো উপকারিতা দেখা যায় নি, কিন্তু অজস্র অপকারিতা সব সময়ই দেখা যায়।

প্রত্যেক ধর্মের রয়েছে দুটি দিক;– ধর্মগুলো নিজেদের দায়িত্ব হিশেবে ব্যাখ্যা করে বিশ্বসৃষ্টির রীতি, এবং তৈরি করে সামাজিক বিধান। ধর্মের বইগুলো বিজ্ঞানের বই নয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওগুলো খুবই অবৈজ্ঞানিক। এগুলোতে বিশ্বসৃষ্টির যে-বর্ণনা পাওয়া যায়, তা পুরোপুরি ভুল; ওই বর্ণনা বইগুলো রচনাকালের মানুষের বিভ্রান্ত কল্পনামাত্র। বিশেষ এক ধরনের সমাজ প্রতিষ্ঠাই ধর্মপ্রবর্তকদের লক্ষ্য, তাই ধর্ম মূলত আদিম রাজনীতি। মৃত্যুর পর মানুষের পরিণতি বর্ণনা ধর্মের এক প্রিয় বিষয়; এ-এলাকায় ধর্মগুলো মানুষকে লোভের পর লোভ আর ভয়ের পর ভয় দেখায়। মৃত্যুর পর মানুষের পরিণতি সম্পর্কে ধর্মগুলো যা বলে, তা হাস্যকর, যাতে বিশ্বাস করতে পারে শুধু লোভী ও ভীত মানুষ। মানুষ সম্পর্কে খুবই নিম্ন ধারণা পোষণ করে ধর্মগুলো। ধর্মগুলো ধ'রে নিয়েছে যে মানুষ লোভী ও ভীত; তাই তাদের লোভ দেখাতে হবে, এবং রাখতে হবে সন্ত্রস্ত ক'রে। ধর্মগ্রন্থ পড়ার সময় ধার্মিক মানুষ বারবার লোভে পড়ে, আর ভয়ে কেঁপে ওঠে; তাই ধার্মিক মানুষের পক্ষে সুস্থ থাকা সম্ভব নয়, লোভ ও ভয়ের মধ্যে বাস ক'রে তারা হয়ে পড়ে বিকলনগ্রস্ত। ধার্মিকেরা খুবই অমানবিক; তারা নিজেদের ধর্ম ও ধর্মের বই ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম ও ধর্মের বইকে মর্যাদা দেয় না। এক ধর্মের ধার্মিক অন্য ধর্মের পবিত্রগ্রন্থ ও গৃহকে অবলীলায় অপমানিত করতে পারে, যা নাস্তিকেরা কখনো করে না। যে-কোনো নির্বোধের পক্ষে ধার্মিক হওয়া সহজ, কিন্তু শুধু জ্ঞানী ও মানবিক ব্যক্তিই হ'তে পারে নাস্তিক। নাস্তিক হত্যা আর ধ্বংস করে না; কিন্তু ধার্মিক সব সময় হত্যা ও ধ্বংসের জন্যে ব্যগ্র থাকে; তারা ইতিহাসের পাতাকে যুগে যুগে রক্তাক্ত করেছে। প্রত্যেক ধর্মে রয়েছে অসংখ্য সন্ত, যারা ঠাণ্ডা মস্তিষ্কের হত্যাকারী। নাস্তিক চায় মানুষের চেতনাকে বদলে দিতে, মানুষকে বিকশিত করতে; আর ধার্মিক চায় মানুষের চেতনাকে নষ্ট করতে, মানুষকে রুদ্ধ করতে। ধার্মিকদের নৈতিকতাবোধ খুবই শোচনীয়।

AMARBOI.COM

বহু ধর্ম রয়েছে পৃথিবীতে। একটি সরল প্রশ্ন জাগতে পারে যে বিধাতা যদি থাকেন, তিনি যদি একলাই স্রষ্টা হন, তবে তিনি কেনো এতো ধর্ম পাঠালেন? তিনি একটি ধর্ম পাঠালেই পারতেন, এবং আমরা পরম বিশ্বাসে সেটি পালন করতে পারতাম। তিনি তা করে নি কেনো? তবে কি তিনি একলা নন? ওই অলৌকিক জগতেও কি রয়েছেন বহু প্রতিদ্বন্দ্বী, যাঁরা মানুষের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে ব্যগ্র? তাঁদের কেউ হিন্দুর, কেউ ইহুদির, কেউ খ্রিস্টানের, কেউ মুসলমানের, এবং কেউ ঙ-র, কেউ চ-র, কেউ ছ-জ-ঝর? যদি তিনি একলা, তাহলে এতো ধর্ম পাঠিয়ে কেনো তিনি বিভ্রান্ত করছেন মানুষকে? শুধু বিভ্রান্ত ক'রেই তিনি সুখ পাচ্ছেন না; তিনি মানুষের মধ্যে তৈরি করেছেন বিভাজন– কাউকে করছেন ইহুদি, কাউকে খ্রিস্টান, কাউকে মুসলমান, কাউকে হিন্দু। কেনো এদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন শত্রুতা, এবং লিপ্ত করেছেন পারস্পরিক হত্যাকাণ্ডে? আরো নানা প্রশ্ন জাগতে পারে। তিনি কেনো শুধু এক ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করেন? তিনি কেনো একজনের কাছে বাণী পাঠান? তিনি কেনো শুধু প্রাচীন কালেই দেখা দিতেন? কেনো তিনি দেখা দিচ্ছেন না আধুনিক কালে? আধুনিক কাল নিয়ে তাঁর বা তাঁদের কোনো উদ্বেগ নেই? কেনো তিনি একদলকে গরু খেতে নিষেধ করেন, আরেক দলকে খেতে বলেন; কেনো তিনি একদলের জন্যে নিষিদ্ধ করেন মদ্য, এবং সিদ্ধ করেন আরেক দলের জন্যে? কেনো তিনি সর্বশক্তিমান হয়েও শক্তির প্রকাশ ঘটান না? তাঁর ক্রিয়াকলাপ কেনো এতো বিস্ময়কর, অস্বাভাবিক, এবং সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাস্য?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসব সরল প্রশ্নের উত্তর ধর্মের বইগুলোতে পাওয়া যাবে না, কিন্তু পাওয়া যাবে যদি আমরা ধর্মের উদ্ভবের রীতি উদ্ঘাটন করি। ধর্মগুলো কোনো অলৌকিক জগত থেকে কেউ পাঠায় নি, তেমন কেউ নেই; বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি এবং গোষ্ঠিই সৃষ্টি করেছে এগুলো। কোনো পরম সত্তা যদি থাকতেন, এবং তিনি যদি পৃথিবীতে ধর্মের প্রয়োজন বোধ করতেন (– সম্ভবত বোধ করতেন না, তুচ্ছ মানুষের তুচ্ছতর স্তব তাঁর ভালো লাগতো না), তাহলে একটি ধর্মই পাঠাতেন তিনি। ধর্মগুলো বাতিল ক'রে দেয় একটি অন্যটিকে; একই সময়ে সবগুলো ধর্ম সত্য হ'তে পারে না। কোনো সত্যের থাকতে পারে না একাধিক ব্যাখ্যা বা তত্ত্ব; কোনো প্রপঞ্চের একাধিক তত্ত্ব পেলে বুঝতে হবে এগুলোর একটি ঠিক হ'তে পারে, বা সবগুলোই ভুল। বিভিন্ন প্রতিযোগী তত্ত্বের মধ্যে মাত্র একটিই ঠিক হ'তে পারে, বা ভুল হ'তে পারে সবগুলোই। ধর্মগুলো বিশ্বসৃষ্টি, মানবসমাজ, ও মানুষের পরিণতি সম্পর্কে প্রস্তাবিত বিভিন্ন প্রতিযোগী তত্ত্ব;– পরস্পরবিরোধী, ও ভুল। এজন্যেই বহু সরল প্রশ্নের উত্তর এগুলো দিতে পারে না; সাধারণত নিষেধ করে প্রশ্ন করতে। এগুলো কথা বলে এমনভাবে, যা প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা যায় না। যা প্রমাণ ও অপ্রমাণ করা যায় না, তা অবৈজ্ঞানিক।

ধর্মগুলো একদিনে দেখা দেয় নি; হঠাৎ কোনো ঈশ্বর কোনো ধর্ম পাঠান নি। মানুষ আদিম কাল থেকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে বিশ্বকে– বিশ্ব ও নিজের উদ্ভবকে, চারপাশের প্রপঞ্চরাশিকে; কিন্তু তখন তার সত্য উদ্ঘাটনের শক্তির বিকাশ ঘটে নি; তাই সে সাহায্য নিয়েছে কল্পনার। সে অবিরাম ভুল কল্পনা করেছে, ভুল কল্পনার পর ভুল কল্পনাকে সত্য ব'লে বিশ্বাস করেছে, এবং বিকাশ ঘটিয়েছে বিচিত্র রকম ধর্মের। ধর্ম হচ্ছে আদিম ও ভুলবিজ্ঞান। আজ আমরা বজ্র আর বিদ্যুৎ ব্যাখ্যা করতে পারি; বিজ্ঞান বজ্রবিদ্যুতের সত্য বের করেছে; কিন্তু আদিম মানুষের পক্ষে এ-সত্য বের করা সম্ভব হয় নি। তারা কল্পনা করেছে দেবতা, আর দেবতাদের অস্ত্র। দেবতা, দেবতার অস্ত্র ইত্যাদি হচ্ছে আদিম মানুষের কল্পিত ব্যাখ্যা, যার মূলে কোনো সত্য নেই; কিন্তু এসব ভুলই গৃহীত হয়েছে ধর্মরূপে। আদিম মানুষ চারপাশের প্রপঞ্চ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বহু কাহিনী বা কিংবদন্তি তৈরি করেছিলো, বর্ণনা করেছিলো দেবতা বা অতিপ্রাকৃত সত্তার উপাখ্যান। আদিম মানুষের কল্পিত উপাখ্যানগুলোকে বলা হয় *পুরাণ*, এবং পুরাণ থেকেই হয়েছে ধর্মের উৎপত্তি। পুরাণ আদিম চিন্তাভাবনাকল্পনার ফল। বহু পৌরাণিক উপাখ্যান অত্যন্ত উপভোগ্য, এমনকি তাৎপর্যপূর্ণ; কিন্তু ওগুলো উপাখ্যান। পুরাণের এক উদ্দেশ্য ছিলো মানুষের সাথে মহাজগতের সম্পর্ক ব্যাখ্যা; পুরাণরচয়িতারা তা ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে অনেকের কাছে এ-পুরাণই হয়ে ওঠে ধর্ম। আমাদের চারপাশের বড়ো ঘটনাগুলোকেও আমরা মহাজগতের সাথে জড়িত করি না; কিন্তু আদিম মানুষের স্বভাবই ছিলো জীবনের তুচ্ছতম ব্যাপারটিকেও মহাজগতের সাথে জড়িয়ে দেয়া। দাঁতের পোকা তাড়াতেও তারা এমন সব মন্ত্র আবৃত্তি শুরু করতো, যেনো ওই পোকার সাথে মহাজাগতিক বিশাল সব ব্যাপারের রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। পুরাণ ভ'রে পাওয়া যায় বিভিন্ন দেবতার জন্মের বিবরণ, তাদের শক্তি ও স্বভাবের কথা, বিশ্বসৃষ্টির উপাখ্যান। বিভিন্ন পুজো আর অর্চনার কারণও বর্ণনা করা হয় পুরাণে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরাণের গল্পগুলোতে পাওয়া যায় আদিম যুক্তি-অবিকশিত মানুষের মনের পরিচয়। পুরাণ যুক্তিপরায়ণ মনের সৃষ্টি নয়; সহজেই বোঝা যায় যে পুরাণগুলো এসেছে আমাদের আদিম পূর্বপুরুষদের কাছে থেকে। আমরা পৌরাণিক উপাখ্যানগুলোকে গল্প ব'লেই মনে করি, সত্য মনে করি না; এবং জেসাসের, যদি সত্যিই জেসাস ব'লে কেউ জন্ম নিয়ে থাকেন, জন্মের বহু আগেই অনেকের কাছে এগুলো গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি। তাই অনেক ধর্মপ্রণেতা, পুরোহিত, এবং কবি এগুলোকে গ্রহণযোগ্য রূপ দিতে চেয়েছেন। থিআগেনেস (৫২০ খ্রিপূ) অশোভন মনে করেছেন গ্রিক পুরাণের দেবতাদের যুদ্ধবিগ্রহ ও অন্যান্য কার্যকলাপ; তাঁর মতে দেবতারা এমন অশোভন কাজ করতে পারে না। ইন্দ্র আর জিউস যতো নারী ধর্ষণ করেছে, কোনো পুরুষ ততো করার স্বপ্নও দেখে নি। তিনি দেবতাদের যুদ্ধবিগ্রহকে ব্যাখ্যা করেছেন বিভিন্ন মৌল উপাদানের, আগুন-বাতাস-জলের, সংগ্রামের রূপকরূপে। বাইবেল বলেছে বিধাতা নিজের আদলে মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আসলে মানুষ নিজের আদলে সৃষ্টি করেছে দেবতাদের। জেনোফানেস পছন্দ করেন নি মানুষ আকৃতির দেবতাদের। তাঁর মতে :

> ঈশ্বর একজনই, যিনি শ্রেষ্ঠ দেবতা আর মানুষদের মধ্যে; অবয়ব আর চিন্তা কোনো কিছুতেই তিনি মানুষের মতো নন, তবু মানুষ কল্পনা করে যে দেবতারা মানুষের মতোই জন্মেছে, এবং তাদের অবয়ব আর কণ্ঠস্বর মানুষেরই মতো। যদি বৃষ, সিংহ, আর অশ্বরা মূর্তি বানাতে পারতো, তবে তারাও নিজেদের অবয়বের মতোই বানাতো দেবতাদের মূর্তি।

প্রাচীন মিশরিরাও বিস্মিত হতো যে তাদের অধিকাংশ দেবতাই পশু। তারা এটা মেনে নিতে পারতো না; এবং ব্যাখ্যা করতো যে দেবতারা পশু নয়, শুধু বিপদের সময়েই দেবতারা আশ্রয় নিতো নানা পশুর শরীরে।

ম্যাক্স ম্যুলার পুরাণরচয়িতাদের মনে করেছিলেন উন্মাদ। পুরাণে আদিম অযৌক্তিক উপাদানের প্রাচুর্য দেখে তিনি সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে মানবজাতির জীবনে এসেছিলো এক অস্থায়ী পাগলামোর কাল; তারা ভুগেছিলো পাগলামো রোগে। একই পাগলামোতে কি ভুগেছিলো ভারত, গ্রিস, মিশর, ব্যাবিলন, প্যালেস্টাইন, আর আইসল্যান্ডের আদিম মানুষ? পুরাণকে কি মনে করবো পাগলামো? পুরাণের অযৌক্তিকতা পাগলামো নয়; তারা পাগল ছিলো না, ছিলো অবিকশিত। পুরাণ অবিকশিত মনের মানুষের সৃষ্টি। তাদের মনের বিকাশ ঘটে নি, যেমন আজো অধিকাংশের মন অবিকশিত রয়ে গেছে। তাদের অভিজ্ঞতা ছিলো কম, এবং ছিলো না বিজ্ঞানসম্মত, বস্তুনিষ্ঠ, ব্যাখ্যার মননশীলতা, যেমন আজো নেই অধিকাংশের। তারা বিভিন্ন প্রপঞ্চ যুক্তিসম্মতভাবে ব্যাখ্যা করতে না পেরে ব্যাখ্যা করেছিলো আদিম কল্পনার সাহায্যে; সত্য আবিষ্কারের বদলে তারা বানিয়েছিলো কল্পোপাখ্যান। তারা ছিলো মানসিক শৈশবে, যেমন আজো আছে অধিকাংশ। তারা মনে করেছিলো প্রকৃতির শক্তিগুলো মানুষেরই মতোই; সেগুলো মানুষের মতোই কথা বলতে, কাজ ও চিন্তা করতে পারে। এরকম বিশ্বাসকে বলা হয় *অ্যানিমিজম* বা *সর্বাত্মবাদ*, যা বিশ্বাস করে প্রত্যেক বস্তুর আছে আত্মা। তারা মনে করেছিলো বাতাস, জল, আর গাছ কথা বলে; তারা বিশ্বাস করেছিলো যে আকাশ ভ'রে রয়েছে দেবতা। তারা যা দেখেছিলো, তা ব্যাখ্যার জন্যে যুক্তির সাহায্য নেয় নি, সাহায্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়েছিলো কল্পনার। সব দেশের,পুরাণের উপাখ্যানেই মেলে মানুষের বর্বরতার কালের পরিচয়। মানুষের প্রথম উদ্ভাবিত ধর্ম সর্বাত্মাবাদ। তারা বিশ্বাস করতো সব কিছুরই আত্মা আছে, যদিও আজ আত্মা ব'লে কিছু আমরা মানি না। সর্বাত্মাবাদী পুরাণে পাওয়া যায় আত্মা সম্পর্কে আদিম ভাবনার স্পষ্ট পরিচয়। পাওয়া যায় অনেক গল্প, যাতে কেউ ভূতপ্রেতের দেশে যায়, বা যায় এমন দেশে যেখানে পশুপাখি কথা বলে, যেখানে মানুষকে রূপান্তরিত করা হয় পশু বা গাছে। সর্বাত্মাবাদী বিশ্বাসে আত্মা আর শরীরের মধ্যে রয়েছে পার্থক্য, যা টিকে আছে আজো সমস্ত ধর্মে। আজ বিজ্ঞান আত্মা মানে না, কিন্তু সাধারণ বিশ্বাসে আদিম বিশ্বাস এখনো টিকে আছে।

সর্বাত্মাবাদের সাথে জড়িয়ে আছে আদিম মানুষের আরেকটি বিশ্বাস, যাকে বলা হয় *ফেটিশিজম* বা *যাদুবাদ* বা *ইন্দ্রজালবাদ*। আদিম মানুষ বিশ্বাস করতো যে অনেক বস্তুর রয়েছে যাদুশক্তি। আফ্রিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, অর্থাৎ সব মহাদেশের বর্বররাই বিশ্বাস করতো বিভিন্ন বস্তুর যাদুশক্তিতে; তারা বিশ্বাস করতো কোনো কোনো বস্তুতে বাস করে কোনো অতীন্দ্রিয় শক্তি। যাতে অতীন্দ্রিয় শক্তি বাস করে, সেটি যাদুবস্তু; যেমন কোনো অস্থি, বা পাথর, বা একগুচ্ছ পালক, বা ঝিনুকের মালা, বা অন্য কিছু। তারা বিশ্বাস করতো কোনো কোনো ব্যক্তি ওই বস্তুতে ডেকে আনতে পারে ওই বস্তুটির সাথে জড়িত অলৌকিক সত্তাটিকে, জিন বা দৈত্যকে, বা ওই সত্তাটি সব সময়ই থাকে ওই বস্তুটিতে। যাদুবাদ আজো টিকে আছে পৃথিবী জুড়ে। যাদুবাদের যাদুবস্তুতে যে-সত্তাটি বাস করে, সেটি হচ্ছে প্রেত। প্রেত দেবতা নয়, প্রেত আর দেবতার মধ্যে রয়েছে পার্থক্য; তবে প্রেত এক সময় হয়ে উঠতে পারে দেবতা। প্রেত আর দেবতার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে দেবতার থাকে ভক্ত, তার পুজো করা হয়; আর যাদুবাদের প্রেত থাকে কোনো ব্যক্তি বা গোত্রের অধীনে; যেমন *আরব্যরজনীর* প্রেত। সেটি দেবতা নয়, ভৃত্য; প্রদীপটি, অর্থাৎ যাদুবস্তুটি যার অধিকারে থাকে, সে হয় তার গোলাম। তবে অনেক সময় যাদুবাদের প্রেত হয়ে উঠতে পারে দেবতা। যাদুবাদের পর মানুষ পৌঁছে ধর্মের আরেক স্তরে, যার নাম *টোটেমিজম* বা *উৎসবস্তুবাদ*। টোটেম হচ্ছে কোনো পশু, বা উদ্ভিদ, বা বস্তু, যা কোনো সামাজিক শ্রেণীর সাথে সম্পর্কিত। টোটেমবাদে বিশেষ বিশেষ সামাজিক শ্রেণীর নাম হয়ে থাকে সম্পর্কিত টোটেমের নাম অনুসারে; তারা নিজগোত্রের প্রতীক হিশেবে ব্যবহার করে টোটেমটিকে। ওই গোত্রের লোকেরা মনে করে যে তারা ওই টোটেম প্রাণী বা উদ্ভিদ বা বস্তুটি থেকে জন্মেছে, এবং টোটেমটি তাদের জন্যে পবিত্র। পুরাণে পাওয়া যায় টোটেমের প্রচুর উদাহরণ।

এর পর মানুষ সৃষ্টি করে দেবতা; দেবতা এবং দেবতা এবং দেবতা; এবং দেখা দেয় *বহুদেবতাবাদ* বা *বহুঈশ্বরবাদ* বা *বহুভগবানবাদ*। বহুদেবতাবাদে দেবতারা পরিপূর্ণ বিকশিত, ও তারা শক্তিমান। দেবতারা শক্তিমান হ'লেও মানুষই তাদের স্রষ্টা, তাই দেবতাদের তারা বিন্যস্ত করে নিজেদের গোত্রের স্তরক্রম অনুসারে। বহুদেবতাবাদের বিকাশ ঘটে নানা পথে। আদিম মানুষ দেবতার পর দেবতা তৈরি করে, দেবতাদের দেয় বিভিন্ন ভূমিকা বা দায়িত্ব, এবং তাদের পুজো করে; অনেক সময় একদল দেবতার কিছু কিছু শক্তি কমিয়ে ওই শক্তি অন্য দেবতার ওপর অর্পণ ক'রে তৈরি করে নতুন দেবতা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা পুরোনো দেবতাদের ঔরসে জন্ম দেয়া হয় নতুন দেবতাদের। কখনো কোনো দেবতা হয়ে ওঠে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কোনো দেবতা হারিয়ে ফেলে তার গৌরব; এতে ওই দেবতা কোনো ভূমিকা পালন করে না, ভূমিকা পালন করে মানুষ। মনে করা যাক কোনো নগরে বা ধর্মকেন্দ্রে পূজিত হতো কয়েকটি দেবতা; কিন্তু তাদের মধ্যে কে বড়ো কে ছোটো তা ছিলো অনির্ণীত। দেবতারা নিজেরা যুদ্ধ ক'রে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারতো না; পুরোহিতেরাই দেবতাদের নানাভাবে বিন্যস্ত ক'রে সৃষ্টি করতো দেবমণ্ডলি। দেবতাদের ভাগ্য পুরোপুরি নির্ভর করতো ভক্তদের ওপর। ভক্তরা তাদের দেবতাদের ভূষিত করতো নানা গুণে, অনেক সময় ভুল বুঝে বদল ঘটাতো দেবতাদের নামের। তারপর ছিলো ভক্ত রাজাদের উত্থানপতন, ভক্তদের দেশত্যাগ, জয় আর পরাজয়, এবং নতুন জাতির সংস্পর্শ। কোনো ভূভাগের রাজা পুজো করতো যে-দেবতাদের, তারা হতো প্রধান দেবতা; অন্য দেবতাদের ভক্ত যখন তাকে পর্যুদস্ত ক'রে রাজা হতো, তখন পর্যুদস্ত হতো আগের রাজকীয় দেবতারা, শক্তিমান আর প্রধান হয়ে দেখা দিতো নতুন রাজার দেবতারা। দেবতাদের ভাগ্য নির্ভর করতো ভক্তদের ভাগ্যের ওপর। দেবতারা ভক্তদের ভাগ্য কখনো নির্ধারণ করে নি, চিরকাল ভক্তরাই নির্ধারণ করেছে দেবতাদের ভাগ্য। বিধাতারা কখনো নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তার করে নি, ভক্তরাই বিস্তার করেছে তাদের বিধাতাদের সাম্রাজ্য।

মানুষ উৎপাদন করেছিলো অজস্র দেবতা। এক সময় তারা আকাশমণ্ডল ভ'রে ফেলেছিলো দেবতায়; এবং তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলো নানা বিভাগের দায়িত্ব। কাউকে দেয়া হয়েছিলো অগ্নিবিভাগের দায়িত্ব, সে অগ্নিদেবতা; কাউকে জলবিভাগের দায়িত্ব, সে জলদেবতা; এভাবে দেখা দিয়েছিলো বায়ুদেবতা, বজ্রদেবতা, মাটির দেবতা, মদের দেবতা, শস্যের দেবতা, এবং শিল্পকলা, শিক্ষা, ধন ও আরো অসংখ্য বিভাগের দেবতা। *ঋগ্বেদ*-এর ঋষিরা তৈরি করেছিলো ৩৩টি দেবতা;– ১১টি পৃথিবীতে, ১১টি অন্তরীক্ষে, ১১টি স্বর্গে; তারপর বিভিন্ন বস্তুর অধিপতি হিশেবে কল্পনা করেছিলো ৩৩ কোটি দেবতা। তারা এসব দেবতা সৃষ্টি করেছিলো দেবতার জন্যে দেবতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নয়, নিজেদের কল্যাণের জন্যেই। তারা চারপাশের সব কিছুকে নিজেদের কল্যাণের জন্যে ব্যবহার করতো, এবং বিশ্বাস করতো ওই সব কিছুরই দেবতা রয়েছে, তাই দেবতাদের পুজো করলে দেবতারা তাদের জীবনকে সম্পদে ভ'রে দেবে। দেবতাদের সাথে তাদের থাকতো একটি চুক্তি, চুক্তিটি হচ্ছে দেবতারা তাদের অন্ন দেবে, বিনিময়ে তারা দেবে দেবতাদের অর্ঘ্য। তাদের কয়েকটি দেবতার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। আজ আমরা জানি সূর্যই পার্থিব সব কিছুর উৎস; আদিম মানুষেরাও সূর্যকেই মনে করতো জীবনের উৎস ব'লে। তবে তারা আজকের মতো জানতো না, তারা জানতো তাদের মতো ক'রে। সব দেশের পুরাণেই দেবমণ্ডলির মধ্যে সূর্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল ক'রে আছে। সর্বাত্মবাদীরা মনে করতো মানুষের মতোই সূর্যের আছে প্রাণ ও ইচ্ছাশক্তি, তাই সে চলতে পারে। বৈদিকরা সূর্যশ্রেণীতে সৃষ্টি করেছিলো বহু দেবতা : আদিত্য, মিত্র, বরুণ, পূষা, ভগ, অশ্বিনীকুমার, সবিতা প্রভৃতি। গ্রিকরা দুটি সূর্যদেবতা সৃষ্টি করেছিলো, একটি অ্যাপোলো, আরেকটি সূর্য নিজে, যার নাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেলিওস। অ্যাপোলো তিমিরবিনাশী দেবতা, যে সোনালি তীরের আঘাতে হত্যা করে রাত্রির সাপ পাইথনকে, এবং তার এক কাজ হচ্ছে সভ্যতার বিকাশ ঘটানো। পৃথিবী জুড়েই পাওয়া যায় সূর্যদেবতা– ইন্দ্র, ক্যাডমাস, হোরাস প্রভৃতি, এবং তাদের উদ্ভবের উপাখ্যানের মধ্যেও মিল রয়েছে। সূর্যদেবতার মতো বজ্রদেবতাও পাওয়া যায় পৃথিবী ভ'রে। আদিম মানুষ সৃষ্টি করেছিলো অজস্র দেবতা, যাদের এখন আর আমরা, হিন্দুরা ছাড়া, দেবতা মনে করি না; এবং বিশ্বাস করি না দেবতায়।

দেবতাদের কাল শেষ হয়ে আসতে থাকে; বহুদেবতাবাদের পর, তিন-চার হাজার বছর আগে, মানুষ এগোয় *একদেবতাবাদ* বা *একেশ্বরবাদের* দিকে; তবে মানুষ কখনোই সম্পূর্ণরূপে একেশ্বরবাদী হয়ে ওঠে নি। একদেবতাবাদীদের ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে, প্রচ্ছন্ন ও স্পষ্টভাবে, বহুদেবতার মুখ দেখা যায়। ঈশ্বর বা বিধাতা বললে দেবতার থেকে মহান কিছু বোঝায় ব'লে অনেকের মনে হয়; কিন্তু ঈশ্বর বা বিধাতাও দেবতাই। এতে যা ঘটে তা হচ্ছে বহুদেবতাকে সরিয়ে একটি দেবতার প্রতিষ্ঠা। বহুদেবতাবাদ থেকে নানা প্রক্রিয়ায় দেখা দেয় একদেবতাবাদ। মানুষই সৃষ্টি করেছিলো বহুদেবতা, আবার মানুষই সৃষ্টি করে একদেবতা; এতে দেবতাদের কোনো ভূমিকা নেই। কখনো বহুদেবতার মধ্যে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে একটি বিশেষ দেবতা, কেননা সেটি বিজয়ী জাতির দেবতা; সে নিজে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে নি, তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে বিজয়ী জাতি; কখনো পুরোহিতেরা বহুদেবতা পছন্দ করে নি, অন্য সব দেবতাকে বাদ দিয়ে প্রধান ক'রে তুলেছে একটিকে; কখনো ভক্তরা ছোটো দেবতাদের শক্তি কমিয়ে শক্তিশালী ও জনপ্রিয় ক'রে তুলেছে বিশেষ একটি দেবতাকে; কখনো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কেউ এসে একাধিক দেবতার মধ্য থেকে একটিকে ঈশ্বর বা বিধাতা ব'লে ঘোষণা ক'রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে তার প্রেরিতপুরুষরূপে; কখনো দেশের রাজবংশটি প্রধান ক'রে তুলেছে একটি দেবতাকে। এতে দেবতাটির কোনো কৃতিত্ব নেই; সব কৃতিত্ব মানুষের। একদেবতাবাদ ও বহুদেবতাবাদের মধ্যে কোনোটি উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট নয়, যদিও এখন একদেবতাবাদকেই উৎকৃষ্ট ব'লে প্রচার করা হয়। ভাষার খেলাও কাজ করে এখানে। একদেবতাবাদকে বলা হয় একেশ্বরবাদ, তবে দেবতা ও ঈশ্বর মূলত একই জিনিশ। ইংরেজিতে শুরুতে বড়ো অক্ষর দিয়ে লেখা হয় God; দেবতাদের বেলা লেখা হয় ছোটো অক্ষরে god; এটা ভাষার খেলা। এমন কোনো মানদণ্ড নেই, যা দিয়ে একটিকে উৎকৃষ্ট ও অন্যটিকে নিকৃষ্ট প্রমাণ করা যায়। দুটিই সমান আদিম কল্পনা। তবে বহুদেবতাবাদ অনেকটা নিরীহ, ওই দেবতারা সারাক্ষণ মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার ও শাস্তি দেয়ার জন্যে উত্তেজিত থাকে না; কিন্তু একদেবতাবাদের দেবতা বা বিধাতা প্রচণ্ড নিয়ন্ত্রণবাদী, হিংস্র, ও বিদ্বেষপরায়ণ। একদেবতাবাদের দেবতার থাকে স্বৈরাচারী প্রবণতা; সে নিজের বন্ধ্যা নিঃসঙ্গতায় বিরাজ করে মহাজাগতিক একনায়করূপে। নিঃসঙ্গ একদেবতা ভালোবাসা চায় না ভক্তদের; সে চায় তার ভয়ে ভক্তরা কাঁপবে থরথর ক'রে, ভক্তরা হবে তার দাস।

আদিম মানুষ সৃষ্টি করেছিলো অজস্র পুরাণ। তারা যে-প্রপঞ্চেরই মুখোমুখি হয়েছে, তার সম্পর্কেই উপাখ্যান তৈরি করেছে–সত্য বের করতে পারে নি; এবং এমন অনেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু সম্পর্কে উপাখ্যান তৈরি করেছে, যার মুখোমুখি তারা কখনো হয় নি; তাই তার সত্য আবিষ্কারের কথাই ওঠে না। তারা তৈরি করেছে বিশ্ব ও মানুষ সৃষ্টির পুরাণ, বন্যার পুরাণ, স্বর্গের পুরাণ, নরকের পুরাণ, অগ্নির পুরাণ ও আরো অজস্র পুরাণ। সব পুরাণেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব; এবং এখনকার প্রচলিত ধর্মগুলো বিশ্বসৃষ্টির তত্ত্ব ধার করেছে বিভিন্ন পুরাণ থেকে। পুরাণের বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব যেহেতু ভুল বা অবৈজ্ঞানিক, তাই পৃথিবীর ধর্মগুলোর বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বও ভুল এবং অবৈজ্ঞানিক। আদিম মানুষের কাছে জল ছিলো এক মহাব্যাপার; তাই সৃষ্টিপুরাণগুলোতে সাধারণত পাওয়া যায় জলের এক মহাজগত, যার ভেতরে উদ্ভূত হয় স্বয়ম্ভূ স্রষ্টা, এবং কোনো শব্দ উচ্চারণ ক'রে, বা ইচ্ছাশক্তিতে, বা শারীরিক শ্রমে সৃষ্টি করে জগত বা পৃথিবী। সাধারণত সে অতল জলের পাতাল থেকে উদ্ধার করে পৃথিবীকে। ব্যাবিলনিরা মনে করতো বেল বা মেরোডাক স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে তিয়াওয়াথের শরীরের দু-টুকরো দিয়ে; পারসি জুরথুস্ত্রিরা বিশ্বাস করতো আহুর মাজদা বা ওরমুজদ হচ্ছে স্রষ্টা; গ্রিকরা বিশ্বাস করতো ইউরেনাস আর গ্যাআর মিলনে জন্মেছে সব কিছু; হিন্দুরা মনে করে বরাহ অবতাররূপে ব্রহ্মা জলের অতল থেকে দাঁতে গেঁথে উদ্ধার করে পৃথিবীকে, এবং শুরু করে সৃষ্টির কাজ; জাপানিরা মনে করে ইজানাগি আর ইজানামির মিলনে সৃষ্টি হয়েছে জগত; পেরুর ইনকাসরা বিশ্বাস করতো আতাগুজু সৃষ্টি করেছে সব কিছু। মানুষ সৃষ্টির পুরাণে সাধারণত পাওয়া যায় যে এক অলৌকিক সত্তা মানুষ সৃষ্টি করেছে কাদা বা ধুলো থেকে। সে অনেক সময় মানুষকে ভিজিয়ে নেয় নিজের রক্তে বা ঘামে, এবং তার ভেতর সঞ্চার করে প্রাণ বা নিশ্বাস। গ্রিকরা বিশ্বাস করতো প্রমেথিউস সৃষ্টি করেছে নরনারী; হিন্দুরা মনে করে ব্রহ্মা বা প্রজাপতি সৃষ্টি করেছে মানুষ; ব্রাজিলের আদিবাসীরা মনে করে অধোলোক থেকে মানুষ এসেছে; মধ্য আমেরিকার কিচেরা মনে করে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে হলদে আর শাদা ভুট্টা থেকে। এর সবগুলোই সম্পূর্ণ ভুল।

প্রাচীন ভারতিরা বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে নিরবধি বুনেছে কল্পনার জাল। *ঋগ্বেদ*-এর ঋষিরা কল্পনা করতে গিয়ে বিহ্বল হয়েছেন, দেখেছেন মহাশূন্যতা। তাঁরা বলেছেন, শুরুতে অসত্তাও ছিলো না, সত্তাও ছিলো না, ছিলো শুধু আঁধারে আবৃত জলরাশি। তারপর সেখানে জাগে কর্ম বা বাসনা। *ঋগ্বেদ* বলেছে :

> অস্তি ছিলো না, নাস্তিও ছিলো না, বায়ু ছিলো না, দূরে আকাশও ছিলো না; কে ছিলো সব কিছু আবৃত ক'রে? কার ওপর নির্ভর ক'রে ছিলো সব কিছু? অতল জলের ভেতরে? তখন মৃত্যু ছিলো না, অমৃত্যুও ছিলো না, ছিলো না রাত্রি ও দিনের বদল; শুধু একজনই নিশ্বাস নিচ্ছিলো ধীরে, তার বাইরে ছিলো না আর কিছু। কে জানে কখন উদ্ভূত হয়েছিলো এই মহাসৃষ্টি? তখন কোনো দেবতার জন্ম হয় নি, তাই কে প্রকাশ করতে পারে এ-সত্য? কখন জন্মেছে এ-জগত, আর তা স্বর্গীয় না অন্য কোনো হাতের রচিত, তা বলতে পারে শুধু স্বর্গে বিরাজমান এর প্রভু, যদি সম্ভব হয় তার পক্ষে।

ঋগ্বেদ-এর ঋষির অনিশ্চয়তাবোধে তৃপ্ত হয় নি যাযাবর আর্যরা, তারা আরো নিশ্চিত হ'তে চেয়েছে, এবং *ঋগ্বেদ*-এর *পুরুষসক্ত*-এ বলা হয়েছে :

> পুরুষের রয়েছে সহস্র মস্তক, সহস্র চোখ, সহস্র পদ। পৃথিবীর সব দিক জুড়ে দশ আঙুলের সমান ভূমিতে তিনি বিরাজ করেন। পুরুষ নিজেই সমগ্র বিশ্ব, যা ছিলো, এবং যা হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা আরো বলেছে যে দেবতারা খণ্ডিত করে পুরুষকে; তার মুখ থেকে জন্মে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে রাজন্য, উরু থেকে বৈশ্য, পা থেকে শূদ্র; তার মন থেকে জন্মে প্রভাত, চোখ থেকে সূর্য, মুখ থেকে ইন্দ্র আর অগ্নি ইত্যাদি, অর্থাৎ রাশিরাশি বাজে কথা। *সপ্তপথ ব্রাহ্মণ*-এ পাওয়া যায় যে 'ভূ' উচ্চারণ ক'রে প্রজাপতি সৃষ্টি করে পৃথিবী, 'ভূবহ্' উচ্চারণ ক'রে বায়ু, 'স্বহ্' উচ্চারণ ক'রে আকাশ; 'ভূ' ব'লে প্রজাপতি সৃষ্টি করে ব্রাহ্মণ, 'ভূবহ্' ব'লে ক্ষত্র ইত্যাদি। *তৈত্তিরিয় ব্রাহ্মণ*-এ আছে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেছে বিশ্ব, তারপর কী কী সৃষ্টি করেছে, তারও বর্ণনা আছে। হিন্দুদের পুরাণগুলোতে পাওয়া যায় সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার বিস্তৃত বিবরণ। যেমন, *বিষ্ণুপুরাণ*-এর মতে ব্রহ্মা আদিতে ছিলো পুরুষ বা চৈতন্য এবং কালরূপে, তারপর তাতে যুক্ত হয় আরো দুটি রূপ; এবং ব্রহ্মার চারটি সত্তা–প্রধান উপাদান, পুরুষ, ব্যক্ত বা দৃশ্যমান বস্তু, ও কালই বিশ্বসৃষ্টি, রক্ষা ও ধ্বংসের কারণ। এর সবই হচ্ছে কল্পনার দীর্ঘ জালবিস্তার।

ব্যাবিলনের সৃষ্টিতত্ত্বে আদিম দেবতা দুটি–আপসু ও তিয়াওয়াথ। তাদের পর সৃষ্টি হয় কয়েকটি নতুন দেবতা–আনু, এন-লিল, ও ইআ। তাদের আচরণ পছন্দ হয় না আপসু এবং তিয়াওয়াথের, তারা শাস্তি দিতে চায় নতুন দেবতাদের; কিন্তু পরাভূত হয় নতুন দেবতাদের কাছে। তিয়াওয়াথ দানব সৃষ্টি ক'রে নতুন দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যায়; কিন্তু নিহত হয় মেরোডাকের সাথে যুদ্ধে। তাকে দু-ভাগে কাটা হয়; তার দেহের একভাগ দিয়ে মেরোডাক সৃষ্টি করে আকাশ। মেরোডাক ভাগ করে ওপর আর নিচের জল, বাসস্থান তৈরি করে দেবতাদের, সৃষ্টি করে চাঁদতারাসূর্য, নির্দেশ করে কক্ষপথ। এক সময় তার শিরশ্ছেদ করা হয়, তার অস্থি আর রক্তে সৃষ্টি হয় মানুষ। এ হচ্ছে চমৎকার আদিম কল্পনা।

AMARBOI.COM

পুরোনো বাইবেল-এ আছে হিব্রুসৃষ্টিতত্ত্ব। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা পৃথিবীর তিনটি প্রধান ধর্ম বিশ্বাস করে এ-সৃষ্টিতত্ত্বে; অর্থাৎ পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ মানে এবং বিভ্রান্ত হয় এটি দিয়ে। বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্ব মৌলিক নয়, এর অনেকখানি ধার করা হয়েছে ব্যাবিলনি সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে; এবং এর নানা মিল রয়েছে হিন্দুসৃষ্টিতত্ত্বের সাথেও। *আদিপুস্তক*-এর 'জগৎ-সৃষ্টির বিবরণ'-এ বলা হয়েছে : 'পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিল, এবং অন্ধকার জলধির উপরে ছিল, আর ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে অবস্থিতি করিতেছিলেন।... পরে ঈশ্বর কহিলেন, জলের মধ্যে বিতান হউক, ও জলকে দুই ভাগে পৃথক করুক। ঈশ্বর এইভাবে বিতান করিয়া বিতানের উর্ধ্বস্থিত জল হইতে বিতানের অধঃস্থিত জল পৃথক করিলেন; তাহাতে সেইরূপ হইল। পরে ঈশ্বর বিতানের নাম আকাশমণ্ডল রাখিলেন।' বাইবেলের ঈশ্বর আদিম জলরাশিকে মঞ্চের সাহায্যে দু-ভাগ করে, যার ওপর স্থাপন করে গগনমণ্ডল। ব্যাবিলনি সৃষ্টিতত্ত্বের তিয়াওয়াথের লাশ দু-ভাগ করার সাথে মিল আছে এর। বাইবেলে আছে, 'পরে ঈশ্বর কহিলেন, দীপ্তি হউক; তাহাতে দীপ্তি হইল।' ব্যাবিলনি সৃষ্টিতত্ত্বে নেই এ-আলোবিকাশের কথা, তবে ব্যাবিলনি ঈশ্বর মেরোডাক নিজেই আলোর দেবতা।

ইরানি বা জুরথুস্ত্রি সৃষ্টিতত্ত্বে আহুর মাজ্‌দা বা ওরমুজ্‌দ্‌ স্রষ্টা ও শুভশক্তি। সে সৃষ্টি করেছে সব কিছু। সে অবশ্য বিশ্বের জন্যে বেশি দিন আয়ু ধার্য করে নি, করেছে বারো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাজার বছর। এটা আজকাল হাস্যকর মনে হয়, কেননা আজ আমরা অনন্ত মহাকালের ধারণা করতে পারি; আদিম মানুষের কোনো অসীম অনন্ততার বোধ ছিলো না; তখন বারো হাজার বছরই ছিলো মহাকাল, আর হয়তো পাঁচশো মাইলই ছিলো অনন্ত অসীম। ইরানি সৃষ্টিতত্ত্বে ছিলো একটি শয়তানও, যার নাম আহ্‌রিমান। আহ্‌রিমান আগে ওরমুজ্‌দের কথা জানতো না, একদিন ওরমুজ্‌দের শরীর থেকে বিচ্ছুরিত জ্যোতি দেখে সে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তিন হাজার বছরে ওরমুজ্‌দ সৃষ্টি করে বিশ্ব, সূর্যচন্দ্রনক্ষত্র, উদ্ভিদ, প্রাণী, ও মানুষ। তবে আহ্‌রিমান ওরমুজ্‌দের প্রতিটি শুভ সৃষ্টির বিরুদ্ধে অশুভ সৃষ্টির অভিযান চালিয়ে যেতে থাকে; সে হয় অশুভর ঈশ্বর। তিন হাজার বছর ধ'রে চলে শুভ-অশুভর যুদ্ধ; তবে জুরথুস্ত্রের জন্মের সাথে জয়ী হয় শুভশক্তি। ইরানি সৃষ্টিতত্ত্বে শুভ-অশুভর বিরোধ খুব বড়ো ব্যাপার, যা নেই হিন্দু সৃষ্টিতত্ত্বে; কিন্তু প্রবলভাবে রয়েছে হিব্রু আর আরব সৃষ্টিতত্ত্বে। তাদের গোপন চিন্তায় ঈশ্বর একটি নয়, দুটি; একটি শুভর, আরেকটি অশুভর।

পুরাণের একটি প্রধান কল্পনা হচ্ছে স্বর্গ ও নরক : মৃত্যুর পর পুণ্যবানদের জন্যে পুরস্কার ও পাপীদের জন্যে শাস্তির এলাকা। মৃত্যুর পর পুণ্যাত্মারা চিরসুখে বাস করবে, জীবনে পুজো করেছে যে-দেবতাদের পাবে তাদের সঙ্গ, এবং পাপীরা উৎপীড়িত হবে, এ-ধারণা কিছুটা অগ্রসর প্রায়-সব পুরাণেই পাওয়া যায়। মিশরি, ভারতি, ব্যাবিলনি, ও হিব্রু পুরাণে স্বর্গ আর নরক দখল ক'রে আছে বেশ বড়ো স্থান। কিন্তু গ্রিক, রোমীয়, স্কেন্ডিনেভীয় পুরাণে স্বর্গনরক নেই, আছে শুধু মৃতদের জন্যে এক বিশেষ স্থান, অন্যলোক– *হেডিস*। বৌদ্ধদেরও কোনো স্বর্গনরক নেই। কেনো একদল মানুষ স্বর্গনরক কল্পনা করেছে, আরেকদল করে নি? যারা স্বর্গনরক কল্পনা করেছে, তাদের নৈতিকতা-বোধ কি উন্নত তাদের থেকে, যারা এমন কল্পনা করে নি? ধর্মীয় প্রচার আজকাল এতো ব্যাপক, এবং স্বর্গনরক এতো বেশি পরিচিত যে অধিকাংশ মানুষই মনে করবে স্বর্গনরক যারা কল্পনা করেছে, তারা উন্নত নৈতিকতাবোধসম্পন্ন; আর যারা স্বর্গনরক কল্পনা করে নি, তারা নৈতিকতাবোধহীন। গভীরভাবে বিবেচনা করলে বুঝতে পারি স্বর্গনরকের কল্পনাকারীরা স্থূল, নিম্ন নৈতিকতাবোধসম্পন্ন; তারা উঠতে পারে নি পার্থিব কামনাবাসনা, লালসাভীতির ওপরে, পারে নি মৃত্যুর মতো পরম নির্মম সত্যকে মেনে নিতে; তাই তৈরি করেছে মিথ্যে স্বর্গনরক। যারা স্বর্গনরকের কথা ভাবে নি, ভেবেছে শুধু অনিবার্য পরিণাম মৃত্যুর কথা, মনকে মিথ্যেয় ভোলায় নি, মেনে নিয়েছে সত্যকে, তাদের নৈতিক মান অনেক উন্নত। স্বর্গনরক সম্পূর্ণ বাজে কথা। রাসেল বলেছেন :

> আমার মনে হয় ক্রাইস্টের নৈতিক চরিত্রে রয়েছে একটি বড়ো ত্রুটি; আর তা হচ্ছে যে তিনি বিশ্বাস করতেন নরকে। আমি মনে করি না যে গভীরভাবে মানবিক কোনো ব্যক্তি চিরশাস্তিতে বিশ্বাস করতে পারেন। সুসমাচারে ক্রাইস্টকে যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে তাতে এটা স্পষ্ট যে তিনি চিরশাস্তিতে বিশ্বাস করতেন। তাঁর কথায় যারা বিশ্বাস করে না তাদের বিরুদ্ধে একটা প্রতিহিংসামূলক ক্রোধ ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে সব সময়ই দেখা যায়।

টিউটোনিক বা জর্মনরা মনে করতো মৃতরা যায় লোকির কন্যা *হেল*-এর (Hel, এখনকার Hell) জগতে। *হেল* শব্দটি এসেছে যে-ধাতু থেকে, তার অর্থ 'গোপন করা';

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই হেলের অর্থ 'গোপন জগত, গোপনবাসের জগত'; অর্থাৎ মৃতদের জগত। পরে খ্রিস্টানরা হেলকে ক'রে তোলে শাস্তির জগত-নরক। হেল মূলত শাস্তির জগত বা নরক ছিলো না, ছিলো বেশ সুখকর স্থান; পরে যখন *ভালহাল্লা*, বীরদের স্বর্গ, ধারণা দেখা দেয়, হেল হয়ে ওঠে মৃত্যুর পর তাদের বাসস্থান, যারা তরবারির আঘাতে মরে নি। এভাবে টিউটোনিক মৃতরা দুভাগে, মৃত্যুর রীতি অনুসারে, ভাগ হয়ে যায়; যেমন ঘটে মেক্সিকোতো, যেখানে মৃত বীরেরা যায় সূর্যদেবতার প্রাসাদে, যারা মরে বজ্রপাতে বা প্লীহায়, তারা যায় জলদেবতার স্বর্গে, আর সাধারণেরা পচে মিকটলানের মৃত্যুগুহায়। টিউটোনিকদের ভালহাল্লা এক চমৎকার স্বর্গ; সেখানে মৃত বীরেরা দেবতাদের সাথে ভোজে আর দ্বন্দ্বে যাপন করে সময়। তবে এ-স্বর্গটি তৈরি একটি গাছের গুঁড়ির চারদিক ঘিরে। ওই গাছের পাতায় চ'রে বেড়ায় ইকথিরমির নামে এক হরিণ, আর হিড্রুন নামে এক ছাগল, যাদের বাঁট থেকে অনিঃশেষ ঝরে সুরার ধারা, যা পান ক'রে বীরেরা মেটায় তৃষ্ণা। তবে ওই স্বর্গে তোরণের সংখ্যা মাত্র পাঁচশো চল্লিশটি, যা দিয়ে একবারে ঢুকতে পারে মাত্র আটশো যোদ্ধা। বীরদের জন্যে একটি বিশেষ স্বর্গ কেনো? বোঝা যায় এটি সেনাগোত্রের কল্পিত স্বর্গ; তারা শুধু পৃথিবীতে ঐশ্বর্যে থেকেই তৃপ্তি পায় নি, মৃত্যুর পরও নিজেদের জন্যে একটি স্বর্গ তৈরি করেছে।

এসিরীয় বা ব্যাবিলনি পুরাণে মৃতরা থাকে শূন্যতা ও ঘোরে পরিপূর্ণ এক এলাকায়, যেখান থেকে কোনো প্রত্যাবর্তন নেই। কাদা আর ধুলো তার অধিবাসীদের খাদ্য, অন্ধকার উত্তরাধিকার। সেটি এমন গৃহ, যাতে নেই কোনো প্রস্থানপথ। ওই গৃহের প্রবেশপথে থাকে এক প্রহরী, যে প্রবেশকারীর থেকে গ্রহণ করে গৃহরানীর জন্যে অর্ঘ্য; এবং ভাগ্যহত প্রবেশকারীর ওপর ছড়িয়ে দেয় মন্ত্রজাল, একের পর এক সাতটি তোরণের ভেতর দিয়ে নিয়ে যায় তাকে, এবং হরণ করে তার পার্থিব সব অধিকার। এ-মৃত্যুলোকের রানীর নাম আল্লাতু, যে বসে রত্নখচিত সিংহাসনে। আল্লাতু প্রবেশকারীকে শাস্তি দিতে পারে, এবং পারে ক্ষমা করতে। এ-পুরাণে মৃত্যুলোক ও জীবনলোকের মধ্যে প্রবাহিত হয় একটি নদী, মৃত্যুর নদী;-এর কোনো আকার নেই, এটি পূর্ণ অসহ্য শীত ও বিষাদাচ্ছন্ন অন্ধকারে। এখানে অশরীরী আত্মারা নিরন্তর খুঁজতে থাকে বেরেনোর পথ। এ-মৃত্যুলোকে আছে একটি বিচারবিভাগও। ওই বিচারালয়ের দিকে যাওয়ার পথ পূর্ণ সব ধরনের বিপদ ও বিভীষিকায়, তবে মৃতদের অবশ্যই যেতে হয় ওই পথ দিয়ে। এ-মৃত্যুলোকে পুণ্যাত্মাদের জন্যেও আছে একটি এলাকা; বিচারের পর যারা পুণ্যাত্মা ব'লে বিবেচিত হয়, তারা বাস করে সেখানে। প্রশান্ত রুপোলি আকাশের নিচে, স্বচ্ছসলিলা নদীর তীরে, সেখানে বাস করে পুণ্যবান প্রাচীন প্রেরিতপুরুষেরা।

ইহুদিদের নরকের নাম *জেহেন্না*, যার থেকে এসেছে মুসলমানদের *জাহান্নাম*। জেহেন্নায় পাপীদের দেয়া হয় শারীরিক ও আত্মিক দু-ধরনেরই শাস্তি। এখানে চিরশাস্তির মধ্যে থাকে অন্য জাতির মানুষেরা; অবিশ্বাসী ইহুদিরাও থাকে, তবে এটা তাদের জন্যে পাপমোচনের এলাকা; পাপমুক্তির পর তারাও যায় স্বর্গে। *শিওল* নামেও আছে একটি ইহুদি মৃত্যুলোক, যেটি একান্তভাবেই হিব্রু বা ইহুদি। হিব্রুরা জেহেন্না ধারণাটি ধার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিলো আক্কাদীয় *জি-উমুনা* থেকে। শিওল মৃত্যুর পর পুণ্যবান ও পাপী উভয়েরই বাসস্থান; গ্রিক হেডিসের মতো জীবন যেখানে ছায়াচ্ছন্ন ও অশরীরী। *যিশাইয়*তে (১৪, ৯-১১) আছে :

> অধঃস্থ নরক তোমার জন্য বিচলিত হয়ে তোমার আগমনে উপস্থিত হয় তোমার সামনে; তোমার জন্যে সচেতন ক'রে তোলে মৃতদের, এমনকি পৃথিবীর সব প্রধানদের; এ সিংহাসন থেকে তুলে এনেছে সব জাতির রাজাদের। তারা সবাই তোমাকে বলে, তুমিও কি দুর্বল হ'লে আমাদের মতো? তুমিও কি হ'লে আমাদের সমান? কবরে নামানো হলো তোমার আড়ম্বর, ও তোমার নেবলযন্ত্রের মধুর বাদ্য : তোমার নিচে পাতা রয়েছে কীট, এবং তোমাকে ঢেকেছে কৃমিরা।

ব্যাবিলনের দাসত্বে থাকার পর ব্যাবিলনি প্রভাবে ইহুদিরা শিওলকে সাধারণ শাস্তির, এবং জেহেন্নাকে দণ্ড ও পীড়নের বিশেষ এলাকায় পরিণত করে।

পুরাণ ও ধর্মের এ-সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে বোঝা যায়, কোনো ধর্মই কোনো ঈশ্বর পাঠান নি; মানুষই ভুল কল্পনার পর ভুল কল্পনা ক'রে সৃষ্টি করেছে এগুলো। ধর্মের বইগুলো ঋণী মানুষের আদিম পুরাণগুলোর কাছে। মানুষ চিরকাল ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে নানা প্রপঞ্চ, কল্পনা করেছে বহু কিছু; মানুষ সত্য বলতে চেয়েছে, এবং মিথ্যা বলেছে প্রচুর, এবং মানুষ মিথ্যায় যতো বিশ্বাস করেছে, সত্যে ততো বিশ্বাস করে নি; এখনো করে না। মিথ্যার বিহ্বলকর ও সুখকর শক্তি রয়েছে, যা নেই সত্যের। ধর্মের বইগুলো সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, যদিও বারবার নিজেদের সত্য ব'লে দাবি করে, এবং সত্যনিষ্ঠদের ভয় দেখায়। এগুলো প্রতিষ্ঠিত আদিম মানুষের কল্পনা ও পরবর্তীদের সুপরিকল্পিত মিথ্যার ওপর। মানুষ কতোটা মিথ্যা বলতে ও বিশ্বাস করতে পারে, তার অসামান্য উদাহরণ জেসাস বা খ্রিস্ট। জেসাস মানুষের শ্রেষ্ঠ কল্পচরিত্র; গত দু-শো বছরের বাইবেলবিজ্ঞানীরা, যাঁদের অনেকেই ধার্মিক ও পুরোহিত, প্রমাণ করেছেন যে জেসাস নামে কেউ ছিলো না। কিন্তু জেসাস সৃষ্টি হলো কীভাবে, এবং হয়ে উঠলো একটি প্রধান ধর্মের প্রবর্তক? জেসাসকে সৃষ্টি করা, তাকে ঘিরে পুরাণ, ও একটি নতুন ধর্ম বানানোর সমস্ত কৃতিত্ব খ্রিস্টান সুসমাচারপ্রণেতাদের। ক্রাইস্ট এক কিংবদন্তি বা পুরাণ। জেসাসসৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করার জন্যে ব্রুনো বাউআর, জে এম রবার্টসন, ভ্যান ডেন বার্গ ভ্যান এইসিংগা, আলবার্ট কালথোফ, গাই ফাউ, প্রোসপার আলফারিক, ডব্লিউ বি স্মিথ, জি এ ওয়েল্‌স্‌ প্রমুখ তৈরি করেছেন একটি তত্ত্ব, যার নাম *খ্রিস্টপুরাণ*।

ডেভিড স্ট্রাউস *লাইফ অফ জেসাস ক্রিটিক্যালি এক্সামিন্ড*-এ (১৮৩৫) বলেছেন *গসপেল* বা সুসমাচারগুলো জেসাসের ঐতিহাসিক জীবনী নয়; জেসাসের বস্তুনিষ্ঠ জীবনী লেখা সুসমাচারলেখকদের উদ্দেশ্য ছিলো না; তাঁরা চেয়েছিলেন ধর্মীয় পুরাণ লিখে তাঁদের প্রবর্তিত ধর্মে মানুষদের দীক্ষিত করতে। স্ট্রাউসের মূলকথা হচ্ছে *নতুন টেস্টামেন্ট*-এর গল্পগুলো সত্য নয়; *মিসাইআ* বা ত্রাতার আগমন সম্পর্কে ইহুদিরা দীর্ঘকাল ধ'রে যে-প্রত্যাশা ক'রে আসছিলো, গল্পগুলো তারই গল্পায়ন। ইহুদিরা বহুকাল ধ'রে প্রত্যাশা ক'রে আসছিলো একজন ত্রাতা আসবেন, কিন্তু তিনি আসছিলেন না। তাঁর আগমন সম্পর্কে *পুরোনো টেস্টামেন্ট* -এ আছে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী; সুসমাচারলেখকেরা ওই ভবিষ্যদ্বাণীগুলোকে সাজিয়ে তৈরি ক'রে ফেলেছিলেন জেসাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রাইস্টকে। *মিসাইআ* শব্দটি এসেছে হিব্রু *মশিআহ্* থেকে, যার অর্থ 'তৈলাক্ত ব্যক্তি'; এ-শব্দটি গ্রিকে হয় *খ্রিস্টোস*, যার থেকে এসেছে ইংরেজি *ক্রাইস্ট*, এবং বাঙলা *খ্রিস্ট*। রাজা এবং পুরোহিতদের শরীরে, তাদের কর্ম শুরুর সময়, তেলমাখানোর রীতি ছিলো ইহুদিদের; তাই তাদের বলা হতো মশিআহ্; পরে এর অর্থ হয় 'ত্রাতা'। ইহুদিরা অবশ্য প্রত্যাশা করছিলো রাজকীয় ত্রাতার; কিন্তু সুসমাচারলেখকেরা রাজকীয় ত্রাতাকে বাদ দিয়ে সৃষ্টি করেন আধ্যাত্মিক রাজা, যে বলে, 'অনুতপ্ত হও, কেননা স্বর্গের রাজত্ব আসন্ন', এবং 'সময় হয়ে গেছে, এবং ঈশ্বরের রাজত্ব আসন্ন; অনুতপ্ত হও, এবং সুসমাচারে বিশ্বাস করো।' ঈশ্বর কোনো ত্রাতা পাঠান নি, কোনো ত্রাতা আসেন নি, ক্রাইস্ট সুসমাচারলেখকদের সৃষ্টি। তাঁরা *পুরোনো টেস্টামেন্ট* থেকে জানতেন ত্রাতা আসবেন; এ-বইতে বিশদভাবেই ব'লে দেয়া হয়েছে ত্রাতা কীভাবে আসবেন, কার গর্ভে জন্ম নেবেন, কী করবেন, কী বলবেন। এসব অবলম্বন ক'রে তাঁরা জেসাসকে তৈরি করেন; ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে তাঁকে জন্ম দেন, তাঁকে দিয়ে কাজ করান, এবং তাঁকে দিয়ে কথা বলান। সুসমাচারগুলো উপন্যাসের থেকে সত্য নয়, জেসাসও সত্য নন উপন্যাসের নায়কের থেকে।

পুরোনো টেস্টামেন্ট ভ'রেই রয়েছে *নবি*রা, এর পাতায় পাতায় নবি পাওয়া যায়; যেমন ওই অঞ্চলের পথে পথে নবি পাওয়া যেতো। ওই নবিদের অনেকেই ছিলো শস্তা জ্যোতিষ। ইংরেজি *প্রফেট* শব্দটি এসেছে একটি গ্রিক শব্দ থেকে, যার অর্থ 'যে অন্যের হয়ে কথা বলে'। শব্দটি হিব্রুতে হচ্ছে *নবি* বা *নভি*। মোজেস বা মুসা তোতলা ছিলেন, ঠিক মতো কথা বলতে পারতেন না; জিহোভার ডাকে সাড়া দিয়ে নবি হওয়ার ইচ্ছেও তাঁর ছিলো না, অনিচ্ছায়ই তিনি নবি হয়েছিলেন। জিহোভা তাঁকে বলেছে, 'আমি তোমাকে ফারাওদের ঈশ্বর করছি, আর তোমার ভাই আরোন (অর্থাৎ হারুন) হবে তোমার নবি।' *নবি* শব্দটি এসেছে *নাবু* থেকে, যার অর্থ 'ডাকা, ঘোষণা করা'। তাই 'নবি'র অর্থ হ'তে পারে 'ঘোষণাকারী, আহ্বানকারী', বা হ'তে পারে 'যাকে আহ্বান করা হয়েছে।' বাইবেলে দু-অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। বাইবেলে জিহোভা বলেছে, 'আমি তোমার পিতার ঈশ্বর, আব্রাহামের ঈশ্বর, আইজাকের ঈশ্বর, এবং জ্যাকবের ঈশ্বর...এসো, আমি তোমাকে ফারাওদের কাছে পাঠাবো যাতে তুমি আমার মানব, ইসরাইলের পুত্রদের, মিশর থেকে উদ্ধার ক'রে আনতে পারো।' শব্দটির আরেক অর্থ *পাঠানো*, তাই নবি হচ্ছে *প্রেরিতপুরুষ*। সুসমাচারলেখকেরা পুরোনো বাইবেলের নবিদের উপাখ্যান ভালো ক'রেই জানতেন। বাউআর বলেছেন, তাঁরা পুরোনো বাইবেলের নবিদের আদলে তৈরি করেছিলেন জেসাসকে, যিনি কখনো ছিলেন না। প্রথম শতকে ইহুদি আর গ্রিক-রোমীয় চিন্তাভাবনা থেকে উদ্ভব ঘটেছিলো খ্রিস্টধর্মের। সে-সময়ের অনেকে দাবি করেছেন যে জেসাসকে তৈরি করা হয়েছে তাইআনার অ্যাপোলোনিয়াসের আদলে। অ্যাপোলোনিয়াস ছিলেন একজন নবপিথাগোরীয় শিক্ষক, যিনি জন্ম নিয়েছিলেন খ্রিস্টীয় শতকের কিছু আগে, যিনি ভ্রাম্যমাণ কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ জীবন যাপন করতেন, নিজেকে দাবি করতেন অলৌকিক শক্তির অধিকারী ব'লে, এবং নিরো ও ডোমিতিয়ানের রাজত্বকালে বাস করতেন নিয়ত মৃত্যুভীতির মধ্যে। তাঁর অনুসারীরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁকে বলতো ঈশ্বরের পুত্র।

আদিখ্রিস্টানরা জেসাসের মুখে অনেক কথা বসিয়েছে, ওসব কথা জেসাস কখনো বলেন নি; কেননা তিনি কখনো ছিলেন না। ওই কথাগুলো জেসাসের কথা নয়, ওগুলো খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস, এবং আশার প্রকাশ। তারা যা দেখছিলো, যা বিশ্বাস করছিলো, যে-প্রত্যাশা পোষণ করছিলো, তাই তারা ব্যক্ত করেছে জেসাসের কাজে ও উক্তিতে। ইহুদিরা বহুকাল আশায় আশায় ছিলো যে ত্রাতা আসবেন, মুক্তি ঘটবে তাদের; আর প্রত্যেক প্রজন্মই মনে করেছে তাদের সময়েই আসবেন মুক্তিদাতা, পালিত হবে প্রাচীন প্রতিশ্রুতি। প্রথম দিকের খ্রিস্টানরা পুরোনো বাইবেল থেকে জানতো যে ত্রাতার আগমনের আগে পৃথিবীতে ফিরে আসবে এলিজা। যখন তারা মনে করে যে ব্যাপটিস্ট জনই হচ্ছে পৃথিবীতে-ফিরে-আসা এলিজা, তখন তারা বিশ্বাস করে যে ত্রাতার আগমনের আর দেরি নেই; এবং তৈরি ক'রে ফেলে জেসাসকে, যে জনকে ডাকে এলিজা নামে। জেসাসের জন্মের ব্যাপারটিকে তারা পরিণত করে এক অলৌকিক ঘটনায়। পুরুষসংসর্গহীন কুমারী মাতার গর্ভে সন্তান জন্ম অসম্ভব হ'লেও তা কল্পনা করা অসম্ভব নয়; ওই সময়ে গ্রিক আর রোমসাম্রাজ্য ভ'রেই প্রচলিত ছিলো কুমারী মাতার গর্ভে সন্তান জন্মের কিংবদন্তি। গ্রিক পুরাণে কুমারী ড্যানার গর্ভে জন্ম নেয় পারসেউস, তার মা ডানা গর্ভবতী হয় স্বর্ণবর্ষণের ফলে; আবার কুমারী নানা গর্ভবতী হয় ডালিম খেয়ে, এবং জন্ম দেয় আত্তিসকে। তখন অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিও–পিথাগোরাস, প্লাতো, আলেকজান্ডার, অগাস্টাস–কুমারী মাতার গর্ভে বা দেবতাদের হস্তক্ষেপে জন্ম নিয়েছেন ব'লে বিশ্বাস করা হতো। আদিখ্রিস্টানরাও যখন জেসাসকে সৃষ্টি করে, তাঁর ঐশ্বরিকতা প্রমাণ করার জন্যে তাঁকে জন্ম দেয় কুমারী মায়ের গর্ভে। অনেকে মনে করেন কুমারী মাতার কিংবদন্তিটি জন্মেছে পুরানো বাইবেলের ত্রাতার জন্মসংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর একটি শব্দ ভুল বোঝার ফলে। পুরোনো বাইবেলে (*যিশাইয়,* ৭:১৪) একটি ভবিষ্যদ্বাণী আছে :

> তাই প্রভু তোমাদের এক চিহ্ন দেবেন। দেখো এক *কন্যা* গর্ভবতী হয়ে পুত্র জন্ম দেবে, ও তার নাম ইম্মানুয়েল রাখবে।

খ্রিস্টানরা এখানে দেখতে পায় ত্রাতার আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী। তারা ঐশ্বরিক উন্মাদনায় ভুল অনুবাদ করে 'কন্যা' শব্দটির। পুরোনো বাইবেলে আছে *হালমাহ্*, যার অর্থ 'তরুণী', বাঙলায় বাইবেল অনুবাদকেরা যার অর্থ করেন 'কন্যা'। হিব্রুতে *বেথুলা* হচ্ছে 'কুমারী'। খ্রিস্টান ধর্মপ্রবর্তকেরা গ্রিকে *হালমাহ্*র অনুবাদ করেন *পার্থেনোস* অর্থাৎ কুমারী। তাই ত্রাতার যেখানে জন্ম নেয়ার কথা ছিলো তরুণী মায়ের গর্ভে, সেখানে খ্রিস্টানরা তাকে জন্ম দেয় কুমারী মায়ের গর্ভে। জেসাস এক কিংবদন্তি; সত্য নন, কিন্তু সত্য ব'লে পূজিত। ধর্ম এমনই সব সত্যের সমষ্টি।

জেসাসের গল্প বলেছেন শুধু সুসমাচারলেখকেরা, সে-সময়ের আর কেউ বলেন নি। প্রথম শতকে রোমসাম্রাজ্যে অন্তত ষাটজন ঐতিহাসিক লিখছিলেন ইতিহাস, তাঁরা কেউ জেসাসের কথা লেখেন নি। জেসাস ঐতিহাসিক ব্যক্তি হ'লে তাঁদের কেউ না কেউ জেসাসের উল্লেখ করতেন; কিন্তু উল্লেখ করেন নি, কেননা তাঁরা ইতিহাস লিখছিলেন, কিংবদন্তি তৈরি করছিলেন না। এখন এটা স্বীকৃত যে সুসমাচারগুলো–*মথি, মার্ক, লুক,*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যোহন–যেগুলো ভিত্তি ক'রে গ'ড়ে উঠেছে খ্রিস্টধর্ম–জেসাসের শিষ্যদের লেখা নয়; সুসমাচারপ্রণেতারা জেসাসকে দেখেন নি। সুসমাচারগুলো লেখা হয়েছিলো জেসাসের কথিত ক্রুশকাঠে প্রাণ দেয়ার চল্লিশ থেকে আশি বছর পরে, লিখেছিলেন নামপরিচয়হীন লেখকেরা। এগুলোর মধ্যে মথি, মার্ক, লুকের বিষয় একই; ভাষাও অনেকটা এক। সম্ভবত মার্কই সবচেয়ে পুরোনো, আর অন্যগুলো এটির নকল। তাই এগুলোতে যে-কাহিনী ও কথা আছে, তা কোনো বাস্তব মানুষের নয়। ঐতিহাসিক বই নয় এগুলো; এগুলো সুসমাচারপ্রণেতাদের বিশ্বাস অনুসারে লেখা জেসাসপুরাণ।

খ্রিস্টধর্মের প্রবর্তকেরা পুরোনো বাইবেলের শূন্য ভবিষ্যদ্বাণী ও নিজেদের ভুল বিশ্বাস অনুসারে সৃষ্টি করেছিলেন এক ত্রাতাকে; কিন্তু মিথ্যায় তাঁদের আত্মা সম্ভবত শান্তি পায় নি, তাই *নতুন বাইবেল* ভ'রেই পাওয়া যায় জেসাসের দ্বিতীয় আগমনের প্রত্যাশা। ইয়েট্স্ খ্রিস্টানদের এ-প্রত্যাশার বেদনা মর্মেমর্মে বোধ ক'রে, বিশশতকে, একটি কবিতা লিখেছেন 'দ্বিতীয় আগমন' নামে, যাতে জেসাস নয়, একটি নরমুণ্ডধারী বিকট পশু বেথলেহেমের দিকে এগোয় জন্ম নেয়ার জন্যে। নতুন অর্থাৎ খ্রিস্টানদের বাইবেল ভ'রেই ছড়ানো 'জেসাস শিগগিরই আসবেন', 'জেসাসের আগমন আসন্ন' ধরনের প্রত্যাশা; কিন্তু জেসাস প্রথমবার আসেন নি, দ্বিতীয়বারও আসেন নি, কখনো আসবেন না। মথির মতে জেসাস বলেছেন, 'সত্যি, আমি তোমাদের বলছি, এই প্রজন্মের কাল কেটে যাওয়ার আগেই ঘটবে এসব ঘটনা।' আশার পর আশা আর বহু ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয়ে গেছে, জেসাস আসেন নি। তাহলে কি জেসাসের কথা সত্য নয়? সুসমাচার-লেখকেরা অদম্য, তাঁরা ঈশ্বরের বাণীকে মিথ্যে হ'তে দিতে পারেন না; তাই তাঁরা ব্যাখ্যা করেন যে ঈশ্বরের সময় মানুষের সময়ের মতো নয়। তাঁরা বলেন, ঈশ্বরের 'একদিন সহস্র বছরের সমান, এবং সহস্র বছর একদিনের সমান।' বলা যে হয়েছে 'শিগগির'; প্রশ্ন হচ্ছে কতোটা 'শিগগির' হচ্ছে 'শিগগির'? কেনো বিলম্ব হচ্ছে? ঈশ্বরের একদিন সহস্র বছর আর সহস্র বছর একদিন, এ-হিশেব খুব উৎসাহব্যঞ্জক নয় মানুষের জন্যে; মানুষ আশাবাদী, কিন্তু তারা আশায় আশায় অসুস্থ হয়ে পড়ে, এবং সহস্র বছর বাঁচে না। ধার্মিকরা মত বদলাতে খুবই অভ্যস্ত, তাঁরা নতুন নতুন ব্যাখ্যা দিতে লজ্জা পান না; এবং ঈশ্বরের বাণী থেকে সব সময়ই সুবিধামতো তাৎপর্য বের করতে পারেন। তাই পরে 'জেসাস শিগগিরই আসবেন' থেকে 'শিগগির' বাদ দেয়া হয়; বলা হয় 'জেসাস আসবেন।' দ্বিতীয় আর তৃতীয় শতকের খ্রিস্টান পুরোহিতেরা মনে করতেন জেসাস শিগগিরই এসে হাজার বছরের জন্যে স্থাপন করবেন তাঁর সাম্রাজ্য। কিন্তু তাঁর দেখা নেই। কনস্ট্যান্টিন (২৮৮-৩৩৭) যখন খ্রিস্টধর্মকে স্বীকৃতি দেয়, তখন এক পাদ্রি জেসাসের সহস্র বছরের শাসনের এক রূপক ব্যাখ্যা দেন। তাঁর মতে এ-স্বীকৃতিই জেসাসের রাজত্বের শুরু; এর সমাপ্তি ঘটবে জেসাসের পুনরাগমনে। খ্রিষ্টানরা জেসাসের ফিরে আসার আশা তখন হাজার বছরের জন্যে স্থগিত ক'রে দেয়, কিন্তু ১০০০ অব্দের কাছাকাছি এসে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। ক্রাইস্ট ফেরেন নি; তাই ব্যর্থ প্রত্যাশার বেদনা থেকে জন্ম নেয় আরেক নতুন আশা। কনস্ট্যান্টিন ৩১২ অব্দে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলো, তারা ওই বছরটিকে সহস্রকের সূচনা ধ'রে ১৩১২র দিকে ক্রাইস্টের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুনরাগমনের প্রত্যাশায় থাকে। তারপরও ক্রাইস্ট আসেন না; সময় আসে, আর চ'লে যায়; তখন আবার দিতে হয় জোড়াতালি। ষোলোশতকের খ্রিস্টান সংস্কারকেরা পোপতন্ত্রকে, রোমীয় ক্যাথলিক গির্জার স্তরক্রমকে, শনাক্ত করে শয়তান ব'লে। তারা বলে যে তারা বাস করছে পবিত্র সহস্রকের পরে, যখন পোপতন্ত্ররূপী শয়তান ছাড়া পেয়ে ক'রে চলছে অবাধ শয়তানি। আরেকদল শার্লেমেনের রাজত্বের সূচনাকে (৮০০ অব্দ) ধরে পবিত্র সহস্রকের শুরু হিশেবে, এবং অপেক্ষায় থাকে ক্রাইস্টের। তারা চিরকাল আশা করতে থাকবে, কিন্তু ক্রাইস্ট ফিরবেন না; কেননা তিনি কখনো ছিলেন না, আসেন নি।

আধুনিক পৃথিবীতে আদিম ব্যাপার হচ্ছে ধর্ম। পৃথিবী অনেক এগিয়েছে, বিকাশ ঘটেছে জ্ঞানবিজ্ঞানের, তবে অধিকাংশ মানুষের মনের আদিমতা কাটে নি; তারা লোভ-ভয়-অপবিশ্বাসের মধ্যে বাস ক'রেই স্বস্তি পাচ্ছে। ধর্ম রাজনীতিও; পৃথিবী জুড়ে ক্ষমতাগৃধ্নু দুষ্ট রাজনীতিকদের বড়ো অস্ত্র হয়ে উঠেছে ধর্ম। তারা নিজেরা ধর্মে বিশেষ বিশ্বাস করে না, তাদের জীবন যদিও অধার্মিক, তবু তারা ক্ষমতার জন্যে উত্তেজিত ক'রে তোলে সাধারণ মানুষের লোভ-ভয়-অপবিশ্বাসকে। মানুষ ধার্মিক হয়ে জন্ম নেয় না, যদিও অনেক সময় রটানো হয় যে কেউ কেউ মায়ের গর্ভ থেকেই ধর্মগ্রন্থ মুখস্থ ক'রে এসেছে; অধিকাংশ মানুষ সাধারণত ধর্মকে পাত্তা দেয় না। ধর্ম এতো দিনে লোপ পেয়ে যেতো যদি না চারপাশে সারাক্ষণ সক্রিয় থাকতো ধর্মের রক্ষীবাহিনী। প্রতিটি ধর্ম সৃষ্টি করে তার সুবিধাভোগী রক্ষীবাহিনী; কখনো এবং কোথাও ওই বাহিনী অত্যন্ত হিংস্র, কখনো কোথাও মৃদু। পরিবার, পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, মসজিদ-মন্দির-গির্জা-সিনেগগ, উৎসব, পুরোহিত-মোল্লা-রাবাই, বিদ্যালয়-পাঠ্যপুস্তক, সমাজ-রাষ্ট্র সবই কাজ করে ধর্মের রক্ষীবাহিনীরূপে। এরা সব সময় চোখ রাখে যাতে কেউ ধর্মের বাইরে যেতে না পারে, অর্থাৎ তাদের ক্ষমতাকে অস্বীকার করতে না পারে। আমাদের দেশে এদের আচরণ মৃদু, কিন্তু ক্রমশ হিংস্র হয়ে উঠছে; এবং ইরানে, সৌদি আরবে, পাকিস্থানে হিংস্র। আমাদের দেশেও ধর্মের বাইরে যাওয়া কঠিন। বিদ্যালয়ে ভর্তি হ'তে, চাকুরির জন্যে আবেদন করতে, এবং তুচ্ছ নানা কাজ করতে গেলে ধর্মের ঘর পূরণ করতে হয়; যারা ধর্মে বিশ্বাস করে না, তারাও রক্ষীবাহিনীর গোপন ফাঁদের বাইরে যেতে পারে না। ধর্ম টিকে আছে এ-রক্ষীবাহিনীর সক্রিয়তায়। রক্ষীবাহিনীটি ধর্মের সুবিধাভোগী বাহিনী; ধর্ম থেকে যতোটা সুবিধা তোলা যায়, তারা তোলে, এবং ধর্মকে ব্যবহার করে নিজেদের আগ্নেয়াস্ত্র হিশেবে, যা গর্জে উঠতে পারে যখন তখন। আমাদের দেশে কেউ চুপচাপ ধর্মের বাইরে থাকতে পারে, পালন নাও করতে পারে ধর্মের বিধিবিধান, কিন্তু সে প্রকাশ্যে ধর্মের সমালোচনা করতে পারে না, লিখতে পারে না। ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলার অধিকার ধর্ম, অর্থাৎ ধর্মের রক্ষীবাহিনী দেয় না, যেমন স্বৈরাচারীরা দেয় না তাদের বিরুদ্ধে কথা বলার অধিকার। ধর্মগুলো যুক্তি ও সততা সহ্য করে না; ধর্মের পক্ষে কোটি কোটি মিথ্যে মানুষ কয়েক হাজার বছরে বলেছে, এখনো বলছে; ধর্মের আপত্তি নেই ওই সব মিথ্যে সম্বন্ধে, বরং ওই মিথ্যেগুলোকেই মনে করা হয় ধর্ম; কিন্তু ধর্মের বিরুদ্ধে একটি সত্যও বলা যায় না। ধর্মের প্রতিপালকেরা যতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিথ্যে কথা বলে প্রতিদিন, শুক্রবার, রোববার, ধর্মীয় জলসায়, সাধারণ মানুষ ততো কখনো বলে না।

ধর্ম এবং ধর্মের বইগুলো অলৌকিক নয়, ধর্মের বইগুলো জ্ঞানের বইও নয়; পঞ্চম শ্রেণীর বই পড়লেও যতোটা জ্ঞান হয়, ধর্মের বইগুলো পড়লে ততোটা জ্ঞানও হয় না, বরং অনেক অজ্ঞানতা জন্মে। বিশ্বাস ও অজ্ঞানতা পরস্পরের জননী; জ্ঞান জন্মে অবিশ্বাস থেকে। বিশ্বাসমাত্রই অপবিশ্বাস; জ্ঞান বিশ্বাসের বিষয় নয়, জানার বিষয়। কোনো ধর্মপণ্ডিত যদি সারাজীবন ধর্মের বই ও তার ভাষ্য পড়ে, আর কিছু না পড়ে, সে থেকে যায় পঞ্চম শ্রেণীর শিশুটির থেকেও মূর্খ। ওই শিশুটি জানে সূর্যকে কেন্দ্র ক'রে ঘুরছে পৃথিবী ও বিভিন্ন গ্রহ, কিন্তু ধর্মপণ্ডিত জানে পৃথিবীই কেন্দ্র; শিশু জানে সাত আসমান ব'লে কিছু নেই,—ওটা টলেমির ধারণা ছিলো এবং ঢুকে গিয়েছিলো ধর্মের বইয়ে, ধর্মপণ্ডিত তা জানে না; শিশু জানে চাঁদ পৃথিবীর উপগ্রহ, তার কোনো পবিত্রতা নেই, ধর্মপণ্ডিত জানে চাঁদ পবিত্র, মাস আর বছর হিশেব করার জন্যে বিধাতা এটি সৃষ্টি করেছে। এগুলোতে সত্য নেই, রয়েছে প্রচুর মিথ্যে, ও আদিম মানুষদের ব্যাপক অপবিশ্বাস। ধর্মের বইগুলোতে রয়েছে প্রচুর ভুল, আর স্ববিরোধিতা; এবং এগুলো পরস্পরবিরোধী। বলা হয় যে ধর্মের বইগুলো বিধাতার বই, তাই সহজাতভাবেই শ্রেষ্ঠ; এ-বই মানুষের পক্ষে লেখা অসম্ভব। তবে এগুলোর থেকে বহু উৎকৃষ্ট বই মানুষ লিখেছে, এবং আরো লিখবে। এগুলোতে পুনরাবৃত্তি ও বাজে কথার শেষ নেই; এবং এমন কিছু নেই, যাকে আমরা অনুভব বা বোধ করতে পারি ঐশী ব'লে। এ-বইগুলো কিছু প্রমাণ করে না; এগুলো বিধাতার উক্তি দিয়েই প্রমাণ করে বিধাতাকে, আর তার কথিত সৃষ্টিকে। ধর্মের অন্ধ ভাষ্যকারেরা এগুলোর সব শ্লোকেই বিধাতার অপার মহিমা দেখে; কিন্তু একটু যুক্তি খাটালেই ধ'সে পড়ে শ্লোকের পর শ্লোকের মহিমা।

AMARBOI.COM

ধর্ম কী? অলৌকিক সত্তায় বিশ্বাসই, অনেকে মনে করেন, ধর্ম। এটা ধর্মের বড়ো উপাদান, তবে এই ধর্মের সব নয়; ধর্মে প্রধান নানা আনুষ্ঠানিকতা। ধর্মে আবশ্যিকভাবে প্রহরে প্রহরে পুজোআরাধনা করতে হয়; যেতে হয় তীর্থে; বানাতে হয় মসজিদ, মন্দির, সিনাগগ, গির্জা, প্যাগোডা, ও নানা দেবালয়; পালন করতে হয় বহু আদিম আচারানুষ্ঠান। এগুলোর উদ্দেশ্য ধর্মীদের সংঘবদ্ধ ক'রে উন্মাদনা জাগিয়ে রাখা; উগ্র রাখা তাদের সম্প্রদায়বোধ। মানুষ যদি একান্ত ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করতো অলৌকিক সত্তায়, ধর্ম হতো ব্যক্তিগত; কিন্তু ধর্মগুলো ব্যক্তিগত ধর্ম চায় না, চায় সংঘবদ্ধ ধর্ম; এগুলোর কাজ অলৌকিক আধ্যাত্মিক অনুভূতি দেয়া নয়, এগুলোর কাজ বিশেষ ধরনের সমাজ গঠন করা। 'আধ্যাত্মিক অনুভূতি' সম্পূর্ণ বাজে কথা; যারা এ-ধরনের অনুভূতি চায়, এবং পেয়েছে ব'লে দাবি করে, তারা মনোব্যাধিগ্রস্ত মানুষ। সমস্ত আধ্যাত্মিক কবিতা ও গান মনোবিকারের ফল। ধর্মগুলো মানুষকে নিজের জীবন ধারণ করতে দেয় না, বাধ্য করে বিশেষ ব্যক্তি বা গোত্রের পরিকল্পিত জীবন যাপন করতে। প্রতিটি ধর্মের পুজোআরাধনার রীতিগুলো হাস্যকর; ইহুদিরা একভাবে, খ্রিস্টানরা আরেকভাবে, মুসলমানরা আরেকভাবে, হিন্দুরা আরেকভাবে, এবং আরো যে অজস্র ধর্ম রয়েছে, সেগুলোতে শৃঙ্খলিতরা বিচিত্ররূপে পুজোঅর্চনা করে। প্রতিটি ধর্মের মানুষ অন্য ধর্মের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরাধনার রীতিকে মনে করে হাস্যকর; মুসলমানের কাছে হিন্দুর পুজো আর ঘণ্টাধ্বনি হাস্যকর, হিন্দুর কাছে মুসলমানের দিনে পাঁচবার উঠে-ব'সে প্রার্থনা হাস্যকর। এসবে এমন কিছু নেই, যা বহন করে কোনো পরম সত্তার ছোঁয়া। এগুলোতে বারবার আবৃত্তি করা হয় এমন সব শ্লোক, যেগুলো স্থূল, যেগুলোর নেই কোনো অসাধারণত্ব। কোনো কোনো ধর্মের আরাধনার অনেক শ্লোক কালাতিক্রমণতাগ্রস্তও; উপাসনার সময় প্রতিদিন এমন সব ব্যক্তিকে ধ্বংস হওয়ার অভিশাপ দেয়া হয় যারা বহু আগেই লোকান্তরিত।

প্রচলিত ধর্মগুলো সম্পূর্ণ পৃথক ধর্ম নয়; এগুলোর একটির সাথে আরেকটির নানা মিল রয়েছে। অনেক সময় এক বা একাধিক ধর্ম থেকে জন্মেছে আরো এক বা একাধিক ধর্ম। তবে প্রতিটি ধর্মই নিজেকে সম্পূর্ণ নতুন ব'লে দাবি করে, যেনো এইমাত্র বিধাতা সেটি তৈরি ক'রে পাঠিয়েছেন। ভারতীয় ধর্মগুলোর মধ্যে মিল অত্যন্ত স্পষ্ট; একটি মূল ধর্ম থেকেই ভারতে দেখা দিয়েছে পরবর্তী ধর্মগুলো। মধ্যপ্রাচ্যেও তাই হয়েছে; কানান বা প্যালেস্টাইন হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের ধর্মগুলোর মাতৃভূমি। প্যালেস্টাইনের মানুষ নানা কিংবদন্তি থেকে সৃষ্টি করেছিলো ইহুদিধর্ম; তার থেকে উদ্ভূত হয় খ্রিস্টধর্ম; এবং ইহুদি-খ্রিস্ট ও মক্কায় প্রচলিত পৌত্তলিক আরবদের ধর্ম থেকে বিকশিত হয় ইসলাম। ইসলামের ধর্মগ্রন্থে বিধাতার প্রেরিত ধর্মরূপে ইহুদি ও খ্রিস্টধর্ম স্বীকৃত; এবং এ-গ্রন্থে রয়েছে বহু উপাখ্যান, যেগুলোর উৎস পুরোনো ও নতুন বাইবেল। আদম-হাওয়ার উপাখ্যানটি স্বীকার করে তিনটি ধর্মই। এ-উপাখ্যানটি প্রথম তৈরি করেছিলো হিব্রুরা, ও অন্তর্ভুক্ত করেছিলো পুরোনো বাইবেলে। এটা প্যালেস্টাইনের পুরোনো লোককাহিনী বা পুরাণে প্রচলিত ছিলো; এমনকি তারা কল্পনা করেছিলো তিনটি হাওয়ার, যাদের শেষটি তিনটি ধর্মগ্রন্থে স্থান পেয়ে নিন্দিত ও বিখ্যাত। ইসলাম ধর্মে শুধু আদম-হাওয়াই নয়, পাওয়া যায় পুরোনো বাইবেলের আরো বহু চরিত্র ; যেমন, হারুন (অ্যারোন), ইব্রাহিম (আব্রাহাম), হাবিল (আবেল), কাবিল (কেইন), দাউদ (ডেভিড), ইলিয়াস (এলিয়াস), জিব্রিল (গ্যাব্রিয়েল), ইয়াজুজ (গগ), ইসহাক (আইজাক), ইসমাইল (ইসমায়েল), ইউনুস (জোনাহ), ইউসুফ (জোসেফ), মাজুজ (ম্যাগোগ), নুহ (নোআহ্), ফিরাউন (ফারাও); এবং পাওয়া যায় বাইবেলের বহু গল্প : বিশ্বসৃষ্টি, আদমের স্বর্গচ্যুতি, কেইন ও আবেল, আব্রাহামের নিজের পুত্রকে উৎসর্গ করার উদ্যোগ, নুহের নৌকো, ইউসুফের মিশরগমন, ইউনুস ও মাছ, ফেরাউন, সলোমনের বিচার, শেবার রানী ও আরো নানা কাহিনী। ইসলামের বিধাতার নামটিও নতুন নয়, নামটি আরবে আগে থেকেই প্রচলিত ছিলো; মুসলমানরা অবশ্য দাবি করে নামটি সৃষ্টির শুরু থেকেই আছে। এ-দাবির ওপর কোনো কথা নেই। নামটির বহু উদাহরণ পাওয়া যায় ওই সময়ের আরবদের ব্যক্তিনামে; যেমন, আবদুল্লা–আল্লার দাস। ইসলামপূর্ব মক্কায় পূজিত হতো তিনটি দেবী– দেবতা নয়,– আল-লাত, মানত, ও আল-উজ্জা। আল-উজ্জা ছিলো চান্দ্রদেবী, মক্কার মহাদেবী; তার ভক্তদের নাম হতো আবদুল উজ্জা (আবু লাহাবের আসল নাম)– উজ্জার দাস। তার আরেকটি নামও ছিলো। ইসলামপূর্ব আরব ছিলো মাতৃপ্রধান, ইসলামে ঘটে পিতৃতন্ত্রের উত্থান; ধর্মে যেমন পরাজিত হয় দেবীরা, তেমনি সমাজে পরাজিত হয় মাতারা, জয়ী হয় পিতারা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইসলামে *হিলাল* বা বাঁকা চাঁদকে পবিত্র মনে করার বিশেষ কারণ রয়েছে। ইসলাম আগের আরবকে অন্ধকারের কাল ব'লে নিন্দিত করলেও ওই আরব অতোটা অন্ধকারে ছিলো না; চিরকালই বিজয়ীরা পরাজিতদের নামে কুৎসা রটায়। ইসলামপূর্ব আরব থেকে ইসলাম নিয়েছে বহু কিছু : পুরুষের বহুবিবাহ (আরবে নারীদের বহুবিবাহও প্রচলিত ছিলো), দাসপ্রথা, সহজ বিবাহবিচ্ছেদ (আরবে নারীরা সহজে বিবাহবিচ্ছেদ করতে পারতো, ইসলামে বিবাহবিচ্ছেদ সহজ হয়ে ওঠে পুরুষের জন্যে), সামাজিক নানা বিধি, খৎনা ইত্যাদি। ইসলাম অপৌত্তলিক; কিন্তু এর তলদেশে আরব পৌত্তলিকতার ফল্গুস্রোত সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায় নি। তীর্থযাত্রা, পশুবলি, উপবাস প্রায় সব ধর্মেই রয়েছে; ইসলামেও আছে। হজ ও কোরবানির মূল ব্যাপার নিয়ে আলোচনা থেকে বিরত থাকছি। আরব কবি আল-মারি (৯৭৩-১০৫৭) লিখেছেন, 'দশ দিক থেকে মানুষ আসে পাথর ছুঁড়তে আর চুমো খেতে। কী অদ্ভুত কথা তারা বলে! মানুষ কি অন্ধ হয়ে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছে না সত্য?' জালালউদ্দিন রুমি লিখেছেন, 'আমি পথ খুঁজি, তবে কাবা বা উপাসনালয়ের পথ নয়, প্রথমটিতে আমি দেখি একদল পৌত্তলিককে আর দ্বিতীয়টিতে একদল আত্মপূজারীকে।' খলিফা উমর কাবার কালোপাথরকে উদ্দেশ ক'রে বলেছিলেন, 'যদি না আমি দেখতাম মহানবি তোমাকে চুমো খাচ্ছেন, আমি নিজে তোমাকে চুমো খেতাম না।'

ইসলামে পশু উৎসর্গকে জড়িত করা হয় মিথ্র নবি আব্রাহামের নিজের পুত্র ইসমায়েলকে উৎসর্গ করার উপাখ্যানের সাথে। পশু উৎসর্গ অত্যন্ত পুরোনো পৌত্তলিক যজ্ঞ। মানুষ যখন যাযাবর ছিলো, শিকারই যখন ছিলো জীবিকা, তখন তারা দেবতাকে তুষ্ট করার জন্যে পশু বলি দিতে শুরু করে। বাইবেলের আবেল ও কেইনের উপাখ্যানে এটা দেখতে পাওয়া যায়। *আদিপুস্তক*-এ আছে : হাওয়ার গর্ভে প্রথম জন্মে কেইন, পরে আবেল। আবেল ছিলো মেষপালক, এবং কেইন চাষী। চাষী কেইন ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করে তার জমির শস্য, আবেল উৎসর্গ করে পশু। ঈশ্বর আবেলের উৎসর্গ, পশু, গ্রহণ করে; কিন্তু কেইনের উৎসর্গ, শস্য, গ্রহণ করেন না। এর ফলেই ঘটে প্রথম নর ও ভ্রাতৃহত্যা;– কেইন হত্যা করে ভাই আবেলকে। প্যালেস্টাইনের ঈশ্বর চাষী পছন্দ করেন না, তাঁর পছন্দ শিকারী, কেননা তিনি মূলত যাযাবরের বিধাতা। আরবসমাজ ছিলো গোত্রবদ্ধ, প্রত্যেক গোত্রের ছিলো নিজস্ব দেবদেবী; বেদুইনরাও বিশেষ বিশেষ স্থানে দেবদেবীদের পুজো করতো। ওই দেবদেবীদের প্রতীক ছিলো বিভিন্ন পাথর। ওই পাথরগুলো কখনো হতো মূর্তি, কখনো বিশাল পাথরখণ্ড। আস সাফা ও আল-মারওয়া পাহাড় দুটির নাম বোঝায় পাথর। আরবরা সৌভাগ্যলাভের জন্যে এ-দু-পাহাড়ে ছোটাছুটি ক'রে ছুঁতো ও চুমো খেতো দুই পাহাড়ে স্থাপিত ইসাফ ও নাইলার দুটি মূর্তি। দ্বিতীয় শতকের শেষ দিকে আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লেমেন্ট লিখেছেন, 'আরবরা পাথর পুজো করে'; ওই শতকেই ম্যাক্সিমাস টাইরিউস লিখেছেন, 'আমি জানি না আরবরা পুজো করে কোন দেবতার, যাকে তারা রূপায়িত করে একটি চতুর্ভুজ পাথররূপে।' মুসলমানরা তীর্থে গিয়ে চুমো খায় একটি কালোপাথরকে। এটি এক সময় নির্দেশ করতো উর্বরতা। মুসলমানরা বিশ্বাস করে এটি পড়েছে স্বর্গ থেকে। বিশ্বাসটি একেবারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভুল নয়, যদিও ব্যাখ্যাটি ভুল; স্বর্গ থেকে না পড়লেও এটি পড়েছে আকাশ থেকেই; এটি একটি উল্কাপিণ্ড। আকাশে কি পাথর আছে? আছে। মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষপথের মাঝখানে ঘুরছে কিছু গ্রহাণু; এগুলোকে ভুলবশত অ্যাস্টিরয়িড বলা হ'লেও এগুলো তারা নয়, এগুলো অতিশয় ছোটো ছোটো গ্রহ। ১৮০১ অব্দের জানুয়ারি মাসের এক তারিখে প্রথম গ্রহাণুটি আবিষ্কার করেন ইতালীয় সন্ন্যাসী পিয়াস্সি। গ্রহাণুটির নাম সিরিস। তারপর দু-হাজারেরও বেশি গ্রহাণু আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলোর কক্ষপথ বেশ গোলমেলে, এবং কখনো কখনো কোনোটির সাথে অন্য কোনোটির সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের ফলে যে-টুকরোগুলো পৃথিবীর জলবায়ুতে প্রবেশ করে, সেগুলোকে বলা হয় উল্কা। তবে শুধু উল্কা নয়, পুরো কোনো গ্রহাণুও এসে আঘাত করতে পারে পৃথিবীকে, এবং সেটা সৃষ্টি করতে পারে একটা বড়ো বিপর্যয়। বিজ্ঞানীরা এখন গ্রহাণুর সম্ভাব্য আঘাত নিয়ে নানা গবেষণা করছেন। ওই কালোপাথরটি একটি উল্কাপিণ্ড; তবে এখন যেটিকে চুমো খাওয়া হয়, সেটি হয়তো আসল পাথরটি নয়। চতুর্থ হিজরি শতকে কারম্যাশিয়ানরা (Qarmatian) আসলটি নিয়ে গিয়েছিলো, ফেরত দিয়েছিলো অনেক বছর পরে। অনেকের ধারণা তারা আসলটি ফেরত দেয় নি। কালোপাথরটির পাশেই আছে আরেকটি লালবর্ণের পাথর, যার নাম *হুবাল*।

ধর্মগুলো দাবি করে ঈশ্বর নিজে, বা কোনো দেবদূতের মাধ্যমে প্রেরিতপুরুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন তাঁর বাণী বা প্রত্যাদেশ। এটা বিশ্বাস করা ধর্মগুলোর অনুসারীদের জন্যে বাধ্যতামূলক। টমাস পেইন *এইজ অফ রিজন* বা *যুক্তির যুগ* গ্রন্থে বলেছেন :

> প্রত্যেক জাতীয় গির্জা বা ধর্ম এটার ভান করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে সেটি পেয়েছে ঈশ্বরের বিশেষ বাণী, যা জ্ঞাপন করা হয়েছে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির কাছে। ইহুদির আছে মোজেস; খ্রিস্টানদের আছে জেসাস ক্রাইস্ট, তার শিষ্য ও সন্তরা; এবং তুর্কিদের আছে তাদের মাহোমেট, যেনো ঈশ্বরের পথ সব মানুষের জন্যে সমভাবে খোলা নয়। প্রত্যেকটি গির্জা দেখিয়ে থাকে বিশেষ বিশেষ গ্রন্থ, যেগুলোকে তারা বলে প্রত্যাদেশ, বা ঈশ্বরের বাণী। ইহুদিরা বলে ঈশ্বর মুসার কাছে, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, দিয়েছেন তাদের ঈশ্বরের বাণী; খ্রিস্টানরা বলে তাদের ঈশ্বরের বাণী এসেছে ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণার মধ্য দিয়ে; এবং তুর্কিরা বলে তাদের ঈশ্বরের বাণী স্বর্গ থেকে নিয়ে এসেছে একজন দেবদূত। ওই গির্জাগুলো একটি অন্যটিকে অবিশ্বাসী ব'লে অভিযুক্ত করে; এবং আমি নিজে এগুলোর প্রত্যেকটিকে অবিশ্বাস করি।

প্রত্যাদেশ অসম্ভব ও কল্পিত ব্যাপার। কিন্তু যদি ধ'রেও নিই যে প্রত্যাদেশ সত্যি ঘটনা, বিধাতা সত্যিই দেখা দিয়েছেন কারো কাছে (অবশ্যই প্রাচীন কালে, আজ যদি কেউ দাবি করে সে প্রত্যাদেশ পেয়েছে, তাকে মানসিক রোগী মনে করা হবে, বা ধার্মিকরা তাকে খুন করবে), বা দেবদূত বিধাতার বাণী পৌঁছে দিয়েছে কারো কাছে, তাহলে ওই প্রত্যাদেশ শুধু তারই জন্যে প্রত্যাদেশ, অন্যদের জন্যে নয়। সে যখন তা অন্য কাউকে বলে, অন্যজন যখন তা বলে আরেকজনকে, এবং সে যখন তা বলে আরেকজনকে, তখন তা তাদের জন্যে প্রত্যাদেশ থাকে না, তা হয় শোনাকথা। প্রত্যাদেশগুলোতে আন্তর কোনো প্রমাণ থাকে না, যা প'ড়েই বোঝা যায় এগুলো বিধাতার বাণী। এগুলোতে থাকে বহু ভুল ও স্ববিরোধিতা; এগুলোতে থাকে কিছু সরল নীতিকথা, আর নির্দেশ, যার জন্যে বিধাতার দরকার পড়ে না। সারা পৃথিবী জুড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষেরা অনেক উৎকৃষ্ট নীতিকথা আর বিধান সৃষ্টি করেছে। বিধাতার আচরণ অদ্ভুত, তিনি একজনের কাছেই দেখা দেন, বাণী পাঠান; আর সমগ্র মানবজাতি তার কাছে থেকে বিধাতার সত্য শেখে, এবং শিখতে গিয়ে তারা একজন মানুষের অনুগত হ'তে বাধ্য হয়। এক সময় তার স্থান দখল করে নানা প্রতিষ্ঠান; অর্থাৎ বিধাতা থেকে যান বিশেষ একদল মানুষের নিয়ন্ত্রণে।

বহু ধর্মে রয়েছে শেষবিচার নামে এক ভয়ঙ্কর ব্যবস্থা, যার ভয়ে অনুসারীরা থাকে দুঃস্বপ্নে। নরক বিধাতার বন্দীশিবির। বলা হয় ওই দিন শিঙ্গা বেজে উঠবে, টুকরো টুকরো হয়ে যাবে স্বর্গমর্ত্য, পাহাড়পর্বত ধুলোতে পরিণত হবে, আকাশ হবে অন্ধকারাচ্ছন্ন, বলক দিতে থাকে সমুদ্ররাশি, আর কবর থেকে বিচারের জন্যে বেরিয়ে আসবে সমস্ত মানুষ। দাঁড়িপাল্লা দিয়ে মাপা হবে তাদের পাপপুণ্য, এবং বিচার করবেন বিধাতা। কারো জন্যে নির্ধারিত হবে চিরস্বর্গ, কারো জন্যে চিরনরক। বিচারে জন্যে নরনারীরা পুনরুজ্জীবিত হবে, অর্থাৎ তারা ফিরে পাবে তাদের পার্থিব শরীর। প্রশ্ন হচ্ছে কীভাবে পুনরুজ্জীবিত হবে মৃতরা? যারা প'চে গেছে, বিনষ্ট হয়ে গেছে যাদের অস্থিমাংস আর অন্ত্রতন্ত্র, যারা পুড়ে ছাঁই হয়ে গেছে, তারা কীভাবে ফিরে পাবে তাদের শরীর? যারা হারিয়ে গেছে সমুদ্রে, যারা গেছে বাঘভালুকের পেটে, কীভাবে পাওয়া যাবে তাদের? বলা হয় শেষবিচারের দিনে সবাইকে জাগানো হবে পার্থিব শরীরে। বলা হয় কিছুই অসম্ভব নয় বিধাতার পক্ষে, তিনি সব পারেন। তিনি সব পারেন, কিন্তু একটি ছোটো সমস্যা রয়েছে; কেউ ম'রে যাওয়ার, মাটিতে মিশে যাওয়ার কোটি কোটি বছর পর, মনে করা যাক, অবিকল তাকে সৃষ্টি করা হলো; কিন্তু তখন তো সে আগের মানুষটি নয়, সে অন্য এক মানুষ, বা আগের মানুষটির অবিকল নকল। একজনের পাপপুণ্যের জন্যে তার অবিকল নকলকে স্বর্গে বা নরকে পাঠানো হচ্ছে অবিকল যমজ ভাইদের একজনের পাপপুণ্যের জন্যে আরেকজনকে পুরস্কার বা শাস্তি দেয়ার মতো অন্যায়। আজকাল একজনের প্রত্যঙ্গ আরেকজনের শরীরে সংযোজন করা হয়। মনে করা যাক এক পাপী এক পুণ্যবানের হৃৎপিণ্ড ধারণ ক'রে বেঁচে রইলো, এবং মারা গেলো পুণ্যবানের হৃৎপিণ্ড নিয়েই। শেষ বিচারের দিনে এক পাপীর পাপের জন্যে কি শাস্তি পাবে পুণ্যবানের হৃৎপিণ্ড? তাকে পুনরুজ্জীবিত করার সময় সম্পন্ন করা হবে আরেকটি শল্য চিকিৎসা, পাপীর আগের হৃৎপিণ্ড এনে লাগানো হবে? কী হবে পুণ্যবান ব্যক্তিটির, যাকে কবর দেয়া হয়েছে হৃৎপিণ্ড ছাড়াই? পরলোক হাস্যকর কল্পনা। মানুষ মরতে ভয় পায় ব'লেই উদ্ভাবন করেছে পরলোক–স্বর্গনরক। পরলোক হচ্ছে জীবনের বিরুদ্ধে এক অশ্লীল কুৎসা; পরলোকের কথা বলা হচ্ছে জীবনকে অপমান করা। পরলোকে বিশ্বাস জীবনকে ক'রে তোলে নিরর্থক।

ধর্মের ভিত্তি, শুনতে সুখকর না লাগলেও, লালসা ও ভীতি। রাসেল বলেছেন :

> ধর্ম, আমার মনে হয়, প্রথমত ও প্রধানত দাঁড়িয়ে আছে ভয়ের ওপর ভিত্তি ক'রে। এর অংশবিশেষ অজানার সন্ত্রাস, এবং অংশবিশেষ হচ্ছে এমন বোধ যে আমার রয়েছে এক জ্যেষ্ঠভ্রাতা, যে বিপদাপদে আমার পাশে এসে দাঁড়াবে। সম্পূর্ণ ব্যাপারটির ভিত্তি হচ্ছে ভয়– অলৌকিকের ভয়, পরাজয়ের ভয়, মৃত্যুর ভয়। ভয় নিষ্ঠুরতার জনক, এবং এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে নিষ্ঠুরতা ও ধর্ম এগিয়েছে হাতে-হাত ধ'রে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব ধর্মের নৈতিকতার ভিত্তি ভয়। বহু ধর্মে বিধাতা চরম ক্রুদ্ধ ও হিংস্র; ক্রুদ্ধ ও হিংস্র হয়ে থাকা ছাড়া তাঁর আর কোনো কাজ নেই; অবিশ্বাসীকে শাস্তি দেয়ার জন্যে তিনি ব্যগ্র, এবং বিশ্বাসীকেও সব সময় রাখেন ভীতির মধ্যে। বিশ্বাসী কোনো উন্নত নৈতিকতাবোধ দিয়ে চালিত হয় না; সে ভয়েই করে পুণ্যকাজ, এবং থাকে সম্পূর্ণ অনুগত। ভয় আর লালসা দূষিত করে সব ধরনের নৈতিকতাকে। ধর্মীয় নৈতিকতা থেকে মানবিক নৈতিকতা অনেক উন্নত। অনেকে বলে ধর্ম আছে ব'লেই সমাজ চলছে; এটা বাজে কথা; ধর্ম না থাকলে সমাজ আরো ভালোভাবে চলতো। অনেকে বলে ধর্ম মিথ্যা হ'তে পারে, কিন্তু এর উপকারিতা আছে; কেননা ধর্ম ভালোমন্দ শেখায়, মানুষকে সৎপথে চালায়। এ-যুক্তি খুবই আপত্তিকর, কেননা এটা মানুষকে যুক্তিহীন করে, আর উৎসাহিত করে ভণ্ডামোকে; বর্জন করে সত্যকে। ধর্ম যে মানুষকে ভালোমন্দ শেখায় না, সৎপথে চালায় না; তার প্রমাণ চিরকালই দেখা গেছে, এবং আজকাল খুবই বেদনাদায়কভাবে দেখা যাচ্ছে। ধর্মের নৈতিকতার সাথে মানবিক নৈতিকতার তুলনা করলে ধরা পড়ে যে ধর্মীয় নৈতিকতার মূলে নৈতিকতা নেই, রয়েছে স্বেচ্ছাচারী নির্দেশ; আর মানবিক নৈতিকতার ভিত্তি হচ্ছে কল্যাণ। মুসলমানের শুয়োর খাওয়া আর হিন্দুর গরু খাওয়া পাপ; এর মূলে কোনো নীতিবোধ নেই, এটা স্বেচ্ছাচারী নির্দেশ। ইসলামে কবি ও চিত্রকর নিষিদ্ধ; তাই আধুনিক বিশ্বের প্রায় সব কিছুই নিষিদ্ধ ইসলামে; এ-নিষিদ্ধকরণের পেছনে কোনো নীতিবোধ কাজ করে নি, কাজ করেছে কবিতা ও চিত্র সম্পর্কে ভুল ধারণা। চুরির অপরাধে হাত কেটে ফেলা বা অবিবাহিত সঙ্গমের জন্যে পাথর ছুঁড়ে হত্যা নীতির দিক থেকে অত্যন্ত শোচনীয়, কিন্তু ধর্মে একেই মনে করা হয় নৈতিকতা। ধর্ম গভীর মানবিক নৈতিকতা বোঝে না, বোঝে কতকগুলো মোটা দাগের আদেশ পালনের নৈতিকতা। দস্তয়ভস্কির এক নায়ক বলেছে তাকে যদি বলা হয় একটি শিশুকে হত্যা করা হ'লে দেশের সবাই চিরসুখে থাকবে, তাহলেও সে ওই শিশুকে হত্যা করবে না, কেননা তা তার কাছে অনৈতিক কাজ। ধর্ম এ-ধরনের নৈতিকতা বোঝে না; মনে করে যে কুলুপ লাগায় সে নৈতিক, যে লাগায় না সে অনৈতিক। ধর্মীয় নৈতিকতা কখনো কখনো খুবই হাস্যকর। ইসলামে পবিত্র পরিচ্ছন্ন থাকাকে নৈতিক কাজ ব'লে মনে করা হয় (কিন্তু প্রকাশ্যে কুলুপ ধ'রে হাঁটাহাঁটি ক'রে পা ঝাঁকানো পেরিয়ে যায় শ্লীলতার সীমা), আর খ্রিস্টধর্মে নোংরা থাকাই নৈতিকতা। খ্রিস্টীয় গির্জা স্নানের ব্যাপারটিকে আক্রমণ করেছে এজন্যে যে যা-কিছু দেহকে আকর্ষণীয় করে, তাই মানুষকে ঠেলে দেয় পাপের পথে। সৌন্দর্য, সন্তদের বিশ্বাস, পাপের উৎস; সৌন্দর্য থেকেই জন্মে কাম, কাম থেকে জন্মে মানুষের আদি ও অন্তিম পাপ। খ্রিস্টীয় চার্চ প্রশংসা করে অপরিচ্ছন্নতার, কেননা নোংরা মানুষ কাম জাগায় না, কাউকে পাপিষ্ঠ করে না। সন্ত পলা বলেছেন, 'দেহ ও বস্ত্রের পবিত্রতা বোঝায় আত্মার অপবিত্রতা।' সন্তরা উকুনকে বলতো বিধাতার মুক্তো; উকুনখচিত থাকা ছিলো সন্ততার শংসাপত্র। কোনো কোনো ধর্মে উপাসনার আগে বিশেষ পদ্ধতিতে দেহ পরিচ্ছন্ন করার রীতি রয়েছে; তবে ওটা দেহকে পরিচ্ছন্ন করার জন্যে নয়, শয়তান তাড়ানোর জন্যে, যে-শয়তান কোথাও নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্মের ইতিহাস পাঁচ হাজার বছরের, এর মধ্যে অজস্র ধর্ম প্রচারিত হয়েছে ও বাতিল হয়ে গেছে; কিন্তু মানুষ আছে কোটি বছর আগে থেকে, টিকে থাকবে বহু কোটি বছর। পৃথিবী ধ্বংসের আগে মানুষ হয়তো অন্য কোথাও পাড়ি জমাবে;– মানুষের সম্ভবনা অনন্ত, দেবতাদের থেকে মানুষ অনেক বেশি প্রতিভাবান। পাঁচ হাজার বছর, তিন হাজার, দেড় হাজার বছরকে চিরকাল মনে করার কারণ নেই। মানুষ দেবতার পর দেবতা তৈরি করেছে, এবং ছেড়েছে; তাতে দেবতাদের কিছু যায় আসে নি, তারা জানেই না তারা উৎপন্ন হয়েছে, কিন্তু অনেক এসে গেছে মানুষের। ভবিষ্যৎমুখি মানুষকে বিপুল লড়াই করতে হয়েছে ধর্মের সাথে; ধর্ম না থাকলে মানুষ আরো অনেক এগোতো। দেবতারা কখনো দেখা দেয় নি, কখনো পীড়ন করে নি মানুষকে; কিন্তু ধর্মকে চিরকালই একগোত্র মানুষ ব্যবহার করেছে অস্ত্ররূপে। ধর্মের পক্ষে যারা, তারা বিশেষ স্বার্থেই ধর্মের পক্ষে; যারা বিপক্ষে, তাদের কোরো স্বার্থ নেই; তাদের স্বার্থ মানুষের বিকাশ। আগামী দু-এক শতকের মধ্যেই মানুষ মুক্ত হবে ধর্মের কবল থেকে। কোনো ধর্মই মানুষের শুরু থেকে ছিলো না ও শেষ পর্যন্ত থাকবে না। ধর্মের প্রধান ক্ষতিকর দিক হচ্ছে ধর্ম বিভেদ সৃষ্টি করে; মানষকে বিভিন্ন গোত্রে ভাগ ক'রে দেয়, সৃষ্টি করে পারস্পরিক ঘৃণা, বিদ্বেষ, শত্রুতা। কোনো সুষম ধর্মও নেই, প্রতিটি ধর্ম বিভক্ত নানা শাখা ও উপশাখায়; ওই শাখা-উপশাখাগুলো ঘৃণা করে পরস্পরকে। মানুষ ধর্ম দ্বারা আক্রান্ত; এবং বিশেষ ধর্মের মানুষ আক্রান্ত ওই ধর্মের মানুষদের দ্বারা; মুসলমান আক্রান্ত মুসলমান দ্বারা, হিন্দু হিন্দু দ্বারা; তাই মুসলমানের হাত থেকে মুসলমানকে, হিন্দুর হাত থেকে হিন্দুকে বাঁচানো দরকার। ধর্মের অন্ধকার থেকে মুক্ত হয়ে মানুষকে হয়ে উঠতে হবে মানুষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেরি ওলস্টোনক্র্যাফ্‌ট্‌ : অগ্নিশিখা ও অশ্রুবিন্দু

মেরি ওলস্টোনক্র্যাফ্‌ট্‌ (১৭৫৯-১৭৯৭) চোখে জাগিয়ে তোলেন দুটি আপাতবিষম সুন্দর ভয়াবহ চিত্রকল্প : অগ্নিশিখা ও অশ্রুবিন্দুর। মনে হয় কোথাও গভীর মিল রয়েছে অগ্নি ও অশ্রুর, অন্তত মেরি মিলিয়ে দিয়েছিলেন দুটিকে; আগুন তাঁর মধ্যে অশ্রু হয়ে টলমল ক'রে উঠতে পারতো, আবার অশ্রু হয়ে উঠতে পারতো লেলিহান অগ্নিশিখা। মেরি, ফরাশি বিপ্লবের থেকেও বিপ্লবাত্মক, ১৭৯১-এ বত্রিশ বছরের তরুণী; মাত্র ছ-সপ্তাহে লেখেন তাঁর তেরো পরিচ্ছেদের ভয়ঙ্কর বইটি : *ভিন্ডেকেশন অফ দি রাইট্‌স্‌ অফ ওম্যান : উইথ স্ট্রিকচার্‌স্‌ অন পলিটিকেল অ্যান্ড মোরাল সাবজেক্টস্‌।* বেরোয় ১৭৯২-এ; দু-শো বছর আগে; ভাবতে ভালো লাগছে, শিহরণ বোধ করছি এজন্যে যে বাঙলা ভাষায়, পৃথিবীর এক অন্ধকার এলাকায়, একা পালন করছি বইটির দ্বিশতবার্ষিকী! বইটি নারীবাদের প্রথম মহাঘোষণা; মানুষের লেখা সবচেয়ে বিপ্লবাত্মক, বিখ্যাত ও আপত্তিকর বইগুলোর একটি তাঁর *ভিন্ডিকেশন।* বইটি প্রকাশের পর পিতৃতন্ত্রের ইতিহাসে প্রথম বিপ্লবী নারী, তেত্রিশ বছরের মেরি পান প্রগতিশীলদের অভিনন্দন ও প্রশংসা, কিন্তু নিন্দাই জোটে বেশি। নিন্দাই ছিলো তাঁর স্বাভাবিক প্রাপ্য, তখন পৃথিবী জুড়েই ছিলো তাঁর শত্রুরা, আজো তারা আছে; তাই ওই বই লিখে সকলের চোখের মণি হয়ে উঠবেন তিনি, তা আশা করতে পারি না, মেরিও করেন নি। তিনি পান তাঁর পুরস্কার : রক্ষণশীল পুরুষতন্ত্র ক্ষেপে ওঠে, তাঁর নাম অভিন্ন হয়ে ওঠে অনাচারের সাথে; রক্ষণশীলদের কাছে মেরি হয়ে ওঠেন নিষিদ্ধ ঘৃণ্য নাম। তবে তিনি ঘৃণাই শুধু পান নি, পেয়েছেন অনুরাগও। টমাস কুপার উল্লসিত হয়ে বলেছিলেন, 'এবার পুরুষতন্ত্রের সমর্থকদের বলো (যদি পারে) *নারী-অধিকার*-এর উত্তর দিতে।' মেতে ওঠে রক্ষণশীলেরা, অশ্লীল গালাগালিতে ভ'রে ফেলে চারপাশ; হোরেস ওয়ালপোল মেরিকে বলেন 'পেটিকোটপরা হায়েনা'; আরেকজন বলে 'দার্শনিকতাকারিণী সর্পিণী' ইত্যাদি। মেরি তাদের চোখে হয়ে ওঠেন অশুভর নারীমূর্তি। তাঁর নিন্দুকেরা শুধু তখনই ছিলো না, ছিলো উনিশশতকে, বিশশতকের অর্ধেক ভ'রে তারা ছিলো, আছে আজো। ফ্রয়েডীয়দের চোখে মেরি এক খোজাগূঢ়ৈষারুগ্ন শিশ্নাসূয়াগ্রস্ত নারী, যে নারীবাদ নামের নষ্টের মূলে। কিছু দিন আগে পর্যন্ত নারীবাদীরাও সংকোচ করতো তাঁর নাম নিতে, ভয়ে কুঁকড়ে যেতো একথা ভেবে যে মেরির নাম নিলে পুরুষতন্ত্র ক্ষেপে উঠবে, তাঁদের কোনো দাবি পূরণ হবে না। মেরি সমস্ত 'সদগুণে'র বিনাশকারিণী, তাঁর নাম নিলে হানি ঘটবে সতীত্বের। কিন্তু জয় হয়েছে মেরিরই, যিনি বত্রিশ বছরে লিখেছিলেন একটি বিপজ্জনক বই, এবং অশ্রুর মতো মিলিয়ে গিয়েছিলেন মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেরি আবার ফিরে এসেছেন, তাঁর নাম এখন পাচ্ছে নারীবাদী সন্তের মহিমা; মার্ক্স যেমন সমাজতন্ত্রের মেরি তেমনই নারীবাদের। তাঁর সমাধিতে মৃত্যুর একশো একষট্টি বছর পর দ্বিশতজন্মবার্ষিকীতে অর্পিত হয়েছে পুষ্পার্ঘ্য।

নারীবাদের প্রথম মহান নারী মেরি ছিলেন অগ্নি ও অশ্রুর সমবায়; তাঁর জীবন ছিলো যেমন লেলিহান, তেমনই কোমলকাতর; তাঁর সমাপ্তি ঘটেছিলো বিষণ্ন আর্ত চিৎকারে। তিনি বেঁচে ছিলেন অন্যদের সময়ে, বেশি দিন বাঁচেন নি; কিন্তু তাঁর বই পড়লে, মধুর মুখচ্ছবিটির দিকে তাকালে মনে হয় মেরি বেঁচে আছেন; এবং রক্ষণশীলদের সাথে ক'রে চলছেন নিরন্তর বোঝাপড়া। ১৭৫৯-এ লন্ডনের বাইরে এপিং বনের কাছাকাছি এক গরিব চাষীপরিবারে জন্ম হয় মেরির। মেরি ছিলেন প্রথম সন্তান। তাঁর বাবা অ্যাডওয়ার্ড ওলস্টোনক্র্যাফ্ট্ তখন অপচয় ক'রে ক'রে নিঃস্ব, সংসারও চালাতে পারছিলো না। মেরির পরে ওই পরিবারে জন্মে আরো তিনটি ছেলে ও দুটি মেয়ে। তাঁর বাবা জীবিকার সন্ধানে সপরিবার ঘোরে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের নানা স্থানে, কিন্তু কখনো সচ্ছলতা পায় নি। তাঁর বাবা ছিলো রাগী, অত্যাচারী; মা ছিলো ভীরু। মেরি বাল্যকাল থেকেই বেড়ে ওঠেন দায়িত্বশীল মেয়েরূপে, এবং মেনে নিতে পারেন নি বাবার স্বৈরাচার। বাবা তাঁর মাকে মারতো মাঝেমাঝেই, আর মেরি মাকে বাঁচানোর জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়তেন বাবামা দুজনের মাঝখানে। মেরি বলেছেন, তাঁর বাবা ছিলো স্বৈরাচারী, মা স্বৈরাচারের স্বেচ্ছাশিকার। তাঁর মায়ের চরিত্রে প্রতিবাদের এক কণাও ছিলো না; এবং তাঁর মা মেয়েদের তুচ্ছ গণ্য ক'রে মনে করতো একদিন বড়ো ছেলেটিই উদ্ধার করবে তাকে। পরে দেখা যায় ছেলে মায়ের দিকে তাকায়ও নি, মেরিই সাহায্য করেছেন মাকে।

AMARBOI.COM

গরিব চাষীপরিবারের মেয়ে মেরি বেড়ে ওঠেন খামারে খামারে; মধ্যবিত্ত মেয়েদের সুবিধা যেমন পান নি তিনি, তেমনই পান নি তাদের সীমাবদ্ধতাগুলো। মেরি খেলাধুলো করতেন ভাইদের সাথে, যা তাকে ভিন্নভাবে বিকশিত করেছিলো; মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের নিরর্থক 'অর্জন'গুলো তাঁকে আয়ত্ত করতে হয় নি। বাসায় লেখাপড়ার সুযোগ ছিলো না, তবু তিনি লেখাপড়া শেখেন নিজের চেষ্টায়। বাল্য থেকেই তাঁর সাধনা ছিলো স্বাধীন স্বাবলম্বী হওয়ার, মেয়েমানুষের পুরুষনির্ধারিত ভূমিকায় তিনি বন্দী থাকতে চান নি। উনিশ বছর বয়সে, ১৭৭৮-এ, বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন মেরি স্বাধীন জীবিকার খোঁজে, যা সে-সময় ছিলো দুঃসাধ্য। নানা পেশা গ্রহণ করেন তিনি, যার কোনোটিই খুব ভালো ছিলো না। প্রথম তিনি নেন এক ধনী বিধবার সহচরীর কাজ, বইতে শুরু করেন পরিবারের দায়িত্ব। তিনি ভার নেন ভাইবোনদের শিক্ষার, পালন করেন অভিভাবকের দায়িত্ব। ১৭৮৩তে তিনি আর্থস্বায়ত্তশাসনের জন্যে নেন একটি বিশেষ উদ্যোগ; বান্ধবী ফ্যানি ব্লাড ও বোনদের নিয়ে লন্ডনের নিউইংটন গ্রিনে স্থাপন করেন বিদ্যালয়। তখন নিউইংটন ছিলো ডিসেন্টার, উদারনীতিক বুদ্ধিজীবী ও যাজকদের আবাসিক এলাকা; তাই সেটি ছিলো মেরির মতো স্বাধীনচেতা নারীর উপযুক্ত বাসস্থল। ওই এলাকায় বাস করতেন সংসদসংস্কারপন্থী জেমস বার্গ, বিপ্লববাদী যাজক রিচার্ড প্রাইস। মেরি আর্থিক স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করছিলেন ব'লে তাঁরা সবাই উৎসাহ দিতেন মেরিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেরি বাল্যকাল থেকে বিরোধী ছিলেন পিতার স্বেচ্ছাচারিতার, নিউইংটনে উদারনীতিক বুদ্ধিজীবীদের সংস্পর্শে তিনি বিরোধী হয়ে ওঠেন সব ধরনের স্বেচ্ছাচারী শক্তির। তাঁর বিদ্যালয় সফল হয় নি; এবং নানা সংকটে জীবন ভ'রে ওঠে মেরির। নিউইংটনেই একজন তাঁকে পরামর্শ দেয় লিখে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করার, যা সে-সময়ে কোনো নারীর জন্যে ছিলো অসাধ্য পেশা। কিন্তু মেরির কাছে অসাধ্য ব'লে কিছু ছিলো না। কী নিয়ে লিখবেন তিনি? তিনি বিদ্যালয় খুলেছিলেন বালিকাদের জন্যে, তাই শিক্ষা সম্পর্কে লেখাই ছিলো তাঁর জন্যে সবচেয়ে সহজ। ১৭৮৭তে মেরি লেখেন প্রথম বই *কন্যাদের শিক্ষা সম্পর্কে চিন্তা।* এ-বইতে তিনি প্রথার বিরুদ্ধে যান নি, খ্রিস্টানরা নারীদের জন্যে যে-ভূমিকা ও অবস্থান ঠিক ক'রে রেখেছিলো, তাই মেনে নেন তিনি; কিন্তু *ভিন্ডিকেশন*-এ আর মানেন নি। এ-বই থেকে আয় হয় দশ গিনি। তখন তাঁর নিজের অর্থাভাবের শেষ ছিলো না, তবু ওই টাকাটা তিনি দিয়ে দেন মৃত বান্ধবীর পরিবারকে, কেননা তাদের খুব দরকার। কিছুতেই আর্থস্বনির্ভরতা অর্জন করতে না পেরে ১৭৮৬তে মেরি নেন একটি হীন চাকুরি। তিনি নেন আয়ারল্যান্ডের লেডি কিংসবরোর গভর্নেসের কাজ। এখানেই পরিচিত হন তিনি উচ্চবিত্ত শ্রেণীর বিলাসবহুল অবসরভরপুর অকর্মণ্য জীবনের সাথে, যে-জীবনকে মেরি ঘেন্না করেছেন অন্তর থেকে। তিনি দেখেন উচ্চবিত্ত নারীদের জীবন কাটে কী অসার বিলাসের মধ্যে, কীভাবে নষ্ট হয়ে যায় তাদের চরিত্রের বিকাশ। পরে মেরি এদের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় কথা বলেছেন, উদ্ধারঅযোগ্য ব'লে ঘোষণা ক'রে বিলোপ কামনা করেছেন এদের। সুখের বিষয় গভর্নেসের কাজে মেরির বেশি দিন থাকতে হয় নি।

মেরি যোগাযোগ করেন তাঁর উদারনীতিক প্রকাশক জোসেফ জনসনের সাথে, জানান নিজের পরিকল্পনা। জনসন মেরিকে ফিরে আসতে বলেন লন্ডনে; তাঁর বই প্রকাশ করবেন ব'লেও প্রতিশ্রুতি দেন। মেরি ১৭৮৭তে ফেরেন লন্ডনে; লেখেন তাঁর প্রথম উপন্যাস : *মেরি* (১৭৮৮)। *মেরি* বেশ ভাবাবেগপূর্ণ উপন্যাস, যাতে স্থান পায় তাঁরই দুঃখকষ্টপূর্ণ জীবন। এটি এমন এক তরুণীর কাহিনী, যে প্রতিবেশের চাপ অগ্রাহ্য ক'রে করছে নানা ভালো কাজ। লন্ডনে ফিরে মেরি মুক্তি পান আয়ারল্যান্ডের অভিজাত পরিবারের অন্তঃসারশূন্যতা থেকে, এবং পান নিজেকে বিকশিত করার মতো চমৎকার মননশীল পরিবেশ। প্রকাশক জনসনের দোকানের ওপরের তলায় তখন মিলিত হতেন চিত্রকর হেনরি ফুসেলি, জোসেফ প্রিস্টলি, উইলিয়ম গডউইন, উইলিয়ম ব্লেক, টমাস পেইন প্রমুখ উদারনীতিক বুদ্ধিজীবী। মেরি পান তাঁদের সঙ্গ। তিনি নেন লেখকের জীবিকা, নিজেকে বলেন 'এক নতুন প্রজাতির প্রথম'; কেননা তখনো লেখা কোনো নারীর জীবিকা হয়ে ওঠে নি। মেরিই প্রথম নারী, যিনি লেখাকে করেন জীবিকা।

এ-অভিনব পেশা গ্রহণের পর মেরির জীবন হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ কর্মের ও লক্ষ্যের; তবে মেরি ছিলেন এমন তরুণী, যাঁর মস্তিষ্কটি ছিলো মেধাবী, হৃদয়টি রোম্যান্টিক। তিনি মন দেন লেখায় এবং লেখায়, খুব দ্রুত লেখায়। তিনি কতোটা দ্রুত লিখতে পারতেন, তার পরিচয় বহন করছে *ভিন্ডিকেশন,* যা লিখতে আজ যে-কেউ বছরখানের সময় নেবে, তিনি নিয়েছিলেন মাত্র ছ-সপ্তাহে। রূপসী ছিলেন মেরি, কিন্তু সাজগোজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পছন্দ করতেন না; তাঁর বাসায় বিশেষ আসবাবপত্রও ছিলো না। ফরাশি নেতা ট্যালির্যাঁদ তাঁর বাসায় এলে তিনি তাঁকে ভাঙা পেয়ালায় চা খেতে দিয়েছিলেন। টাকা তাঁর সহজ আয়ের জিনিশ ছিলো না, তাই অপচয়ের জিনিশও ছিলো না। মেরি লিখতে আর অনুবাদ করতে থাকেন জনসনের *অ্যানালিটিকেল রিভিউর* জন্যে, ক্রমশ বিশ্বাস অর্জন করতে থাকেন নিজের সামাজিক রাজনীতিক নান্দনিক বোধ সম্পর্কে। তিনি পুস্তক সমালোচনা লিখে লিখে তৈরি করতে থাকেন নিজের দৃঢ় ভিত্তি। তখনকার লন্ডনের রক্ষণশীল বুদ্ধিজীবীদের প্রধান বার্ক দু-হাতে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছিলেন সব বিপ্লব ও সামাজিক পরিবর্তন। ফরাশি বিপ্লবের বিরুদ্ধে তিনি লেখেন *রিফ্লেকশনস অন দি ফ্রেঞ্চ রেভোলিউশন।* মেরি এর উত্তরে লেখেন *এ ভিন্ডিকেশন অফ দি রাইট্‌স্ অফ মেন* (১৭৯০); নারী-অধিকার প্রতিপাদনের আগে মেরি প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেন মানুষের অধিকার। এ-বইতে মেরি আক্রমণ করেন রক্ষণশীলতাকে, ব্যক্ত করেন মানুষ, সমাজব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর প্রগতিশীল বক্তব্য; দাবি করেন যে নাগরিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা মানুষের জন্মাধিকার, শুধু স্বৈরাচারই মানুষকে বঞ্চিত করে এসব অধিকার থেকে। বার্ক যাদের সেবক, সে-অভিজাতদের তিনি বলেন 'উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত নপুংসকতা দ্বারা খাসি করা পদাধিকারী উড়নচণ্ডী লম্পট'। মেরি চরম প্রতিপক্ষ ছিলেন উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত শক্তিমান ও ধনবানদের।

মানুষের অধিকার দাবির এক বছর পর, ১৭৯১-এ, মেরি দাবি করেন নারীর অধিকার; লেখেন *ভিন্ডিকেশন।* জোসেফ জনসন বইটি প্রকাশ করেন ১৭৯২-এ। প্রথম সংস্করণে মুদ্রণত্রুটি ছিলো অনেক, তাই মেরি ওই বছরই বের করেন দ্বিতীয় সংশোধিত সংস্করণ, এবং এটিই গৃহীত বইটির শুদ্ধ সংস্করণরূপে। মেরির বইটিই অকাট্য নীতিপ্রণালিভিত্তিক নারীমুক্তির প্রথম সুপরিকল্পিত প্রস্তাব, ইশতেহার, ঘোষণা; নারীবাদের আদিগ্রন্থ। বিপ্লবকে কাছে থেকে দেখার জন্যে ১৭৯২-এ মেরি যান ফ্রান্সে। এর মাঝে বেরিয়েছে বইটির ফরাশি সংস্করণ, তাই মেরি সেখানে হয়ে উঠেছেন খ্যাতিমান। তিনি সেখানে গৃহীত হন সাহিত্যিক ও রাজনীতিক লেখকদের এক আন্তর্জাতিক সংঘে, যাতে ছিলেন হেলেন মারিয়া উইলিয়ম্‌স্, জোয়েল বারলো, ফরাশি বিপ্লবী ব্রিসো, এবং মানুষের মুক্তির মহাপ্রবক্তা টমাস পেইন। বইটি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন ফরাশি নেতা ট্যালির্যাঁদের নামে, আশা করেছিলেন নারীশিক্ষা সম্পর্কে আইনপ্রণয়নে ট্যালির্যাঁদ প্রভাবিত করবেন সংসদকে। তাঁর আশা পর্যবসিত হয় হতাশায়। বিপ্লবীরাও বিশ্বাস করে নারী-অধীনতায়। ব্যর্থ হয়ে যায় ফরাশি বিপ্লব, খুশি হয় বার্কেরা; তবু মেরি লেখেন *অ্যান হিস্ট্রিকেল অ্যান্ড মোরাল ভিউ অফ দি অরিজিন অ্যান্ড প্রোগ্রেস অফ দি ফ্রেঞ্চ রেভোলিউশন* (১৭৯৪)। তিনি হতাশ হন, তবু জনগণের ওপর বিশ্বাস হারান না।

প্যারিসে মেরির পরিচয় হয় গিলবার্ট এমলের সাথে। সে মার্কিন, একটি ভাবালু উপন্যাসের লেখক, তবে ব্যবসায়ী। তার সাথে পরিচয়ই মেরির জীবনের প্রধান দুর্ঘটনা। মেরি তার প্রেমে পড়েন, কিন্তু এমলে আকর্ষণ বোধ করে মেরির দেহের প্রতি। তাঁরা তিন বছর একত্র বাস করেন, বিয়েতে বিশ্বাসহীন মেরি বিয়ে করতে চাইলেও বিয়ে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁদের হয় নি। তাঁদের একটি মেয়ে (মে ১৭৯৪) হয়, নাম ফ্যানি এমলে। এর পর এমলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে মেরির কাছে থেকে; আর মেরি মেয়ে নিয়ে ছোটেন এমলের পেছনে পেছনে, প্যারিস থেকে লা হাভারে, লন্ডনে, আবার প্যারিসে। এমলে ছুটতে থাকে টাকা আর অন্য নারীর পেছনে। ১৭৯৫-এ মেরি মেয়ে আর একটি পরিচারিকা নিয়ে যান স্ক্যান্ডিনেভিয়ায়। সেখানে পালন করেন এক অদ্ভুত দায়িত্ব, করেন এমলের ব্যবসাপ্রতিনিধির কাজ। সেখানে থাকার সময় মেরি এক কল্পিত অনুপস্থিত প্রেমিকের উদ্দেশে পত্রাকারে লেখেন জর্নাল; কয়েক মাস পরে তা বেরোয় *লেটার্স রিটেন ডিউরিং এ শর্ট রেসিডেন্স ইন সুইডেন, নরওয়ে অ্যান্ড ডেনমার্ক* (১৭৯৬) নামে। জীবনের চরম সংকটকালে লেখা এ-চিঠিগুলো বিস্ময়করভাবে প্রশান্ত, কাব্যিক, ও সমাজসমালোচনা-মুখর। লন্ডনে ফিরে মেরি দেখেন এমলে বাস করতে শুরু করেছে একটি অভিনেত্রীর সাথে। ক্লান্ত কাতর মেরির কাছে জীবন হয়ে ওঠে দুর্বহ; একরাতে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন টেমস নদীতে। কিন্তু ব্যর্থ হন আত্মহত্যায়। যে-প্রেমের বিরুদ্ধে লিখেছিলেন মেরি *ভিন্ডিকেশন*-এ, তার প্ররোচনায়ই নারীবাদের মহাদেবী বেছে নেন আত্মহত্যা।

কিন্তু জীবন তখনো অপেক্ষা ক'রে ছিলো তাঁর জন্যে; মৃত্যু থেকে উঠে এসে মেরি ঢোকেন জীবনে : *এনকোয়ারি কনসারনিং পলিটিক্যাল জাস্টিস*-এর (১৭৯৩) আলোড়নজাগানো লেখক দার্শনিক উইলিয়ম গডউইনের সাথে গ'ড়ে ওঠে তাঁর হৃদয়সম্পর্ক। গডউইনের সাথে সম্পর্কের সময়টা মেরির জীবনের সবচেয়ে সুখের সময়; ওই দার্শনিক ভালোবেসেছিলেন মেরিকে, ও মেরির লেখাকে। মেরির মৃত্যুর পর তিনিই লিখেছিলেন মেরির অকপট জীবনী, ও সম্পাদনা করেছিলেন মেরির রচনাবলি। মেরি ও গডউইন কেউই বিশ্বাস করতেন না বিয়েতে; তাঁদের কাছে বিয়ে ছিলো কৃত্রিম চুক্তি, যা সৎমানুষের জন্যে অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু তাঁরা, মেরি গর্ভবতী হয়ে পড়লে, বিয়ে করেন। সন্তান প্রসবের জন্যে যখন অপেক্ষা করছিলেন মেরি, তখন তিনি লিখে চলছিলেন *রংস অফ উইমেন* (১৭৯৮) নামে একটি উপন্যাস। মেরি যখন সুখী, তখনই পরিহাসের মতো এগিয়ে আসে মৃত্যু। নারীবাদের মহানারী, বিয়েতে অবিশ্বাসী কিন্তু বিবাহিত, মেরি মৃত্যু বরণ করেন নারীদেরই এক পুরোনো শাস্তিতে : সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মৃত্যু হয় মেরির ১৭৯৭-এর আগস্টে, আটত্রিশ বছর বয়সে। তিনি উপহার দিয়ে যান একটি মেয়ে, যার নাম মেরি গডউইন শেলি : পৃথিবীর বিখ্যাততম গথিক উপন্যাস *ফ্র্যাংকেনস্টাইন*-এর লেখিকা, কবি শেলির দ্বিতীয় স্ত্রী।

মেরি *ভিন্ডিকেশন* লিখেছিলেন এমন এক সময়ে, যখন পশ্চিমে চলছিলো প্রচণ্ড সামাজিক রাজনীতিক ভাঙাগড়া, যখন বিপ্লব ছিলো অধিকাংশের স্বপ্ন। ফ্রান্সে তখন বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ঘোষণা করা হচ্ছিলো সাধারণ মানুষের অধিকার, বিলেতে আমূলবাদীদের ভয়ে শংকিত হয়ে পড়ছিলো অভিজাততন্ত্র। ওই আমূলবাদেরই এক উৎসারণ মেরির *ভিন্ডিকেশন।* তাঁরা তখন প্রশ্ন তুলছিলেন সমস্ত প্রচলিত সামাজিক রাজনীতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে; অনুপ্রাণিত ছিলেন লক ও রুশোর মত দিয়ে যে রাজা বা অভিজাততন্ত্র ক্ষমতার অধিকারী নয়, সাধারণ মানুষই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। বিলেতে তখন অধিকাংশ মানুষেরই ছিলো না সাধারণ নাগরিক অধিকার, সব অধিকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলো অভিজাতমণ্ডলির। সেটা টম পেইনের *রাইট্স্ অফ ম্যান*-এর কাল। যে-বোধ থেকে পেইন লিখেছিলেন *রাইট্স্ অফ ম্যান*, সে-বোধেই মেরি লিখেছিলেন *রাইট্স্ অফ ওম্যান।* মেরির আগেও কেউ কেউ বলেছেন নারীর ভূমিকা ও অধিকারের কথা, তবে মেরি তাঁদের মতো ক'রে বলেন নি; মেরি বলেছেন নিজের বিপ্লবী রীতিতে। তিনি কোনো পুরোনো ধারার উত্তরাধিকারী নন, তিনিই স্রষ্টা এক নতুন ধারার, যাকে এক সময় বলা হতো নারীমুক্তি আন্দোলন, এখন বলা হয় নারীবাদ। মেরি নারীর অধিকারের কথা বলতে গিয়ে তুলে ধরেন সমগ্র রাজনীতিক ও সামাজিক সংশ্রয়কে, যা নারীপুরুষের জীবনের সাফল্য সম্পর্কে তৈরি করেছে দ্বৈত মানদণ্ড, নারীকে ঠেলে দিয়েছে নিকৃষ্ট অবস্থানে, করেছে পুরুষাধীন। বিলেতে তখন নারী ছিলো পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতোই শোচনীয় অবস্থায় : ধর্ম, সমাজ, আইন সব কিছুই নারীকে ক'রে রেখেছিলো মনুষ্যেতর। গরিব নারীদের শেষ ছিলো না দুর্দশার, আর অভিজাত নারীরা জীবন যাপন করছিলো বিলাসী পশুর জীবন। মেরির আগে যাঁরা নারীর অবস্থাবদলের কথা বলেছেন, তাঁরা কেউ নারীর মুক্তির কথা বলেন নি; তাঁরা বলেছেন পুরুষাধীন থেকে নারীর আরেকটুকু ভালো থাকার কথা। তাঁরা সবাই প্রচার করেছেন যে পুরুষের কাছে মোহনীয়, রমণীয় হওয়াই নারীর সার্থকতা। সে-সময়ে যে-নারীরা কিছুটা 'মুক্তি' পেয়েছিলেন, যাঁরা 'নীলমুজো' নামে বদনাম অর্জন করেছিলেন, তাঁরাও প্রথাগত ধারণা থেকে দূরে যান নি; তাঁরাও বিশ্বাস করতেন নারীর সহজাত নিকৃষ্টতায়।

এ ভিন্ডিকেশন অফ দি রাইট্স্ অফ ওম্যান সুশীল ভদ্রবই বা কোনো সুশীলা ভদ্রবালার লেখা বই নয়, এটি বিপ্লবীর লেখা বিপ্লবী বই। মেরি চিত্তবিনোদন করতে বা ঘুম পাড়াতে চান নি, চেয়েছেন জাগিয়ে তুলতে। তিনি লিখতে চেয়েছেন উপকারী বই, বলেছেন, 'আমার লক্ষ্য উপকারে আসা।' বইটির প্রতি অনুচ্ছেদে ছড়িয়ে আছে মেরির তীব্র ব্যক্তিত্ব, তাঁর কৌতুক ও ক্রোধ জ্ব'লে উঠেছে বার বার। মেরি নারীর অধিকারের কথা বলেছেন, তবে বলেছেন প্রধানত মধ্যবিত্ত নারীর কথা। উচ্চবিত্ত নারীদের তিনি ঘেন্না ও করুণা করতেন, বিশ্বাস করতেন যে উচ্চবিত্ত শ্রেণীটি লুপ্ত হয়ে যাবে। দারিদ্র্য তাঁর চোখে মহান ছিলো না, দারিদ্র্যের নির্মমতার সাথে খুব ভালোভাবেই পরিচিত ছিলেন মেরি; তাই নিম্নবিত্তদের জন্যে তাঁর দরদের অভাব না থাকলেও কীভাবে তাদের সমস্যার সমাধান হবে, তা তিনি বলেন নি। তিনি বলেছেন মধ্যবিত্ত নারীদের কথা, কেননা তারাই রয়েছে 'স্বাভাবিক অবস্থায়'। মেরি তাঁর বইয়ের শুরুতে, প্রথম তিন পরিচ্ছেদে, প্রতিষ্ঠা করেছেন মৌল নীতিগুলো, যার ওপর ভিত্তি ক'রে তিনি দাবি করেছেন নারীর অধিকার। তারপর তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে প্রতিবেশের প্রভাবে বিকৃত হয়েছে নারীরা; দেখিয়েছেন আঠারোশতকের নারীবিরোধী ধারার কয়েকজনের, বিশেষ ক'রে রুশোর লেখার প্রতিক্রিয়াশীলতা ও ভ্রান্তি। শেষে আলোচনা করেছেন নারীর অবস্থান, শিশুশিক্ষা, পরিবার প্রভৃতি সম্পর্কে।

মেরির লক্ষ্য ছিলো সুস্পষ্ট, বইটির প্রতি পাতায় তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে নারীপুরুষের অসাম্য মানুষের তৈরি ব্যাপার। বইয়ের শুরুতে, *ভূমিকার* প্রথম বাক্যেই মেরি বলেছেন :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে, এবং চারপাশের জগতের দিকে উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠায় তাকিয়ে আমার চেতনা পীড়িত হয়েছে বেদনার্ত ক্ষোভের সবচেয়ে বিষণ্ণ আবেগে, এবং আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলেছি একথা স্বীকার ক'রে যে হয়তো প্রকৃতিই পুরুষ ও নারীর মধ্যে সৃষ্টি করেছে বড়ো বিভেদ, নয়তো পৃথিবীতে এ-পর্যন্ত যে-সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে, তা খুবই পক্ষপাতপূর্ণ।

নারীপুরুষের প্রাকৃতিক বিভেদের কথাটা তাঁর নয়, প্রথাগতদের; তিনি বিশ্বাস করেন যে সভ্যতা একদেশদর্শী, বিভেদ মানুষেরই সৃষ্টি। তিনি বেছে নিয়েছেন মধ্যবিত্ত নারীদের, বলেছেন, 'আমি বিশেষ মনোযোগ দেবো মধ্যবিত্তদের প্রতি, কেননা তারাই সবচেয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় আছে ব'লে মনে হয়।' তিনি তাঁর সময়ের নারীদের জানতেন ভালোভাবে, যারা পুরুষতন্ত্রের সমস্ত বাজে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলো মন দিয়ে; তিনি চান তাদের বিপরীত দৃষ্টিকোণ দেখতে, ও ভিন্ন মানুষে পরিণত করতে। মেরি বলেছেন [ভূমিকা] :

> আমার লিঙ্গশ্রেণীয়রা, আশা করি, আমাকে ক্ষমা করবেন, যদি আমি তাদের রমণীয় রূপের তোষামোদ করার বদলে তাদের গণ্য করি বুদ্ধিমান প্রাণীরূপে, এবং যদি আমি মনে না করি যে তাঁরা রয়ে গেছেন চিরশৈশবে, যাঁরা নিজেরা দাঁড়াতে পারেন না।

তাঁর লিঙ্গশ্রেণীয়রা দুর্বল সব দিকে, তিনি তাদের উদ্দীপ্ত করতে চেয়েছেন, 'যাতে তাঁরা শরীর ও মন উভয়েরই শক্তি অর্জনের চেষ্টা করেন।' নারীর যে-অবস্থা তিনি দেখেছেন :

> একমাত্র উপায়ে নারীরা পৃথিবীতে দাঁড়াতে পারে-বিয়ে ব'সে। এ-কামনা তাদের পশুতে পরিণত করে, যখন তাদের বিয়ে হয় তখন তারা এমন আচরণ করে যা শুধু শিশুদের কাছেই আশা করা যায়-তারা সাজগোজ করে, তারা রঙ মাখে।

মেরি তাঁর বইটি উৎসর্গ করেছিলেন ফরাশি রাজনীতিক নেতা ট্যালির্যাঁদের নামে। পাঁচ পাতার উৎসর্গবক্তব্যে তিনি কতকগুলো দাবি জানান, বলেন, 'আমি আমার লিঙ্গের পক্ষে দাবি করছি, নিজের জন্যে নয়।' ফরাশি বিপ্লবের বাণী ছিলো তাঁর সমস্ত চেতনা জুড়ে, তা তিনি প্রকাশ করেছেন স্পষ্ট ভাষায় [উৎসর্গ] :

> স্বাধীনতাকে আমি দীর্ঘ কাল ধ'রে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন, সব গুণের ভিত্তি ব'লে গণ্য ক'রে আসছি; আমার সব চাওয়া সংকুচিত ক'রে হ'লেও আমি নিশ্চিত করবো আমার স্বাধীনতাকে, যদি আমাকে উষর প্রান্তরে বাস করতে হয় তবুও।

একটি মৌলিক প্রশ্ন করেছেন মেরি : 'চরম বিচারক ক'রে কে তৈরি করেছে পুরুষদের?' তিনি দাবি করেছেন নারীপুরুষের সাম্য, যার মূলে রয়েছে তাঁর নৈতিকবোধ ও বিশ্বাস যে পীড়ন অশুভ পীড়নকারী ও পীড়িত দুয়ের জন্যেই। তিনি বলেছেন, 'তারা সুবিধাজনক দাসী হ'তে পারে, তবে দাসত্বের বিক্রিয়া ঘটে সব সময়, তা পতিত করে প্রভুকে এবং তার শোচনীয় আশ্রিতকে।'

ভিন্ডিকেশন-এর প্রথম দু-পরিচ্ছেদের নাম 'মানুষের অধিকার ও দায়িত্ব বিবেচনা' ও 'লৈঙ্গিক চরিত্র সম্পর্কে প্রচলিত মতামত বিবেচনা'। মেরি এ-দু-পরিচ্ছেদে নারী ও তার ভূমিকা সম্পর্কে প্রচলিত মত আলোচনা ক'রে দেখিয়েছেন সেগুলোর ভ্রান্তি, এবং বর্জন করেছেন সেগুলো। শতাব্দীপরম্পরায় সবাই বলেছে ও লিখেছে বিধাতাই নারীকে তৈরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছে পুরুষের থেকে হীন ক'রে, নারী সহজাতভাবেই নিকৃষ্ট; একে তিনি উড়িয়ে দিয়েছেন 'বাজে কথা' ব'লে। তাঁর কাছে মানুষের বৈশিষ্ট্য বুদ্ধি বা যুক্তিশীলতা; তিনি স্বীকার করতে রাজি নন যে বিধাতা নারীকে মানুষ হিশেবে তৈরি ক'রে তারপর কেড়ে নিয়েছে তার বুদ্ধিবিবেচনা। মেরির মতে মানুষ ও সভ্যতার অগ্রগতির বড়ো বাধা স্বেচ্ছাচারী অবৈধ ক্ষমতা, এবং ক্ষমতাসংঘগুলো ব্যক্তি ও সমাজকে পীড়ন ক'রে দূষিত ক'রে ফেলেছে। মেরি স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতার চরম প্রতিপক্ষ, তিনি ঘৃণা করেন উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষমতাকে; *ভিন্ডিকেশন*-এ বার বার মেরি প্রকাশ করেছেন তাঁর ঘেন্না। তিনি বলেছেন, যে-সব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অন্যদের ওপর আধিপত্য করে উত্তরাধিকার-লব্ধ ধন ও ক্ষমতার মতো কৃত্রিম অধিকার দিয়ে, তারা হয়ে ওঠে তোষামোদপরায়ণ, অলস, অগ্রগতির প্রতিবন্ধক। প্রচণ্ড আক্রমণ করেছেন মেরি অভিজাততন্ত্র, সেনাবাহিনী, ও গির্জাকে, কেননা এগুলো স্বেচ্ছাচারী শক্তিসংঘ। মেরি বলেছেন, 'উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত মর্যাদা, ধন, রাজত্ব থেকে উৎসারিত হয়েছে' অশেষ দুর্দশা; এবং 'সব ধরনের ক্ষমতাই দুর্বল মানুষদের মাতাল ক'রে তোলে; এবং এর অপব্যবহার প্রমাণ করে যে মানুষের মাঝে যতো বেশি সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজে ততো বেশি বিরাজ করবে নৈতিক উৎকর্ষ ও সুখ'।

মেরি রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, সেনাবাহিনী, পুরোহিততন্ত্রের করেছেন প্রবল সমালোচনা, কেননা এগুলো টিকে আছে উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাচারী শক্তির ওপর ভর ক'রে। তিনি বলেছেন এসব সংস্থা যতোদিন আছে, ততোদিন অসম্ভব পরিবর্তন, তাই দরকার এসব সংস্থার বিলোপসাধন। মেরি নারীর অবস্থার একটু-আধটু উন্নতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না; নারীর অবস্থা একটু ভালো করা হ'লে, বা একদল অভিজাত নারীকে একটু ওপরে উঠোনো হ'লে সমস্যার সমাধান হবে না, তাই তিনি চেয়েছেন সার্বিক বদল। তিনি বলেছেন, সামাজিক ও আর্থ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বদল ছাড়া সমাজের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বদল ঘটবে না। উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত ধন, ক্ষমতা সবই যুক্তি ও পরিবর্তনের প্রতিবন্ধক। সমাজের সম্পূর্ণ বদলের কথা না ব'লে শুধু নারীর অবস্থাবদলের কথা তাঁর কাছে ছিলো নিরর্থক, কেননা যে-স্বেচ্ছাচারী শক্তি পীড়ন করছে নারীকে, সে-শক্তিই আধিপত্য করছে সমাজের অধিকাংশ পুরুষের ওপর। মেরি বার বার চমৎকার আক্রমণ করেছেন উত্তরাধিকাপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতাকে, দেখিয়েছেন ওগুলো কীভাবে রোধ করছে মানুষের মুক্তি। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মেরি দেখিয়েছেন পুরুষতন্ত্র নিজেদের আধিপত্য টিকিয়ে রাখার জন্যে কীভাবে ভিন্ন ক'রে দিয়েছে নারীদের ভূমিকা, নারীকে দিয়েছে সাফল্যের ভিন্ন আদর্শ, 'নিষ্পাপতা'র নামে রেখে দিয়েছে 'অজ্ঞানতা'র মধ্যে। নারীকে কী শিক্ষা দেয়া হয়? মেরি বলেছেন :

> বাল্যকাল থেকেই নারীদের বলা হয়, এবং তাদের মাদের উদাহরণ দেখিয়ে শিক্ষা দেয়া হয়, যে পুরুষের দুর্বলতা সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান, যাকে ঠিকভাবে বলতে হয় চতুরতা, নম্র মেজাজ, দেখানো আনুগত্য, বালসুলভ শোভনতার প্রতি সতর্ক মনোযোগের সাহায্যেই তারা পাবে পুরুষের রক্ষণাবেক্ষণ; আর যদি রূপসী হয়, তাহলে তাদের জীবনের কমপক্ষে বিশ বছরের জন্যে আর কিছুর দরকার নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এভাবেই নষ্ট ক'রে দেয়া হয়েছে নারীকে। পুরুষ নারীর মধ্যে চেয়েছে 'নম্রতা ও মধুর আবেদনময়ী সৌন্দর্য', নারীকে ক'রে রাখতে চেয়েছে 'চিরশিশু', দেয় নি তাকে বিকশিত হ'তে। নারীকে যে-শিক্ষা দেয়া হয়েছে, তা শুধু নিরর্থকই নয়, ক্ষতিকরও। মেরি বলেছেন :

> আমাকে দুর্বিনীত বলতে পারেন; তবু আমি যা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি তা আমাকে বলতে হবে যে রুশো থেকে ডঃ গ্রেগরি পর্যন্ত যাঁরা নারীশিক্ষা ও ভদ্রতা সম্পর্কে লিখেছেন, তাঁরা সবাই নারীকে সাহায্য করেছেন আরো কৃত্রিম, দুর্বল চরিত্রের হয়ে উঠতে, এবং পরিণামে তাদের ক'রে তুলেছেন সমাজের আরো বেশি অপদার্থ সদস্য।

তিনি দেখিয়েছেন নারীদের দেয়া হয়েছে যে-শিক্ষা, তা তাদের পরিণত করেছে পুরুষের ভোগ্যবস্তুতে। নারীকে তার বুদ্ধির বিকাশ ঘটাতে দেয়া হয় নি, তাকে উৎসাহিত করা হয়েছে ইন্দ্রিয়ের বিকাশ ঘটাতে। মস্তিষ্কহীন নারী ও সেপাইয়ের তুলনা ক'রে মেরি বলেছেন, 'তাদের শেখানো হয়েছে অন্যদের সন্তোষ বিধান করতে, এবং তারা বেঁচে আছে শুধু সন্তোষবিধানের জন্যে।' রুশো ছিলেন মেরির প্রিয়, কিন্তু মেরি রুশোর নারীতত্ত্ব বাতিল ক'রে দিয়েছেন যুক্তিসম্মতভাবে। রুশো শিক্ষা দিয়েছেন নারী মুহূর্তের জন্যেও নিজেকে স্বাধীন ভাববে না, পুরুষের কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় ক'রে তোলার জন্যে নারী হবে আবেদনময়ী ছেনাল, নারী হবে পুরুষের অবসর বিনোদনের মধুর সহচরী। মেরি একে বলেছেন, 'হোয়াট ননসেন্স!' নারীকে যে প্রেমের কথা বেশি ক'রে শোনানো হয়, তারও বিরুদ্ধতা করেছেন মেরি, কেননা তা নারীকে দুর্বল ক'রে তোলে। নারীকে সমাজ একরাশ বাজে শিক্ষা দিয়ে যে অদ্ভুত প্রাণীতে পরিণত করেছে, মেরি তা আলোচনা ক'রে বাতিল ক'রে দিয়েছেন। পুরুষ সম্পর্কে মেরি বলেছেন :

> পুরুষকে আমি ভালোবাসি আমার সমকক্ষ সঙ্গী হিশেবে; তবে তার রাজদণ্ড, সত্য বা আরোপিত, যেনো আমার দিকে প্রসারিত না হয়, যদি না কোনো ব্যক্তির যুক্তিবুদ্ধি দাবি করে আমার শ্রদ্ধানুগত্য; এমনকি তখনো আমার আনুগত্য হবে তার বুদ্ধির কাছে, পুরুষটির কাছে নয়।

নারী এতোদিন ধ'রে পুরুষের অধীন রয়েছে ব'লেই যে নারী পুরুষের থেকে নিকৃষ্ট এটা মেরির কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তারা সমান, তাই তারা পালন করবে একই মানবিক দায়িত্ব। মেরি বলেছেন, 'আমি মেনে নিচ্ছি যে নারীর রয়েছে ভিন্ন দায়িত্ব পালনের ভার; তবে সেগুলো হবে *মানবিক* দায়িত্ব, এবং আমি দৃঢ়ভাবে মনে করি যে সে-সব পালনের নীতিও হবে অভিন্ন।'

ভিন্ডিকেশন-এর চতুর্থ পরিচ্ছেদ 'বিভিন্ন কারণে নারী যে-অধঃপতিত অবস্থায় পৌঁচেছে, সে-সম্পর্কে মন্তব্য'। মেরি বলেছেন, নারী প্রাকৃতিকভাবেই দুর্বল, না পরিস্থিতির প্রভাবে দুর্বল এটা স্পষ্ট; এবং তিনি স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে নারী পরিস্থিতির শিকার। মেরির মতে নারী বর্তমানকে উপভোগ করতে গিয়ে, ভবিষ্যতের কথা না ভেবে নষ্ট করেছে নিজেকে। মেরি মনে করেন 'নারীকে শুধু পুরুষের বিনোদের জন্যে সৃষ্টি করা হয় নি, এবং তার লৈঙ্গিকতা নষ্ট ক'রে দেবে তার মানবিকতা, তা হ'তে পারে না।' পুরুষ নারীকে ক'রে রাখতে চেয়েছে লৈঙ্গিক প্রাণী, নারীকেও শিখিয়েছে যে লৈঙ্গিক প্রাণী হওয়াই তার জন্যে ভালো। নারীকে করতে দেয়া হয় নি বুদ্ধির চর্চা, তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবৃত্তিকে ক'রে তোলা হয়েছে প্রধান। মেরি বলেছেন, বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ থেকে সাধারণ সূত্র তৈরি করার শক্তিই জ্ঞান, কিন্তু নারীকে দেয়া হয় নি তার সুযোগ। পুরুষ নারীকে এ-শক্তিলাভের সুযোগ তো দেয়ই নি, বরং প্রচার করেছে যে নারীর লৈঙ্গিক স্বভাবের সাথে জ্ঞান সামঞ্জস্যহীন। মেরির মতে বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার সুযোগ না পেয়েই পতন ঘটেছে নারীর; তারা মেতে উঠেছে বা তাদের মাতিয়ে তোলা হয়েছে স্থূল ইন্দ্রিয়চর্চায়। নারীর পেশা হয়েছে বিনোদন করা, নারী 'রূপের সার্বভৌমত্ব'কে মেনে নিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে তার স্বাধীনতাকে, এবং বোধ করেছে 'হীনতার গৌরব'। নারীকে শেখানো হয়েছে তুচ্ছ সব ব্যাপারে গৌরব বোধ করতে। মেরি দেখিয়েছেন উপন্যাস, সঙ্গীত, কবিতা নারীকে ক'রে তুলেছে ইন্দ্রিয়াতুর প্রাণী; তারা সব কিছু অর্জন করতে চায় রূপ ও দুর্বলতা দিয়ে। তারা ভঙ্গুর হয়ে উঠেছে, তাই সব কিছুতে নির্ভর করে পুরুষের ওপর।

ভিন্ডিকেশন-এর পঞ্চম পরিচ্ছেদ 'কয়েকজন লেখক, যাঁরা নারীকে পরিণত করেছেন করুণার পাত্রে, যা প্রায় মানহানির কাছাকাছি, তাঁদের সমালোচনা'। অসামান্য, এবং অত্যন্ত প্রভাবশালী, পরিচ্ছেদ এটি; এটি নারীবাদীদের অনুপ্রাণিত ক'রে চলছে দু-শো বছর ধ'রে। এটির প্রেরণায় আধুনিক নারীবাদীরা বাতিল ক'রে দিয়েছেন সাম্প্রতিক অনেক মহাপুরুষকে, যেমন মেরি বাতিল করেছিলেন রুশো ও অন্যদের। মেরি অনুরাগী ছিলেন রুশোর, বিশ্বাসী ছিলেন তাঁর রাজনীতিক আদর্শে; কিন্তু রুশোর নারীদর্শন তাঁর কাছে মনে হয়েছে অত্যন্ত আপত্তিকর, কেননা তা নারীকে পুরুষাধীন রাখার দর্শন। উদ্ধৃতির পর উদ্ধৃতি দিয়ে মেরি বাতিল করেছেন রুশোকে, দেখিয়েছেন রুশোর প্রতিক্রিয়াশীলতা। মেরির আলোচনার পর রুশো আর রুশো থাকেন না, হয়ে ওঠেন এক বিভ্রান্ত দার্শনিক, যাঁর নারীতত্ত্ব গ্রহণ করলে মানুষের মুক্তির কথা হয়ে ওঠে হাস্যকর প্রলাপ। মেরি দেখিয়েছেন রুশো তাঁর নিজের দর্শনের করুণ শিকার; তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন উদারনীতিক আদর্শের সাথে। মেরি বলেছেন, রুশোর যেখানে দেখা উচিত ছিলো যুক্তি দিয়ে, সেখানে তিনি দেখেছেন আবেগ দিয়ে; এবং নারীকে নষ্ট করেছেন। নারী সম্পর্কে রুশোর তত্ত্বকে মেরি বলেছেন 'পুংস্বৈরাচার'। রুশোর আদর্শ নায়িকা সোফি মেরির কাম্য নারীর সম্পূর্ণ বিপরীত। রুশো চান পুরুষনির্ভর রূপসী ছেনাল; মেরি চান স্বাধীন, চরিত্রসম্পন্ন নারী, যে আর্থিকভাবে আত্মনির্ভর। রুশোর কাছে যা রমণীয়, মেরির কাছে তা অনৈতিক ও বিপজ্জনক। রুশোর আদর্শ নারী একই সাথে নির্বোধ ছেনাল ও শোচনীয় সতী। রুশো নারীকে শিখিয়েছেন স্বামী স্ত্রীকে অন্যায়ভাবে অসতীও বললে নারী তার প্রতিবাদ করবে না; সে অভিযোগ মেনে নিয়ে থাকবে স্বামীর অনুগত। মেরির মতে এটা নারীকে সম্পূর্ণ নষ্ট করার কুশিক্ষা। মেরি রুশোকে যেমন বাতিল করেছেন তেমনই বাতিল করেছেন জেমস ফোরডাইস ও ডঃ গ্রেগরিকে। তখন খুব প্রভাবশালী ছিলো ফোরডাইসের *সারমন্‌স্ টু ইয়াং উইমেন* (১৭৬৫), *দি ক্যারেক্টার অ্যান্ড কন্ডাক্ট অফ দি ফিমেল সেক্স* (১৭৭৬), ও গ্রেগরির *লেগ্যাসি টু হিজ ডটার।* মেরি দেখান এঁদের ভ্রান্তি। এ ছাড়া মাদাম গেনলিসের *লেটার্স অন এডুকেশন*, লর্ড চেস্টারফিল্ডের *লেটার্স*ও আলোচনা ক'রে দেখান এগুলোর অপশিক্ষা। এ-পরিচ্ছেদে মেরি পরিষ্কার করেন বিপুল আবর্জনা, যা এতোদিন চলছিলো দর্শন ও প্রাজ্ঞতার নামে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেরির ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 'চরিত্রের ওপর আবাল্যজড়িত ভাবাদর্শের প্রভাব'। মেরি প্রয়োগ করেন জন লকের মনোবিজ্ঞান, শূন্য শ্লেটতত্ত্ব, এবং দেখান নারীর চরিত্রের ওপর প্রতিবেশের প্রভাব অশেষ। রক্ষণশীলদের মতে নারী বিধির বিধানেই অধম, মেরি দেখান প্রতিবেশই নারীকে করেছে এমন। নারীর নিকৃষ্টতার মূলে নক্ষত্র নেই, তার শরীরও নেই, আছে সর্বনাশা প্রতিবেশ। বাল্যকাল থেকেই, মেরি দেখান, মাবাবা ও অভিভাবকেরা বালিকাকে শেখায় যে তাকে হ'তে হবে আদর্শ নারী; তাকে ঢালাই করা হয় শোচনীয় আদর্শ নারীর ছাঁচে। মেয়েরা দেখে তাদের সুখ নির্ভর করে তারা কতোটা পুরুষের কাছে উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারে, তার ওপর। সামাজিকীকরণের ফলে তারা হয়ে ওঠে শারীরিক মানসিকভাবে দুর্বল, নির্বোধ, অন্তঃসারশূন্য, মূর্খ, চতুর, রূপসচেতন, ভাবালুতাপূর্ণ, অর্থাৎ অপদার্থ। প্রথম তারা এসব শেখে মায়ের কাছে থেকে, তারপর সারা সমাজ থেকে। তিনি মেয়েদের শারীরিক ও মানসিক দু-রকম শক্তি অর্জনের কথাই বলেছেন। মেরি বলেন, ঘরকন্নাও নষ্ট করে নারীদের; ঘরকন্না তাদের এমন বিপর্যস্ত করে যে তাদের পক্ষে চিন্তা করার শক্তি ও সুযোগ থাকে না। মেয়েরা কী পড়ে? মেরি বলেছেন, সুযোগ পেলে তারা ইতিহাস, দর্শন পড়ে না, পড়ে সাধারণত উপন্যাস। না পড়ার থেকে যা-কিছু পড়াই মেরির কাছে ভালো, তবে উপন্যাস পড়া তাঁর কাছে কোনো শিক্ষাই নয়। তিনি ভাবালুতাপূর্ণ উপন্যাসের কথাই বলেছেন; ওই উপন্যাস মেয়েদের উদ্ভট কল্পরাজ্যে নিয়ে যায়, বাস্তবের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় না। *ভিন্ডিকেশন*-এ মেরি নারীর ভূমিকা, শিক্ষা, শিশুপালন, অর্থনীতি, কাজ, ভূমিকা-সম্প্রসারণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন বিস্তৃতভাবে। অর্থনীতিটা ছিলো তাঁর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ; তাঁর মতে জীবিকা অর্জনের সামর্থ্যই মানুষকে দেয় স্বাধীনতা, তাই যতোদি নারী আর্থ স্বাধীনতা অর্জন করবে না, ততোদিন কোনো স্বাধীনতাই অর্জন করবে না। তিনি বার বার বলেছেন নারীর আর্থস্বাধীনতার কথা।

মেরি ওলস্টোনক্র্যাফ্‌টের *ভিন্ডিকেশন* নারীমুক্তির সার্বিক প্রস্তাব; এটি থেকেই জন্ম নিয়েছে পরবর্তী বিভিন্ন ধারার নারীবাদ। তাঁর প্রস্তাব সম্পূর্ণ বিপ্লবাত্মক, এবং তিনি ছিলেন ব্যক্তিগত ও রাজনীতিকভাবে তাঁর অধিকাংশ উত্তরাধিকারীর থেকে অনেক বেশি আধুনিক, ও প্রগতিশীল। তবে মৃত্যুর পর তাঁর প্রস্তাবের থেকে তাঁর প্রথাবিরোধী জীবনই সাধারণত বিষয় হয় আলোচনা ও বিতর্কের। তিনি প্রথাগত নৈতিকতা অস্বীকার ক'রে অবিবাহিত বাস করেছেন এক পুরুষের সাথে, জন্ম দিয়েছেন তথাকথিত অবৈধ সন্তান, এটাই বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিলো কপট রক্ষণশীলদের কাছে। মেরি সম্পূর্ণ সৎ ছিলেন, অনেক বেশি সৎ ছিলেন প্রথাগত সৎদের থেকে; এবং এখন পশ্চিম মেনে নিয়েছে মেরির জীবনরীতিকেই। উনিশশতকের নারীবাদীরা পুরুষতন্ত্রের সাথে সন্ধি ক'রেই পেতে চেয়েছিলেন অধিকার, এবং তাঁরা মেরির মতো সার্বিক পরিবর্তনে বিশ্বাস করেন নি। তাঁরা পেতে চেয়েছিলেন একটু-আধটু সুবিধা, আর ভোটাধিকার। পুরুষতন্ত্রের সাথে সন্ধিপাতানো নারীবাদীরা আচরণ করেছেন অবলা সতীসাধ্বীর মতো; যাতে পুরুষেরা রেগে উঠতে পারে, তা থেকেই সুশীলা কুলবালার মতো সরিয়ে নিয়েছিলেন নিজেদের। তাঁরা জোসেফিন বাটলারকে অস্বীকার করেন, যখন তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পতিতাদের পক্ষে কথা বলেন (১৮৬৪); তাঁরা এলিজাবেথ স্ট্যান্টনকে অস্বীকার করেন, যখন তিনি *নারীর বাইবেল* (১৮৯৫, ১৮৯৮) লেখেন; তাঁরা অ্যানি বেসান্টকে অস্বীকার করেন, যখন তিনি জন্মনিয়ন্ত্রণের কথা বলেন। তবে সুশীলা নারীবাদীরা পুরুষতন্ত্রের কাছ থেকে বিশেষ কিছু আদায় করতে পারে নি, ভোটাধিকারও নয়; তখনই পুরুষতন্ত্র নারীবাদীদের দাবি মেনেছে যখন দেখা দিয়েছেন কোনো অশীল নারীবাদী। মেরিকেও তাঁরা অস্বীকার ক'রে চলতে চেয়েছেন, তবে মেরি তাঁদের চেতনায় থেকেছেন সব সময়ই, এবং তাঁর বইটির বেরিয়েছে নানা সংস্করণ। মেরি পুরুষবিদ্বেষী ছিলেন না, পুরুষ তাঁর ছিলো খুবই পছন্দ; তিনি চেয়েছিলেন সমানাধিকার। তিনি অবাধ কামেও বিশ্বাসী ছিলেন না, তিনি যে-দুটি পুরুষের সাথে শারীরিকভাবে মিলেছেন, তাঁদের তিনি ভালোবেসেছিলেন। মেরি, নারীবাদের জননী, ছিলেন আদর্শ জননী; অগ্নিশিখা ও অশ্রুবিন্দুর সমবায়, যিনি আজো তীব্র, জীবন্ত, এবং প্রেরণার অশেষ উৎস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বাসের জগত

পাঁচ হাজার বছর ধ'রে মানুষ জন্ম নিয়েই দেখছে তার জন্যে প্রাণপণে প্রস্তুত হয়ে আছে পূর্বনির্ধারিত বিভিন্ন বিশ্বাসের জগত। নিজের জন্যে কোনো বিশ্বাস খুঁজে বের করতে হচ্ছে না তাকে, জন্মেই দেখছে পরিবার ও সমাজ, কখনো কখনো রাষ্ট্র, তার জন্যে বিশ্বাস তৈরি ক'রে রেখেছে, মনে করছে ওইটিই শ্রেষ্ঠ বিশ্বাস, এবং তাকেও পোষণ করতে হবে ওই বিশ্বাস। মানুষ জন্ম নিচ্ছে, বেড়ে উঠছে পূর্বপ্রস্তুত বিশ্বাসের মধ্যে; তার জন্যে বিশ্বাসের জামাকাপড় শেলাই করা আছে, তার দায়িত্ব ওই জামাকাপড়ের মধ্যে ঢুকে প'ড়ে শান্তি পাওয়া। বিশ্বাসী হওয়া প্রশংসিত ব্যাপার; প্রথাগতভাবে ভালো মানুষ, সৎ মানুষ, মহান মানুষ বলতেই বোঝায় বিশ্বাসী মানুষ। তারা কী বিশ্বাস করছে, তা বিবেচনার বিষয় নয়, বিবেচনার বিষয় হচ্ছে তারা বিশ্বাস করছে; তাই তারা ভালো, সৎ, এমনকি মহৎ। পৃথিবী জুড়ে মানুষ গ'ড়ে তুলেছে বিচিত্র বিশ্বাসের জগত, বিশ্বাস দিয়ে তারা ভাগ ক'রে ফেলেছে বিশ্বকে, তারা কাউকে বিশ্বাসের জগতের বাইরে থাকতে দিতে রাজি নয়। একটা কিছু বিশ্বাস করতে হবে মানুষকে, বিশ্বাস না করা আপত্তিকর। আপনার পাশের লোকটি স্বস্তি বোধ করবে যদি জানতে পারে আপনি বিশ্বাস করেন, তার বিশ্বাসের সাথে আপনার বিশ্বাস মিলে গেলে তো চমৎকার; আর খুবই অস্বস্তি বোধ করবে, কোনো কোনো সমাজে আপনাকে মারাত্মক বিপদে ফেলবে, যদি সে জানতে পারে আপনি বিশ্বাস করেন না। বিশ্বাস কয়েক হাজার বছর ধ'রে দেখা দিয়েছে মহামারীরূপে; পৃথিবীর দীর্ঘস্থায়ী মহামারীর নাম বিশ্বাস।

বিশ্বাস কাকে বলে? আমরা কি বলি আমি পিঁপড়েয় বিশ্বাস করি, সাপে বিশ্বাস করি, জলে বিশ্বাস করি, বা বজ্রপাতে, বা পদ্মানদীতে বিশ্বাস করি? এসব, এবং এমন বহু ব্যাপারে বিশ্বাসের কথা ওঠে না, কেননা এগুলো বাস্তব সত্য বা প্রমাণিত। যা সত্য, যা প্রমাণিত, যা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই, তাতে বিশ্বাস করতে হয় না; কেউ আমরা বলি না যে আমি বিদ্যুতে বিশ্বাস করি, বা রোদে বিশ্বাস করি, বা গাড়িতে বিশ্বাস করি, কেননা সত্য বা প্রমাণিত ব্যাপারে বিশ্বাস করতে হয় না, বিশ্বাস করতে হয় অসত্য, অপ্রমাণিত, সন্দেহজনক বিষয়ে। অসত্য, অপ্রমাণিত, কল্পিত ব্যাপারে আস্থা পোষণই হচ্ছে বিশ্বাস। 'বিশ্বাস কর্' ক্রিয়াটি নিশ্চয়তা বোঝায় না, বোঝায় সন্দেহ; আর এ-ক্রিয়ার সাথে অকর্তাপদে দু-রকম বিভক্তি হয়, এবং বাক্যের অর্থ বিস্ময়করভাবে বদলে যায়। আমি বলতে পারি 'আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, কিন্তু ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি না'। এ-বাক্যে প্রথম ঈশ্বর অধিকরণ কারক, এতে বসেছে 'এ' বিভক্তি; আর দ্বিতীয় ঈশ্বর কর্মকারক, এতে বসেছে 'কে' বিভক্তি; এবং বাক্যটি বোঝাচ্ছে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করলেও আমি তার ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করি। বাঙলায় কিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করার জন্যে অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি হয়। বিশ্বাস নিশ্চয়তা বোঝায় না,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্দেহই বেশি বোঝায়; তবে বিশ্বাসীদের স্বভাব ভাষার স্বভাবের বিপরীত;–ভাষা যেখানে বোঝায় অনিশ্চয়তা, বিশ্বাসীরা সেখানে বোঝেন নিশ্চয়তা। মানুষের বিশ্বাসের শেষ নেই, কোটি কোটি বিশ্বাস পোষণ করে মানুষ। এমন মনে করার কোনো কারণ নেই যে এখন যেসব বিশ্বাস চলছে, সেগুলো চিরকাল ধ'রে চলছে; এখনকার বিশ্বাসগুলোর বয়স খুব বেশি নয়, এগুলোর আগে লাখ লাখ বিশ্বাসের উদ্ভব ও বিনাশ ঘটেছে; দেবতা বা ঈশ্বর বা বিধাতা বা কোনো বিশেষ স্রষ্টায় বিশ্বাস সেদিনের, চারপাঁচ হাজার বছরের, কথা; মানুষের বয়স তাদের বিভিন্ন ধরনের দেবতা বা বিধাতাদের বয়সের থেকে অনেক বেশি।

বিশ্বাসের সাথে অন্ধকারের সম্পর্ক গভীর, বিশ্বাস অন্ধকারের আত্মজ; আলোর সম্পর্ক তার কম বা নেই। অন্ধকারের কাজ হচ্ছে বস্তুকে অদৃশ্য করা, তার রূপরেখাকে রহস্যময় করা; আলোর কাজ তাকে দৃশ্যমান করা; অন্ধকার রহস্য সৃষ্টি করে, আলো ঘোচায় রহস্য। আলোকিত ঘরে রহস্য নেই, দিনের বেলা রহস্য নেই; কিন্তু অন্ধকার ঘর রহস্যে বোঝাই, রাত রহস্যে পূর্ণ। বিশ্বজগত মানুষের কাছে অন্ধকার ঘর বা রহস্যময় রাতের মতো, তার অধিকাংশ এলাকা মানুষের অজানা, আর যতোটুকু জানা, তাও সবাই জানতে চায় না, অন্ধকারই তাদের কাছে বেশি আকর্ষণীয় মনে হয়। বিশ্বজগতকে আলো জ্বেলে জানতে না চেয়ে মানুষ তাকে রহস্যে ভ'রে তুলেছে, তার রূপ বদলে দিয়েছে; এর ফলে ঘটেছে বিশ্বজগতের রহস্যীকরণ। বিশ্বাস হচ্ছে রহস্যীকরণপ্রবণতা, যা বস্তুনিষ্ঠভাবে সত্য জানতে চায় না, বরং মিথ্যেকে আকর্ষণীয় ও শক্তিশালী ক'রে তুলতে চায়। রহস্যীকরণপ্রবণতা মিথ্যেকেই ক'রে তুলেছে সত্য; এজন্যে সত্য শব্দটি এখন বিভ্রান্ত করে আমাদের। বিশ্বাসের সম্পর্ক ইন্দ্রজালের সাথে, বিজ্ঞানের সাথে নয়; এখনো মানুষ ইন্দ্রজাল দিয়ে আক্রান্ত, অভিভূত; বিজ্ঞান দিয়ে আলোকিত নয়। মানুষ বিশ্বজগত সম্পর্কে খুব কম জানে, কিন্তু যতোটুকু জানে, তাও কম নয়; মানুষের জানার বিষয়গুলো বিচার করলে বিস্মিত না হয়ে পারি না। মানুষ তার কল্পিত দেবতাদের থেকে অনেক বেশি প্রতিভাবান, শক্তিমান, এবং জ্ঞানী; তবে অধিকাংশ মানুষ ওই জ্ঞান থেকে বহুদূরবর্তী। পুরোনো পৃথিবীর বহু বিস্ময়ের কথা শোনা যায়, পুরোনো পৃথিবীর মহাপুরুষেরা বহু বিস্ময়কর কাজ করেছেন ব'লে বহু রটনা প্রচলিত, কিন্তু পুরোনো মহাপুরুষেরা তুচ্ছ যাদুর বেশি কিছু করতে পারেন নি, প্রকৃত বিস্ময়কর কাজ করেছে আধুনিক মানুষ।

মানুষ যতো বিশ্বাস পোষণ করে, তার প্রথম প্রধান উৎস পরিবার; তারপর তার সমাজ, তার রাষ্ট্র, তার সভ্যতা। মুসলমান পরিবারে জন্ম নিলে প্রথম তার ভেতরে ঢুকবে মুসলমানের বিশ্বাসগুলো, পাশের বাড়ির হিন্দু পরিবারে জন্ম নিলে প্রথম তার ভেতরে ঢুকতো হিন্দুর বিশ্বাসগুলো; খ্রিস্টান পরিবারে জন্ম নিলে ঢুকতো খ্রিস্টানের বিশ্বাসগুলো, ইহুদি পরিবারে জন্মালে ঢুকতো ইহুদিরগুলো। বিশ্বাস কারো ভেতর থেকে সহজাতভাবে উঠে আসে না, বিশ্বাস সহজাত নয়; মানুষ নিজের ভেতর থেকে কোনো বিশ্বাস অনুভব করে না, বিশ্বাস পারিবারিক সামাজিক রাষ্ট্রিক; পরিবার তাকে যে-বিশ্বাসগুলো দেয়, সেগুলোকেই সে পবিত্র শাশ্বত ধ্রুব মনে করে; ভয়ে সে এগুলোকে আঁকড়ে ধরে, লোভে সে এগুলোকে জড়িয়ে ধরে। কোনো বিশ্বাসই পবিত্র শাশ্বত ধ্রুব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়, যদিও প্রত্যেকে তার বিশ্বাসকে তাই মনে করে। *পবিত্র* শব্দটিই নিরর্থক, এর কোনো সর্বজনীন তাৎপর্য নেই; একজনের কাছে যা পবিত্র আরেকজনের কাছে তা ঘৃণার বস্তু হ'তে পারে, সাধারণত হয়ে থাকে; যেমন উগ্র ধার্মিকের কাছে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মের সব কিছুই ঘৃণ্য। ধার্মিক হিন্দু মুসলমানের পবিত্র গৃহ পোড়াতে দ্বিধা করে না, ধার্মিক মুসলমান অবলীলায় পদদলিত করে হিন্দুর পবিত্র দেবদেবীমূর্তি; খ্রিস্টান-ইহুদিও নির্দ্বিধায় একই আচরণ করে। তাই পবিত্রতার বোধ সর্বজনীন নয়, পবিত্রতার বোধ উঠে আসে নিজের বিশ্বাস থেকে, ভয় থেকে। আসলেই *পবিত্রতা* নিরর্থক শব্দ; কোনো কিছু পরিচ্ছন্ন হ'তে পারে, পবিত্র হ'তে পারে না, পবিত্রতার কোনো বাস্তব রূপ নেই। কোনো কিছুই শাশ্বত নয়; মানুষের কোনো কোনো বিশ্বাস একশো দুশো বা দু-তিন হাজার বছর ধ'রে চলছে, তাও অবিকল একইভাবে চলছে না, কিন্তু মানুষ ওগুলোকেই শাশ্বত ব'লে ভাবছে; মনে রাখছে না পৃথিবী থেকে বহু বিশ্বাস লোপ পেয়ে গেছে, যেগুলোকে এক সময় শাশ্বত মনে করা হতো, যেগুলো কয়েক হাজার বছর টিকে ছিলো। ধ্রুব নয় কোনো কিছু; যদিও বিশ্বাসীরা তাদের বিশ্বাসকে তাই মনে করে। ধ্রুব বলতে বুঝবো তা, যা অবিচল একক একমাত্র সত্য; কিন্তু বিশ্বাসের কোনো শেষ নেই, এবং বিশ্বাসগুলো পরস্পরবিরোধী। এগুলোর একটি ধ্রুব হ'তে পারে, সবগুলো ধ্রুব হ'তে পারে না; কিন্তু এগুলোর প্রতিটিই এতো ত্রুটিপূর্ণ যে এগুলোর একটিকেও ধ্রুব মনে করতে পারি না।

বিশ্বের রহস্যীকরণে সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা নিয়েছে ধর্ম; এবং ধর্ম সব কিছুকে গ্রাস ক'রে মানবপ্রতিভার সব কিছুকে বাধ্য ও উৎসাহিত করেছে বিশ্বের রহস্যীকরণে অংশ নিতে। ধর্মপ্রবর্তকেরা, ও তাঁদের অনুসারীরা, বুঝেছেন যে দখল করতে হবে শক্তিকেন্দ্র; এবং শক্তিকেন্দ্র দখল করতে পারলে আর কিছুই তাঁদের বাহুর বাইরে থাকবে না। মানুষের প্রতিভার সব এলাকায় যেতে চাই না আমি, থাকতে চাই শিল্পকলা, বিশেষ ক'রে সাহিত্যে, এবং দেখতে পাই যে সাহিত্য বিশেষভাবেই অংশ নিয়েছে বিশ্বজগতের রহস্যীকরণে। সাহিত্য তাই একটি সুন্দর অন্ধকারের এলাকা। চিত্রকলায়ও এটা খুবই ঘটেছে; হিন্দু ও খ্রিস্টান চিত্রকরেরা উৎসাহের সাথে, হয়তো আর্থ অনুপ্রেরণায় অনেকটা, রহস্যীকরণে যোগ দিয়ে বিশ্বকে ঢেকে দিয়েছেন রহস্যের আবরণে। দেবদেবী, মেরি ও ক্রাইস্টের অজস্র ছবি এঁকেছেন ও মূর্তি তৈরি করেছেন তাঁরা, যেগুলোর কোনো কোনোটি আমার প্রিয়; কিন্তু ওই সব মূর্তি ও ছবির সৌন্দর্যের থেকে বিশ্বাসীদের কাছে ওগুলো আকর্ষণীয় রহস্যীকরণের জন্যে, বিশ্ব সম্পর্কে মনে ভুল বিশ্বাস সৃষ্টির জন্যে, তাদের মনের ভুল বিশ্বাসকে গভীর ক'রে তোলার জন্যে। মুসলমানদের ছবি আঁকা নিষিদ্ধ, বিশেষ ক'রে স্রষ্টা ও প্রবর্তকের ছবি আঁকা আত্মহত্যার থেকেও শোচনীয় ব'লে মুসলমান চিত্রকরেরা এ থেকে বিরত রয়েছেন। সাহিত্য রহস্যীকরণের কাজ করেছে প্রবলভাবে, বিশ্বের গৌণ ও প্রধান লেখকেরা কবিতা, গান, উপাখ্যান ও সন্দর্ভে দলবেঁধে অংশ নিয়েছেন বিশ্বজগতের রহস্যীকরণে। তাই সাহিত্য প্রধানত অপবিশ্বাসের জগত; এখনো সাহিত্যে যে-প্রবণতা দেখতে পাই, তা অন্ধকারের প্রবণতা, ভুল ধারণা সৃষ্টির প্রবণতা। অজস্র বিশ্বাসের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে সাহিত্য হয়ে আছে এক ভুলের বিশ্ব,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদিও তার সৌন্দর্য অশেষ। শুধু সত্যের নয়, মিথ্যেরও সুন্দর রূপ রয়েছে; অনেক সময় মিথ্যের রূপই বেশি সুন্দর সত্যের রূপের চেয়ে, তাই কবিরা ও নানা ধারার লেখকেরা অজস্র মিথ্যের সৃষ্টি করেছেন সুন্দর রূপ। মিথ্যেকেই তাঁরা বিশ্বাস করেছেন সত্য ব'লে।

বিশ্বের সাহিত্যের বড়ো অংশ দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বাসের ভিত্তির ওপর; অর্থাৎ যা অসত্য, অপ্রমাণিত, সন্দেহজনক, তার ওপর। পরিবার ও প্রথা থেকে পাওয়া বিশ্বাস কবিরা প্রকাশ করেছেন তীব্র আবেগে, তাকে করেছেন রূপময়; কিন্তু তার ভিত্তিটাকে সরিয়ে নিলে ওই আবেগ ও রূপ সম্পূর্ণ কাঠামোসহ ভেঙে পড়তে পারে, একদিন পড়বে। অধিকাংশ কবিই পরিবার ও সমাজ থেকে পাওয়া বিশ্বাস যাচাই করেন নি, যাচাই করার শক্তি নেই অনেকেরই, তাঁরা ভেসে গেছেন আবেগে। কবিতা ও গানের বিনোদক ভূমিকা রয়েছে, তাঁরা দেখেছেন যাচাই না ক'রে আবেগে ভেসে গেলে বিনোদনের কাজটি সম্পন্ন হয় আরো ভালোভাবে। জনগণ প্রাপ্ত বিশ্বাসে স্বস্তি পায়, ওই বিশ্বাসকে যখন কেউ প্রবল ক'রে তোলে তখন তা হয়ে ওঠে অত্যন্ত উপভোগ্য, তখন তারা একই সাথে ভোগ করে শিল্পকলা ও বিশ্বাস। শিল্পকলার সৌন্দর্য অবশ্য অধিকাংশ মানুষই উপভোগ করতে পারে না, তারা উপভোগ করে তার ভেতরের মানবিক ও বিশ্বাসগত আবেগ, এবং কবিরা তা কাজে লাগিয়ে থাকেন। কবিতায় বিশ্বাস যতোটুকু থাকে ততোটুকু অকবিতা, বিশ্বাসের বাইরে যতোটুকু থাকে ততোটুকু কবিতা; যুগে যুগে বিশ্বাস ভেঙে পড়ে, কিন্তু সৌন্দর্য অতো অল্প সময়ে ভেঙে পড়ে না। বিশ্বাসের কবিতা হচ্ছে ভুল কাঠামোর ওপর দাঁড়ানো আবেগগত সৌন্দর্য।

রবীন্দ্রনাথকে মনে হয় বিশ্বাসের পরম রূপ; বিশ্বকে রহস্যীকরণের এক প্রধান ঐন্দ্রজালিক। তাঁর কবিতা ও গানে, এবং বহু প্রবন্ধে, পাই বিশ্বাসের কাঠামোর ওপর ভর ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা সৌন্দর্য। রবীন্দ্রনাথ যে-বিশ্বাস পোষণ করেছেন, তা ভেতর থেকে উঠে আসে নি তাঁর; উঠে এসেছে পরিবার থেকে, এবং তাকে তিনি উপনিষদের বহু সুন্দর মিথ্যেয় সাজিয়েছেন জীবন ভ'রে। তিনি বিশ্বাস করতেন এক পরমসত্তায়, ওটা তাঁর নিজের উপলব্ধি নয়, পরের উপলব্ধি; তাঁর পিতা বহুদেবতাবাদী ধর্ম ছেড়ে একদেবতাবাদী পরমসত্তায় বিশ্বাস না আনলে, তাঁর পরিবার ওই একক পরমসত্তার স্তবে মুখর না হ'লে তিনিও থেকে যেতেন বহুদেবতাবাদী। রবীন্দ্রনাথের পরমসত্তায় বিশ্বাসের সাথে প্রথাগত ধর্মের বিশেষ মিল নেই; তাঁর বিশ্বাসে প্রথাগত ধর্মের স্বর্গনরক নেই, আবশ্যিক আরাধনা নেই, তাঁর পরমসত্তা সৃষ্টিকে শাস্তি দেয়ার জন্যে ব্যগ্র হয়ে নেই। তিনি পরমসত্তার সাথে পাতিয়েছিলেন এক ব্যক্তিগত সম্পর্ক, যা অনেকটা প্রবল শক্তিমান প্রেমিকের সাথে আবেগকাতর অসহায় প্রেমিকার সম্পর্কের মতো; তাঁর পরমসত্তা অনেকটা ধর্ষকামী–যে সুখ পায় পীড়ন ক'রে, তার পীড়ন মধুময়, আর তিনি নিজে অনেকটাই মর্ষকামী–যিনি সুখ পান পীড়িত হয়ে, পরমসত্তার পীড়নে দলিত দ্রাক্ষার মতো তাঁর ভেতর থেকে মধু উৎসারিত হয়। সম্পর্কটি অনেকখানি হৃদয়গত ও শারীরিক। বিশ্বজগতের রহস্যীকরণের কাজ রবীন্দ্রনাথ করেছেন বিচিত্ররূপে; এবং এ-কাজে তিনি একটি শব্দ বারবার ব্যবহার করেছেন, শব্দটি হচ্ছে *সত্য*। বিশ্ব রহস্যীকরণে তাঁর চাবিশব্দ *সত্য*, যখনই তিনি তাঁর বুঝতে-না- পারা পরম উপলব্ধি বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বাসের কথা বলতে চেয়েছেন, যা সম্পর্কে তাঁর নিজেরই ধারণা অস্বচ্ছ, তখনই তিনি ব্যবহার করেছেন এ-শব্দটি; এবং অনুরাগীরা এক সুখকর বিভ্রান্তির মধ্যে বাস করার স্বাদ পেয়েছেন। 'সত্য যে কঠিন,/কঠিনেরে ভালোবাসিলাম' বা 'সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে' ইত্যাদি উক্তিতে কবিতা কম, বিভ্রান্তি বিপুল; তবে রহস্যীকরণের কাজটি সম্পন্ন হয়েছে, *সত্য* একরকম অলৌকিক সামগ্রী এ-বোধ তৈরি হয়েছে চমৎকারভাবে।

সত্য শব্দটিকে রহস্যীকরণের কাজে তিনি কতোভাবে ব্যবহার করেছেন, তার কয়েকটি উদাহরণ দিই *ধর্ম* বইটির একটি প্রবন্ধ থেকে :

> ১ সংসারে প্রতিদিন আমরা যে সত্যকে স্বার্থের বিক্ষিপ্ততায় ভুলিয়া থাকি উৎসবের বিশেষ দিনে সেই অখণ্ড সত্যকে স্বীকার করিবার দিন (উৎসব, *ধর্ম*, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ১৩, বিশ্বভারতী, ১৯৬৭, ৩৩৫)।
>
> ২ বস্তুত বিশ্বের সকল জিনিসকেই আমরা যখন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি, তখনই এই সত্যকে আমরা দেখিতে পাই না (উৎসব, ওই, ৩৩৫)।
>
> ৩ মিলনের মধ্যে যে সত্য তাহা কেবল বিজ্ঞান নহে, তাহা আনন্দ (উৎসব, ওই, ৩৩৫)।
>
> ৪ আমরা সত্যকে যে-পরিমাণে উপলব্ধি করি, তাহার জন্য সেই পরিমাণে মূল্য দিতে পারি (উৎসব, ওই, ৩৩৬)।
>
> ৫ সত্য প্রেমরূপে আমাদের অন্তঃকরণে আবির্ভূত হইলেই সত্যের সম্পূর্ণ বিকাশ হয় (উৎসব, ওই, ৩৩৬)।
>
> ৬ তাই বলিতেছি, আনন্দ হইতেই সত্যের প্রকাশ এবং সত্যের প্রকাশ হইতেই আনন্দ (উৎসব, ওই, ৩৩৭)।

সত্য শব্দটি উদ্ধৃতিগুলোতে নিরর্থক, যদিও রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় শব্দ এটি, শব্দটি সুস্পষ্ট কোনো বোধ প্রকাশ না ক'রে করছে রহস্যীকরণ; আর শেষ উদ্ধৃতির বক্তব্য তাঁর নিজেরও নয়, যদিও এটি তাঁর খুবই প্রিয়, জীবনে বহুবার নানা রূপে এটি প্রকাশ করেছেন তিনি; কীটসের বিখ্যাত 'Beauty is truth, truth beauty'-কে একটু রূপান্তরিত করেছেন, 'সুন্দর' বা 'সৌন্দর্য'-এর বদলে ব্যবহার করেছেন 'আনন্দ'; বলতে পারতেন 'আনন্দই সত্য, সত্যই আনন্দ'; কিন্তু দুটিকে অভিন্ন না ক'রে করেছেন পরস্পরের উৎস। রহস্যীকরণের কাজ তিনি অজস্ররূপে করেছেন; বাস্তবকে বাস্তবরূপে, পরিচিত মূর্ত বস্তুকে মূর্ত বস্তুরূপে না দেখে রহস্যের প্রকাশরূপে দেখতেই তাঁর ভালো লাগতো। *শান্তিনিকেতন* বইটির প্রথম প্রবন্ধের প্রথম পংক্তিতেই পাই :

> উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত! সকাল বেলায় তো ঈশ্বরের আলো আপনি এসে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়–সমস্ত রাত্রির গভীর নিদ্রা একমুহূর্তেই ভেঙে যায় ('উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ১৩, বিশ্বভারতী, ১৯৬৭, ৪৪৯)।

বেশ ভালো লাগে পড়তে, একটুখানি অপার্থিব আবেগেও আক্রান্ত হই, মনে হয় বেশ একটা রমণীয় রহস্যলোকের মধ্যে প'ড়ে আছি, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সকাল বেলার ওই আলো 'ঈশ্বরের আলো' কেনো? এ-আলো হ'তে পারতো শুধুই 'আলো', বা 'সূর্যের আলো'; 'ঈশ্বরের আলো' বলার সাথে সাথে আমাদের পরিচিত রোদ রহস্যময় বস্তুতে পরিণত হয়, রহস্যীকরণ ঘটতে থাকে দিকে দিকে। সূর্যের আলোকে তিনি সূর্যের আলো ব'লে মানতে পারেন না, তাঁর মন ভ'রে ওঠে না হয়তো, তিনি ওই আলোতে তাঁর বিশ্বাসের ছোঁয়া চান, বস্তুজগতকে রঙিন রহস্যময় ক'রে তুলতে চান তাঁর বিশ্বাস দিয়ে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন কাজ পৃথিবী জুড়েই করেছেন বিশ্বাসীরা, যাঁদের অনেকে ভুগেছেন বিশ্বাসের প্রচণ্ড দুরারোগ্য উন্মত্ততায়, যেমন ভুগেছেন অনেক অতীন্দ্রিয় উন্মাদ, বা উইলিয়ম ব্লেইক, যাঁর কাছে ভোরের তরুণ অরুণকে অরুণ মনে হয় নি, মনে হয়েছে দেবদূতরা দলেদলে স্তব করছে পরমেশ্বরের। আমরা জানি সূর্যের আলো ঈশ্বরের আলো নয়, এটা নিরন্তর জ্বলন্ত গ্যাসের কাজ, আর ভোরের সূর্যে দেবদূতরাও স্তবগান করে না, ওই ঈশ্বর আর তাঁর দেবদূতরা অবাস্তব অলীক কল্পনামাত্র। পুরোনো প্যালেস্টাইন বা পুরোনো ভারতের সত্যদ্রষ্টারা আজ হঠাৎ এসে টেলিভিশন, বিমান, নিয়ন আলো দেখলে এগুলোও তাঁদের মনে হবে ঈশ্বরের মহিমার প্রকাশ; এবং অনুপ্রাণিত হয়ে রচনা ক'রে ফেলবেন নানা রকমের বেদ ও সংহিতা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের যেগুলোকে বলেছেন 'পূজা', সেগুলোতে বিশ্বজগতের রহস্যীকরণপ্রক্রিয়া নিয়েছে চূড়ান্ত রূপ; ধর্মপ্রবর্তক বা প্রচারকের মতো তিনি কাজ করেন নি, কবি তিনি এবং তাঁদের থেকে বহু দূরবর্তী, তাঁদের মতো তাঁর হাতে শেকল নেই, মানুষকে বন্দী করার জন্যে তিনি বেরিয়ে পড়েন নি, মানুষকে তিনি করতে চেয়েছেন মুক্ত, কিন্তু অলীক পরমসত্তায় বিশ্বাস আলোবাতাসের মতো এগুলোতে কাজ ক'রে চলছে। এগুলো দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বাসের ভিত্তির ওপর; এগুলো উপভোগ করার জন্যে বেশ খানিকটা বিশ্বাস দরকার। তবে বিশ্বাস করেন না যাঁরা, পরমসত্তা যাঁদের কাছে হাস্যকর, তাঁরা এগুলো কীভাবে উপভোগ করেন, বা আদৌ কি উপভোগ করেন? রবীন্দ্রনাথের প্রভু বা পরমসত্তায় বিশ্বাস হাস্যকর আমার কাছে, তবে আমি উপভোগ করি এগুলো; কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কেনো উপভোগ করি? এমন হ'তে পারি আমি এখনো রহস্যীকরণপ্রক্রিয়ার শিকার হয়ে আছি, নিজেকে পুরোপুরি মুক্ত করতে পারি নি তার প্রভাব থেকে, তবে বোধ করি এগুলো উপভোগ করি আমি এগুলোর তীব্র আবেগ, মানবিক অনুভূতির অতুলনীয়তা, অসাধারণ সৌন্দর্য, পার্থিব চিত্রের পর চিত্র, রূপক, চিত্রকল্প প্রভৃতির জন্যে। রবীন্দ্রনাথের আন্তরিকতা, আবেগতীব্রতা ও রূপময়তার জন্যে মাঝেমাঝে যা বিশ্বাস করি না, তাও আমাকে অভিভূত করে, শিউরে দেয়। তাঁর পরমসত্তা অবশ্য সুধীন্দ্রনাথকথিত 'ইহুদির হিংস্র ভগবান' নয়, চণ্ডরোষে ধেয়ে আসার জন্যে সে উদ্যত হয়ে নেই; তাঁর পরমসত্তা পরম প্রেমিক, সুন্দর, প্রিয়তমের মতো কখনো কখনো সুখকররূপে নিষ্ঠুর।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরমসত্তাকে শুধু দয়াময় প্রেমিক হিশেবেই দেখতে পছন্দ করতেন না, নিষ্ঠুরতাও চাইতেন তার কাছে, তা অবশ্যই মোহন নিষ্ঠুরতা। তিনি সব কিছু পরিবৃত দেখতেন পরমসত্তার অস্তিত্ব দিয়ে। তা যেমন হতে পারে এমন প্রাত্যহিক : 'যে-কেহ মোরে দিয়েছ সুখ দিয়েছ তাঁরি পরিচয়,/সবারে আমি নমি।/যে-কেহ মোরে দিয়েছ দুখ দিয়েছ তাঁরি পরিচয়,/ সবারে আমি নমি।', বা তা হ'তে পারে এমন মহাজাগতিক : 'তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে আলোয় আকাশ ভরা।' প্রাকৃতিক সব কিছুতে তিনি দেখছেন পরমসত্তার স্পর্শ :

> সারা জীবন দিল আলো সূর্য গ্রহ চাঁদ
> তোমার আশীর্বাদ, হে প্রভু, তোমার আশীর্বাদ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ হচ্ছে রহস্যীকরণ, সূর্য গ্রহ চাঁদ কারো আশীর্বাদ নয়, এগুলো এক বিশাল মহাজাগতিক দুর্ঘটনার ফল (এর স্থূল রূপও পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের শিল্পসুন্দর স্তব নজরুলের হাতে হয়ে উঠেছে এমন স্থূল : এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল মিঠা নদীর পানি/ (খোদা) তোমার মেহেরবানি)। *পুরোনো বাইবেল*-এর 'গীতসংহিতা'র ১৯-সংখ্যক সঙ্গীতের শুরুর দুই পংক্তি এমন :

আকাশমণ্ডল প্রচার করে ঈশ্বরের গৌরব,
আর ভূলোক প্রকাশ করে তাঁর হস্তকর্ম।

রাজা ডেভিড বা অন্য কেউ যিনি এ-গান লিখেছিলেন, তাঁর কাছে আকাশমণ্ডলকে খুবই বিশুদ্ধ পবিত্র ব্যাপার মনে হয়েছিলো, যা চারপাশের মাটিপাথরজলের জগত থেকে অনেক পরিশুদ্ধ। ওই গীতরচয়িতা আকাশমণ্ডল দেখে বিস্মিত হয়েছেন, কিন্তু তিনি যেমন সূর্য কী নক্ষত্র কী বোঝেন নি, তেমনি তাদের অকল্পনীয় বিশালত্ব সম্পর্কেও তাঁর কোনো ধারণা ছিলো না। তাঁর কাছে সূর্য আর নক্ষত্র ছিলো ভিন্ন ব্যাপার, এবং অত্যন্ত ক্ষুদ্র; মহাকাল ও মহাজগতের অনন্ততা ও বিশালত্ব বুঝি আমরা, তিন হাজার বছর আগের মানুষের মহাজগত মহাকালের অনন্ততা অসীমতা সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিলো না, ধারণা করার শক্তিও দেখা দেয় নি। তাঁর বিস্ময়ের পর তিন হাজার বছর কেটে গেছে, বহু কিছুর সাথে চাঁদ তারা সূর্যও হারিয়েছে মহিমা; আমরা এখন জানি ওগুলো কী। আকাশমণ্ডল কোনো বিশুদ্ধ পবিত্র স্থান নয়, তার সদস্যরাও কারো গৌরব প্রকাশ বা প্রচার করে না; এবং আমরা, আমাদের পৃথিবীও আকাশমণ্ডলেরই সদস্য, আমরাও ভ্রমণ ক'রে চলছি সূর্যের চারদিকে—মহাজগতে। ভেইনবার্গ, বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী ও *প্রথম তিন মিনিট* ও *চূড়ান্ত তত্ত্বের স্বপ্ন*-এর লেখক, বলেছেন, 'আমাদের চারপাশের পাথরগুলো যতোটুকু ঈশ্বরের গৌরব প্রচার করে নক্ষত্রগুলো তার থেকে একটুও কম বা একটুও বেশি প্রচার করে না ঈশ্বরের গৌরব।' এগুলোর সাথে কোনো সম্পর্ক নেই ঈশ্বরের, কোনো দেবতার; আর সূর্য গ্রহ চাঁদ আলো বাতাস মেঘ বৃষ্টি কোনো প্রভুর আশীর্বাদ নয়। কিন্তু বাইবেলের গীতিকার ও একালের সঙ্গীতকার লিখেছেন একই গান, যা সুন্দর লাগে, কিন্তু মহাজগতের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করে না; সব কিছুকে ঢেকে দেয় রহস্যে।

AMARBOI.COM

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য প্রথাগত বিশ্বাসী ছিলেন না, প্রথাগত গ্রন্থনির্ভর ধার্মিকদের মতো তিনি নিশ্চিত ছিলেন না চরম পরিণতি সম্পর্কে। যদিও মৃত্যুই চরম পরিণতি, তিনি জানতেন, তবু আরো কিছু আশা তাঁর ছিলো; সন্দেহও ছিলো। যা তিনি এতো আদর্শায়িত ক'রে দেখেছেন, তা মৃত্যুতে শেষ হয়ে যাওয়ার মতো এতোই নিরর্থক, এটা ভাবা কষ্টকর ছিলো তাঁর কাছে। একটি ব্যাকুল গানে তিনি প্রশ্ন করেছেন :

পথের শেষ কোথায়, শেষ কোথায়, কী আছে শেষে!
এত কামনা, এত সাধনা কোথায় মেশে?।

এর কাতরতা আমাকে মুগ্ধ করে, সুর আলোড়িত করে; কিন্তু এমন প্রশ্ন আমি করবো না। মোহগ্রস্ত নই আমি, আমি সৎ থাকতে চাই, সিসিফাসের মতো মেনে নিতে চাই জীবনের নিরর্থকতা, এবং অস্বীকারও করতে চাই নিরর্থকতাকে। কিছুতেই বিভ্রান্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ'তে চাই না, মোহের কাছে সমর্পণ করতে চাই না নিজেকে; আমি জানি পথের শেষ মৃত্যুতে, সব কামনা ও সাধনার শেষে রয়েছে নির্বিকার মাটি ও ক্ষুধার্ত আগুন, কিন্তু আমি ভেঙে পড়তে চাই না। রূপময় জীবনের শেষে মানুষের এই পরিণতিকে এক অপূর্ব কবিতায় পরিণত করেছিলেন জীবনানন্দ। মৃত্যুর আগে তো আমরা অজস্র রূপ আর রসের ভেতর দিয়ে চলেছি; নির্জন খড়ের মাঠে পৌষের সন্ধ্যায় আমরা হেঁটেছি, মাঠের পারে দেখেছি কুয়াশার ফুল ছড়িয়ে চলছে নদীর নরম নারী; দেখেছি অন্ধকারে আকন্দ ধুন্দুল জোনাকিতে ভ'রে গেছে, দেখেছি বুনোহাঁস গুলির আঘাত এড়ায়ে উড়ে যাচ্ছে দিগন্তের নম্র নীল জ্যোৎস্নার ভেতরে, আলো আর বুলবুলিকে খেলা করতে দেখেছি হিজলের জানালায়, আমরা দেখেছি প্রতিদিন ভোর আসে ধানের গুচ্ছের মতো সবুজ সহজ। কিন্তু এই রূপময় জীবনের পরে কী, আর কী বুঝতে চাই আমরা? জীবনানন্দ হাহাকার ক'রে ওঠেন নি, মেনে নিয়েছেন সুন্দর নিরর্থকতাকে :

আমরা মৃত্যুর আগে কি বুঝিতে চাই আর? জানি না কি আহা,
সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মত এসে জাগে
ধূসর মৃত্যুর মুখ;– একদিন পৃথিবীতে স্বপ্ন ছিল– সোনা ছিল যাহা
নিরুত্তর শান্তি পায়;– যেন কোন্ মায়াবীর প্রয়োজনে লাগে।
কি বুঝিতে চাই আর?...রৌদ্র নিভে গেলে পাখি-পাখালীর ডাক
শুনি নি কি? প্রান্তরের কুয়াশায় দেখি নি কি উড়ে গেছে কাক!

রবীন্দ্রনাথে শুনতে পাই 'এত কামনা'র হাহাকার, জীবনানন্দে কামনা আরো রূপময়– সব রাঙা কামনা– কিন্তু হাহাকার নেই, এর শেষে জেগে আছে নিরর্থক দেয়ালের মতো ধূসর মৃত্যুর মুখ। যতো স্বপ্ন যতো সোনা ছিলো জীবনে, তা যেনো কোনো যাদুকরের খেলার সামগ্রী। জীবনানন্দ আর বুঝতে চান নি, বোঝার কিছু নেই ব'লে; শেষে শুধু মুগ্ধ করেছেন দুটি অধরা চিত্রকল্প দিয়ে, যে-দুটি শুধু ঢেউ তুলে চলে স্থির জলে– রৌদ্র নিভে গেলে পাখি-পাখালীর ডাক/ শুনি নি কি? প্রান্তরের কুয়াশায় দেখি নি কি উড়ে গেছে কাক!

বিশ্বাসীদের সব কিছু দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বাসের ভিত্তির ওপর, তবে ওই ভিত্তিটা দাঁড়ানো শূন্যতার ওপর। তাঁরা ওই শূন্যতার দিকে তাকাতে চান না। বিশ্বাসীরা সাধারণত ভীত ও লুব্ধ মানুষ, তাদের ভেতরে ভয় ও লোভ একসাথে কাজ করে, শূন্যতাকে ভয় পেয়ে তারা স্বর্গের কল্পিত পূর্ণতাকে আঁকড়ে ধরে। রবীন্দ্রনাথ ওই ধরনের বিশ্বাসী ছিলেন না, তাহলে তিনি ধর্মপ্রবর্তক হতেন, কবি হতেন না। রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে একবার তাকিয়েছিলেন তাঁর বিশ্বাসের ভিত্তিটির দিকে। তাঁর যে এই গভীর সর্বব্যাপী বিশ্বাস, তা কি উঠে এসেছিলো তাঁর নিজের ভেতর থেকে? যাকে তিনি সত্য আর পরম ব'লে মেনেছিলেন, তা কি তাঁর একান্ত আপন সত্য উপলব্ধি? যে-সুন্দর নিঠুরের কাছে তিনি সমর্পণ করেছিলেন নিজেকে, যার চরণধুলার তলে মাথা নত রাখতে ভালোবাসতেন তিনি, যার ইচ্ছে তিনি পূর্ণ দেখতে চাইতেন নিজের জীবনে, যার অঙ্গদ সুন্দর কিন্তু খড়্গ আরো মনোহর মনে হতো তাঁর, সুখে না থেকে যার কোলে থাকতে চাইতেন তিনি, যার সাথে নিত্য বিরোধ তাঁর সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিলো, যার সম্মুখে তিনি দাঁড়াতে চাইতেন প্রতিদিন, তাকে কি তিনি পেয়েছিলেন নিজে? না কি পেয়েছিলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথা থেকে? বিশ্বাস কয়েক হাজার বছর ধ'রে সবাই পাচ্ছে প্রথা থেকে, তিনিও তাই পেয়েছিলেন। *পত্রপুট*-এর পনেরো সংখ্যক কবিতায়, যে-কবিতাটির নাম দিতে পারি 'ব্রাত্য', তিনি স্বীকার করেছেন আসল সত্য। তিনি বলেছেন :

আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
দেবতার বন্দীশালায়
আমার নৈবেদ্য পৌঁছল না।
আজ আপন মনে ভাবি,
'কে আমার দেবতা,
কার করেছি পূজা।'
শুনেছি যাঁর নাম মুখে মুখে
পড়েছি যাঁর কথা নানা ভাষায় নানা শাস্ত্রে
কল্পনা করেছি তাঁকেই বুঝি মানি।
তিনিই আমার বরণীয় প্রমাণ করব ব'লে
পূজার প্রয়াস করেছি নিরন্তর।
আজ দেখেছি প্রমাণ হয় নি আমার জীবনে।

তাঁর স্বীকারোক্তিতেই দেখছি তাঁর পরম বিশ্বাস নিজের নয়, প্রথাগত; তাঁর পরমসত্তাকে পেয়েছেন তিনি পরিবার ও সমাজের কাছে থেকে, পেয়েছেন বিভিন্ন গ্রন্থে– গ্রন্থের কোনো শেষ নেই, গ্রন্থের প্রতারণারও কোনো শেষ নেই; প্রতারক গ্রন্থ লিখতে পারেন, বিভ্রান্ত গ্রন্থ লিখতে পারেন, অসৎ গ্রন্থ লিখে চালাতে পারেন বিধাতার নামে; তাই বুঝতে পারি তাঁর নিজের ভেতর থেকে উঠে আসে নি তাঁর বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথ নির্মম সংকীর্ণ স্বার্থপরায়ণ ধর্মের কবলে নিজেকে সমর্পণ করেন নি, কতোগুলো বইয়ের বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করেন নি; কিন্তু তাঁর সম্পূর্ণ কল্পজগতটিই দাঁড়িয়ে আছে শোচনীয় শূন্যতার ওপর, যে-শূন্যতার রহস্যীকরণে তিনি নিজেকে ব্যয় করেছেন সারা জীবন। তিনি নিজে যদি খুঁজতেন নিজের বিশ্বাস, তাহলে হয়তো বিশ্বাস করতেন না; তাঁর সে-মানসিকতা ছিলো না, পরিবারের পরমসত্তাকে অস্বীকার করার মতো প্রথাবিরোধীও ছিলেন না তিনি। তাঁর মতো অসাধারণ মানুষই যেখানে বিশ্বাস লাভ করেন পরিবার, প্রথা, সমাজ, গ্রন্থ থেকে, এবং ভুল বিশ্বাসকে দীর্ঘ জীবন ধ'রে মহিমামণ্ডিত করতে থাকেন, সেখানে সাধারণ মানুষ আর কী করতে পারে! প্রথা মেনে নেয়ার সুবিধা অনেক, না মানার বিপদ অজস্র।

যখন আধুনিক কবিতা, আধুনিক শিল্পকলা, বিশশতকের স্বভাব বিষয়ে পড়া শুরু করি আমি কৈশোর পেরিয়ে নতুন যৌবনে পড়ার চাঞ্চল্যকর বয়সে, ভালো লাগতে থাকে ওই কবিতার অভাবিত চিত্রকল্প, অপ্রথাগত সৌন্দর্য, এতোদিন ধ'রে শেখা অনেক কিছুকেই মনে হ'তে থাকে হাস্যকর, তখন বহু বইয়ে বিশশতকের একটি ব্যাখ্যায় আমি আহত হই। বহু সমালোচক, এখন তাঁদের সীমাবদ্ধতা বুঝতে পারি আমি, বিশশতককে নিন্দা করেন বিশ্বাসহীনতার শতক ব'লে, তাঁদের কাছে শতকটিকে মনে হয় মরুভূমি– বিশ্বাসহীনতার মরুভূমি, যা টিএস এলিঅটের ওয়েস্ট ল্যান্ড। প্রথম আমি বুঝতে পারি নি, বুঝে উঠতে অনেক দিন লাগে, এবং হাসি পায়। আমি বুঝতে পারি ওই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমালোচকদের মনে, যেমন এলিঅটের ভেতরে, বাস করে পুরোনো বিশ্বাস, অজস্র বাজে ধারণা, তাই এ-মহান শতাব্দীকে তাঁদের এমন মনে হয়। বিশশতক বিশ্বাস বাদ দিয়েছে, এতে এটি মরুভূমি হয়ে ওঠে নি, হয়ে উঠেছে সৎ; এর থেকে সৎ শতাব্দী আর নেই। এর আগে তথাকথিত সভ্য মানুষ তিরিশচল্লিশটি বিশ্বাসের শতাব্দী যাপন করেছে, কিন্তু ওই বিশ্বাস মানুষের কোনো কাজে আসে নি, ওই বিশ্বাস মানুষকে অসুস্থ বন্দী দরিদ্র অসহায় পীড়িত ক'রে রেখেছে; ওই বিশ্বাস ছিলো মোহগ্রস্ত আর সুবিধাবাদীদের পরিকল্পিত বিশ্বাস। অতীতের দিকে তাকিয়ে বিশশতকের থেকে উৎকৃষ্ট কোনো শতক দেখতে পাই না আমি, আমার মনে হয় না অন্য কোনো শতক আমার জন্যে এর চেয়ে বেশি বসবাসযোগ্য হতো। আগের কোনো শতকে আমি হতাম হয়তো ক্রীতদাস, বা ভূমিদাস, কোনো শতকে আমার জীবন কেটে যেতো প্রভুদের স্তবগানে, আমি থাকতাম অসুস্থ, অন্ধ, স্বাধিকারহীন। বিশশতক, দুটি মহাযুদ্ধ ও বহু রোগে আক্রান্ত বিশশতক, আমাকে যা দিয়েছে, তা আর কোনো শতক দিতে পারতো না। এলিঅটের কবিতার অজস্র চিত্রকল্প আর উক্তিতে আমি মুগ্ধ। এ-মুহূর্তেও মনে আসছে :

Let us go then, you and I,
When the evening is spread out against the sky
Like a patient etherised upon a table;

In the room the women come and go
Talking of Michelangelo.

And time for you and time for me,
And time yet for a hundred indecisions,
And for a hundred visions and revisions

Do I dare
Disturb the universe?

I have measured out my life with coffee spoons

I grow old...I grow old...
I shall wear the bottoms of my trousers rolled.

I have heard the mermaids singing, each to each.
I do not think that they will sing to me.

Every street-lamp that I pass
Beats like a fatalistic drum

Here I am, an old man in a dry month,
Being read to by a boy, waiting for rain.

After such knowledge, what forgiveness? Think now

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

History has many cunning passages, contrived corridors,
And issues, deceives with whispering ambitions

April is the cruellest month, breeding
Lilacs out of the dead land, mixing
Memory and desire, stirring
Dull roots with spring rain.

What are roots that clutch, what bracnches grow
Out of this stony rubbish? Son of man,
You cannot say, or guess, for you know only
A heap of broken images, where the sun beats,
And the dead tree gives no shelter, the cricket no relief,
And the dry stone no sound of water.

'You gave me Hyacinths first a year ago;
They called me the Hyacinth girl.'

Unreal city,
Under the brown fog of a winter dawn,
A crowd flowed over London Bridge, so many,
I had not thought death had undone so many.

Sweet Thames, run softly till I end my song,
Sweet Thames, run softly, for I speak not loud or long.

Gentile or Jew
O you who turn the wheel and look to windward,
Consider Phlebas, who was once handsome and tall as you.

Here is no water but only rock
Rock and no water and sandy road
The road winding above among the mountains
Which are mountains of rocks without water

Where the hermit-thrush sings in the pine trees
Drip drop drip drop drop drop drop
But there is no water

Who is the third who walks always beside you?
When I count, there are only you and I together
But when I look ahead up the white road
There is always another one walking beside you

আর উদ্ধৃত করছি না, অনুবাদের চেষ্টাও করতে চাই না; এগুলো ষাটের দশকে যেভাবে আলোড়িত করতো আমাকে, যেভাবে আমার চোখের সামনে দাঁড় করাতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবর্ণনীয় দৃশ্যের পর দৃশ্য, আজো করে। ইথারিত রোগীর মতো সন্ধ্যা, বা কফির চামচে জীবন পরিমাপ, বা প্রলয়ের ঢাকের মতো প্রতিটি বাতিস্তম্ভের বেজে চলা, বা এপ্রিল নিষ্ঠুরতম মাস আজো অভিভূত করে আমাকে। আজো আমি গুনগুন করতে ভালোবাসি :

Here is no water but only rock
Rock and no water and sandy road

বা

Who is the third who walks always beside you?

তবে আমি এগুলোর যে-ভাষ্য পাই, এবং এলিঅট যা বোঝাতে চেয়েছেন, তা মেনে নিই না। এখানে জল নেই শুধুই পাথর, পাথর এবং জল নয় শুধু বালুপথ– এ-দৃশ্য ও ধ্বনি আমি উপভোগ করি; তবে আমার ভালো লাগে না জল মানে বিশ্বাস আর পাথর মানে অবিশ্বাস, এ-ব্যাখ্যা। বিশ্বাসের কোনোই দরকার নেই, দরকার রহস্যমুক্ত সত্যের। পরিহাস ব'লে মনে হয় পরের পংক্তিটি– Who is the third who walks always beside you? মনে হয় বেশ একটা অলৌকিক অপার্থিব অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার বিবরণ পড়ছি; আমরা ছিলাম দুজন হঠাৎ তৃতীয় একজনের অস্তিত্ব অনুভব করছি, গুনতে গেলে পাচ্ছি দুজনকে, কিন্তু দেখতে গেলে দেখছি আমাদের দুজনের মধ্যে রয়েছে আরেকজন। খুবই অলৌকিক অতীন্দ্রিয় ঐশ্বরিক ব্যাপার মনে হচ্ছে, কিন্তু এটা কোনো অলৌকিক ব্যাপার নয়, এলিঅট নিজের অভিজ্ঞতা থেকেও লেখেন নি পংক্তিটি, লিখেছেন দক্ষিণ মেরু অভিযাত্রীর অভিজ্ঞতা থেকে ধার ক'রে। প্রচণ্ড শীতে আর ক্ষুধায় মৃত্যুর ভীতির মধ্যে দক্ষিণ মেরুযাত্রী একজনের মনে এ-বিভ্রম সৃষ্টি হয়েছিলো, যে-বিভ্রম ওই পরিস্থিতিতে জাগা স্বাভাবিক, যা কোনো অলৌকিক ব্যাপার নয়, তাকেই এলিঅট ধর্মীয় উপলব্ধির রহস্যে পরিণত করেছেন। অলৌকিক উপলব্ধি এমনই অসৎ।

এলিঅট তাঁর ধর্মীয় ও রাজনীতিক রক্ষণশীলতা স্পষ্টভাবেই জানিয়েছেন যে ধর্মবিশ্বাসে তিনি ক্যাথলিক আর রাজনীতিক বিশ্বাসে রাজতন্ত্রবাদী। তাঁর কবিতা ও নাটকে খ্রিস্টধর্মীয় রক্ষণশীলতা বারবার প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর *দি রক*-এর একটি অংশ প'ড়ে আমি বেশ মজা পাই, চমৎকার চমৎকার উক্তি আমোদ দেয় আমাকে, কিন্তু এর সবটাই বাজে কথা :

O perpetual revolution of configured stars,
O perpetual recurrence of determined seasons,
O world of spring and autumn, birth and dying!
The endless cycle of idea and action,
Endless invention, endless experiment,
Brings knowledge of motion, but not of stillness;
Knowledge of speech, but not of silence;
Knowledge of words, and ignorance of the Word.
All our knowledge brings us nearer to our ignorance,
All our ignorance brings us nearer to death,
But nearness to death no nearer to GOD.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Where is the life we have lost in living?
Where is the wisdom we have lost in knowledge?
Where is the knowledge we have lost in information?
The cycles of Heaven in twenty centuries
Bring us farther from GOD and nearer to the Dust.

I journeyed to London, to the timekept City,
Where the River flows, with foreign flotations.
There I was told: we have too many churches,
And too few chop-houses. There I was told:
Let the vicars retire. Men do not need the church
In the place where they work, but where they spend their Sundays.
In the City, we need no bells:
Let them waken the suburbs.
I journeyed to the suburbs, and there I was told:
We toil for six days, on the seventh we must motor
To Hindhead, or Maidenhead.
If the weather is foul we stay at home and read the papers.
In the industrial districts, there I was told
Of economic laws.
In the pleasant countryside, there it seemed
That the country now is only fit for picnics.
And the Church does not seem to be wanted
In country or in suburb; and in the town
Only for important weddings.

AMARBOI.COM

হায় নক্ষত্রমণ্ডলির অনন্ত আবর্তন,
হায় নির্ধারিত ঋতুসমূহের অনন্ত পুনরাবর্তন,
হায় বসন্ত ও শরৎ, জন্ম ও মৃত্যুর জগত!
চিন্তা ও কর্মের অন্তহীন চক্র,
অন্তহীন আবিষ্কার, অন্তহীন পরীক্ষানিরীক্ষা,
আনে গতির জ্ঞান, স্থিতির জ্ঞান নয়;
ভাষার জ্ঞান, নৈঃশব্দের জ্ঞান নয়;
শব্দের জ্ঞান, এবং শব্দ সম্পর্কে অজ্ঞানতা।
আমাদের সব জ্ঞান আমাদের নিকটবর্তী করে আমাদের অজ্ঞানতার,
আমাদের সব অজ্ঞানতা আমাদের নিকটবর্তী করে মৃত্যুর,
তবে মৃত্যুর কাছাকাছি হওয়া ঈশ্বরের কাছাকাছি হওয়া নয়।
কোথায় জীবন যা আমরা হারিয়ে ফেলেছি জীবনযাপনের মধ্যে?
কোথায় প্রজ্ঞা যা আমরা হারিয়ে ফেলেছি জ্ঞানের মধ্যে?
কোথায় জ্ঞান যা আমরা হারিয়ে ফেলেছি তথ্যের মধ্যে?
বিশটি শতক ধ'রে নক্ষত্রমণ্ডলির আবর্তন
আমাদের দূরে সরিয়ে নেয় ঈশ্বরের থেকে, এবং কাছাকাছি করে ধুলোর।

আমি গেলাম লন্ডনে, সময়নিয়ন্ত্রিত নগরে,
যেখানে বয়ে চলে নদী, বিদেশি নৌবহরসহ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেখানে আমাকে বলা হলো : আমাদের বড়ো বেশি আছে উপাসনালয়,
এবং খুব কম আছে খাবারদোকান। সেখানে আমাকে বলা হলো :
অবসর দাও পুরোহিতদের। মানুষের কর্মস্থলে কোনো দরকার নেই উপাসনালয়ের,
উপাসনালয় দরকার যেখানে তারা রোববার কাটায়।
নগরে, আমাদের দরকার নেই ঘণ্টাধ্বনির :
ঘণ্টাধ্বনি জাগাক শহরতলিকে।
আমি গেলাম শহরতলিতে, এবং সেখানে আমাকে বলা হলো :
ছ-দিন আমরা খাটাখাটি করি, সপ্তম দিনে আমাদের যেতেই হয়
হাইন্ডহেড, বা মেইডেনহেডে।
যদি আবহাওয়া খারাপ থাকে আমরা ঘরে ব'সে পড়ি খবরের কাগজ।
শিল্প-এলাকায় আমাকে বলা হলো
আর্থিক আইনের কথা।
মনোরম পল্লী-অঞ্চলে গিয়ে মনে হলো পল্লী এখন উপযুক্ত শুধু বনভোজনের।
উপাসনালয়ের কোনো দরকার নেই পল্লীতে, বা শহরতলিতে;
আর শহরে দরকার শুধু গুরুত্বপূর্ণ বিবাহানুষ্ঠানের জন্যে।

পড়তে বেশ লাগে, শুনতেও বেশ লাগবে,– এটা নাটকের অংশ; তবে এর বহু 'উপলব্ধি' বড়ো রকমের বাজেকথা, বিশ্বের রহস্যীকরণের জন্যে বানিয়ে তোলা, যদিও বাজেকথাগুলো অনেকের মনে হতে পারে মহৎ উপলব্ধি; আর দ্বিতীয়াংশে উপাসনালয়বিমুখতার যে-বিবরণ রয়েছে, তাতে ব্যথিত হওয়ার কিছু নেই, মানুষ এগুলোর কবল থেকে যে মুক্ত হচ্ছে, এগুলোকে যে গুরুত্বহীন মনে করছে, তাতে আনন্দিত হওয়ার কথা। তাঁর কয়েকটি উপলব্ধি যাচাই করতে পারি। এলিঅট চিন্তা ও কর্মের অন্তহীন চক্র, অন্তহীন আবিষ্কার ও পরীক্ষানিরীক্ষা আর গতির জ্ঞানকে ভালো ব্যাপার মনে করছেন না, চাচ্ছেন স্থিতির জ্ঞান বা ধ্যান; তবে স্থিতি বা ধ্যান বাজেকথা মাত্র, তিনি নিজেও স্থিতি বা ধ্যানের চর্চা করতেন না, ব্যাংকে ও পরে প্রকাশনাসংস্থায় কাজ করতেন, পালিয়ে বেড়াতেন উন্মাদ প্রথম স্ত্রীর কাছ থেকে, বুড়ো বয়সে বিয়ে করেন তরুণী ব্যক্তিগত সহকারিণীকে। ধ্যানের কথা বাতিল বইগুলোতে খুবই পাওয়া যায়, তবে চিন্তা, কর্ম, আবিষ্কার, আর পরীক্ষানিরীক্ষার পাশে ধ্যান বা স্থিতি হাস্যকর ব্যাপার। 'আমাদের সব জ্ঞান আমাদের নিকটবর্তী করে আমাদের অজ্ঞানতার',– একে কি সত্য ব'লে মানতে হবে? জ্ঞান কি মুক্ত করছে না আমাদের অজ্ঞানতা থেকে? এখনকার কিশোররাও কি অনেক ব্যাপারে বেশি জানে না আরিস্ততল, মোজেস বা মহর্ষিদের থেকে? জ্ঞান আমাদের অজ্ঞান করে না, বরং ক্রমশ আমরা নির্মোহ সত্যের দিকে এগোই, জ্ঞানী হই, যেমন আমরা পুরোনো ধ্যানীদের থেকে জানি অনেক বেশি। তাঁরা আসলে কোনো সত্যই উদঘাটন করেন নি, উচ্চারণ করেছেন কিছু বিভ্রান্ত শ্লোক, ওই বিভ্রান্ত শ্লোক উচ্চারণকে জ্ঞান বলতে পারি না। এলিঅট যে-জীবন, প্রজ্ঞা, জ্ঞানের কথা বলেছেন, যা আমরা হারিয়ে ফেলেছি ব'লে আর্তনাদ করছেন, তা কিংবদন্তিমাত্র; ওই জীবন, প্রজ্ঞা, জ্ঞানের থেকে বিশশতকের জীবন, জ্ঞান, তথ্য অনেক উন্নত। ঐশী গ্রন্থগুলোর প্রণেতারা আজকের জ্ঞানের বিকাশের কথা কখনো ভাবতেও পারেন নি। আর ঈশ্বরের কাছাকাছি হওয়া? শুধু হেসে উঠতে ইচ্ছে করে। জনগণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপাসনালয়বিমুখতায় খুবই মর্মাহত এলিঅট; বুঝতে পারি যে বিশশতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির থেকে জনগণ অনেক বেশি এগিয়েছে চেতনায়। তারা কতকগুলো ভুল বিশ্বাসের মধ্যে প'ড়ে নেই; তারা উঠে এসেছে আদিম বিশ্বাস থেকে, বিশ্বকে রহস্যমুক্ত করছে তারা, আর আধুনিক কবি, আদিম মানুষের মতো, করছেন বিশ্বের রহস্যীকরণ।

এলিঅটের মতে চিরকালের শ্রেষ্ঠ কবি দান্তে, যাঁর মহিমা তিনি বর্ণনা করেছেন বহুবার, যাঁর *দি ডিভাইন কমেডি* বা *স্বর্গীয় মিলন* পৃথিবীর বিখ্যাততম কাব্যগুলোর একটি। বিশ্বাস ও কবিতার মধ্যে পার্থক্য করতে পারি আমি, বিশ্বাসের কোনো মূল্য নেই আমার কাছে, কিন্তু কবিতার মূল্য আছে; তাই এর কাব্যত্ব অনুভব করি আমি, কিন্তু যে-বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে কাব্যটি, তা শিশুসুলভ ও হাস্যকর। এর রূপকার্থ– পরমসত্তার সঙ্গে বিশ্বাসী আত্মার মিলন প্রবীণ শিশুদের কাছে মধুর, তাদের এটা পরম রূপকথার স্বাদ দেয়; আমি কৌতুক বোধ করি। মধুসূদন *মেঘনাদবধকাব্য*-এর অষ্টম, *প্রেতপুরী*, সর্গ দান্তের কাব্যের *নরক* সর্গের অনুসরণে লিখেছিলেন, তবে দান্তের মতো বিশদ হওয়ার ধৈর্য বা সুযোগ ছিলো না মধুসূদনের। এ-কাব্যের *নরক* খণ্ডের তৃতীয় সর্গে নরকের তোরণে বড়ো বড়ো বর্ণে লেখা আছে :

THROUGH ME THE ROAD TO THE CITY OF DESOLATION,
THROUGH ME THE ROAD TO SORROW DIUTURNAL,
THROUGH ME THE ROAD AMONG THE LOST CREATION....
LAY DOWN ALL HOPE, YOU THAT GO IN BY ME.

এর দ্রুত সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেছেন মধুসূদন :

আগ্নেয় অক্ষরে লেখা দেখিলা নৃমণি
ভীষণ তোরণ-মুখে;– "এই পথ দিয়া
যায় পাপী দুঃখদেশে চির দুঃখ-ভোগে;–
হে প্রবেশি, ত্যজি স্পৃহা, প্রবেশ এ দেশে।"

AMARBOI.COM

দান্তের কাব্য ও প্রতিভাকে অস্বীকার করার কথা ওঠে না, তাঁর কবিত্ব মুগ্ধ করে আমাকে, কিন্তু অস্বীকার করি তাঁর বিশ্বাসকে। তাঁর বিশ্বাস সম্পূর্ণ মধ্যযুগীয়; বিশ্ব, পৃথিবী, নরক, স্বর্গ প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর ধারণা হাস্যকর। বার্ট্র্যান্ড রাসেল নিজেকে খ্রিস্টান বলতে অস্বীকার করেছিলেন যে-সমস্ত কারণে, তার একটি হচ্ছে নরক– ঈশ্বরের অগ্নিকুণ্ড, তার অবাধ পীড়নসুখের এলাকা; তাঁর মতে যে-ঈশ্বর নরকেরও ঈশ্বর, যে তার সৃষ্টিকে শাস্তি দেয়ার জন্যে পরিকল্পনার কোনো শেষ রাখে নি, যে এতো হিংস্র, তাকে মানা যায় না। ঈশ্বরকে প্রচণ্ড শাস্তিদাতারূপে ভাবতে পারেন না রাসেল; যে এমন শাস্তি দিতে পারে, তাকে মহৎ ব'লে ভাবাও কঠিন। নরক পরিকল্পনায় সব ধরনের ঈশ্বরের থেকে নিপুণ দান্তে, তারা নতুন নরক নির্মাণের দরকার বোধ করলে দান্তেকে নরকের স্থপতির দায়িত্ব দিলে যে অভাবিত হিংস্র নরক পাবে, তা দেখে তারাই ভয় পাবে;–আমি ভেবে পাই না একটি মানুষ কতোটা নিষ্ঠুর ও প্রতিশোধপরায়ণ হ'লে এমন বিশদভাবে পরিকল্পনা করতে পারেন নরকের, এবং তাতে অন্তহীন শাস্তি দিতে পারেন তাঁর সব ধরনের শত্রুকে। দান্তের নরকের পীড়নের কোনো তুলনা পাই না, শুধু কিছুটা পাই হিটলারের বন্দীশিবির ও সোলঝিনিৎসিনের *গুলাগ দ্বীপপুঞ্জ*-এ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দান্তের কাব্য মৃত্যুর পর পরমসত্তার (একটি ভুল বিশ্বাস) সাথে আত্মার (আরেকটি ভুল বিশ্বাস) মিলনের রূপক। পরমসত্তা, নরক, শুদ্ধিস্থল, স্বর্গ কিছুই দান্তের নিজের কল্পনা নয়, এগুলো পেয়েছেন তিনি ক্যাথলিক বিশ্বাস থেকে; সেগুলোকে ভ'রে তুলেছেন নিজের কল্পনায়, ওই কল্পনাকেও নিয়ন্ত্রণ করেছে তাঁর ধর্মবিশ্বাস। এ-কাব্যের সব বিশ্বাসই ভুল। শুরু বিয়াত্রিচেকে নিয়ে; কৈশোরে প্রথম দেখেছিলেন এই পবিত্র স্বর্গীয় মুখ, যা কখনো ভোলেন নি, এবং ওই মুখের অধিকারিণী হয়ে ওঠে তাঁর কাছে শুদ্ধতমা। শুদ্ধতাও এক কৌতুককর ব্যাপার, বিশ্বাসীদের অন্তরে তা কখনো মলিন হয় না, যদিও আমরা জানি কিছুই অমলিন শুদ্ধ নয়। বিয়াত্রিচের বিয়ে হয়ে যায় এক ব্যাংক-কর্মকর্তার সাথে, দান্তে নিজেও বিয়ে করেন; কিন্তু তাঁর হৃদয়ে জেগে থাকে শুদ্ধতমার জন্যে শুদ্ধতম প্রেম। কতো সহস্রবার বিয়াত্রিচে ঘুমোলো পতিদেবতার নিচে, কতোভাবে তৃপ্ত করলো পতির বিচিত্র সখ, কতোবার শীৎকার ক'রে উঠলো, গর্ভবতী হলো কতোবার, দান্তেও কতোবার উঠলেন তাঁর নারীর ওপরে, ভেঙে পড়লেন কতোবার; কিন্তু তা কোনো ব্যাপার নয়, বিশ্বাসীদের শুদ্ধতা শৃঙ্গারে সঙ্গমে মলিন হয় না। বিয়াত্রিচেকে তিনি পথেঘাটে যতোবার দেখেছেন ততোবার মনে হয়েছে তিনি দেখছেন ঈশ্বরকে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ভালো বিষয় হ'তে পারেন দান্তে, মনোবিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করতে পারেন কী উন্মত্ততায় ভুগতেন দান্তে– প্রতিভাস, ভ্রান্তবিশ্বাস, না মতিভ্রমে? সব মহাধার্মিক ঈশ্বরদ্রষ্টাই মনোবিকলনগ্রস্ত। ফ্লোরেন্সের ওই তরুণীর মধ্যে তিনি দেখেন ঈশ্বরের সশরীরী গৌরব, যার মধ্যে একাকার হয়ে আছে খ্রিস্টীয় উপাসনালয়, মা মেরি, আর খ্রিস্ট নিজে। তিনি নরক, শুদ্ধিস্থল, ও স্বর্গের যে-ভূগোল নির্দেশ করেছেন, খুবই নিখুঁত হওয়ার চেষ্টা করেছেন দান্তে, যে-ভূগোল ও জ্যোতির্বিজ্ঞানকে মনে করেছেন ধ্রুব, তা আজকের চোখে শুধু ভুলই নয়, হাস্যকরও। তিনি নরক কল্পনা করেছেন একটি চোঙাকৃতি সুড়ঙ্গরূপে, যা জেরুজালেমের নিচ থেকে পৃথিবীর অভ্যন্তরের দিকে নেমে গেছে। ওই নরককে ভাগ করেছেন তিনি স্তরে স্তরে, একেক স্তরে দণ্ডিত করেছেন একেক ধরনের পাপীকে। তাঁর নিজের শত্রুদের তিনি দিয়েছেন কঠিন শাস্তি। তারপর কল্পনা করেছেন পারগ্যাটোরি বা শুদ্ধিস্থল, যেখানে, ক্যাথলিক বিশ্বাস অনুসারে, বাস করে পাপমুক্ত আত্মারা, যা অবস্থিত দক্ষিণ গোলার্ধের কোনো এক দ্বীপের কোনো এক পর্বতের চুড়োয়। এখানে রয়েছে সাতটি স্তর, যাতে ঘুরে ঘুরে আত্মারা মুক্তি পায় সাতটি সাংঘাতিক পাপ থেকে, এবং উপযুক্ত হয়ে ওঠে স্বর্গে ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাতের। স্বর্গ হচ্ছে স্বর্গবাসের প্রবেশপত্র পাওয়া আত্মাদের বাসস্থান। স্বর্গকে তিনি স্থাপন করেন মধ্যযুগীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানসম্মত দশ আসমানে, যার ওপর ফুটে আছে অতীন্দ্রিয় রহস্যগোলাপ।

বিশ্ব সম্পর্কে কী ধারণা ছিলো বিশ্বাসী দান্তের? মধ্যযুগে এ সম্পর্কে যতোটুকু জানা হয়েছিলো, তিনি জানতেন ততোটুকু; তাঁর পবিত্র বই ও বিশ্বাস তাঁকে যে-সব ভুল ধারণা দিয়েছিলো, তিনি পোষণ করতেন সে-সব ভুল ধারণাই। দান্তের ঈশ্বর বিশ্ব সম্পর্কে বেশি জানতো না, যতোটুকু জানতো তাও শিখেছিলো আলেকজান্দ্রিয়ায় টলেমির বইপত্র থেকে। ভূকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের কল্পনা আগে থেকেই ছিলো, টলেমি তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিধিবদ্ধ করেন, যা ষোড়শশতকে, দান্তের দু-শো বছর পর, বাতিল করে দেন কোপারনিকাস; এবং প্রতিষ্ঠা করেন সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্ব। তবে মহাবিশ্ব এর মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়; একটি গরিব নক্ষত্র সূর্য, তাকে কেন্দ্র ক'রে মহাজগতের একপ্রান্তে আছে সৌরলোক; আরো কোটি কোটি কোটি নক্ষত্রলোক আছে মহাবিশ্বে। এসব জানা ছিলো না ঈশ্বরের, ও দান্তের। দান্তে বিশ্বাস করতেন পৃথিবীই বিশ্বের কেন্দ্র, আর ওই বিশ্ব বেশি বড়ো ছিলো না, এখনকার মহাবিশ্বের কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি ভাগের একভাগের কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি কোটি ভাগের খণ্ডাংশমাত্র। আলোর গতি ও আলোকবর্ষের কথা ঈশ্বর ও দান্তে কখনো ভাবতে পারেন নি। টলেমি বিশ্বজগতের ক্রিয়াকলাপের ভেতরে ঢোকেন নি, আপাতদৃষ্টিতে যা দেখা যায় তাকেই মনে করেছেন সত্য, আর তাকে অন্যরা মনে করেছে চিরসত্য, এবং ওই সত্য ঈশ্বরের ধ্রুবসত্য হয়ে ঢুকে গেছে ঈশ্বরদের বইগুলোতে।

সূর্য উঠতে দেখি আমরা, দেখি ডুবতে; টলেমিও দেখেছিলেন সূর্য ওঠে, সূর্য ডোবে। এ দেখেই মনে করেছিলেন সূর্য এভাবেই ঘোরে পৃথিবীর চারদিকে, যা খুবই বড়ো ভুল। সূর্য ওঠেও না ডোবেও না; পৃথিবীই ঘুরছে নিজের অক্ষরেখার ওপর ও সূর্যকে ঘিরে নিজের কক্ষপথে। প্যালেস্টাইন অঞ্চলের ধর্মবইগুলোতে এ-ভুলই ঈশ্বরের সত্য ব'লে ঘোষিত হয়েছে। চাঁদ, সূর্য, ও গ্রহগুলোর দিকে তাকালে মনে হয় এগুলো ঘুরছে পৃথিবীকে ঘিরে; টলেমি এগুলোর গোলাকার পথগুলোকে ভাগ করেছিলেন সাতটি পথে। এগুলোই ধর্মগ্রন্থের পবিত্র সাত আসমান : পৃথিবী থেকে ক্রমশ দূরবর্তী চাঁদ, বুধ (Mercury), শুক্র (Venus), সূর্য, মঙ্গল (Mars), বৃহস্পতি (Jupiter), ও শনির (Saturn) কক্ষপথ (তখনো ইউরেনাস, নেপচুন, এবং মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যবর্তী গ্রহাণুগুলো আবিষ্কৃত হয় নি; আবিষ্কারের পর ধার্মিকেরা আরো তিন আসমান যোগ ক'রে দশ আসমানে বিশ্বাস আনেন)। মধ্যযুগের ইউরোপের কতো না কবিই মুগ্ধ ছিলেন 'স্ফেয়ার' বা কক্ষপথের অশ্রুত সঙ্গীতে, এ নিয়ে কতোই কবিতা লিখেছেন তাঁরা। এই সাত আসমানের পরে স্থির নক্ষত্রদের পথ বা অষ্টম আসমান, তারপর আদিচালকের (Primum Mobile : First Mover) অবস্থান, যা নিজে চলে না কিন্তু চালায় সব কিছু। এই নয় কক্ষ বা পথ বা আসমানের পর হচ্ছে দশম স্বর্গ, ঈশ্বরের ও তার সন্তদের প্রকৃত বাসভবন। এর কোনো অবস্থান নেই, গতি নেই, চলাচল নেই; এটা শাশ্বত ও অনন্ত। এমন কল্পনায় বিশ্বাসীদের চোখ জলে ভ'রে যায়, ঈশ্বরের মহিমা অনুভব ক'রে তারা স্বর্গের সুখ অনুভব করে। কিন্তু এ হচ্ছে অপকল্পনার চমৎকার উদাহরণ। মানুষের সব ধরনের কল্পনা আমার ভালো লাগে, কিন্তু সেগুলোতে আমি বিশ্বাস করি না, মজা পাই। দান্তের কাব্য সুন্দর, কিন্তু বিশ্বাস ভুল; তাঁর বিশ্বাসের কাজ হচ্ছে বিশ্বকে মিথ্যেয় বা রহস্যে ঢেকে দেয়া।

বাঙলা লেখকদের লেখা পড়ার সময় বিব্রত বোধ করি বারবার। আমাদের প্রধান লেখকদের মধ্যেও মৌলিকত্ব শোচনীয়রূপে কম, যখন তাঁরা চিন্তা করেন তখন তাঁরা অনেকটা শিশু; তাঁদের অধিকাংশই অবিকশিত, অনেকাংশে অজ্ঞান, বিশ্বজ্ঞানের অভাবে আদিম বিশ্বাস প্রবল তাঁদের; তাঁরা স্বস্তি পান কুসংস্কারে, পুরোনো বাজেকথায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুসংস্কারকীর্তনে তাঁরা অকুণ্ঠ। তরুণ বয়স থেকেই অস্বস্তি বোধ করি আমি নজরুলের লেখা পড়ার সময়; তিনি মাঝারি লেখক ব'লে নয়, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিভ্রান্ত লেখক ব'লে। তিনি ভারী বোঝার মতো চেপে আছেন বাঙালি মুসলমানের ওপর; বাঙালি মুসলমান তাঁকে নির্মোহভাবে বিচার করতে পারবে না বহু দিন। বাঙালি মুসলমান প্রগতিশীলেরাও যথেষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল, আর তারা পড়ে না, নজরুলকেও পড়ে না, শুনে শুনে বিশ্বাস করে যে নজরুল বিদ্রোহী। প্রচারে প্রচারে তাঁকে আমি বিদ্রোহী ব'লেই মনে করেছি যখন বালক ছিলাম, বেশ কিছু পদ্যেগদ্যে দেখেছিও তাঁর বিদ্রোহীরূপ, কিন্তু তিনি বাঙলা ভাষার বিভ্রান্ত কুসংস্কার-উদ্দীপ্ত লেখকদের মধ্যে প্রধান। বেশি ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না, কয়েকটি মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি। গানের পরে গানে তিনি লিখেছেন 'নামাজ পড়, রোজা রাখ, কলমা পড় ভাই।/তোর আখেরের কাজ করে নে, সময় যে আর নাই'; 'শোনো শোনো য়্যা এলাহি আমার মুনাজাত।/তোমারি নাম জপে যেন হৃদয় দিবস-রাত'; 'আল্লাহ নামের নায়ে চড়ে যাব মদিনায়'; 'মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই,/যেন গোরে থেকেও মোয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই'; 'ওরে ও দরিয়ার মাঝি! মোরে নিয়ে যা রে মদিনা'; 'খোদার প্রেমের শারাব পিয়ে বেহুঁশ হয়ে রই পড়ে'; 'আল্লাহ্ আমার প্রভু, আমার নাহি নাহি ভয়/আমার নবী মোহাম্মদ, যাঁহার তারিফ জগৎময়।' অবশ্য এগুলোকেও অনেকে মনে করতে পারেন খুবই বিদ্রোহী ও প্রগতিশীল কাণ্ড; কিন্তু এখানো কোনো বিদ্রোহীকে পাচ্ছি না, পাচ্ছি একজন ইসলাম অন্ধকে।

রবীন্দ্রনাথ করতেন রহস্যীকরণ, তিনি কোনো প্রথাবদ্ধ ধর্মের গীতিকার ছিলেন না; তিনি তাঁর বিশ্বাসকে জড়িয়ে দিতেন মহাজগতের সাথে। নজরুলে সেই রহস্যীকরণ নেই, তিনি স্থূলভাবে প্রকাশ করেছেন তাঁর বিশ্বাস বা উদ্দীপনা। নজরুলের বিশ্বাসও সন্দেহজনক, মনে হয় তিনি এক বিশ্বাসের সাথে আরেক বিশ্বাসের পার্থক্য বোঝেন না। বিধিবদ্ধ ধর্মীয় বিশ্বাসগুলো কঠোর, একটি মানলে আরেকটি মানা যায় না, ইসলাম মানলে হিন্দুধর্ম মানা যায় না, একই সাথে কেউ হ'তে পারে না মুসলমান ও হিন্দু; কিন্তু নজরুল তাঁর এক বিশ্বাস থেকে আরেক বিশ্বাসে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন আগের বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে। আমি বিস্মিত হই যিনি লেখেন 'আল্লাহ্ আমার প্রভু, আমার নাহি নাহি ভয়/আমার নবী মোহাম্মদ, যাঁহার তারিফ জগৎময়', তিনি কী ক'রে লিখতে পারেন 'কালী কালী মন্ত্র জপি বসে লোকের ঘোর শ্মশানে'; 'বল্ রে জবা বল্!/কোন্ সাধনায় পেলি শ্যামা মায়ের চরণতল'; 'তোর রাঙা পায়ে নে মা শ্যামা আমার প্রথম পূজার ফুল' ও আরো এমন বহু পৌত্তলিক পদ। তিনি কি একই সাথে হ'তে পারেন খাঁটি মুসলমান, আর কালীভক্ত? অনেকে ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করেন যে নজরুল দুই সংস্কৃতির মিলন ঘটিয়েছিলেন; যদি তিনি তাই ক'রে থাকেন তাহলে তিনি মিলন ঘটিয়েছিলেন দুই খারাপের। আমি কি এমন মিলন ঘটাতে পারি? আমি কি আজ আল্লার স্তব লিখে কাল কালীমায়ের পায়ে সঁপতে পারি নিজেকে? নজরুলের কী কোনো বিশ্বাস ছিলো? না কি তিনি স্বতস্ফূর্ত উদ্গীরণ করেছেন বিদ্রোহ; আর বাণিজ্যিক প্রেরণায় লিখে গেছেন একই সাথে হামদ, নাত, আর কালীকীর্তন? নজরুলের ইসলামি আর শাক্ত গানগুলো তাঁকে প্রচুর অর্থ এনে দিয়েছিলো, আমরা জানি, আর ওই অর্থই হয়তো তাঁকে মাতিয়েছিলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুসংস্কৃত উদ্দীপনায়।

বাঙলার লেখকদের মধ্যে চেতনায় সবচেয়ে আধুনিক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত; সভ্যতা ও মানুষের বিবর্তন বুঝেছিলেন তিনি ভালোভাবে, এবং ঈশ্বর নামের অলীক ব্যাপারটি ছিলো তাঁর কাছে স্পষ্ট। তিরিশের আধুনিক কবিরা অবিশ্বাসী ছিলেন; তবে তাঁরা এড়িয়ে গেছেন ব্যাপারটি, শুধু সুধীন্দ্রনাথ এড়িয়ে যান নি। বারবার ঈশ্বর এসেছে তাঁর কবিতায়, তাঁর ঈশ্বর ঠিক হিন্দু নয়, ঈশ্বর বলতে তিনি মুসার ঈশ্বরকেই বুঝেছেন বেশি। তিনি ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, পরিহাস করেছেন, ওই অলীক কল্পনার মূলও দেখিয়েছেন। 'উড়ায়ে মরুর বায়ে ছিন্ন বেদ-বেদান্তের পাতা', সুধীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বলেছি পিশাচহস্তে নিহত বিধাতা।' ইউরোপে উনিশশতকের শুরু থেকেই ঈশ্বরের মৃত্যুর সংবাদ রটতে থাকে, যা চরম সংবাদে পরিণত হয় নিটশের 'ঈশ্বর মৃত : গড ইজ ডেড' ঘোষণায়। বহু শতক ধ'রেই অসুস্থতায় ছিলো ইউরোপি ঈশ্বর, নিটশে তার মৃত্যুর সংবাদ সংবাদপত্রের শিরোনামের মতো প্রচার করেন। কিন্তু সে কি অচিকিৎসায় বা বার্ধক্যজনিত রোগে মারা গেছে? না, তাকে হত্যা করা হয়েছে। নিটশের *প্রফুল্ল বিজ্ঞান* (১৮৮২) বইটিতে এক পাগল বাজারে গিয়ে চিৎকার করতে থাকে, 'আমি ঈশ্বরকে খুঁজছি! আমি ঈশ্বরকে খুঁজছি।' তার কথা শুনে বাজারের লোকজন হেসে ওঠে; মজা করার জন্যে তারা জিজ্ঞেস করে ঈশ্বর কি হারিয়ে গেছে, না কোথাও লুকিয়েছে, না কি ভ্রমণে বেরিয়েছে? তখন ওই পাগল ঘোষণা করে : 'ঈশ্বর মারা গেছে। ঈশ্বর মৃত। আর আমরাই খুন করেছি তাকে।' সুধীন্দ্রনাথই সম্ভবত প্রথম, বাঙলা ভাষায়, ঈশ্বরের নিহত হওয়ার সংবাদটি দেন।

বেদবেদান্তের পাতা ছিঁড়ে মরুর বায়ে উড়িয়ে দিয়ে একসাথে তিনি বাতিল করেছেন প্যালেস্টাইনি ও আর্য ঈশ্বর। সুধীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'শূদ্রের অলক্ষ্যভেদে নিহত আমার ভগবান।' এতে মনে পড়ে *মহাভারত*-এর কৃষ্ণের মৃত্যুর ঘটনা। প্রত্যাদেশকেও বাতিল করেছেন সুধীন্দ্রনাথ, এবং পরিহাস করেছেন ধর্মবোধকে। ধার্মিকেরা 'ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন' তত্ত্বে বিশ্বাসী, যাকে দর্শনে পরিণত করেছেন বহু দার্শনিক, যেমন লাইবনিৎস, আর একে পরিহাসও করেছেন অনেকে, যেমন ভলতেয়ার *কাঁদিদ*-এ দেখিয়েছেন উপদংশও দয়ালু ঈশ্বরের দয়া, মঙ্গলের জন্যেই তিনি দান করেছেন উপদংশ; আর সুধীন্দ্রনাথ গভীর বেদনায় বলেছেন : 'শর্বরীর রুগ্ন মুখ ভ'রে গেলে মারী গুটিকায়/ভাবিব না উৎসুক অমরা/আমাকে ও-পার থেকে আরাত্রিকে আহ্বান পাঠায়।' তাঁর কাছে ভগবান হচ্ছে 'ভগবান, ভগবান, য়িহুদির হিংস্র ভগবান',–জিহোভা, ইহুদি মহাপুরুষদের কল্পিত প্রচণ্ড ঈশ্বর, যে ক্ষিপ্ত হয় সহজে, যে এতোই পবিত্র যে তার নাম নেয়াও নিষেধ, তাই তার নাম এমনভাবে বানান করা হয়, JHWH, যাতে তা উচ্চারণও করা না যায়। সুধীন্দ্রনাথ প্রচুর ধর্ম আর ঈশ্বর দেখেছেন, তাদের সর্বশক্তির অনেক উপাখ্যান শুনেছেন, কিন্তু তার পরিচয় পান নি। অবিশ্বাসে বলেছেন :

> ভগবান, ভগবান, রিক্ত নাম তুমি কি কেবলই?
> তুমি কি সত্যই
> আরণ্যিক নির্বোধের ভ্রান্ত দুঃস্বপন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তপন্ত তপন
সাহারা-গোবির বক্ষে জুলে না কি তোমার আজ্ঞায়?

তাঁর ভগবান সংজ্ঞাটি চমৎকার : আরণ্যিক নির্বোধের ভ্রান্ত দুঃস্বপন। ভারতীয় ভগবানকে তিনি বলেছেন 'যাযাবর আর্যের বিধাতা', আর 'লুপ্তবংশ কুলীনের কল্পিত ঈশান'। ঈশ্বর কার স্বার্থ দেখে? চিরকাল ঈশ্বর বাস করে গরিবের উঠোনে, আর স্বার্থ দেখে অসুরদের : 'তোমার অমিত ক্ষমা, সে কি শুধু অসুরের তরে?' বিধাতার ক্রিয়াকলাপ দেখে পরিহাস করেছেন সুধীন্দ্রনাথ :

হে বিধাতা,
অতিক্রান্ত শতাব্দীর পৈতৃক বিধাতা,
দাও মোরে ফিরে দাও অগ্রজের অটল বিশ্বাস।
যেন পূর্বপুরুষের মতো
আমিও নিশ্চিন্তে ভাবি, ক্রীত, পদানত
তুমি মোর আজ্ঞাবাহী দাস।
তাদের সমান
মণ্ডূকের কূপে মোরে চিরতরে রাখো, ভগবান।

অগ্রজের অটল বিশ্বাস কিসে? ঈশ্বরে? না, তারা বিশ্বাস করেছে নিজেদের ক্ষমতায়। তারা সৃষ্টি করেছে সর্বশক্তিমানদের, লাগিয়েছে নিজেদের কাজে, এবং নিজেরা রয়ে গেছে কুয়োর ব্যাঙ। সুধীন্দ্রনাথের প্রার্থনা যেনো পূরণ করেছে বিধাতা, তাই এখন বিশ্বজুড়ে দেখা দিচ্ছে অটল বিশ্বাসী কূপমণ্ডূকগণ।

AMARBOI.COM

আদিম দেবতারা ও সন্ততিরা

আধুনিক কবিতার উদ্ভব-বিজয়-প্রতিষ্ঠা বিশশতকি বাঙলা সাহিত্যের বৃহত্তম ঘটনা। আধুনিক কবিতার চেয়ে উজ্জ্বল ও মূল্যবান কিছু ঘটে নি এ-শতকে : এমন রঙিন ও রঙরিক্ত, দ্রোহী ও আনত, সুখকর ও সুখহর, সমকালমগ্ন ও মহাকাললুব্ধ, ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক, বিশ্বমুখি ও স্বদেশলগ্ন, এবং জ্ঞানী ও মেধাবী আর কিছু জন্মে নি বিশশতকি বাঙলা সাহিত্যে। আধুনিক কবিতাই সে-বিশালব্যাপক রাস্তা, যে-পথে বিংশ শতাব্দী প্রবেশ করে বাঙলায়। আধুনিক কবিতাপূর্ব বাঙলা সাহিত্য, গদ্যেপদ্যে, উনিশশতকের বিলম্বিত উপহার। অনুন্নত ও পশ্চাৎপ্রবণ বাঙলাদেশ সময়ের সহযাত্রী নয়, পিছিয়ে পড়া তার স্বভাব; এবং বিভিন্ন কালকে একই সময়ে লালন করা শাদা সাম্রাজ্যবাদীদের আগমন-উত্তর বাঙলার চরিত্র। বাঙলার বিশ শতাব্দীও সর্বাঙ্গে বিংশ শতাব্দী নয়; এর বড়ো এক অংশ মধ্যযুগ, বিরাট এক অংশ উনিশশতক, এবং ক্ষুদ্র এক অংশ বিশশতক– জীবনে, জীবনযাপনে, রাষ্ট্রব্যবস্থায়, চিন্তায় ও শিল্পসাহিত্যে। বিংশশতাব্দীই আধুনিকতা; তবে সে-ধারণা কালগত নয়, চেতনাগত। এ-শতকের তৃতীয় দশকের দ্বিতীয়াংশে কয়েকজন তরুণের দ্রোহী ও প্রতিভামণ্ডিত চিত্ত থেকে উৎসারিত হয় যে কবিতাপুঞ্জ, তা বিংশশতাব্দীর প্রাণনিঙড়ানো শস্য। আধুনিক কবিতার শ্রমসাধনা ছিলো নিজস্ব কালের গুণাবলি অর্জনের, এবং আবহমান সময়ের সাথে আপন কালের সন্ধিস্থাপনের। এ-সাধনা রবীন্দ্রনাথের ছিলো না; সময়ের সাথে তিনি অভিজ্ঞ ও প্রবীণ হয়েছেন, রূপান্তরিত হয়েছেন; কিন্তু বিশশতকের পাপপূণ্য অর্থাৎ চারিত্র নিজের শরীর ও আত্মায় ধারণের সাধক ছিলেন না রবীন্দ্রনাথ। তাঁর অনেক কবিতাই কালোত্তর, কিন্তু অ-বিংশ শতকি;– আধার ও আধেয়ের উভয় স্তরেই। তাঁর শোভামণ্ডিত পবিত্র আগুনে আত্মাহুতি দিতে ব্যগ্র হয়েছিলেন যে-কবিকুল বিশশতকের প্রথম-দ্বিতীয় ও অন্যান্য দশকে, কোনো রকমের শ্রমসাধনা তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না; কবিপ্রসিদ্ধ বিষয়ে ছন্দোবদ্ধ পংক্তিবিন্যাসই ছিলো তাঁদের লক্ষ্য। তিরিশি কবিতা, যার প্রিয় পরিচিত সৎ নামান্তর আধুনিক কবিতা, ছড়ায় নতুন কালের নিশ্বাস। এ-কবিতার মুখোমুখি হ'লে যে-বোধ ঢোকে আমাদের চেতনাচৈতন্যে, তা অন্য কোনো কালের, এবং রবীন্দ্রনাথের, কবিতার কাছ থেকে পাওয়া যায় না। ওই বোধ একাধিক বিশ্বযুদ্ধঅভিজ্ঞ, বহুবিশ্বাসরিক্ত বিংশশতাব্দীর, ব্যাপক নতুন নিজস্ব জটিলতাখচিত বিংশশতাব্দীর। বাঙলা সাহিত্যে বিংশ শতাব্দী ও আধুনিক কবিতা অনেকাংশে সমার্থক। পাঁচজন, যেনো অভিনব আদিম দেবতা, এলেন; এবং বদলে দিলেন বাঙলা কবিতাকে– বক্তব্যে, ব্যঞ্জনায়, চিন্তায়, শব্দে, কলাপ্রকৌশলে। শুধু তাই নয়; তাঁদের শ্রমসাধনা বদলালো বাঙালির জীবন-ও শিল্প-চেতনা। জীবনকে তাঁরা পরালেন জটিল নতুন পোশাক, শ্রান্ত সারল্যের পরিবর্তে প্রদীপ্ত জটিলতা; শিল্পকে দিলেন জটিলতর নতুনতর প্রাণ ও পোশাক–কবিতাসৃষ্টির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূভাগ থেকে সরল অমেধাবীদের বিদায়ের দিন ঘনিয়ে এলো। প্রতিভাবান পাঁচজন– বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, ও অমিয় চক্রবর্তী– আধুনিক কবিতার পঞ্চশূর। বাঙলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথের পর যথার্থ নতুন কবিতা এ-পাঁচজনের সৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথের কাছে তিরিশি পাঁচজনের সবাই, কমবেশী, ঋণী। তাঁরাই প্রথম বাঙলা ভাষায় দেখালেন যে মহাপ্রতিভার অনুকরণ করাই কবিতাজগতের একমাত্র রীতি নয়, ঋণও নেয়া সম্ভব এ-জগতে; এবং সে-ঋণ ভিত্তি ক'রে গ'ড়ে তোলা সম্ভব অগাধ ঐশ্বর্য। শুধু ঋণ নয়, অনুকরণও করেছেন তাঁরা রবীন্দ্রনাথের : বুদ্ধদেব বসুর কৈশোরিক কবিতাগ্রন্থ *মর্মবাণী*, অমিয় চক্রবর্তীর *উপহার*, সুধীন্দ্রনাথের *প্রাক্তনী* ও *তন্বী* রবীন্দ্রাচ্ছন্ন। কিন্তু যে-দিন তাঁরা বুঝলেন রবীন্দ্রনাথে মুক্তি নেই তাঁদের, ও বাঙলা কবিতার, সেদিন সূচিত হলো বিংশশতাব্দী– এক নতুন, জটিল, যুদ্ধাহত, অবিশ্বাসী, ও গাঢ় চৈতন্যময় সময়– যার কবিতাও নতুন। আধুনিক পাঁচজনের মধ্যে বিংশশতাব্দীর জটিল যুদ্ধক্ষেত্রে নায়কের ভূমিকায় নামতে চেয়েছিলেন যিনি, তিনি সুধীন্দ্রনাথ। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা, যাকে বলতে পারি এ-শতাব্দীর সারকথা, পেশ করেছেন *সংবর্ত*-এর 'যযাতি' কবিতার এ-অংশে : 'জাতিভেদ বিবিক্ত মানুষ;/নিরঙ্কুশ একমাত্র একনায়কেরা। কিন্তু তারা/ প্রাচীর, পরিখা, রক্ষী, গুপ্তচর ঘেরা প্রাসাদেও/উন্নিদ্র যেহেতু, তাই ভগ্নসেতু নদীতে নদীতে,/মরু নগরে নগরে। পক্ষান্তরে অতিবেল কারা/তথা সংক্রমিত মেরু ব্যক্তির ধ্বংসাবশেষে : দ্বেষে/পুষ্ট চীন থেকে পেরু প্রতিহিংসা মানে না সিন্ধুর মানা।...আমি বিংশ শতাব্দীর/সমানবয়সী; মজ্জমান বঙ্গোপসাগরে; বীর/নই তবু জন্মাবধি যুদ্ধে যুদ্ধে বিপ্লবে বিপ্লবে/বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখে, মানুষ্যধর্মের স্তবে/নিরুত্তর, অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী, প্রগতিতে/যত না পশ্চাৎপদ, ততোধিক বিমুখ অতীতে।' এ-ভয়াবহ শতক তার হাত বাড়ালো সর্বত্র : গোত্রে গোত্রে বিভেদ বাড়ালো, বিচ্ছিন্ন হলো ব্যক্তিমানুষ, বড়ো শরীরের ক্ষুদ্র মানুষেরা তুলে নিলো স্বহস্তে শাসনব্যবস্থা, যার দীর্ঘ হিংস্র বাহুর আওতায় এলো এমনকি দূরপল্লীর রাখাল, অরণ্যের গোপন পশুপাখি। এ-সময়ের আবেগ-চিন্তা-স্বপ্ন-জীবন পৃথক, ও বিপরীত, অব্যবহিতপূর্ব সময়ের থেকে : তাই তার আত্মার উৎসারণ কবিতাও ভিন্ন। সুধীন্দ্রনাথকথিত বিংশশতাব্দী সশরীরে, ব্যাপক গভীরভাবে, এসেছিলো পাশ্চাত্যে; বাঙলায়ও পৌঁচেছিলো তার অমোঘ তাপ; আর ওই তাপ যাঁদের চিন্তা-বোধি-আবেগ-স্বপ্নে পৌঁচেছিলো, তাঁরাই জনক হয়েছিলেন, বাঙলায়, আধুনিক কবিতার।

উনিশশতক একটি সত্য বুঝেছিলো যে পশ্চিমের সাহায্য ছাড়া বাঙলা কবিতার মুক্তি অসম্ভব। মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ বাঙলা ভাষায় পাশ্চাত্যের কবি। উনিশশতকের প্রথমার্ধে যে বাঙলা ভাষার দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত গদ্যের ঢেউ উঠতে দেখি, কোনো কবি ও কবিতা দেখি না, তার কারণ তখনো এমন কোনো প্রতিভার উদ্ভব ঘটে নি, যিনি পারতেন পশ্চিম থেকে ঋণ নিতে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পক্ষে তা সম্ভব ছিলো না; তাই পদ্যে ও সাংবাদিকতায় সারাজীন কাটালেও তিনি বাঙলা কবিতার আটকে-পড়া স্রোতকে খুলে দিতে পারেন নি। মধুসূদন পাশ্চাত্য ঋণ আর শক্তি নিয়ে মুক্তি দিলেন বাঙলা কবিতাকে;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু তাঁর অনুকরণকারীদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিলো ওই মুক্তস্রোতকে পুনরায় রোধ করা; কেননা তাঁরা পশ্চিম থেকে ঋণ না ক'রে শুধুই অনুকরণ করেছিলেন মধুসূদনের। বিহারীলাল চক্রবর্তী, যাঁকে বলা যেতে পারে বাঙলা কবিতার প্রথম প্রকৃত আধুনিক, বাঙলা কবিতাকে নতুন পথে বইয়ে দিতে যে পরিপূর্ণভাবে সফল হন নি, তার কারণ ইউরোপি রোম্যান্টিসিজমের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিলো না। কিন্তু নিবিড় সম্পর্ক ছিলো রবীন্দ্রনাথের; এবং ছিলো সে-প্রতিভা, যা ঋণকে ঐশ্বর্যে পরিণত ক'রে উত্তমর্ণকেও অতিক্রম ক'রে যায়। আধুনিক সময় আবার দেখেছে : প্রাণ ধারণের জন্যে যেমন সাহিত্যের সচ্ছলতার জন্যেও তেমনই অপরিহার্য পাশ্চাত্যের সাহায্য। আধুনিক কবিতার জন্মের সাথে জড়িয়ে আছে ইউরোপের বহু ভাষার কবিতা ও কাব্যান্দোলন– সুধীন্দ্রনাথ বিশ্বভিখারিরূপে দেখেছিলেন আধুনিক কবিকে, যাঁর কাজ ছিলো ছুটে যাওয়া কীটসের কাছে, ইয়েট্সের নিকট, গ্রিক পুরাণের প্রাচীন মন্দিরে, মালার্মের বৈঠকে, বোদলেয়ারের অশুভ নগরে, র‍্যাবোর নরকে, এবং আরো বহু দরোজায়। এমন নয় যে আদিম দেবতারা খুঁজেছিলেন সমকালীন ইউরোপ তাঁদের কবিতাপ্রেরণা; তাঁদের খোঁজার বিষয় ছিলো তা, যা নেই রবীন্দ্রনাথে। আদি ও মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যকে তাঁরা বিবেচনার মধ্যেই আনেন নি। রবীন্দ্রনাথের ব্যাপক রচনাপুঞ্জে যা নেই, তা-ই আধুনিক এমন একটি বোধ ছিলো তাঁদের। রবীন্দ্রনাথ যে-সমস্ত সদগুণের আধার, তাঁদের সন্ধানের বিষয় ছিলো সে-সমস্তের বিপরীত বস্তু। বিষয়বদলের সাথে অনিবার্য হয়ে উঠেছিলো ভাষা আর কলাকৌশলবদল; পুরোনো পাত্রে নতুন বিষয় পরিবেশন শিল্পলোকে অসম্ভব ও হাস্যকর। তাঁরা বাঙলা কবিতায় ঢোকালেন একটি পাশ্চাত্য বৈশিষ্ট্য : কবিতার সাথে জড়িত ক'রে দিলেন কাব্যতত্ত্ব; এবং বিভিন্ন তাত্ত্বিক কোণ থেকে রচিত হ'তে লাগলো কবিতা– প্রতীকী কবিতা মনোহরণ করলো কারো, কারো প্রেরণারূপে দেখা দিলো পরাবাস্তবতাবাদ, কারো কবিতা রচিত হয়ে উঠতে লাগলো সাম্যবাদী ইশতেহারের আজ্ঞায়। তিরিশি পাঁচজন বাঙলা সাহিত্য নামক হাজার বছরব্যাপী সমতল সমুদ্রে জাগালেন বিংশ শতাব্দীর ঢেউ ও বেগ। আধশতাব্দী ধ'রে এ-কবিতা শাসন করছে বাঙলা ভাষাকে; রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত এমন শাসক আর কেউ ছিলেন না বাঙলা সাহিত্যে।

তিরিশের আগে কবি ও পাঠক, উভয় সম্প্রদায়ই, কবিতাকে গণ্য করতেন চিত্তবিনোদনের রমণীয় উপাচাররূপে; যেনো মেধাহীনের অশিক্ষিত ইন্দ্রিয়চর্চার লাস্যময়ী সঙ্গিনী হওয়াই কবিতার লক্ষ্য ও সার্থকতা। কবিতা যে বিনোদনসামগ্রী নয়, এমনকি সুখদাত্রী সহচরীও নয়, এ-বোধ শেখায় আধুনিক কবিতা;– তাই কবিতাভোগ থেকে স'রে পড়তে থাকে মেধাশূন্য ভোগীরা। এ-কবিতা দাবি করে জ্ঞান ও জ্ঞানী ইন্দ্রিয়, অভিনিবেশ ব্যতীত এর আবেগ-সৌন্দর্য-কামনাও পাঠকচিত্তে ঢুকতে রাজি নয়। আগে প্রতিটি কবিতার ছিলো দুটি স্তর : প্রথমে কোনো রচনাকে হ'তে হতো পদ্য;– ছন্দ-মিল-উপমারূপকখচিত হয়ে, এবং প্রথম স্তরের সাফল্যের পরই তা ঢুকতে চেষ্টা করতো কবিতাস্তরে। অধিকাংশ রচনাই পৌঁছোতো না কবিতাস্তরে, নিঃশেষিত হতো প্রথম– পদ্য-স্তরেই। আধুনিক কবিতার উদ্ভবের আগে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া তাঁর সময়ের সব কবিই পদ্যরচয়িতা; তাঁদের রচনারাজি দ্বিতীয় স্তরে খুব কম সময়ই উঠতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেরেছে। কিন্তু তাতে কোনো আপত্তি ছিলো না পাঠকশ্রেণীর ও কবিমণ্ডলির, কেননা পদ্যের ঝাঁজালোমধুর মদ্য মেটাতো উভয়েরই পিপাসা। আধুনিক কবিতা অস্বীকার করলো পদ্যের স্তর ভেঙে কবিতার শিখরে উঠতে; তার অনন্য লক্ষ্য হলো কবিতা, যেখানে পৌঁছোতে হবে কোনো সিঁড়ি না ভেঙে। এমন উচ্চাকাঙ্খা সব সময় সাফল্য আয় করতে পারে না; তাই রচিত হ'তে লাগলো কবিতা, এবং কবিতা-না-হয়ে-ওঠা রচনাপুঞ্জ; কিন্তু এর মধ্যে কবিতার প্রতিভাস জাগানো পদ্যের কোনো স্থান রইলো না। আধুনিকতার অনুকারীদের হাতে রচিত হয়েছে বিপুল পরিমাণ কবিতা-না-হয়ে-ওঠা রচনা, যাকে আধুনিকতার শত্রুপক্ষ বারবার কাজে লাগায় নিস্তেজ অস্ত্ররূপে।

বিংশশতাব্দী শুধু পাপ আর পতনের কাল নয়; এ-শতাব্দীকে পূর্ববর্তী সময় থেকে অসুস্থতর বা সুস্থতর ভাবারও কোনো কারণ নেই। এ-শতকের বৈশিষ্ট্য নির্মোহতা; অন্ধ স্তবের বদলে এ সমস্ত ক্ষণ জাগিয়ে রাখে দৃষ্টি। আধুনিক কবিতাও কেবল পাপপতনের স্তোত্র নয়, আপাদশির পঙ্কপ্রোথিত হয়েও এর লক্ষ্য পদ্মত্ব। আধুনিক কবিতা পঙ্কজ পুষ্প, যা পঙ্ককে অস্বীকার করে না, স্বীকার করে হৃদয়ে-মেধায়, এবং পুষ্পরূপ লাভেও অনিচ্ছুক নয়, বরং কায়মনে পুষ্পেরই প্রার্থনা করে। তিরিশপূর্ব কবিতায় বিপরীতকে এক সূত্রে গাঁথার কোনো চেষ্টা লক্ষ্যে আসে না;– রবীন্দ্রনাথে পাই অসীম সৌন্দর্য ও কল্যাণস্রোত, আর তাঁর অনুকারীদের মধ্যে পৌনপুনিকভাবে রচিত হয় জীবনে অননুভূত কাব্যিক সৌন্দর্যকল্যাণবন্দনা। সৌন্দর্যকল্যাণের শত্রু নয় কেউ; ওই কবিতাবলিতে সৌন্দর্যকল্যাপ্রেম স্তবকেস্তবকে ছড়িয়ে আছে ব'লেই ওই কবিতাবলি অনাধুনিক এমন নয়;– ওই কবিতাপুঞ্জে তা সত্যরূপে উপস্থিত হয় নি ব'লেই ব্যর্থ হয়েছে শতো শতো ছন্দমিলবিন্যস্ত রচনা। তাঁরা, রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত, অভিজ্ঞতাহীনতার উদাহরণ, এবং নিদর্শন কাব্যচেতনাশূন্যতার।

প্রধান কবি ও কবিরা, একক অথবা সম্মিলিতভাবে, পরিস্রুত করেন গোত্র ও জাতির ভাষা-আবেগ-চৈতন্য-সংবেদনশীলতা। এমন পরিস্রুতি পেলে ময়লাধরা ভাষা ঝকঝক ক'রে ওঠে নতুন মুদ্রার মতো; আবেগের ক্ষয়ে যাওয়া ধার তীক্ষ্ণশাণিত হয়; জন্ম নেয় নতুন চৈতন্য-সংবেদনশীলতা, যা মানুষকে সাহায্য করে এমন কিছু বুঝতে, অনুভব ও হৃদয়ঙ্গম করতে, যা তার কল্পনা-মেধায় আগে কখনো ঢোকে নি। বুদ্ধদেব, সুধীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে ও অমিয় চক্রবর্তী সম্মিলিতভাবে, রবীন্দ্রনাথের পর পুনর্বার, পরিস্রুত করেন তাঁদের জাতির ভাষা-আবেগ-চৈতন্য-সংবেদনশীলতা। প্রথম পরিস্রুতির দায়িত্ব নিয়েছিলেন মধুসূদন, সাফল্য পরিমাপযোগ্য; দ্বিতীয় পরিস্রুতিসাধক রবীন্দ্রনাথ, সাফল্য অপরিসীম; এবং তৃতীয়, ও শেষ, পরিস্রুতি ঘটে তিরিশি পাঁচজনের শ্রমেসাধনায়;– সাফল্য রবীন্দ্রতুল্য। বাঙলা ভাষার বিস্তৃতি ঘটেছে অভাবিতরূপে আধুনিক কবিতায় : জীবনানন্দ বাঙলাকে ক'রে তুলেছেন স্বপ্ন-ভাষা, সুধীন্দ্রনাথ তাকে দিয়েছেন স্পন্দিত ধাতবতা; বুদ্ধদেবের কাছে বাঙলা ভাষা পেলো জটিল সৌন্দর্য; বিষ্ণু দে বাঙলাকে দিলেন দর্প, আর অমিয় চক্রবর্তী দিলেন শুভ্রতা। এ-কবিতায় প্রথম যে-অভিনবত্বের মুখোমুখি হ'তে হয়, তা ভাষা; এবং ওই ভাষা বারবার মনে করায় যে এ-কবিগোত্র যেনো আবিষ্কার করেছেন বাঙলা ভাষার এক নতুন অভিধান, যা আগে জানা ছিলো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতার কলাপ্রকৌশলেও সঞ্চারিত হলো নতুন বিপ্লবের নতুন আবিষ্কাররাশি, পুরোনো ও অব্যবহার্য হয়ে উঠলো কবিতার প্রাক্তন কলা ও প্রকৌশল– ছন্দের লীলালাস্যের বদলে দেখা দিলো মহিমা, উপমারূপকের শিশুসারল্যের স্থান দখল করলো মনস্বী জটিলতা, কথ্য কণ্ঠস্বর বেজে উঠলো প্রত্যেক উচ্চারণে; এমনকি সুদূর, অপরিচিত, সাধু শব্দপ্রয়োগেও। কিন্তু এর চেয়েও বড়ো বিপ্লব ঘটে আবেগ-চৈতন্য-সংবেদনশীলতার জগতে : রবীন্দ্রনাথ, ও তাঁর অনুকারীদের কবিতা যে-আবেগে উছলে পড়ার পাঠ দিয়েছিলো, যে-সমস্ত উদ্দীপকের ক্রিয়ায় সাড়া দিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম আমরা, এ-কবিতা তার থেকে অনেক পৃথক, ও বিপরীত, আবেগ ও উদ্দীপক উপস্থিত করলো; এবং তাতে সাড়া দিতে বাধ্য হলাম আমরা। আধুনিক কবিতা বাঙালিকে দিলো নতুন আবেগ, চৈতন্য, সংবেদনশীলতা; যার সাহায্যে বুঝতে পারলাম যে তিরিশিপূর্ব কবিতার অধিকাংশ আবেগই বানানো ও পানসে। আধুনিকেরা কবিতার বিষয়বস্তুতে সঞ্চার করলেন যে চিন্তা-চেতনা-আবেগ, তা পূর্ববর্তী কবিমণ্ডলির চিন্তা-চেতনা-আবেগ থেকে অন্তত এক শতাব্দী অগ্রসর। বিংশশতাব্দীতে বিশ্ববাসের অভিজ্ঞতাসার ছড়ানো এ-কবিতারাশিতে।

সুধীন্দ্রনাথের কবিতার আত্মা হচ্ছে চিন্তা, যা তীব্রস্রোত আবেগে রূপান্তরিত হয়ে কবিতারূপ পেয়েছে। জীবনানন্দ তাঁর চিন্তারাশিকে পরিণত করেছেন সৌগন্ধে সৌন্দর্যে; বুদ্ধদেব রচনা করেছেন আবেগের দর্শন। বিষ্ণু দে চিন্তাকে, অনেকাংশে, রূপান্তরিত করেছেন সঙ্গীতে, আর অমিয় চক্রবর্তী জ্ঞানকে দিয়েছেন কবিতারূপ। তাঁদের একের সাথে আরেকের বাহ্যিক মিল নেই;– সুধীন্দ্রনাথ থেকে বহু দূরে অবস্থান অমিয় চক্রবর্তীর, বিষ্ণু দের পৃথিবী থেকে অনেক ভিন্ন জীবনানন্দের বিশ্ব, বুদ্ধদেব অন্য চার সমকালীন থেকে বহুদূরবর্তী। কিন্তু মিল আছে তাঁদের অন্তর্লোকে; তাঁরা সবাই বিংশশতাব্দীর ধ্যানী। এ-আদিম আধুনিকেরাই সর্বাধুনিক; তাঁদের পরে যাঁরা প্রবেশ করেন বাঙলা কাব্যমণ্ডলে, তাঁদের পক্ষে রক্ষা করা সম্ভব হ য়নি আধুনিকতার স্রষ্টাদের উচ্চতা ব্যাপকতা গভীরতা। তাঁরা যা সংগ্রহ ও সৃষ্টি করেছিলেন বিশ্ব ও ইতিহাসব্যাপী মানসপর্যটন ক'রে, তার তুল্য কিছু সংগ্রহ ও সৃষ্টি সম্ভব হয় নি সন্ততিদের পক্ষে। প্রতিভাদৈন্য তো রয়েছেই এর মূলে; তা ছাড়া আছে শ্রম-নিষ্ঠা- সাধনার পার্থক্য। তিরিশোত্তরগণ অগ্রণীদের নিষ্ঠারিক্ত; তিরিশিদের কাব্যসৃষ্টির প্রেরণা ও উৎস ছিলো সমগ্র বিশ্ব ও সমগ্র বিশ্বের সাহিত্যসম্পদ; আর পরবর্তীদের উৎস ও প্রেরণা হলেন তিরিশিরা। সন্ততিরা আধুনিকতার চেতনা সংগ্রহ করলেন পিতৃপুরুষের রচনাবলি থেকে, এবং তিরিশের চেতনাচৈতন্য তরলিত রূপে কবিতারূপ পেলো পরবর্তী দশকসমূহে। সাম্প্রতিক বাঙলা কবিতা তিরিশি কবিতারই সম্প্রসারণ। তিরিশি পঞ্চশূরের পর আর কোনো কবি বা কবিমণ্ডলির আবির্ভাব ঘটে নি, যাঁকে বা যাঁদের বিবেচনা করা যায় পিতৃপুরুষদের প্রতিদ্বন্দ্বী ব'লে। অসামান্য সাফল্যের পরেই আসে সীমিত সাফল্য, অথবা ব্যর্থতা– সাহিত্যজগতে এমন ঘটনা বারবার ঘটেছে; তিরিশি পাঁচজনের পরে তা আরেকবার ঘটে বাঙলা কবিতায়। ওই পাঁচ আধুনিক অসামান্য প্রতিভাবান ছিলেন, হয়তো পেয়েছিলেন কালের দাক্ষিণ্য, তাই সমর্থ হয়েছিলেন অসাধারণ উচ্চ কবিতা সৃষ্টি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে; এবং একদশকেই আবির্ভূত হয়েছিলেন এমন পাঁচজন, যাঁরা হাজার বছরের বাঙলা কবিতার শ্রেষ্ঠ দশজনের অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা কবিতার যে-উচ্চ মান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা যে চিরস্থায়ী হবে, এমন কামনা কারো থাকতে পারে না; উচ্চ মানের পরে মান-অবনতিই স্বাভাবিক। এমন ঘটেছে ইংরেজি কবিতায়ও; পাউন্ড-এলিয়টের উচ্চকবিতার পর আসে দীনতর কবিতার দশকপরম্পরা।

১৯৪৭-এ বাঙলাদেশ ও সাহিত্য দ্বি-খণ্ডে ও-স্রোতে ভাগ হয়। অস্থায়ী পাকিস্তান রাষ্ট্রটি নিজস্ব স্বাক্ষর আঁকে যেমন এক ব্যাপক ভূখণ্ডের ওপর, তেমনি চিন্তা-কল্পনা-কবিতার ওপরও। সাতচল্লিশোত্তর বাঙলা সাহিত্য দুস্থানকেন্দ্রিক : ঢাকা এক কেন্দ্র, অপর কেন্দ্র কলকাতা। ঢাকাকেন্দ্রিক কবিতার সাথে কলকাতাকেন্দ্রিক কবিতার পার্থক্য স্পষ্ট, যদিও তারা উভয়ই তিরিশি কবিতার উত্তরাধিকারী। একটি দীর্ঘ নদী, হাজার বছর আগে উৎসারিত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা জন্ম দিতে দিতে সাতচল্লিশে এসে ভাগ হয় স্পষ্ট দু-স্রোতে। মুসলমান তরুণেরা তিরিশি, আধুনিক, কবিতার সাথে যুক্ত হলেন কখন? আধুনিক কাব্যচেতনা তাঁদের চিত্ত ও মেধায় প্রবেশ করে কোন শুভ মুহূর্তে? মধ্যযুগ থেকে বিশশতকের প্রথম দশক পর্যন্ত সংখ্যাহীন কবিযশোপ্রার্থী মুসলমান বাঙলা কবিতার সাধনা করেছেন, যুক্ত হ'তে চেয়েছেন বাঙলা ভাষার সাথে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে, তবু নজরুল ইসলামই প্রথম মুসলমান বাঙলা ভাষার কবি। নজরুলপূর্ব মুসলমানদের বাঙলা কাব্যসাধনা ঐতিহাসিক ও সমাজতত্ত্ববিদদের গবেষণাস্বর্গ, কিন্তু উন্নত কাব্যভোগীর জন্যে এক অন্ধকার এলাকা। নজরুল ইসলামও সর্বদা কবি নন; এক মহাপদ্যকার তিনি, যাঁর বিপুল সৃষ্টির সামান্য অংশই উৎকৃষ্ট কবিতা। তিনি বাঙালি মুসলমানকে সংযুক্ত করেছিলেন বাঙলা কবিতার সাথে, কিন্তু আধুনিকতার সাথে নয়। আদিম দেবতাদের সামান্য পূর্ববর্তী তিনি, তাঁদের প্রভাবিতও করেছিলেন তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে; কিন্তু ওই পাঁচজনের বুকে বিশশতকী যে-বোধ আসন পেতেছিলো, নজরুল সে-বোধের কাছাকাছি যান নি কখনো। কবিতাত্রাণের চেয়ে সমাজ ও স্বজাতিত্রাণের ঝোঁক ছিলো তাঁর অধিক; আর এ-কাজে তাঁর উচ্চভাষী, উদ্দীপনামণ্ডিত, আন্দোলিত পদ্যপুঞ্জ যতোখানি সফল হ'তে পারতো, শিল্পকলার আর কোনো কৌশল ততো সাফল্য আয় করতে পারতো না। আদি-আধুনিকেরা নজরুলের মতো সমাজত্রাণের সরল উপায় কল্পনায় আনেন নি; তাঁদের বিশ্বাস–শিল্পকলা যদিও কখনো কখনো পরোক্ষভাবে সমাজের ত্রাণ সাধন করে, কিন্তু তার প্রত্যক্ষ লক্ষ্য ভিন্ন। আমাদের অভিজ্ঞতাও তাই বলে : একটি মহৎ কবিতা সমাজের সামান্য আবর্জনাও পরিষ্কার করতে পারে না, তা শুধু পারে স্বপ্নবিদ্ধের অর্ন্তদৃষ্টির সামনে অনন্ত বিভা জ্বেলে দিতে। নজরুল গিয়েছিলেন অন্য পথে, আলোড়ন জেগেছিলো পথের ঘাসে-কাঁকরে, এবং তীব্র কাঁপন লেগেছিলো মুসলমান তরুণদের রক্তে।

নজরুল আধুনিক ছিলেন না, কিন্তু বৃত হয়েছিলেন প্রচণ্ডভাবে; এবং তাঁর উদ্দীপক ও মধ্যপ্রাচ্যভরপুর কবিতাপুঞ্জ মুসলমান তরুণদের আধুনিকতা থেকে দূরে থাকতে উৎসাহ দিয়েছে কয়েক দশকব্যাপী। হাস্যকর উদ্দীপনা ও মধ্যপ্রাচ্যব্যাধি কী-রকম জীর্ণ ক'রে ফেলেছিলো মুসলমান তরুণদের, তার পরিচয় লিখিত হয়ে আছে নজরুল-উত্তর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলমান তরুণ কবিদের রচনায়। আধুনিক কবিতার স্রষ্টারা নজরুলের মতো নগদ পুরস্কার পান নি, তাঁদের অপেক্ষা করতে হয়েছে প্রায় আধশতাব্দী। নজরুল নিদর্শন ছিলেন মুসলমান তরুণদের সামনে, তাই নজরুলের অনুকরণ ব্যতীত অন্য পথ তাঁদের দৃষ্টিতে ছিলো হেলার বস্তু। আধুনিক কবিতা-চেতনা আয়ত্তের জন্যে দরকার ছিলো বিশ্বপরিব্রাজকতা, অধ্যয়ন, অনুশীলন; তার চেয়ে অনেক বেশি সহজ ছিলো নজরুলের মতো উচ্চকণ্ঠ উচ্চারণ ও মধ্যপ্রাচ্যের স্তোত্র। অধীত বিদ্যায় প্রসঙ্গটি এখানে ওঠে, যদিও আমরা এ-প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যেতেই পছন্দ করি; যেহেতু আমাদের চৈতন্যে গেঁথে যাওয়া বিশ্বাস হচ্ছে যে কবিমাত্রই স্বভাবকবি, তাঁদের অধীত জ্ঞানের কোনো দরকার পড়ে না। আধুনিকেরাই প্রথম, মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথকে স্মরণে রেখেও বলা যায়, শিক্ষিত কবিগোষ্ঠিরূপে দেখা দেন; এবং তাঁদের পরে কবিতারচনার জন্যে শিক্ষা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু মুসলমান যে-তরুণেরা কবিতারচনায় উৎসাহী ছিলেন, রচনা করেছিলেন কবিতাধর্মী রচনা, তাঁরা আধুনিক চেতনা আয়ত্তের উপযুক্ত শিক্ষা ও অধীত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না। তাই তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিলো নজরুলের স্বতস্ফূর্ত উচ্চকণ্ঠ পদ্যের দিকে আকৃষ্ট হওয়া; এবং আধুনিকতার থেকে দূরে স'রে থাকা। অবশ্য সে-সময়ে রবীন্দ্রানুসারী না হয়ে শুধুই নজরুল-অনুকারী হওয়া অসম্ভব ছিলো; তাই অনেকেই রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন-সৌন্দর্যের নকল করেছেন বিভ্রান্তের মতো। কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য : শাহাদাৎ হোসেন, সুফিয়া কামাল, আবদুল কাদির, জসীমউদ্‌দীন, গোলাম মোস্তফা, মঈনুদ্দীন, মহিউদ্দীন, বে-নজীর আহমদ। এঁদের মধ্যে শাহাদাৎ হোসেন নজরুলের কিঞ্চিৎপূর্ব ও সমকালীন, গোলাম মোস্তফা সমকালীন, ও অন্যেরা নজরুল-উত্তর। এঁদের ওপরে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল ইসলাম যুগপৎ ক্রিয়া করেছেন। শাহাদাৎ হোসেন ছিলেন স্বপ্ন-ও সৌন্দর্য-মুগ্ধ, যে-স্বপ্নসৌন্দর্য তিনি পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। তিনি নিজেকে স্বপ্নলোকের অস্থায়ী অধিবাসী ব'লেই মনে করেছেন;– স্বপ্নলোকচ্যুত হয়ে বাস্তবের রূঢ়তার মধ্যে প্রবেশের পরেও তাঁর মধ্যে জেগে থেকেছে স্বপ্নলোকস্মৃতি। কিন্তু তাঁর মধ্যেও পরবর্তীকালে ঢুকে পড়ে মধ্যপ্রাচ্য; নজরুলের মতো কোলাহল তাঁর পদ্যেও ধ্বনিত হয়ে উঠতে চায়। কিন্তু তিনি মর্মমূলে রবীন্দ্রানুসারী, আর তাঁর পথ ধ'রেই প্রবেশ করেন আবদুল কাদির। সুফিয়া কামালের ভাষা যদিও শাহাদাৎ হোসেন-আবদুল কাদিরের ভাষার মতো পেশি অর্জন করে নি, তবু তাঁরা তিনজন একই মণ্ডলের অধিবাসী। তাঁদের রচনারাজিতে স্বপ্ন ও সৌন্দর্যের জন্যে যে-কাতরতা ছড়িয়ে আছে, তা শিখেছেন তাঁরা রবীন্দ্রনাথের নিকট; তাঁদের নিজস্ব কোনো স্বপ্ন ও সৌন্দর্যদৃষ্টি ছিলো না। যে-আবেগে তাঁরা উচ্ছ্বসিত হয়েছেন, হাহাকার করেছেন যে-অভাবে, স্বপ্ন দেখেছেন যে-মানসসুন্দরের, তা তাঁদের নিজেদের নয়;–রবীন্দ্রনাথের। স্বপ্ন, সৌন্দর্য, কল্পনা, পুষ্প প্রভৃতি কাব্যিক প্রসিদ্ধ বিষয় তাঁদের ছন্দোবদ্ধ স্তবকে পুনরাবৃত্ত হয়েছে; কিন্তু কখনো সত্য হয়ে ওঠে নি। 'কুসুমপ্রিয় যারা/তারা পচা ফুলে ব'সে করে বসন্তের স্তব'– শামসুর রাহমানের এ-পংক্তিটি নির্ভুলভাবে প্রযোজ্য এঁদের রচনা সম্পর্কে। শাহাদাৎ হোসেনের সৌন্দর্য- ও স্বপ্ন-কাতর কিছু পংক্তি নিম্নরূপ : 'লোকান্তের কল্পকুঞ্জে মন্দার-শয়নে/আধ-ঘুমে আধ-জাগরণে/লক্ষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুগ যুগান্তর ধরি'/আপনা পাসরি'/মগ্ন ছিনু যবে আমি চিত্রার স্বপনে;–লীলায়িত তনুভঙ্গে চঞ্চল চরণে/নৃত্যরঙ্গে সুরনটী অপাঙ্গ-লীলায়/ইঙ্গিতে ডেকেছে মোরে কেলিকুঞ্জে রঙ্গ-মণিকায়;/কল্পবালা কলকণ্ঠে রচিয়াছে সুরের স্বপন/আবেশ কম্পন–/জাগিয়াছে বিচিত্রার অন্তহীন রঞ্জিত মায়ায়;/চিত্রালোক ঝিলিমিলি কল্পতরুচ্ছায়/উর্মিনাটে মন্দাকিনী/ততিনী নটিনী/অশ্রান্ত নর্তনে মোরে জানায়েছে অন্তরের গোপন কামনা/চিত্রার স্বপনে তবু মুগ্ধ আমি আছিনু উন্মনা' ['অবতরণিকা', *রূপচ্ছন্দা*]। তরল স্বপ্নস্রোত ব'য়ে যাচ্ছে স্তবকটির ওপর দিয়ে, একটি প্রথাসিদ্ধ কাব্যিক আবেশঘোর সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে কাব্যিক অনুষঙ্গ ও শব্দের ব্যবহারে; কিন্তু তা আলোড়ন জাগায় না, কেননা এর সমস্তটা বানানো ও অন্যের থেকে শেখা। শাহাদাৎ হোসেন ও তাঁর মতো অজস্র রবীন্দ্রানুকারীর হাজার হাজার সৌন্দর্যস্বপ্নআবেগখচিত স্তবক কবিতার দুটি রোম্যান্টিক সংজ্ঞাকে– 'তীব্র অনুভূতির স্বতস্ফূর্ত উৎসারণ', ও 'সুন্দরতম শব্দের সুন্দরতম সংস্থান'– অর্থশূন্য ক'রে তুলেছে। এ-রকম অজস্র স্তবকসমষ্টি পদ্যস্তরেই নিঃশেষিত, যদিও তাতে প্রথাসিদ্ধ সৌন্দর্যের আকাল নেই, আবেগও তীব্র, শব্দগুলো প্রথাসম্মতভাবে সুন্দর, সংস্থানও ভালো।

রবীন্দ্রানুকরণ আরো স্পষ্ট আবদুল কাদিরের রচনায়; তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতার ছায়াবলম্বনে রচনা করেছেন ছন্দমিলন্যস্ত পদ্য। তাঁর রচনাও শেখা স্বপ্ন ও সৌন্দর্য বিন্যাস। তাঁর *দিলরুবার* [১৩৪০] যে-কবিতাগুলো জন্মেছে রবীন্দ্রনাথের কোনো-না-কোনো কবিতার ভাববীজ থেকে, সে-গুলো নির্দেশ করে যে তাঁর কোনো নিজস্ব কামনা-বাসনা-স্বপ্ন-আবেগ নেই; সবই তিনি সংগ্রহ করেছেন রবীন্দ্রনাথ থেকে। আবদুল কাদিরের রবীন্দ্রাচ্ছন্ন দুটি স্তবক : 'স্নেহের প্রদীপে জ্বলে রূপক্ষরা যৌবনের শিখা;/ তোমার প্রতীক্ষা করি' পাঠায়েছি পুষ্পের লিপিকা,–/হে সুন্দরী প্রিয়া, প্রিয়তমা!/আজি মোর গীতরাগে/অশোক-মঞ্জরী জাগে,/পলাশের ওষ্ঠপুটে লাগিয়াছে তাম্বুল-সুষমা।/ঘুমন্ত বনের ভালে জ্বলিছে শ্যামল বহ্নিশিখা,/উন্মুক্ত বায়ুর নৃত্যে কাঁপি' কাঁপি' মেলিছে মল্লিকা/গোপন কলিকা॥/আমার বেদনা দাহে রোমাঞ্চিয়া ওঠে তৃণদল,/রক্তের নর্তন-ভঙ্গে সিন্ধুবুকে তরঙ্গচঞ্চল/হে প্রেয়সী, প্রতীক্ষা তোমার। পথে ওড়ে পুষ্প ধূলি,/ঝড়ে দ্বার গেছে খুলি',/উন্মুক্ত মন্দির মম যাচে তব মুগ্ধ অভিসার।'–['দিলরুবা', *দিলরুবা*]। এ-পংক্তিবিন্যাস কবিতা হ'য়ে ওঠার জন্যে আকুল, কিন্তু শরীর আত্মায় বাঁধা প'ড়ে আছে নিম্ন-পদ্যস্তরে। শাহাদাৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, আবদুল কাদির, সুফিয়া কামাল, মহিউদ্দীন, মঈনুদ্দীন, জসীমউদ্‌দীন, বে-নজীর আহমদ ও তাঁদের সমকালীন আরো অনেকের রচনা আধুনিকতার স্পর্শহীন। এঁদের মধ্যে অবশ্য সামান্য স্বাতন্ত্র্য ঝলকে ওঠে মহিউদ্দীন ও বে-নজীর আহমদের রচনায়; এবং জসীমউদ্‌দীন আধুনিকতা থেকে বেশ দূরে থেকে গ'ড়ে তোলেন আপন কবিতাজগত। এঁরা, একমাত্র জসীমউদ্‌দীন বাদে, কবি হিশেবে এতো গৌণ যে স্মরণীয় শুধু ঐতিহাসিক কারণে। এঁদের অভাবে বাঙলা কবিতার উজ্জ্বলতা একটুও কমতো না।

চল্লিশের দশকে, যখন আধুনিক কবিতার প্রতিষ্ঠা পাকা হয়ে গেছে, তখন যাঁরা বাঙলা কবিতার অঙ্গনে আসেন তাঁদের এক গোত্র : ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিকান্দার আবু জাফর, আবুল হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান, গোলাম কুদ্দুস, মতিউল ইসলাম, আজিজুর রহমান, তালিম হোসেন। যদিও এঁদের একটি বড়ো অংশ শোচনীয়তার নিদর্শন, তবু এঁদেরই কারো কারো মধ্যে আধুনিক চেতনা ও কাব্যচেতনার আদি-উন্মেষ ঘটে। এঁদের মধ্যে মনোযোগ আকর্ষণ করেন মাত্র চারজন : ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব, আবুল হোসেন, ও সৈয়দ আলী আহসান। ফররুখ আহমদের *সাত সাগরের মাঝি* [১৯৪৪] কতিপয় স্মরণীয় কবিতাখচিত হওয়া সত্ত্বেও আধুনিক চেতনার শস্য নয়। উচ্চকণ্ঠ এ-কবি নজরুল ইসলামের পরিশীলিত উত্তরাধিকারী;– জীবনবোধ, কাব্যভাবনা, আঙ্গিকচেতনা ও সংবেদনশীলতায় তাঁর কবিতা আধুনিকতার স্পর্শরহিত। তিনি তিরিশ-উত্তরকালে পুথিসাহিত্য ও নজরুলের উত্তরাধিকারী হয়ে রইলেন। আবুল হোসেনের নববসন্ত [১৯৪০], ও *বিরস সংলাপ*-এর [১৯৬৯] চল্লিশ-দশকে রচিত কবিতাগুচ্ছ সাক্ষ্য দেয় যে এ-কবির বুকে, অগভীর ও অব্যাপকভাবে হ'লেও, আধুনিক জীবন ও কবিতাচেতনা স্থান পেয়েছিলো। যদিও তাঁর হাতে একটিও তৃপ্তিকর গভীর সম্পূর্ণ কবিতা রচিত হয় নি, তবু তিনি উপমারূপকচিত্রকল্প রচনার আধুনিক কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন কিছু পরিমাণে; কিন্তু তিনি নিঃশেষিত হন অল্পতেই। আহসান হাবীবের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *রাত্রিশেষ* বেরোয় ১৯৪৭-এ; এবং এ-কাব্যেই সর্বপ্রথম একজন মুসলমান কবি ব্যাপক বিংশশতকি চেতনাসহ আত্মপ্রকাশ করেন। তিরিশি কবিরা যে-সব চিত্রকল্প তৈরি করেছিলেন স্বকালের বন্ধ্যাত্ব, শূন্যতা, ঊষরতা, অস্থিরতা জ্ঞাপনের জন্যে, সে-সব পুনরাবৃত্ত হলো তাঁর কবিতায় : 'বন্ধ্যা মাটি', 'ঝরাপালকের ভস্মস্তূপ'-ধর্মী চিত্রকল্পের সাহায্যে তিনি চেষ্টা করলেন আপন বিশ্বরচনার। সুধীন্দ্রনাথ-বিষ্ণু দে-জীবনানন্দের শূন্যতা-নৈরাশ্য ঢুকলো তাঁর স্বপ্নে-মর্মে; এবং স্পষ্টভাবে অনুসরণ করলেন তিনি, অনেক ক্ষেত্রে, সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে। আহসান হাবীবের *রাত্রিশেষ*-অন্তর্গত 'দ্বীপান্তর' কবিতার খণ্ডাংশ এমন : 'অতঃপর সচকিত আকস্মিক বিমূঢ় বিরতি/নিরাতঙ্ক পদতলে এ-মৃত্তিকা বিশ্বাসঘাতক!/উড়ন্ত পাখায় আজ নেমে এল অবাঞ্ছিত যতি,/অরণ্য স্বপনহীন, সে বন্ধু আকাশ পলাতক!/...দিনগুলি তারপর দুর্বোধ্য, ধোঁয়াটে, ধূসর,/সনির্বেদ, নিরালম্ব– অন্ধকার অচেনা বন্দরে!' এর পংক্তিতে পংক্তিতে সুধীন্দ্রনাথ প্রতিধ্বনিত; শুধু তাই নয়, সুধীন্দ্রনাথের বহু চাবিশব্দ উপস্থিত এখানে। আহসান হাবীব তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থে সুধীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য আধুনিকের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, অনুসরণ করেছিলেন তাঁদের, এটা তাঁর গৌরব;– এ-প্রভাব-অনুসরণ নির্দেশ করে যে তিনি নতুন সংবেদনশীলতা দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু ওই সংবেদনশীলতা তাঁর মধ্যে সুফলবান হয় নি; তিনি যুগবন্ধ্যাত্ব-সচেতন হ'লেও যুগের অন্তঃসার মূর্তি পায় নি তাঁর চৈতন্যে ও কবিতায়। তিনি একজন সরল রোম্যান্টিক, যিনি স্বপ্ন দেখেন বাস্তবের দৈন্যও; কখনো আশা জাগে চিত্তে, কখনো হতাশা, এবং কখনো অতীক্ষ্ণ বিদ্রূপশর নিক্ষেপে উৎসাহ পান। *রাতিশেষ* আধুনিক কবিতার অগ্রসরতার উদাহরণ নয়, অনুপ্রাণিতও করে নি পরবর্তীদের; এবং এ-কাব্যের চেতনা গভীর বিস্তৃতি পায় নি তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থরাজিতে। তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থসমূহ– *ছায়াহরিণ* [১৯৬২], *সারা দুপুর* [১৯৬৪], *আশায় বসতি* [১৯৭৫], *মেঘ*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে চৈত্রে যাবো [১৯৭৬], *দু'হাতে দুই আদিম পাথর* [১৯৮০]– গভীর জীবন ও শিল্প-চেতনার উৎসারণ নয়। কালের উজ্জ্বল সহযাত্রী হ'তে পারেন নি তিনি,– মূল্যবান স্বপ্নকল্পনাবোধ যেমন দুর্লক্ষ্য তাঁর কবিতায়, তেমনি অনর্জিত থেকে গেছে কলা-প্রকৌশলগত সিদ্ধি। আহসান হাবীবের গৌরব তিনি সে-সকল মুসলমান কবিযশোপ্রার্থীদের একজন, যাঁদের বুকে আধুনিক চেতনা, স্বল্প পরিমাণে হ'লেও, সর্বাগ্রে জ্বলেছিলো।

সৈয়দ আলী আহসান তাঁর তরুণ জীবনের অন্তত দেড় দশক অপব্যয় করেছেন। প্রথম জীবনে তিনিও ইসলাম ও পুথিসাহিত্যকে প্রেরণারূপে ব্যবহারের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর সাফল্যের প্রধান অন্তরায় ছিলেন মৌলবাদী ফররুখ আহমদ, যিনি ওই এলাকায় আয় ক'রে নিয়েছিলেন সাফল্য। আধুনিকতার সাথে অনেক দেশে জড়িত হয়ে পড়ে রাজনীতিক প্রতিক্রিয়াশীলতা,– সৈয়দ আলী আহসান আধুনিকতাকে সুবিধাবাদী প্রতিক্রিয়াশীলতার সাথে জড়িত ক'রে দেন। চল্লিশ-দশকের শুরুর দিকে তিনি ইসলামি ঐতিহ্যকে এলিয়টের অনুকরণে উপস্থাপনের চেষ্টার পাশাপাশি সাম্যবাদবিরোধী কবিতাও রচনা করেন আধুনিক ভঙ্গিতে। তাঁর এ-সময়ের কবিতাসমূহের ব্যর্থতা ধরা পড়ে তাঁর নিজেরও কাছে, তাই *কাব্যসংগ্রহ*-এর [১৯৭৪] ভূমিকায় তিনি এসব রচনাকে অস্বীকার করেন। সৈয়দ আলী আহসানের আধুনিকায়ন এক বিলম্বিত ঘটনা : তাঁর আধুনিক চেতনামণ্ডিত প্রথম কাব্য *অনেক আকাশ* [১৩৬৬], যে-নামটি গৃহীত জীবনানন্দ থেকে, প্রকাশিত হয় পঞ্চাশের দশকের শেষাংশে। এ-কাব্যে আধুনিক সৈয়দ আলী আহসানের উদ্ভব; আর বিকাশ ঘটে পরবর্তী কাব্যগ্রন্থসমূহে–*একক সন্ধ্যায় বসন্ত* [১৩৬৯], *সহসা সচকিত* [১৩৭৩], *উচ্চারণ* [১৯৭৮], ও *আমার প্রতিদিনের শব্দ*-এ [১৩৮১]। সৈয়দ আলী আহসান বস্তুবাস্তবতাময় পৃথিবীকে, নিসর্গ ছাড়া, গ্রহণ করেন না কবিতায়। শব্দের বহুবিকিরণ সংগ্রহ করা তাঁর লক্ষ্য, এবং কবিতাকে তিনি পরিণত করেন পঞ্চেন্দ্রিয়ের লীলালাস্য ও বিমূর্ততার লীলাভূমিতে। আধুনিকতার একটি লক্ষণকেই তিনি বড়ো ক'রে তোলার চেষ্টা করেছেন তাঁর কবিতায়; শব্দের ওপর তিনি আরোপ করেন অপরিসীম গুরুত্ব। তাই তাঁর আধুনিকতা যতোটা আধারগত, ততোটা আধেয়গত নয়।

১৯৫০-এ আশরাফ সিদ্দিকী ও আবদুর রশীদ খানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *নতুন কবিতা* নামী একটি ক্ষুদ্র কাব্যসংকলন, যাকে সম্পাদকদ্বয় দাবি করেছেন 'সাহিত্যপথের নতুন যাত্রীদের কাব্যসৃষ্টির খতিয়ান' ব'লে। *নতুন কবিতা*র বিভাহীন ভূমিকাটি কোনো কাব্যান্দোলনের ইঙ্গিত দেয় না। *নতুন কবিতা* আজ স্মরণীয় ঐতিহাসিক কারণে। সংকলনটিতে স্থান পেয়েছিলেন তেরোজন 'কবি', তিরিশ বছর বয়স্ক তরুণ থেকে চোদ্দ বছর বয়স্ক কিশোর, যাঁদের ব্যাপক ব্যর্থতা ও সামান্য সাফল্যের সংগ্রহ এটি। সংগৃহীত কবিযশোপ্রার্থীদের অনেকে লুপ্ত হন অত্যল্প সময়ের মধ্যে, কেউ কেউ পৌঁছোন দীনতাব্যর্থতার সীমান্তে। এগিয়ে যান মাত্র দুজন– শামসুর রাহমান ও হাসান হাফিজুর রহমান। সংকলনটিতে একটিও উল্লেখযোগ্য পরিপূর্ণ কবিতা স্থান পায় নি, এবং অধিকাংশেরই শব্দ-বাক্য-বিষয় দ্যুতিহীন। শামসুর রাহমানই *নতুন কবিতা*-অন্তর্ভুক্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একমাত্র কবি, যাঁর কবিতার স্বপ্নকল্পনাবোধ উজ্জ্বল। স্বপ্নবিহার ও প্রতিবেশচেতনা ঢুকেছে তাঁর কবিতায়, জীবনানন্দ দখল করেছেন তাঁর কল্পনা; এবং চোখে প্রবেশ করেছে অচিরস্থায়ী মরুস্বপ্ন। 'অনেক চোখের রাত' নামী কবিতাটির মরুস্বপ্নভরা কয়েকটি পংক্তি এমন : 'এমন অনেক রাত হয়তো নেমেছে/বাদাকশানের পথে.../এমন অনেক রাত হয়তো নেমেছে সাত সাগরের ঢেউয়ে/হয়তোবা বিবসনা শা'জাদীর গজল-মুখর/কোনো দূর ঝরোকোয়;/এমন অনেক রাত হয়তো নেমেছে/বেদুইন কুমারীর চোখের পাতায়।' এ-রোম্যান্টিক স্বপ্নের ওপর প্রভাব ফেলেছেন হয়তো তিরিশের অব্যবহিতপূর্ব মরুস্বপ্নচারীরা, এমনকি ফররুখ আহমদ; কিন্তু *নতুন কবিতা*-অন্তর্ভুক্ত শামসুর রাহমানের ছটি কবিতায় যাঁর ছাপ রক্তমাংসস্বপ্নে আঁকা হয়ে গেছে উজ্জ্বল রেখায়, তিনি জীবনানন্দ দাশ। স্বপ্নভারাতুরতা, সৌন্দর্যস্পৃহা, প্রতিবেশপৃথিবীবোধ, আত্মকেন্দ্রিকপরিক্রমা, যা শামসুর রাহমানের বৈশিষ্ট্য, এ-কবিতাগুলো তার উন্মেষচিহ্নখচিত। *নতুন কবিতা*-ভুক্ত সকলেরই কবিতায় লক্ষণীয় হচ্ছে ভাব ও ভাষার দ্বন্দ্ব, যে-দ্বন্দ্বের কালো রক্ত ছড়িয়ে আছে প্রায় সর্বত্র; আর এ-কালো রক্তের ছোপ সবচেয়ে কম লেগেছে শামসুর রাহমানের কবিতায়। তিনি একমাত্র কবি এ-সংকলনের, যিনি ভাবনার শরীর অনুসারে বানাতে শিখেছেন ভাষাপোশাক। তাই তাঁর উক্তি অন্যদের চেয়ে অনেক আন্তরিক ও বিশ্বাসযোগ্য : 'চাঁদ ফুল পাখি মেঘ নক্ষত্র শিশির আর নারীর প্রণয়/আজো মিথ্যা নয়.../নতুন ধানের স্বপ্ন মিথ্যা কভু' ['একটি কবিতা']। এ-উক্তি অভিনব অসাধারণ নয়; কিন্তু এর মধ্যে বিদ্যমান আপন ভাবনাবেদনা উপস্থাপনের সে-শক্তি, যা শব্দসজ্জাকে কবিতায় পরিণত করে। শব্দকে কবিতায় পরিণতিদানে শামসুর রাহমান, *নতুন কবিতা* ভুক্তদের মধ্যে, সার্থকতম। হাসান হাফিজুর রহমান আধুনিক চেতনাঋদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ভাষাভাবনার পারস্পরিক দ্বন্দ্বে বিক্ষত *নতুন কবিতা* ভুক্ত কবিতাগুচ্ছে। এ-কবিতাগুচ্ছে ফ'লে উঠেছে তাঁর নিজস্ব গদ্যরীতি, যা তাঁর পরবর্তী কবিতায়, সফলতায় বিফলতায়, বহন করে হাসান হাফিজুর রহমানের আঙুলের ছাপ।

বিভিন্ন নতুন কবির কাব্যগ্রন্থপ্রকাশ, তৎকালীন বাঙলায় প্রথম, শুরু হয় পঞ্চাশের দশকে। বাঙলাদেশের উদ্ভবের অব্যবহিত আগে যেমন সৃষ্টিশীলতামুখর হয়ে উঠেছিলেন তরুণ কবিরা, এবং স্বাধীনতার পরে একের পর এক প্রকাশিত হ'তে থাকে তাঁদের কাব্যগ্রন্থ, পাকিস্তানি স্বাধীনতা তেমন সৃষ্টিশীল প্রেরণাদীপ্র ছিলোনা। তাই চল্লিশ দশকের শেষাংশ নতুন কাব্যগ্রন্থহীন থেকে যায়, পুরোনো পদ্যলেখকেরা পাকিস্তান ও তার পিতার স্তোত্ররচনায় নষ্ট হ'তে থাকেন। পঞ্চাশ-দশকের সূচনা হ'লে প্রকাশ শুরু হয় নির্গ্রন্থ কবিদের কাব্যগ্রন্থপ্রকাশ;তবে অজস্র নতুন বেরোনো কাব্যগ্রন্থের ঝলমলে রঙে রঞ্জিত নয় ওই দশক;–পঞ্চাশ-দশকের প্রথমার্ধে নির্গ্রন্থ কোনো কবির কাব্যগ্রন্থ বেরোয় সম্ভবত একটি, এবং দ্বিতীয়ার্ধে বেরোয় বেশ কয়েকটি। শামসুর রাহমানের প্রথম, ও বিলম্বিত, কাব্যগ্রন্থ *প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* [১৩৬৬] বেরোয় ১৯৬০-এর শুরুতে– ইঙ্গিতময় ফাল্গুনে। *প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* র প্রকাশ, বাঙলাদেশের কাব্যমণ্ডলের, প্রথম সুবর্ণমণ্ডিত ঘটনা : চল্লিশের দশক থেকে আধুনিকতা ও আধুনিক কবিতার সাথে যুক্ত হওয়ার জন্যে স্খলনপতনভরা যে-শ্রমসাধনা ক'রে আসছিলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙালি মুসলমান কবিমণ্ডলি, তা ব্যাপক সাফল্য আয় করে *প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* তে। এ-গ্রন্থে গ্রথিত কবিতারাশি আগেই প্রকাশিত হয়েছিলো পত্রপত্রিকায়, সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল কবি ও আধুনিক হিশেবে চিহ্নিত হচ্ছিলেন তিনি; এবং ১৯৬০-এ যখন ওই কবিতারাশি গ্রন্থিত হয়ে প্রকাশ পায়, তখন তীব্র অভিঘাত সৃষ্টি করে। *প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* যে-বোধটিকে প্রধান ক'রে সকলের সামনে উপস্থিত করে, তা আধুনিকতা, যা আয়ত্তের জন্যে দু-দশক ধ'রে ব্যর্থতা থেকে ব্যর্থতায় স্খলিত হয়েছেন মুসলমান কবিসম্প্রদায়। ১৯৬০ বাঙালি মুসলমানের আধুনিক হয়ে ওঠার বছর; তাঁদের কবিতার আধুনিকতা আয়ত্তের বছর। তিরিশি কবিতাস্রোতের সাথে *প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* র সাহায্যে বাঙলাদেশকে দৃঢ় সংযুক্ত করেন শামসুর রাহমান;– আধুনিক জীবন-ও কাব্য-চেতনার এমন ব্যাপক প্রবল গভীর প্রকাশ গোচরে আসে না শামসুর রাহমানপূর্ব কোনো বাঙলাদেশীয় কবির কবিতায়। শামসুর রাহমানই সে-শক্তিমান ও ভাগ্যবান আধুনিক, এবং সর্বাংশে আধুনিক, যাঁর কবিতা আধুনিক চেতনাচৈতন্য সংবেদনশীলতার উন্মেষচিহ্নখচিত নয় শুধু, বরং সমৃদ্ধ আধুনিক চেতনার উজ্জ্বল উৎসারণ। আহসান হাবীব ও আবুল হোসেন-এ দেখি যার ক্ষীণ উন্মেষ, সৈয়দ আলী আহসান-এ জ্ব'লে উঠেছে যার একমাত্রিক দীপ্তি, হাবীবুর রহমান, আবদুল গণি হাজারী, মোহাম্মদ মামুন, আবদুর রশীদ খান-এ পাই যার তমসাগ্রস্ত গরিব আভাস, শামসুর রাহমান-এ তা জ্ব'লে উঠেছে ঝাড়লণ্ঠনের বর্ণাঢ্য শোভাপ্রদীপ্তিসহ। *প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* বাঙলাদেশীয় কবিতার ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল উচ্চ স্তম্ভ। বইটির নামই বিকিরণ করে নতুন চেতনা, এবং কল্পনাকে সরল রোম্যান্টিক আশাউচ্ছ্বাস থেকে বিরত ক'রে এক জটিল গভীর নিঃসীম আলোড়নের মধ্যে প্রবিষ্ট ক'রে দেয়। নামটি ইঙ্গিত করে যে কবির, এবং সকলের, মানসমৃত্যু ঘটে গেছে, এখন আছে শুধু প্রথাসম্মত দ্বিতীয় মৃত্যু। তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *রৌদ্র করোটিতে* [১৯৬৩] পরিয়ে দেয় তাঁকে বাঙলাদেশের অস্বীকৃত প্রধান, আধুনিক, কবির শিরোপা। স্বপ্ন-সৌন্দর্য-কল্পনামণ্ডিত মনোবিশ্ব ও জীবনখচিত প্রতিবেশপৃথিবী সাদরে গৃহীত হয় *রৌদ্র করোটিতে*র কবিতাসমূহে : এক ভয়াবহ সময় ও বিশ্বে বসবাসের অভিজ্ঞতা জড়ো হয় এর কবিতাপুঞ্জে। তিরিশি কবিতার বড়ো অংশ মনোবিশ্বের শস্য; শামসুর রাহমান তার সাথে গেঁথে দেন বস্তুবাস্তবতা ও অব্যবহিত প্রতিবেশপৃথিবী। বাঙলাদেশীয় কবিতা, তাঁর নিকট থেকে, পায় বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য, জীবন ও স্বপ্ন, বাস্তব ও অবাস্তব, প্রতিবেশ ও অধরা নীলিমা। শামসুর রাহমানের প্রথম কাব্য দুটি গোপন ও প্রকাশ্য প্রভাব বিস্তার করেছে বাঙলাদেশের কবিতার আলোতেবাতাসে; বিষয় ও ভাষায় তিনি যে-চেতনা সঞ্চার করেছেন তাঁর কবিতায়, তা সংক্রামিত হয় অন্যদের ও তরুণতরদের মধ্যে; এবং শামসুর রাহমানোত্তর বাঙলায় অনাধুনিক চেতনা লালন করাই হয়ে ওঠে কষ্টকর। আজ বাঙলার নবীনতম কবির ব্যর্থতম রচনাও কোনো-না-কোনোভাবে আধুনিক চৈতন্যের উপাসক। শক্তি সৃষ্টি সাফল্যে, তাঁর সাম্প্রতিক ধূসরতা সত্ত্বেও, ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইলে প্রতিদ্বন্দ্বীরহিত তিনি, এবং সম্ভবত শামসুর রাহমানই বাঙলাদেশের একমাত্র 'প্রধান কবি'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন কবি কখন হয়ে ওঠেন প্রধান কবি?– তিনি কি এ-কারণেই প্রধান যে তিনি তাঁর কালে সক্রিয় অন্য কবিদের থেকে উৎকৃষ্ট;– ভাব-ভাষার বিন্যাসে উৎকৃষ্টতম? প্রধান কবি তাঁর কালের উৎকৃষ্টতম, বা অন্যতম উৎকৃষ্ট কবি, সন্দেহ নেই; কিন্তু কোনো কালের উৎকৃষ্টতম কবিমাত্রই যে প্রধান বা মুখ্য কবি, তা নয়। এমন অনেক সময় আসতে পারে যখন আবির্ভূত হ'তে পারেন নিম্ন, মাঝারি, ভালো কবিরা; কিন্তু অনুপস্থিত থাকতে পারেন কোনো প্রধান কবি। প্রধান কবি নতুন সংবেদনশীলতার জন্ম দেন তাঁর গোত্রের অন্তরে, পরিস্রুত করেন ভাষা, এবং অধিকার করেন জীবন ও অভিজ্ঞতার এমন এলাকা, যা তাঁর আগে অধিকারে আসে নি অন্য কারো। তিনি তাঁর জীবন ও অভিজ্ঞতার এলাকাকে এমনভাবে উপস্থিত করেন সমকাল ও মহাকালের সামনে যে তাঁর সমকালের মানুষেরা তাঁর অভিজ্ঞতাকেই নিজেদের অভিজ্ঞতা হিশেবে গ্রহণ করে। যেহেতু তিনি কবি, তাই তিনি তাঁর আপন ভাষার কবিতাকে উন্নীত করেন নতুন স্তরে; আবিষ্কার করেন কবিতার নতুন ব্যাকরণ, যা হয়ে উঠবে আগামীকালের ঐতিহ্য; এবং তিনি নিজে তাঁর কালের অন্য কবিদের অতিক্রম ক'রে তাঁর ভাষার সমস্ত কালের প্রধান কবিদের পংক্তিতে আপন স্থান ক'রে নেন। বাঙলাদেশের কবিদের মধ্যে শামসুর রাহমানই শুধু অর্জন করেছেন উল্লিখিত গুণাবলি– সম্পূর্ণরূপে না হ'লেও অনেকাংশে; সুতরাং একজন প্রধান কবির মর্যাদা, বাঙলাদেশে, একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য। শামসুর রাহমানের উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠত্ব এখন অবিসংবাদিত; তিনি যে জীবন ও অভিজ্ঞতা উপস্থিত করেছেন তাঁর কবিতাবলিতে, তা দু-দশক ধ'রে প্রধান্য বিস্তার ক'রে আছে। কবিতার কলাকৌশলে তিনি সৃষ্টি করেছেন নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ অভিনবত্ব : এমন কিছু উপমা উৎপ্রেক্ষা চিত্রকল্প রচিত হয়েছে তাঁর কবিতায়, যাদের অবিনাশী ব'লে স্বীকার করা যায়। শামসুর রাহমান শুধু বাঙলাদেশের প্রধান ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কবি নন, তিরিশি পাঁচজনের পর সমগ্র বাঙলা কবিতার বিস্তৃত ক্ষেত্রেও তিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কবি। আদিম দেবতাদের পরে চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকে উদ্ভূত হন যে-কবিরা, সুভাষ মুখোপাধ্যায় থেকে শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও পরবর্তীদের পর্যন্ত, কেউ শামসুর রাহমানের মতো ব্যাপকগভীর বিস্তৃত নন, যদিও কেউ কেউ কোনো কোনো ক্ষেত্রে চমৎকার। তাঁর কবিতার একটি বড়ো অংশ হয়তো আগামী দু-তিন দশকের বাতাসে নেভে যাবে, একটি বৃহৎ অংশ হয়তো আনন্দ যোগাবে ভবিষ্যতের গবেষকদের চিত্তে– কার কবিতা জোগায় না?– কিন্তু তাঁর প্রচুর কবিতা বাঙলা ভাষার সঙ্গী হয়ে পাঠকচিত্তে শিহরণ জাগাবে। বিশ শতকের দ্বিতীয়াংশ হবে যার কাছে ধূসর-অতীত সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা-গবেষণাগ্রন্থ-ইতিহাসপুস্তক, সে এ-সময়ের কবিতার ভেতর দিয়ে যেতে যেতে শামসুর রাহমানের কবিতায় এসে অনুভব করবে যে তার মেধা আর চিত্ত বলছে : এই তো একজন প্রধান কবির ছোঁয়া পাচ্ছি!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নামপরিচয়হীন যে-কোনো একজন নিহত মুক্তিযোদ্ধার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা

তোমাকে দেখি নি, তোমার লাশও দেখি নি; দশ বছর ধ'রে তোমার একরাশ শক্ত সমর্থ স্বাধীন অস্থি বাঙলার কোনো ঠাণ্ডা নদীর অতলে, শহরের কংক্রিটের নিচে, সবুজ পল্লীর পলিমাটির আশ্রয়ে, কোনো অরণ্যের লতাগুল্মশেকড়ের সাথে জড়াজড়ি ক'রে শান্তি পাচ্ছে। তোমার একটি নাম ছিলো, যা সুর হয়ে বেজে উঠতো বোনের, মায়ের, পাশের বাড়ির তরুণীটির কণ্ঠে; কিন্তু এখন, দশ বছর ধ'রে যে শুধু নিহত অস্থি হয়ে আছো, তোমার কোন নাম নেই; পরিচয়ও ছিলো তোমার, যে-কোনো সম্রাটের পরিচয়ের চেয়েও যা সম্ভ্রান্ত, কিন্তু এখন, দশ বছর ধ'রে যে শুধু কালছেঁড়া চিৎকার হয়ে আছো, তোমার কোনো পরিচয় নেই। তোমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করি, ক্ষমা চাই। হয়তো তুমি রাড়িখাল, কণকসার, কদমতলি, বাঘরা বা এমন হাজার হাজার সবুজ নামের এক গ্রামে শক্ত মুঠোয় ধ'রে ছিলে লাঙল, তোমার স্বপ্নে ছিলো সোনার গুচ্ছের মতো ধান, সামনে পেছনে ছড়ানো ছিলো পলিমাটির মাঠ; এমন সময় ডাক এসেছিলো, তুমি শুনেছিলে। তুমি হয়তো কোনো পাটকলে বা ঢালাই কারখানায় কলকব্জার সাথে জীবন যাপনে লিপ্ত ছিলে, এমন সময় ডাক শুনে তুমি সাড়া দিয়েছিলে। তুমি হয়তো যাচ্ছিলে ইস্কুলে, মহাবিদ্যালয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, এমন সময় আহ্বান এসেছিলো। হয়তো তুমি শহরের চৌরাস্তার পাশে ক্লান্ত শুয়েছিলে তোমার ঠেলাগাড়ি, বা রঙিন রিকশার পাশে, এমন সময় তীব্র চীৎকারে জেগে উঠে দেখেছিলে তোমার হাতে আশ্চর্য রাইফেল। বা তুমি ছিলে একান্ত কর্মহীন বেকার, যেহেতু দেশ তোমাকে কোনো কাজ দেয় নি, ছিলে জীবন ধারণের দুঃস্বপ্নে পরাক্রম শত্রুর সাথে দ্বন্দ্বরত, অথচ নিষ্ক্রিয়, এমন সময় দেখলে তোমার সামনে উপস্থিত দেশ, তাকে বাঁচানোর দায়িত্ব।

তোমার চুল কি মার্চ মাস থেকেই অমন লম্বা ছিলো; পেশি ছিলো অমন পাথরের মতো শক্ত, ইস্পাতের মতো ধার? কেমনে তুমি এতো অল্প দিনে অর্জন করেছিলে দ্রুতগতি, আকিস্মক ছুটে এসে অতো দ্রুত শত্রুকে ছিন্নভিন্ন করার কৌশল আয়ত্ত করেছিলে তুমি কেমনে? তুমি কি প্রথম থেকেই জানতে তোমার শক্তির কাছে সহজেই মুষড়ে পড়বে চীন-আমেরিকার স্বয়ংক্রিয় রাইফেল; তুমি কি জানতে অস্ত্রভারাক্রান্ত শত্রুরা জানে শুধু খুন আর আত্মসমর্পণ? তুমি হয়তো সবই জানতে মনে মনে, নইলে প্রায় অসহায় তুমি এমন উদ্ধত ভঙ্গিতে কী ক'রে দাঁড়াতে পারলে অন্ধকারের হিংস্র সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে? তোমাকে দেখি নি আমি, ভীরু আমি, কিন্তু এখন, তোমাকে দেখছি আমি : তুমি, বটের বহুমুখি শেকড়ের মতো পা ঢুকিয়ে দিয়েছো বাঙলার

amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পলিমাটির ভেতরে, তোমার মাথা মেঘলোক ভেদ ক'রে উঠে গেছে, উপকথার শত্রুঘ্নের অস্ত্রের মতো গর্জে উঠছে তোমার দিগন্ত-থেকে-দিগন্তে ঠেকা রাইফেল। তুমি আমার কল্লোলোকে একমাত্র বীর, পৃথিবীতে তোমার আগে আর তোমার পরে কোনো বীর নেই। তুমি আমার চিরোজ্জ্বল বীর।

কিন্তু তোমাকে আমি কোনো উপাধি দেবো না, কোনো শিরোপা তোমাকে মানায় না; তোমার বুকে বা শিরে ওগুলোকে ফেলনা রাংতার মতো মনে হয়। ওগুলো তাদেরই দরকার, যারা বিক্রি করতে চায় নিজেদের, ঘরে তুলতে চায় রাশিরাশি সোনারূপো। তুমি কিছুই চাও না। তুমি বীরোত্তম বা বীরবিক্রম নও, তার চেয়ে অনেক বড়ো তুমি, ত্যাগোত্তম মহত্তম। তাই তোমার কোনো উপাধিশিরোপা নেই, বুকেবাহুতে তারা বা তলোয়ার নেই, তোমার কোনো চিহ্নিত সমাধি নেই। সারা বাঙলাই তোমার সমাধি, যে-কোনো ফুল ফোটে এ-চরাচরে, তা তোমার জন্যেই, যে-কোনো ফুল বাতাসের ছোঁয়ায় ঝরে, তা তোমার সমাধির ওপরেই ঝ'রে পড়ে। তোমাকে আমি শহীদও বলি নি, বলেছি নিহত; কেননা তুমি সত্য চেয়েছিলে, আমিও চাই; আমি জানি ওই বিদেশি শব্দটি তোমাকে এমন কোনো মহিমা দিতে পারে না। অজস্র ঘাতক ইস্পাত ও বারুদ তোমার বুকের পেশিতে যখন ঢুকেছিলো, রক্তক্ষরিত হচ্ছিলো তোমার সমস্ত শিরাউপশিরা থেকে, তখন তুমি কোনো উপাধি চাও নি, সিংহাসন চাও নি; তুমি শুধু বাঙলার মাটিদুর্বাকে আরো ব্যগ্র আঙুলে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিলে। কোনো সেবিকা আসে নি তোমাকে চিকিৎসা করার জন্যে, আসে নি হেলিকপ্টার, স্ট্রেচার। তুমি নামহীন এলাকায় পরিচয়হীন প'ড়ে ছিলে। তোমাকে সবাই ভুলে গেছে। তোমার কাছে আমি ক্ষমা চাই। কয়েকটি কথা আমি তোমার কাছে জানতে চাই : তুমি কেনো মুক্তি চেয়েছিলে, যুদ্ধে গিয়েছিলে? যে-হাতে ধরতে লাঙল, রিকশার হ্যান্ডেল, কলম, বই, ঠেলাগাড়ির চাকা, স্ত্রী ও প্রেমিকার হাত, কেনো তাতে তুলে নিয়েছিলে স্টেন? অস্ত্র তোমার দরকার হয়েছিলো কেনো? তোমার কি একটা গাঢ় স্বপ্ন ছিলো, আদর্শ ছিলো, লক্ষ্য ছিলো? স্বাধীনতা দরকার ছিলো তোমার, অথচ তোমার তা ছিলো না? তুমি কি একটা অত্যন্ত নিজস্ব দেশ, বিশেষ রকমের সমাজ চেয়েছিলে, যা ছিলো না বর্বর পাকিস্তানে? তুমি যে অত্যন্ত আবেগে 'জয় বাঙলা', 'সোনার বাঙলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' গেয়ে উঠতে, তা কি ছিলো শুধুই সংক্রামক, না তা তোমার বুক থেকে আপনি উঠে আসতো, যেমন বীজ থেকে আপনি উদগত হয় উদ্ভিদ? তুমি কি ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইল এলাকাকে শুধু একটি নতুন নাম পরিয়ে দিয়েছিলে, না তাকে সম্পূর্ণ বদলে দিতে চেয়েছিলে? তোমার স্বপ্ন ছিলো, আদর্শ ছিলো, তুমি নতুন সমাজ চেয়েছিলে বাঙলায়, আর ওই কামনাই তোমাকে পরিণত করেছে রক্তমাংসহীন অস্থিতে; বাঙলার মাটিতে তুমি নামহীন পরিচয়হীন প'ড়ে আছো। তুমি স্বাধীনতা দেখো নি, একাত্তরের ষোলোই ডিসেম্বর আসার বেশ আগেই তুমি বিগত স্বপ্ন হয়ে গেছো। তুমি কোনো দিন জানবে না বাঙলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, এখন আর খাকি ঘাতকদের অস্ত্র কোলাহল করে না বাঙলার গ্রাম খাল বস্তি শহরে। কিন্তু তুমি যে তোমার জীবন শুরু হ'তে-না-হ'তেই বিলিয়ে দিলে, ভাবলে তোমার রক্তে পরিস্রুত হবে দেশ, তা কি হয়েছে? আমি তোমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছে ক্ষমা চাই; প্রার্থনা করি তোমার ক্ষমা, কেননা তোমার রক্তের বিনিময়ে পাওয়া দেশ তোমার পথে চলে নি। মুক্তিযোদ্ধা, তুমি কি অপচয়ের অন্য নাম?

মৃত্যুই সব কিছুর সমাপ্তি; তাই তোমার এখন দৃষ্টি নেই, বাঙলার অবস্থা তোমার চোখে তুমি আর দেখতে পাবে না। তবু যদি দেখতে পাও, তবে কি বেশ প্রফুল্ল বোধ করবে এ ভেবে যে তোমার রক্ত অকাজেই তুমি নষ্ট করো নি? এখন চারদিকে তোমার বিরুদ্ধে শত্রুতা, যেমন ছিলো একাত্তরে; কিন্তু একাত্তরে তুমি জয়ী হয়েছিলে, কিন্তু তারপরেই শুরু হয় তোমার পরাজয়। বাঙলার প্রান্তেপ্রান্তে এখন পরাভূত তুমি, তোমার স্বপ্ন এখন হাস্যকর বস্তু। যে-শ্লোগানে তুমি পেশিতে তেজ পেতে, তা এখন প্রায় নিষিদ্ধ; যে-সঙ্গীতকে তুমি আত্মার চেয়ে ভালোবেসেছিলে, তার বিরুদ্ধে এখন প্রাসাদে প্রাসাদে চক্রান্ত। আমি জানি তুমি কোনো বিশেষ দলের ছিলে না, ছিলে বাঙলার; কিন্তু এখন একান্তভাবে বাঙলার থাকাটা নিরাপদ নয়। চারদিকে জেগে উঠেছে অন্ধকারের প্রাণীরা, তোমাকে খঞ্জর হাতে খুঁজতো যারা একাত্তরের পথেঘাটে, পরে পালিয়ে যারা ঢুকেছিলো পাতালে, এখন তাদেরই সুসময়। তোমার লক্ষ্য ছিলো ভবিষ্যৎ, যদিও নিজে তুমি অতীত হয়ে গেছো; কিন্তু আমরা যারা বেঁচে আছি, তাদের লক্ষ্য অতীত। আমরা এখন পিছমুখো, পেছনের দিকে দৌড় দিচ্ছি প্রাণপণে। আমাদের সমস্ত চাওয়া আমরা এখন সংশোধন করে নিচ্ছি; যা একসময় বাতিল ক'রে ছেড়ে এসেছি, এখন তাই বরণ করছি প্রত্যহ; আর যা পাওয়ার স্বপ্নে তুমি অস্থি হয়েছো, তাদের দণ্ড দিচ্ছি, আঁস্তাকুড়ে ফেলছি ভোরবেলা সন্ধ্যাবেলা। তুমি কি ক্ষমা করবে আমাকে?

তোমাকে যদি জানাই যে তোমার স্বপ্নের দেশ বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে বিপথগামী, দুর্নীতিপরায়ণ, নৈতিকতাহীন, গরিব, নষ্টভ্রষ্ট, অসুস্থ দেশ, তাহলে কি তুমি দুঃখ পাবে? ক্রুদ্ধ হবে? আবার হাতে তুলে নিতে চাইবে অস্ত্র? কিন্তু তাতে কোনো কাজ হবে না, কেননা তোমার সমস্ত শক্তি গত দশ বছরে নিঃশেষে হরণ করা হয়েছে। তুমি এখন সমস্ত গৌরবহীন, বরং গৌরব পায় তারা, যারা বিরুদ্ধে ছিলো তোমার। সারা দেশটার কথাই ধরা যাক। তার উদ্দেশ্যের প্রচণ্ড বদল ঘটেছে এক দশকে, এমন হয়েছে যে তাকে বাঙলাদেশ না ব'লে বাঙলাস্তান বললেই বেশি মানায়। স্বাধীনতার পর থেকেই কেমন শোচনীয় পতন শুরু হয় দেশটির : চারদিকে মেতে ওঠে লুণ্ঠনকারীরা, তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ে স্বাধীনতার সমস্ত সোনাদানা ঘরে তুলতে। তারা ভুলে যায় রক্ত আর অশ্রুর প্রতিশ্রুতি, কেননা তাদের হাতে উদ্দাম শক্তি। ঘরে হীরেমাণিক্য। দুর্নীতিতে মাতে দেশের সব এলাকা, নৈতিকতা থেকে খ'সে পড়ে একে একে ক্ষমতাবানেরা; অবহেলায় যাদের 'সাধারণ মানুষ' বলা হয়, তাদের অবস্থা সুখ জাগায় শুধু শিল্পদৃষ্টিসম্পন্ন ফটোগ্রাফারদের চিত্তে। বাঙলাদেশ ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো একগুচ্ছ লোকের, যারা তোমার মতো আত্মবিসর্জনের দিকে না গিয়ে অন্যদিকে গিয়েছিলো। বাঙলাদেশ দশ বছরেই একাধিক ক্ষুদ্র একনায়ক দেখেছে, তাদের রক্তাক্ত পতন দেখেছে, তবু পতন থেকে তার উত্থান ঘটে নি। এখনো ঢালু মাঠে গড়িয়ে যাওয়া বলের মতো গড়াচ্ছে বাঙলাদেশ, কেউ জানে না থামবে কোন পাতালে। আমরা দেখেছি বাঙলাদেশকে কেউ কেউ আংটির মতো পরতে চেয়েছে, কেউ তাকে পরিণত করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেয়েছে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে; কোনো কোনো বীরোত্তম তাকে গেঁথে রাখতে চেয়েছে আপন উর্দির তারা ক'রে, কখনো বুটের মতো পরতে চেয়েছে ডান পায়ে বাঁ পায়ে। তোমার কাছে, আমরা যারা অসহায়ভাবে বেঁচে আছি, ক্ষমা প্রার্থনা করি।

কোনো কোনো সত্য, আমি বিশ্বাস করি, চিরসত্য : যেমন একবার রাজাকার চিরকাল রাজাকার। যে-একাত্তরে জন্ম নেয় নি সেও হ'তে পারে রাজাকার। এখন একটা প্রশ্ন আমার ভেতর থেকে চিৎকারের মতো উঠে আসছে, যদিও প্রকাশ করতে ভয় পাচ্ছি, সেটি হচ্ছে একবার মুক্তিযোদ্ধা কি চিরকাল মুক্তিযোদ্ধা? না কি মুক্তিযোদ্ধারও ঘটতে পারে আন্তর বদল, এবং হয়ে উঠতে পারে তার-একদা-শত্রুর মতো অবিকল? তুমি যদি ওই নামহীন মাঠে নামহীন গাছের তলায় নামহীন অস্থিপুঞ্জে পরিণত না হতে, তবে কি তুমি চিরদিন থাকতে আকাশ-মেঘ-বিদ্যুতে শির-ঠেকানো উজ্জ্বল মুক্তিযোদ্ধা? অনেক বদল দেখেছি আমি, দেখেছি অন্ধকারের পাত্রপাত্রীদের সাথে মিলে গেছে আলোর সৈনিকেরা, চ'লে গেছে বিপরীত দিকে, যেদিকে তাদের যাওয়ার কথা ছিলো না। যেদিকে যাওয়ার অর্থই হলো নিজের বিরুদ্ধে যাওয়া, বাঙলার বিরুদ্ধে যাওয়া। তুমি ক্ষমা করো আমাকে। তুমি যদি জিজ্ঞেস করো বাঙালির জীবনের শ্রেষ্ঠ বছর কোনটি, তবে আমি বলবো একাত্তর। যদিও বাঙলা তখন দোজখে পরিণত হয়েছিলো, সারাক্ষণ কাঁপছিলো বাঙালি রক্তক্ষরণের ভয়ে, বাতাসে থেকে থেকে গর্জন ক'রে উঠছিলো আগ্নেয়াস্ত্র, তবু সেটিই আমাদের সেরা বছর। তখন আমাদের একটা স্বপ্ন ছিলো, লক্ষ্য ছিলো আমাদের, কিন্তু এখন আমাদের কিছু নেই : লক্ষ্য আর স্বপ্ন এখন নর্দমার ময়লার মতো ঘৃণ্য। তোমার বিরোধীরা এখন বাঙলাকে ওই আবর্জনা থেকে উদ্ধার করার কাজে দিনরাত লিপ্ত। কী চমৎকার দুর্নীতিপরায়ণ অনৈতিক সমাজ তুমি আমাদের উপহার দিয়ে গেলে। ভারতীয় উপমহাদেশ দুর্নীতির লীলাভূমি; তবে এখন এ-উপমহাদেশের বাঙলাদেশ নামক ক্ষুদ্র খণ্ডাংশটি দুর্নীতি আর অনৈতিকতার বেহেশত। এখানে যে যতো দুর্নীতিপরায়ণ, সে-ই ততো পুণ্যবান; তারই ততো খ্যাতিপ্রতিপত্তি। বাঙলাদেশের দোকানদার, আমলা, রাজনীতিক, ব্যবসায়ী, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী, কবি, বৈজ্ঞানিক, শ্রমিক, চাষী, চোর সবাই এখন দুর্নীতিতে আপাদশির মগ্ন; কেউ কেউ আছে দুর্নীতির সুযোগ পাচ্ছে না। বাঙলাদেশের বর্তমানের সমাজ দোকানদারি সমাজ, যার কোনো নীতি নেই, যে-কোনো কাজই তার নীতিশাস্ত্রে বৈধ। এখন চারপাশে শুধু বেচাকেনা চলছে, রাস্তার ছেঁড়া কাগজ টুকরো থেকে বুকের আবেগ দিনরাত বিক্রি হচ্ছে; যা বিক্রির যোগ্য নয়, তা এখন ফালতু আর হাস্যকর। জ্ঞান এখন ততোটুকুই মূল্যবান যতোটুকু বিক্রির যোগ্য, বিদ্যা ততোটুকুই দামি তার যতোটুকু চাঁদনি চকে বা মতিঝিলে বা জুতোর দোকানে বিক্রি হ'তে পারে। বাপ বেচছে ছেলের কাছে, মেয়ে বেচছে প্রেমিকের কাছে, স্ত্রী বেচছে স্বামীর কাছে, রাজনীতিক ব্যবসায়ী বেচছে দলের কাছে, গুণ্ডা বেচছে মন্ত্রীর কাছে; অর্থাৎ সারা বাঙলা এখন একটি চোরা আর ছেঁড়া মালের বাজার। তোমার কাছে, একাত্তরের ডিসেম্বরের অনেক আগে পরপারে চ'লে যাওয়া সূর্য, আমি করজোড়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করি।

আমি রক্তের কণায় কণায় তোমার উপস্থিতি বোধ করি; যদিও তোমাকে, তোমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গীদের আমি দেখি নি। তুমি লুংগি প'রে মাঠ পেরিয়ে যাচ্ছো, পেরোচ্ছো খাদ খাল নদী, ঝোপঝাড়ের তল দিয়ে গিয়ে হঠাৎ সক্রিয় ক'রে তুলছো তোমার ভোঁতা রাইফেল, শত্রুর হাত থেকে ছিনিয়ে আনা মেশিনগান, এবং বাঙলার এক একটি এলাকা পবিত্র হচ্ছে। তোমার আগ্নেয়াস্ত্র থেকে উৎসারিত শব্দ কী আশ্চর্য সুখকর। তোমার রাইফেল থেকে বুলেট নয়, বেরিয়ে আসছিলো গুচ্ছগুচ্ছ গোলাপ, যা শত্রুর জন্যে ছিলো বুলেট, আমাদের জন্যে ছিলো পুষ্পের গুচ্ছ। শহরের বানানো স্বাভাবিকতা যখন কোনো কোনো সন্ধ্যায় আচমকা নষ্ট হয়ে যেতো, বিকল হতো সুরক্ষিত বিদ্যুৎকেন্দ্র, অজস্র গুলির শব্দে যখন শহরে নামতো অন্ধকার, তখন বুঝতাম তুমি এসেছো, আর সে-অন্ধকারকেই মনে হতো আলোর অধিক। এখন আমি সেই অন্ধকার চাই। যখন কোনো ভাঙা সাঁকোর সামনে এসে দাঁড়াতাম, দেখতাম দানবের মতো ক্ষেপে আছে খাকিবাহিনী, বুঝতাম তুমি এসেছিলে। তুমি দলে দলে এসে, শত্রুর দিকে উদ্যত নল থেকে ঢেলে দিচ্ছো রাশিরাশি ইস্পাত, তোমার হাত থেকে শাঁ শাঁ ক'রে ছুটে যাচ্ছে গ্রেনেড, বিধ্বস্ত হচ্ছে শত্রুর বানানো স্বাভাবিকতার সাঁকো, চুরমার হচ্ছে তার শিরস্ত্রাণ আর ব্যক্তিগত হাড় : এখনো দেখতে পাই তোমার এলোমেলো ক্রুদ্ধ বাউলের মতো চুল বাঙলার আকাশ জুড়ে ওড়ে। তুমি লুকিয়ে আছো কোনো সবুজ ঝোপের আড়ালে বাঙলার বাঘের মতো, তোমার চোখ জ্বলছে; তুমি ব্রিজের নিচে ডুবে আছো বাঙলার কুমিরের মতো, ছিনিয়ে নিচ্ছো শত্রু; তুমি শহরের স্ট্রিটের কোণায় সেরেনাদগাওয়া প্রেমিকের মতো দাঁড়িয়ে আছো, এবং তোমার গান বজ্রবিদ্যুতের মতো খানখান করে দিচ্ছে শত্রুর ছাউনি বাঙলার প্রতিটি ফুলপাখিমানুষকে রাত্রে সুনিদ্রা দেয়ার জন্যে। যা দেখি নি তাও স্পষ্ট দেখছি আমি, তুমি আছো বিনিদ্র রাইফেলের পাশে, যে-কোনো সময় দুজনেই গর্জন ক'রে উঠবে ব'লে। তোমার কোনো ক্লান্তি নেই, যেহেতু সকলের ক্লান্তি হরণের দায়িত্ব তোমার; তোমার কোনো ভয় নেই, যেহেতু সকলের ভয় দূর করার স্বপ্ন তোমার। তুমি ছিলে, তাই আমরা একাত্তরে ভুলে ছিলাম ভয় আর ক্লান্তি; তুমি নেই, তাই একাশিতে আমরা ভয় ক্লান্তি দুঃস্বপ্নের ভেতরে ঢুকছি। তুমি আমাদের উদ্ধার করো।

এখন দেশ অসংখ্য শ্রেণীদলসংঘে বিভক্ত, আর তারা পরস্পরের পরিচ্ছন্ন উৎখাত চায়। নানা অস্ত্র নিয়ে তারা প্রস্তুত, যেদিন বিদেশে অবস্থিত কেন্দ্রের নির্দেশ আসবে, ঝাঁপিয়ে পড়বে তারা লক্ষ্যের মস্তকের ওপর। বাঙলায় এখন শেকড় নেই কারো তোমার মতো, সকলের শেকড় অন্যত্র ছড়ানো। যার শেকড় একান্ত বাঙলায়, সে এ-ভূভাগে তেলাপোকার চেয়েও অসহায়। ভীষণ অসহায় সে-মানুষেরা, যাদের বলা হয় সাধারণ মানুষ। দু-ধরনের মানুষ চোখে পড়ে এখন : সাধারণ আর অসাধারণ। অসাধারণ মানুষেরা, যারা মনুষ্যত্ব অনেকটা ঝেড়ে ফেলে অসাধারণ হয়ে উঠেছে, সমস্ত ক্ষমতার পরিণতি, আর সাধারণ মানুষেরা ক্ষমতার উৎস। প্রকাশ্যে প্রচণ্ড স্তুতি করা হয় সাধারণ মানুষদের; বলা হয় তারাই ক্ষমতার উৎস, দেশের ভিত্তি, কিন্তু সংগোপনে তাদের ত্রস্ত রাখা হয় সব সময়। তারা অধিকারহীন, পেট শূন্য, শরীর নগ্ন, তবু তাদের অশ্লীল মনে হয় না; কেননা যতোটুকু মেদ শরীরে জমলে উলঙ্গ শরীরকে অশ্লীল মনে হয় সে-অশালীন মেদটুকু তাদের চামড়ার তলে নেই। মনে হয় তারা এখন আর কিছু চায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, এমনকি বাঁচতেও চায় না; হাজার বছর ধ'রে কামনা করে এখন তারা নিষ্কাম বাউল। তাদের বেঁচে থাকাটা একরকম করুণ লোকসঙ্গীত। কিন্তু কী চমৎকার আছে ক্ষমতার পরিণতিরা। শরীরে তাদের মেদমাংসের বিস্ময়কর ছড়াছড়ি; তারা বিদেশি পোশাক পরে, বিদেশি খাদ্য খায়, সাইরেনঅলা গাড়ি চড়ে, না-ঠাণ্ডা না-গরম ঘরে ঘুমোয়, বিদেশি আর দেশি ব্যাংকে মিলিয়ন-বিলিয়ন (লাখকোটি এখন বাতিল) টাকা জমায়, সুন্দরী ও সানগ্লাসের সাহচর্যে থাকে। মাঝে মাঝে রটনা করে দুর্নীতির উনিশ-বিশ দফা, তাতে সাধারণ মানুষদের রফা ঘটে অনেকখানি, কিন্তু আরো শক্তি জমে পরিণতিদের পেশিতে। তোমার কাছে ক্ষমা চাই, কেননা তোমার সমস্ত পুরোনো লক্ষ্য এখন বাঙলায় বাতিল হয়ে গেছে। পুঁজি জমছে একগোত্রের ট্যাঁকে, গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র এখন পচা বুলি, বাঙলা ভাষাটাশার কথা এখন হাস্যকর, সবখানেই ইংরেজির ছড়াছড়ি, সম্মান; এবং আসছে আরবি, ডুবছে বাঙলাভাষা। এখন মূর্খ চাষা ছাড়া আর কেউ বাঙলা বলে না, পতিতাও বিদেশি ভাষা শিখছে নানা টিউটরিয়ালে। তবু কখনো যখন কোনো নির্বোধ যুবক নিঃসঙ্গভাবে পুরোনো গান ধরে, তখন শুধু তোমার কথাই মনে পড়ে। আমি তোমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করি, এবং এ-দুঃসময়ে তোমারই ধ্যান করি। অচিহ্নিত মাটির তলায় ঘুমিয়ে-থাকা অস্থি, ব্রিজের নিচে দিনদুপুরে অস্তমিত সূর্য, দশবছর ধ'রে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত শূন্যতা, আমাদের প্রথম বিজয় আর পরাজয়, কোটি কোটি মানুষের মেঘের পাতায় বিশাল অশ্রুবিন্দু, আমাদের সকলের নিহত হৃৎপিণ্ড, তোমার ধ্যান করি, তোমার কাছে ক্ষমা চাই। তুমি কি আবার জেগে উঠবে বাঙলার নদীর ধারে, বনঝোপের আড়ালে, ধান আর পাটের আলে, মফস্বল শহরের কানাগলিতে, আলোঅন্ধকারের কামড়ে আহত রাজনীতির স্ট্রিটে, পাহাড়ের চুড়োয়? আমি তোমার আকাশছাওয়া উদ্ধত চুলের দিকে তাকিয়ে আছি, উদ্যত নলের দিকে চেয়ে আছি, তোমার স্বপ্ন অবিচল সমস্ত চোখেচোখে ধ'রে আছি। কিন্তু দশ বছর ধ'রে তোমার কাছ থেকে স'রে যাচ্ছে তোমারই স্বপ্ন, উল্টে যাচ্ছে পাল্টে যাচ্ছে, হয়ে উঠছে তোমার স্বপ্নের বিপরীত, তোমার দুঃস্বপ্ন। কী রকম ভয়ঙ্কর মূর্তি তার। কখনো বুট হয়ে ঢুকে যাচ্ছে দানবিক পায়ে, তারা হয়ে ঝুলছে তার উর্দিতে, নাচছে চাবুকের শব্দে, খোঁচা খেয়ে প্রসব করছে ধান, আর যারতার সাথে ঘুম যাচ্ছে প্রকাশ্যে। তুমি থাকলে হয়তো চিৎকার করে বলতে, 'এ-জন্যই কি আমি হাজার হাজার বছর ধ'রে অরণ্যের ভেতর দিয়ে, নদীর জল সাঁতরিয়ে, খালের পার দিয়ে, পাহাড়ের চূড়ো ডিঙ্গিয়ে, আলকাতরা কংক্রিট পেরিয়ে, সাঁকো পার হয়ে তোমার দিকে আসছিলাম ছাপ্পান্নো হাজার বর্গমাইলের সবুজ রূপসী?' আমি তোমার কাছে, আমার একমাত্র বীর, দিনরাত ক্ষমাপ্রার্থনা করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহীদ মিনার : কাফনে মোড়া অশ্রুবিন্দু

রক্ত আর অশ্রুর ফোঁটা অবিনশ্বর নয়, তা জীবনের মতোই করুণ কোমল নশ্বর। হৃৎপিণ্ডের একবিন্দু রক্ত ধুলোয় ঝরলে মাটি তা শুষে নেয়, টলমল করা অশ্রুর ফোঁটা চোখের কোণ থেকে গড়িয়ে মিশে যায় অনন্তে। রক্ত আর অশ্রু ধাতুতে গঠিত নয়; মহাকালের বিরুদ্ধে উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না অশ্রু আর রক্ত। শিশিরের মতো ক্ষণায়ু তারা, কিন্তু মন চায় তাদের চিরায়ু দিতে। প্রিয় রক্ত আর অশ্রুকে কে কবে ভুলেছে? এক ফোঁটা রক্ত অবিস্মরণীয় হয়ে উঠতে পারে মহাযুদ্ধের চেয়ে, আঁখিপাতে টলোমলো একবিন্দু অশ্রু হয়ে উঠতে পারে মহাসাগরের চেয়ে বিশাল গভীর। রক্ত আর অশ্রুর ভূভাগের নাম বাঙলাদেশ। এর পলিমাটিতে মিশে গেছে অজস্র হৃৎপিণ্ডের রক্ত। তাই এতো লাল ফুল ফোটে এদেশে; আর তার কপোলে টলমল করে অশ্রু। শহীদ মিনারখচিত বাঙলায় কতো শহীদ মিনার আছে পথের ধারে, বিদ্যালয়প্রাঙ্গণে, বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে, ঘাসের আস্তরণের নিচে, কেউ তা জানে না। যখন আমি কোনো শহীদ মিনারের পাদদেশে দাঁড়াই, মনে হয় দাঁড়িয়ে আছি অশ্রুবিন্দুর পদতলে, টলমল করছে ওই অশ্রুবিন্দু যদিও তা গঠিত ধাতুতে। একেকটি শহীদ মিনার আমাদের প্রিয় অশ্রুবিন্দু, যাকে পরিয়ে দিয়েছি কাফন। আমাদের শোক হয়ে তা টলমল করছে সারাক্ষণ। অশ্রু টিকে থাকতে পারে না, কিন্তু বায়ান্নো থেকে বাঙালি তার অশ্রুকে অবিনশ্বর করতে শিখেছে : শিখেছে এক নতুন স্থাপত্যকলা, যাতে অশ্রু রূপান্তরিত হয় শহীদ মিনারে। শহীদ মিনারে চিরায়ু লাভ করে আমাদের অশ্রু; স্থির দাঁড়িয়ে থাকে পথপ্রান্তে, বিদ্যালয়েরপ্রাঙ্গণে, বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে। বাঙলাদেশের পথেপ্রান্তে আছে অজস্র ধাতুতে গঠিত অশ্রুবিন্দু, যা আমাদের করুণ চোখের জলের অবিনাশী রূপান্তর।

এমন শোকাকুল দেশ আর কোথায় পাওয়া যাবে? কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে এতো বড়ো রক্তের ফোঁটা আর আশ্রুবিন্দু? আমাদের ইতিহাস ঘাতক আর শহীদদের ইতিহাস; ইতিহাসের প্রতিটি যুগেই ঝ'রে পড়েছে বাঙালির বুকের রক্ত, বাঙলার মাটি শুষে নিয়েছে সন্তানের রক্ত। শুকিয়ে গেছে মায়ের বোনের চোখের কোণে অশ্রু, কিন্তু বায়ান্নোর রক্ত শুকোতে দেয় নি বাঙালি, মিশে যেতে দেয় নি অশ্রুকে। তারপরও রক্ত ও অশ্রুর অভাব ঘটে নি; লুপ্ত হয় নি ঘাতকেরা, অভাব ঘটে নি শহীদের। উঠেছে মিনারের পর মিনার। টলমল করছে অশ্রুবিন্দুর পর অশ্রুবিন্দু, শোকে ছেয়ে গেছে বাঙলাদেশ। আমি চোখ বুজলেই অজস্র শহীদ মিনার, টলোমলো অশ্রুবিন্দু, দেখতে পাই : অশ্রু দুলছে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের পাশে, টলমল করছে অশ্রুমিনার বরিশাল, খুলনা, চট্টগ্রাম, সিলেটে; গ্রামগঞ্জে, পথের প্রান্তে। ফুল ফুটছে, ফুলে ভরে উঠছে বেদি। মিছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলছে আলপনাআঁকা পথ দিয়ে অশ্রুবিন্দুর দিকে, শোক বেজে উঠেছে মানুষ আর প্রকৃতির আত্মার অভ্যন্তর থেকে। দাঁড়িয়ে আছে শহীদ মিনার; কাফনে মোড়া অক্ষয় অশ্রুবিন্দু।

শহীদ মিনার বাঙালির স্বতঃস্ফূর্ত স্থাপত্যকলা। শোকে যেমন দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে অজ্ঞাতে, উদগত হয় অশ্রুরেখা, ঠিক তেমনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে মথিত বুকের গীতিকার মতো উৎসারিত হয়েছে একেকটি শহীদ মিনার। কোনো পূর্বপরিকল্পনার প্রয়োজন পড়ে নি, অনেক ভেবে বের করতে হয় নি তাদের অবয়বকাঠামো। মাথা জীর্ণ ক'রে উদ্ভাবন করতে হয় নি তাদের রূপকার্থ। একটি ইঁট ছুঁড়ে দিলেই হয়েছে শহীদ মিনার। এক টুকরো জমির ওপর এক ধাপ মাটি জড়ো করলেই তা রূপ ধরেছে শহীদ মিনারের। একগুচ্ছ ফুল জড়ো করলেই রচিত হয়েছে একটি শহীদ মিনার। প্রত্যেকটিতে জড়ো হয়েছে শোক বেদনা দীর্ঘশ্বাস; প্রতিটিই বহন করেছে দ্যুতিময় রূপকার্থ। এমন অবলীলায় কোনো বস্তু বা উপাদানকে এতো অর্থদ্যুতিময় করতে পারে নি কোনো শিল্পী; কিন্তু শহীদ মিনার– বিদ্যালয়প্রাঙ্গণে, রাস্তার পাশে, ছাত্রাবাসের সম্মুখে, মাঠের প্রান্তে– যাঁরা গ'ড়ে তুলেছেন বাঙলাদেশ ভ'রে, তাঁরা অবলীলায় বস্তুকে পরিণত করেছেন অবিনাশী রূপকপ্রতীকে। যার মাটি নেই, সে আকাশে মনে মনে এক টুকরো মেঘকে জড়ো করে বানাতে পারে শহীদ মিনার। পথের পাশে কয়েকটি তৃণগুল্মলতা জড়িয়ে রচনা করা সম্ভব প্রদীপ্ত শহীদ মিনার। প্রতিটিই টলমল করতে থাকে অশ্রুবিন্দুর মতো, প্রতিটিই দীর্ঘশ্বাস হয়ে বেরিয়ে আসতে থাকে অতল অভ্যন্তর থেকে।

বায়ান্নোর তেইশে ফেব্রুয়ারির রাতেই ঘাতকদের চোখ এড়িয়ে টলমল ক'রে উদগত হয়েছিলো বাঙলাদেশের প্রথম শহীদ মিনার; এবং সেটি ছিলো অশ্রুবিন্দুর মতোই অচিরস্থায়ী আর সমুজ্জ্বল। ঘাতকেরা শুধু প্রাণ নিয়েই তৃপ্তি পায় না, তারা হরণ করতে ভালোবাসে শোক আর অশ্রু : তাই ওই প্রথম শহীদ মিনার ঘাতকদের আক্রমণে গ'লে গিয়েছিলো। দু-দিন বয়স্ক হ'তে না হ'তেই নুরুল আমিন ওই অশ্রুবিন্দু মুছে দিয়েছিলো রোমশ আঙুলে। সে-প্রথম কোমল অশ্রু আমি দেখি নি; অনেকে দেখে নি তার টলোমলো বেদনা। কিন্তু তার ছবির দিকে তাকালে মন ছলছল ক'রে ওঠে। খুব বেশি ভাবনার সময় ছিলো না তার রূপ সম্পর্কে, ঘাতকদের মধ্যে অবস্থান ক'রে তাকে বিশাল করা ছিলো অসম্ভব। প্রয়োজনও ছিলো না। কে কবে বুকের দুঃখকে ভাবনা চিন্তা ক'রে পরিণত করে অশ্রুতে? বেদনা নির্ভর করে না অশ্রুবিন্দুর বিশালতার ওপর। চরম দুঃখে গোপন বেদনার মতোই অশ্রুরূপে টলমল ক'রে উঠছিলো প্রথম শহীদ মিনার, এবং মুছে গিয়েছিলো পশুর রোমশ থাবায়। একটি বেদির ওপর কয়েক ফুট উঁচু চারকোণা আরেকটি বেদি, তার ওপর দুটি স্তর, তার ওপর দু-তিন ফুট উঁচু একটি মিনার, এই তো প্রথম শহীদ মিনার। উদ্ধত নয়, জমকালো নয়; কিন্তু তার ছবির দিকে তাকালেই সে-আবেগ জাগে, যা জাগে মায়ের চোখের অশ্রুরেখার দিকে তাকালে।

ওই যে অশ্রুবিন্দু প্রথম শহীদ মিনাররূপে দেখা দিয়ে ঝ'রে গেলো, তাই শেষ নয়। রোদনকে কেউ রুদ্ধ ক'রে রাখতে পারে না, বন্দুক দেখিয়ে রোধ করা যায় না শতধারায় উৎসারিত অশ্রু। পীড়নকারীরা পীড়িতের প্রতিরোধকে যতোটা ভয় পায়, তার চেয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক বেশি ভয় পায় রোদন ও অশ্রুকে। ওই রোদন, ওই অশ্রু সাময়িক প্রতিরোধের চেয়ে অনেক বেশি ভয়াবহ, তা জ্বেলে দেয় অক্ষয় অব্যয় অবিনাশী অশ্রুর আগুন। তাই বায়ান্নোর পর শহীদ মিনার মাথা তুলতে পারে নি, যেখানেই তুলতে চেয়েছে সেখানেই এগিয়ে এসেছে ঘাতকের রোমশ আঙুল। উনিশ শো তিপ্পান্নোতে ইডেন মহাবিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে টলমল ক'রে উঠতে চেয়েছিলো একফোঁটা অশ্রু; কয়েকটি ইঁটের গাঁথুনিতে প্রতীকের দ্যুতিভরা স্তম্ভ। কিন্তু উঠতে পারে নি। একটি ছবি আছে তার–কয়েকটি ইঁটের ওপর, ইঁট না কি ফুল, বসাচ্ছে এক তরুণী, এবং তার মতো হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আরো কয়েকটি তরুণী। দুজন স্যুট-টাই-পরা ভদ্রলোক, হয়তো তারা ঘাতকদের সুশ্রী প্রতিনিধি, কঠোরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ভয়ংকরভাবে ফেটে পড়েছে অধ্যক্ষা–ঘাতকদের রোমশ বাহু। ওই অশ্রু রোমশ আঙুলের ঘর্ষণে শুকিয়ে গিয়েছিলো। শুধু তাই নয়, বহিষ্কৃত হয়েছিলো কয়েকজন ছাত্র ও ছাত্রী, ঢাকা ও ইডেন কলেজ থেকে, অশ্রুকে বাস্তব প্রতীকী রূপ দেয়ার অপরাধে। বায়ান্নো থেকে তিপ্পান্নো– এ এক বছর হলো রোমশ হাতে অশ্রু মোছার কাল : যেখানেই মাথা তুলেছে শহীদ মিনার সেখানেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে পাকিস্তানি ঘাতকেরা।

কিন্তু উনিশ শো তিপ্পান্নো থেকে দুর্দমনীয় ভঙ্গিতে মাথা তুলতে থাকে শহীদ মিনার। মেডিক্যাল ছাত্রাবাসের সামনে দেখা দেয় প্রতীকী স্তম্ভ, ঢাকা হলে ওঠে একটি ছোটো মিনার, এবং সারা দেশে একই চোখের পাতায় জমা অশ্রুরেখার মতো টলমল ক'রে ওঠে শহীদ মিনারগণ। এসব মিনার ভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িত। একাত্তরের পর এদের সাথে যুক্ত হয় স্বাধীনতার শহীদদের মিনার, এবং এখন বাঙলাদেশের পরোতে পরোতে ছড়িয়ে আছে তারা। ঢাকা শহরে প্রতি এক মাইলে পাওয়া যাবে এমন একেকটি অশ্রুবিন্দু। মায়ের নিঃসঙ্গ অশ্রুর মতো তারা টলমল করে সারা বছর, এবং ফেব্রুয়ারি এলে তাদের ঘিরে গীত হয় শোকগাথা, ঝ'রে পড়ে ফুলদল। অনেক তাদের রূপ, বিস্তার তাদের বিভিন্ন রকম, উচ্চতা নানা মাপের, কিন্তু অর্থ অভিন্ন। দূর থেকে যে-কোনোটিকে দেখলেই ছলাৎ ক'রে ওঠে অন্তর। তাদের দিকে তাকালে কখনো মনে হয় না তাদের বানানো উচিত ছিলো আরো সুপরিকল্পিতভাবে, প্রয়োজন ছিলো শিল্পিতার; মনে হয় যা হয়েছে তাই পরম, অশ্রুবিন্দুর কোনো সুপরিকল্পিত শিল্পিত রূপ কেউ আশা করে না। আমি অজস্র ছোটো বড়ো মাঝারি অশ্রুবিন্দু দেখেছি, প্রতিটিই অভিন্নভাবে ব্যাকুল করেছে আমাকে। ওদের কাছে এলেই শিথিল হয়ে আসে গতি, কলকল ক'রে ওঠে বুক, মাথা নত হয়ে আসে, বুকের ভেতর ফুল ফুটতে আর ঝরতে থাকে। বাঙলাদেশে এতো পবিত্রতা, এতো মর্মস্পর্শিতা অর্জন করতে পারে নি আর কোনো বস্তুতেগড়া কাঠামো।

অজস্র শহীদ মিনার রয়েছে বাঙলাদেশে, মিলেমিশে গেছে একুশ আর একাত্তরের শহীদ মিনার। দুকালে ঘটে দুটি আপাতপৃথক ঘটনা, কিন্তু মর্মত অভিন্ন এরা। বায়ান্নো আর একাত্তর একই বছর, ঘটে একই ঘটনা। একুশই আমাদের অঘোষিত অস্বীকৃত স্বাধীনতা দিবস; একুশ না ঘটলে একাত্তর ঘটতো না। তাই দু-কালের শহীদ মিনারে নেই কোনো অবয়ব ও আর্থপার্থক্য, যদিও বাহ্যিক পার্থক্য রয়েছে মিনারের সাথে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিনারের। সলিমুল্লাহ্ হলের মিনারটি গোল থামের মতো উঠে গেছে ওপর দিকে, বেশি ওপরে ওঠে নি, কিন্তু যেনো ভেদ করেছে আকাশ। একটি বালক বিদ্যালয়ে অপ্রশস্ত ভিত্তির ওপর সূর্যের তিনটি রেখার মতো স্থির হয়ে আছে শহীদ মিনার। মতিঝিল কলোনিতে আছে বেদির ওপর দুটি অমসৃণ দেয়াল, কিন্তু তা শোক প্রকাশে অব্যর্থ। শান্তিনগরের মোড়ে ছ-স্তর বেদির ওপর দাঁড়িয়ে আছে তিনটি স্তম্ভ, জসীমউদদীন সড়কে শহীদ মিনার দাঁড়িয়ে আছে একটি তরুণের মূর্তিতে, জগন্নাথ হলে সূর্য বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শহীদ মিনার। এগুলোর অধিকাংশই একাত্তরের, কিন্তু এরা বায়ান্নোরই। বাঙলাদেশ ভ'রে টলমল করছে এ-অশ্রুবিন্দুমালা।

সব মিনারের মূল আর কেন্দ্র কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, যা বাঙলাদেশের প্রতীকী কেন্দ্রবিন্দু। আমি এ-বিশাল অশ্রুবিন্দুকে, রোদন আর দীর্ঘশ্বাসের অনশ্বর রূপকে, দেখে আসছি উনিশ শো তেষট্টি থেকে। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের পাশে যেখানে ঝ'রে পড়েছিলো একুশের শহীদদের রক্ত, সেখানে টলমল করছে শোকের কাফন পরা এ-অশ্রুবিন্দু। এখানে আসে চিরন্তন বাঙালি আর তার সন্তান, ফুল দেয়, হৃৎপিণ্ড দেয়। এখানে আসে শাসকেরাও; তাদের আসতে হয় শক্তিতে থাকার লোভে, না এলে টলমল ক'রে উঠবে সিংহাসন, তাই তারা আসে। শাসকসম্প্রদায় সব সময়ই অনান্তরিক, এক ক্ষেত্রেই শুধু আন্তরিক তারা– ক্ষমতায় অবস্থানের ক্ষেত্রে। তাদের বুকে কোনো ফুল ফোটে না ব'লে তারা সরকারি মালি দিয়ে বানিয়ে আনে কৃত্রিম ফুলের তোড়া। শহীদ মিনারে ওই একটি, আর ক্ষমতালুব্ধ আরো কয়েকটি তোড়া পড়ে, যেগুলোর হৃৎপিণ্ড নেই, অশ্রু নেই; আছে শুধু ক্ষুধা আর লিপ্সা। তারা আসে কখনো লোক সরিয়ে দিয়ে, কখনো তাড়া খেতে খেতে। কিন্তু তাদের আসতে হয়, ওই ক্ষমতাসীনদের অনেকেই মনে মনে ঘেন্না করে এ-অশ্রুবিন্দুকে, কিন্তু ফুল নিয়ে না এসে পারে না। যারা আসে না বিনাশ হয়ে ওঠে তাদের আশুনিয়তি। মন ভ'রে ফুল ফুটিয়ে আসে অন্যরা, শক্তি যাদের পদতলে নয়, শক্তি যাদের লক্ষ্য নয়; তারা কিছু বাস্তব ফুল রাখে বেদিমূলে, কিন্তু মনে মনে রাখে পৃথিবী ভ'রে দেয়ার মতো রক্তগোলাপ।

এ-অশ্রুবিন্দু এক দিনে এক বছরে ওঠে নি। পঞ্চান্নোর একুশে রচিত হয় এর ভিত্তি, তেষট্টিতে এটি পায় পরিচিত আকার। একাত্তরে এ-অশ্রুবিন্দু লক্ষ্য ক'রে গর্জে ওঠে পাকিস্তানি কামান; ডানাভাঙা পাখির মতো শহীদ মিনারকে প'ড়ে থাকতে দেখেছি আমি একাত্তরে। বাহাত্তর কাটে আহত অবস্থায়, আবার তিয়াত্তরে ফিরে পায় রূপ। কয়েকদিন আগে বেশ দূর থেকে আমি তাকিয়ে দেখছিলাম তার রূপ; মনে হলো পাখির ডানা থেকে খ'সে পড়া একটি নরম পালক। বিশাল প্রাঙ্গণে পাখির পালকের মতো প'ড়ে আছে শহীদ মিনার। আমি এ-মিনার দেখে আসছি তেষট্টি থেকে, এর পাশ দিয়ে আমাকে কয়েক বছর ক্লাশে যেতে আর ছাত্রাবাসে ফিরতে হয়েছে। তার নিচের পথটি ছিলো আমার নিত্য পথ। তাকে দেখেছি আমি তেষট্টিতে, একাত্তরে, তিরাশিতে, দেখেছি প্রায় প্রত্যেক দিন। ঢাকা শহরে এই একটি মাত্র কাঠামো আছে, যার পাশ দিয়ে গেলে কাঁপন লাগে মনে আর শরীরে; শিশির জমে মনের ঘাসে ঘাসে। আমি কতো দিন একে আমার মনের ভেতরে স্থাপন ক'রে পথ হেঁটেছি, তার করুণ কোমলতায় নিজকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করুণ করেছি। পৃথিবীর বহু কিছু সম্পর্কে আমার কড়া আপত্তি আছে, এমনকি আপত্তি আছে পৃথিবী সম্পর্কেও, কিন্তু ওই অশ্রুবিন্দু সম্পর্কে কোনো আপত্তি কখনো বোধ করি নি। একাত্তরের জুলাই মাসে পাশের রিকশায়, শহীদ মিনারের রাস্তায়, 'আমার সোনার বাঙলা' গান শুনে আমি প্রায় কেঁদে ফেলেছিলাম। যে যাচ্ছিলো ওই রিকশায়? শহীদ মিনারের কাছে এসে মন কেনো চেপে রাখতে পারে নি সে? সে কি এখন জীবিত? শহীদ মিনারের কাঠামোকে আমি নানা কোণ থেকে নানাভাবে দেখেছি; নানা তাৎপর্য বের করার চেষ্টা করেছি। তার লাবণ্য চোখে পড়েছে সব সময়ই, শান্ত মহিমা বিকিরিত দেখেছি সব সময়; কিন্তু ওই কাঠামো স্বস্তি দিতে পারে নি আমার স্বপ্নকে। তেষট্টিতে শহীদ মিনারের চারপাশে এতো বড়ো সব দালান ছিলো না, তাই তাকে বেশ বিশালই মনে হয়েছিলো। কিন্তু বছরের পর বছর চারদিকে উঠতে থাকে বড়ো বড়ো কাঠামো, আর আমার ওই অশ্রুবিন্দুকে ক্রমশ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর দেখাতে থাকে। ট্রাক এসে গোঁ গোঁ করে তার পদতলে, লাফিয়ে পড়ে ব্যস্ততাপরায়ণ বাস, কেঁপে ওঠে শহীদ মিনার। কয়েক বছর আগে দূর থেকে শহীদ মিনারকে একটি ছোটো দেশলাই বাক্সের মতো মনে হয় আমার। চারদিকে যখন উঠছে উদ্ধত সব গলাবাড়ানো কাঠামো, ঢেকে দিচ্ছে আকাশ ও ঢাকা শহরের বৃক্ষমালা, তখন ছোট্ট শিশির বিন্দুর মতো প'ড়ে আছে শহীদ মিনার। কয়েক বছর ধ'রেই একটু দূরে উঠছে একটি স্মৃতিস্তম্ভ, এমনভাবে বানানো হচ্ছে যেনো মহাকাল আর পারমাণবিক বোমা সেটিকে কাবু করতে না পারে। একটি তুলনা হৃদয়ের দাঁত ব্যথার মতো কামড় দেয় : তিনজন মানুষের, যারা জীবনে সুখ আর ক্ষমতা ভোগ করেছে বিপুল, বারবার বিশ্বাসঘাতকতা করেছে জনগণের সাথে, তাদের স্মৃতিস্তম্ভ এতো উদ্ধত বিশাল; আর বাঙলার সমস্ত মানুষের শোকের প্রতীক এতো করুণ কোমল ক্ষুদ্র?

কোন স্থপতিসংঘ পরিকল্পনা করেছিলো শহীদ মিনারের, আমার জানা নেই। যখন আমি শহীদ মিনারের কথা ভাবি, তার দিকে চেয়ে দেখি, মনে হয় তাঁদের কল্পনায় মহত্ত্ব, বিশালতা, অবিনাশত্ব সম্পর্কে ধারণা ছিলো সামান্য। তাঁরা বেদনাটুকু বুঝে ছিলেন, একটি প্রিয় রূপকও বের করেছিলেন, কিন্তু মহত্ত্ব বিশালতা দ্বারা আলোড়িত হন নি। তাই শহীদ মিনার হয়ে আছে বেদনার গীতিকা, এক ফোঁটা অশ্রু; তা মহাকাব্যিক মহত্ত্ব ও মহিমামণ্ডিত নয়। শহীদ মিনারের পাঁচটি স্তম্ভ মা ও তার চার সন্তানের প্রতীক ব'লে ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু ওই কাঠামো খুবই ক্ষীণ। এ-বছর শহীদ মিনারের প্রাঙ্গণ সম্প্রসারিত হয়েছে, ডানে বাঁয়ে সবুজ ঘাসের শোভা রচনা করা হয়েছে। রাস্তা দূরে স'রে গেছে, অনেক গাছ উপড়ে ফেলা হয়েছে। এ-সম্প্রসারিত প্রাঙ্গণ থাকা উচিত ছিলো শুরু থেকেই। হঠাৎ প্রাঙ্গণের বিস্তারের ফলে শহীদ মিনারের কাঠামো হয়ে পড়েছে প্রায় অদৃশ্য, হারিয়ে যাওয়া পালকের মতো, তাকে খুঁজতে হয়, এবং অনেক দূর দেখা যায় টলমল করছে শহীদ মিনার। বাঙালির বেদনাশ্রুবিন্দু কি এতো ছোটো, এতো ম্রিয়মাণ তার দুর্দম রক্তের দ্রোহ? তা হ'তেই পারে না। শহীদ মিনারকে আমি দেখতে চাই দীর্ঘশ্বাসের চেয়েও কোমল, অশ্রুবিন্দুর চেয়েও টলোমলো, আর বাঙালি জাতির বহু শতাব্দীর অগ্নিজ্বলা বিদ্রোহের মতো মহান। এ-কাঠামো শুধু হয়ে রইবে না গীতিময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অশ্রুবিন্দু, তা হয়ে থাকবে আমাদের মহাকাব্যিক বিজয়গাথা।

ফাল্গুন-ফেব্রুয়ারিতে বাঙলার সব কিছুই তো শহীদ মিনার : ওই মেঘ, বাতাসে কেঁপে ওঠা ঘাসের আস্তরণ, পাতার আড়ালে ব'সে থাকা দোয়েল, বোনের খোঁপা, ফোটা আর না-ফোটা ফুল, বর্ণমালার প্রতিটি বর্ণ, চোখের কোণে জ'মে ওঠা অশ্রু;– সবই শহীদ মিনার। বাঙলার ফাল্গুন খুবই দুঃখী মাস, যখন তার সাজার কথা বাসন্তি শাড়িতে তখন তার শরীরে শোকের কালো পাড়; যখন তার হৃৎপিণ্ড কেঁপে কেঁপে ওঠার কথা চঞ্চল মধুর আবেগে, তখন তার বুকভরা আর্তনাদ; যখন তার চোখে থাকার কথা উল্লাস, তখন সেখানে টলমল করে অশ্রু। কেমন করুণ সুরে কাঁদে মাঘনিশীথ আর ফাল্গুনদুপুরের কোকিল। ফুল, তুমি ফোটো; লাল, নীল, সবুজ হয়ে ঝ'রে পড়ো শহীদ মিনারের বেদিমূলে। সুর, তুমি বাজো বাঙলার সমস্ত শহীদ মিনারে। এ-দুঃখের মাস ঢাকা থাক দুঃখের কালো কাফনে, ভেতরে তার টলমল করুক চিরজীবী অশ্রুবিন্দু।

সংখ্যাহীন শহীদের মাংস মিশে গেছে বাঙলার মাটিতে, নাম মুছে গেছে অসংখ্য সম্ভাব্য শহীদের। মুছে যাবে আরো অসংখ্য সম্ভাব্য শহীদের নামপরিচয়, অন্ধকারের শক্তিরা যতোদিন থাকবে। তাদের ভাগ্যে জুটবে না একটি শাদা কাফন, যেমন জোটে নি অনেকের। শুধু টলমল ক'রে উঠবে মায়ের চোখ, বোনের কালো নয়ন, পিতার অক্ষিকোটর, ভাইয়ের বুক। যে-ভাইকে কাফন পরাতে পারি নি, যার লাশ সামনে নিয়ে পাঠ করতে পারি নি শেষ শ্লোক, তার জন্যে শুধু ভেতর থেকে অনন্ত ঝরনার উৎসারণের মতো উচ্ছ্বসিত হবে অশ্রু। সে-অশ্রুবিন্দুকে পরিয়ে দেবো শাদা কাফন কালো কাফন লাল কাফন শোকের কাফন দীর্ঘশ্বাসের কাফন। তার সামনে দাঁড়াবো ফুল নিয়ে, ভালোবাসা নিয়ে; দেখবো আমাদের অশ্রু রূপান্তরিত হয়ে গেছে কোমল করুণ শহীদ মিনারে; টলমল করছে বাঙলার প্রাঙ্গণে, সড়কের ধারে, বনের প্রান্তে, পৌরসভার কঠোর বক্ষস্থলে। টলমল করছে, করবে চিরকাল ওই কাফনে মোড়া অশ্রুবিন্দু– শোকভারাতুর শহীদ মিনার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাক্য

ভূমিকা॥ বাক্য কাকে বলে?– এ-প্রশ্ন করা হ'লে বহুদিন আগে ব্যাকরণ-ভুলে-যাওয়া ব্যক্তিও বেশ দৃঢ় উত্তর দেবেন : 'মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে এমন শব্দসমষ্টিই বাক্য।' তিনি বিদ্যালয়ে-মহাবিদ্যালয়ে ব্যাকরণ পড়েছেন; বাক্যের সংজ্ঞা, আরো নানা সংজ্ঞার সাথে, মুখস্থ করেছেন। তারপর ভুলে গেছেন ব্যাকরণের বহু আদেশ-উপদেশ; কিন্তু তিনি যে-সব ব্যাকরণিক পরিভাষা আমৃত্যু বহন ও ব্যবহার করবেন, তার মধ্যে বাক্য প্রধান। শিক্ষিত মানুষকে কিছু-না-কিছু লিখতেই হয়, ও পড়তে হয় অনেক কিছু; তাই 'বাক্য' শব্দ ও ধারণাটিকে ভোলা সম্ভব হয় না তাঁদের পক্ষে। তাঁদের অনেকে বিশ্বাস করেন যে বাক্য সম্পর্কে তাঁদের ধারণা বেশ পরিচ্ছন্ন : সহজেই বুঝতে পারেন কোন বাক্যটি শুদ্ধ, আর কোনটি অশুদ্ধ বা অসম্পূর্ণ। বাক্যের যে-সংজ্ঞাটি তাঁরা শিখেছেন প্রথাগত ব্যাকরণে, সেটিকে তাঁরা অনন্য ধ্রুব ব'লে জানেন; কিন্তু বাক্যসংগঠন সম্পর্কে গবেষণায় রত হওয়ার সাথেসাথে গবেষক মুখোমুখি হন একঝাঁক বাক্য সংজ্ঞার। বিভিন্ন ইংরেজি ব্যাকরণে পাওয়া যায় বাক্যের দু-শোরও বেশি সংজ্ঞা; বাঙলা ব্যাকরণেও একগুচ্ছ সংজ্ঞা পাওয়া যায়। প্রথাগত ইংরেজি, ও তার অনুকরণে রচিত বাঙলা, ব্যাকরণে যে- সংজ্ঞাটি ফিরেফিরে পাওয়া যায়, সেটি এমন : 'যে-শব্দগুচ্ছ মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে, তা-ই বাক্য।' দু-হাজার বছর ধ'রে জনপ্রিয় এ-সংজ্ঞাটিতে এমন কোনো মানদণ্ড নেই, যার সাহায্যে নির্ভুলভাবে বাক্যশনাক্তি সম্ভব। 'মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশের' যে-মানদণ্ড পাওয়া যায় এতে, তা প্রয়োগযোগ্য নয়; তাই বাস্তবে বাক্যনির্ণয়ের সময় এটির প্রয়োগ থেকে বিরত থাকি আমরা। যদি কেউ কোনো মুদ্রিত রচনার বাক্যসংখ্যা গুণতে চান, তবে তিনি এক পূর্ণচ্ছেদের পরের শব্দ থেকে আরেক পূর্ণচ্ছেদের আগের শব্দ পর্যন্ত শব্দগুচ্ছকে এক বাক্যরূপে ধ'রে হিশেব করবেন সমগ্র রচনার বাক্যসংখ্যা;– ওই শব্দগুচ্ছে মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পেয়েছে কি-না, সেদিকে তিনি খেয়ালই করবেন না। তাঁর কাছে বাক্যের সংজ্ঞা এমন : 'এক পূর্ণচ্ছেদের অব্যবহিত পরবর্তী শব্দ থেকে পরবর্তী পূর্ণচ্ছেদের অব্যবহিত পূর্ববর্তী শব্দ পর্যন্ত বিন্যস্ত শব্দের সমষ্টিই বাক্য।' এতে মনোভাব-সম্পূর্ণতার কোনো স্থান নেই, যদিও গণনাকারী ধ'রে নিতে পারেন যে লেখকমাত্রই দু-পূর্ণচ্ছেদের মধ্যে বিন্যস্ত শব্দে মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করেন।

ছাত্রদের বাক্যবোধ জাগানোর চেষ্টা বাঙলা ভাষা-অঞ্চলে খুব প্রবল নয়; কিন্তু পশ্চিমে এ-চেষ্টা অন্তহীন। সেখানে শিক্ষার্থীদের মনে বাক্যবোধ সৃষ্টির নিরন্তর চেষ্টা চালানো হয়, ও শুদ্ধ বাক্য রচনার কৌশল শেখানো হয় নিত্য অভিনব উপায়ে। তবুও ত্রুটি ঘটে, যা অনেকে লালন করে সারা জীবন। পাওয়া যায় এমন বাক্য, যা আসলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়েকটি বাক্যের সমাহার; আবার এমন বাক্যগুচ্ছও রচিত হয়, যা মাত্র একটি বাক্যে রূপ পেলেই ঠিক হতো। এমন ঘটে যেহেতু বাক্যবোধহীনতাবশত, তাই পশ্চিমের ছাত্রদের মনে বাক্যবোধ বা এমন আন্তর শক্তি সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়, যার সাহায্যে তারা বাক্য থেকে অবাক্য বা অপবাক্যকে পৃথক করতে পারে। বাক্যবোধ সৃষ্টি সম্পর্কে ওয়ালকট ও অন্যান্যের পরামর্শ এমন (উদ্ধৃত ফ্রিজ (১৯৫২, ১০)) : 'আমাদের বাক্যগুলো সম্পূর্ণ কি অসম্পূর্ণ, তা নির্ণয়ের সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে বাক্য 'অনুভব করা'। অসম্পূর্ণ বাক্য কোন ভাব প্রকাশ করেনা...সম্পূর্ণ বাক্য থেকে অবাক্য পৃথক করা কঠিন কাজ নয়। কোনো ভাবনা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত হয়েছে কি-না, তা আমরা 'অনুভব করি' সহজাতভাবেই।...ছাত্রদের রচনায় আরো একটি পুনরাবৃত্ত ত্রুটি হচ্ছে 'কমার সাহায্যে সংযোজন'...তারা অনেক সময় একাধিক বাক্যকে কমা দিয়ে একসাথে জুড়ে দেয়। যদি আপনি সম্পূর্ণ বাক্য-একক 'অনুভব করা'র শক্তি আয়ত্ত ক'রে থাকেন, তবে আপনার এমন ভুল হওয়ার কথা নয়।...এমন ত্রুটি নির্ণয়ের উৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে রচিত বাক্য উচ্চস্বরে পড়া, ও অনুভব করা যে রচিত বাক্যে ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পেয়েছে কি-না।' বাক্যবোধ একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু প্রথাগত আনুশাসনিক ব্যাকরণবিদেরা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারেন নি একটি বাক্যে ঠিক কি পরিমাণ ভাবনার প্রকাশ ঘটালে মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়।

এক শব্দের বাক্য যেমন দেখা যায়, তেমনি চোখে পড়ে প্রচুর পরিমাণ শব্দে গঠিত বাক্য। উনিশশতকী বাঙলা ভাষার লেখকদের বাক্য সাধারণত দীর্ঘ; তা অনেক সময় পংক্তি- পরম্পরায় ছড়িয়ে প'ড়ে গ'ড়ে তোলে পরিপূর্ণ অনুচ্ছেদ। বিশশতকের লেখকেরা ছোটো বাক্যের প্রতি আকৃষ্ট; তাই তাঁদের রচনায় পাওয়া যায় এমন বাক্য, যার অনেকাংশ গঠিত অল্পসংখ্যক শব্দে। অনেক লেখক তাঁদের পাত্রপাত্রীদের মানস-জটিলতা উন্মোচনের জন্যে জটিল সূত্রে গঠিত বাক্যের পাশাপাশি রচনা করেন এমন অনেক উপবাক্য, বাক্যটুকরো, যাতে কোনো সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ পায় না। দীর্ঘ বাক্যের একটি উদাহরণ দিয়েছেন ফ্রিজ (১৯৫২, ১১);– তিনি জানিয়েছেন যে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতির ১৯৪৩ সালের প্রতিবেদনে স্থান পেয়েছে একটি বাক্য, যা গঠিত ৪২৮৪টি শব্দে, এবং মুদ্রিত হয়েছে এগারো পৃষ্ঠাব্যাপী। এ-সমস্ত উদাহরণ একটি কথা জানায় যে একটি বাক্যে ঠিক কতোখানি ভাব প্রকাশ পাবে, এবং ঠিক কতোগুলো শব্দ বসবে, তা বাক্য রচনার আগে নির্ণয়ের উপায় নেই।

ভাষাবিজ্ঞানের তিনটি প্রধান ধারা– প্রথাগত ব্যাকরণ, সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান, ও রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ– বাক্য সম্পর্কে মোটামুটি তিন রকম ধারণা পোষে। এর মধ্যে প্রথাগত ব্যাকরণের বাক্যধারণা সম্পর্কে আমরা অনেকটা অবহিত। প্রথাগত ব্যাকরণ বাক্যের সংজ্ঞা রচনা করে আর্থ মানদণ্ডে এবং আধেয়-অনুসারে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করে বাক্য নামী ব্যাকরণিক এককটিকে। নানা ভাষায় এককটির নানা নাম, যেমন : বাক্য, লোগোস, প্রোপ্রোজিতিও, ফ্রেজ, থিস, সাটজ; তবে পুবপশ্চিমের সমস্ত প্রথাগত ব্যাকরণই প্রায় অভিন্ন কৌশলে নির্ণয় করতে চেয়েছে বাক্য। প্রথাগত ব্যাকরণ অভিলাষী বাক্যের এক সর্বজনীন ও সর্বভাষিক আর্থ বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করতে, যার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহায্যে যে-কোনো ভাষার বাক্য শনাক্ত করা সম্ভব। প্রথাগত ব্যাকরণবিদেরা ধ'রে নিয়েছিলেন যে ভাষা আন্তর ভাবনার প্রতিফলন বা বহিঃপ্রকাশ, এবং ব্যাকরণ যেহেতু ভাষার সূত্র উদঘাটনে উৎসাহী, তাই তা উদঘাটন করবে ভাবনার সমস্ত সূত্র। তাঁরা এমন ধারণাও পুষতেন যে মানব-মন চিন্তা করে বাক্যের সাহায্যে, আর সব মানুষের মনের গঠন যেহেতু একই রকম, তাই সব ভাষার বাক্যের মূল বৈশিষ্ট্য সদৃশ হ'তে বাধ্য। তাই প্রথাগত ব্যাকরণবিদেরা রচনা করেছিলেন বাক্যের সর্বজনীন আর্থ সংজ্ঞা, যা ব্যবহৃত হয়েছে দু-হাজার বছরেরও অধিক সময়; কিন্তু তা বাক্যশনাক্তির উপযুক্ত মানদণ্ড দিতে পারে নি। আদি প্রথাগত ব্যাকরণবিদেরা বাক্যের বিশ্বজনীন ও সর্বভাষিক সংজ্ঞা রচনায় উৎসাহী হ'লেও তাঁরা উপাত্ত-ভাষারূপে নিতেন সাধারণত গ্রিক, লাতিন, সংস্কৃত, বা ফরাশি, এবং বিশ্বাস করতেন যে তাঁদের উপাত্ত-ভাষাতেই চিন্তাভাবনা সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রকাশ পায়; সুতরাং অন্যান্য ভাষায়ও চিন্তাভাবনা অবিকল অমনভাবে প্রকাশ পাওয়া উচিত। যেমন : দিদরো মনে করতেন যে একমাত্র ফরাশি ভাষায়ই মনোভাব প্রকাশ পায় সবচেয়ে স্বাভাবিক ও সঙ্গত- ভাবে, তাই ফরাশিই বিজ্ঞানচর্চার উপযুক্ততম ভাষা। তবু প্রথাগত ব্যাকরণবিদেরা বাক্যসংগঠন সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন, যদিও সীমাবদ্ধতাও কম নয় তাঁদের। প্রথাগত বাক্যধারণার বিরুদ্ধে প্রথম আপত্তি তোলেন সাংগঠনিকেরা। সাংগঠনিকেরা সমস্ত ক্ষেত্রে আর্থ মানদণ্ডের বিরোধী, রৌপ মানদণ্ডের পক্ষপাতী এবং সর্বজনীনতায়ও অবিশ্বাসী তাঁরা। তাঁরা রৌপ মানদণ্ডে বাক্য শনাক্ত করায় উৎসাহী; এবং বিশ্বাস করেন যে প্রত্যেক ভাষার অনন্য নিজস্ব বাক্যসংগঠন রয়েছে। বাক্যসংগঠনের ওপর নতুন আলো ছড়িয়ে তাঁরা বাক্যসংগঠনের অনেক বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে সমর্থ হ'লেও তাঁদের বাক্যধারণা গভীর নয়। রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ভাষাবিজ্ঞানীরা উপস্থিত করেন বাক্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন ধারণা, এবং বাক্য বর্ণনায় অর্জন করেন অভূতপূর্ব সফলতা। এ-পরিচ্ছেদে আমার লক্ষ্য প্রথাগত, সাংগঠনিক, ও রূপান্তরবাদী বাক্যসংজ্ঞা ও ধারণার পরিচয় দেয়া, ও তাদের উপযুক্ততা বিচার করা।

গ্রিক-রোমান বাক্যসংজ্ঞা ও ধারণা॥ পাশ্চাত্য প্রথাগত ব্যাকরণে যে-বাক্যসংজ্ঞা ও ধারণা পাওয়া যায়, তার উৎস গ্রিক-রোমান বাক্যসংজ্ঞা ও ধারণা। পশ্চিমে প্রথম বাক্য সম্পর্কে ভেবেছিলেন গ্রিক দার্শনিক ও ব্যাকরণবিদেরা; এবং তাঁদের প্রতিভামণ্ডিত অনুকরণ করেছিলেন রোমানগণ। গ্রিক দার্শনিকেরাই প্রথম বাক্যের স্বরূপ উদঘাটনে মন দেন, ও পরে তাতে যোগ দেন ব্যাকরণবিদেরা। গ্রিক ভাষার তিনটি শব্দে ধরা পড়ে দু-রকম বাক্যধারণা। গ্রিক ধাতুজাত 'সিন্ট্যাক্স' ও 'সেন্টেন্স্' শব্দের অর্থ 'একত্রবিন্যাস'; –এ-শব্দ দুটি থেকে ধারণা করা যায় যে তাঁরা বিভিন্ন শব্দের সমবায় বা বিন্যাসকে বাক্য ব'লে মনে করতেন। এ-বাক্যধারণাটি প্রধানত রৌপ। আরো একটি শব্দ আছে গ্রিক ভাষায়, শব্দটি হচ্ছে 'লোগোস';–এর আছে বেশ কয়েকটি অর্থ; যেমন : 'পদ', 'বাক্য', 'প্রস্তাব' প্রভৃতি। এ-শব্দটি নির্দেশ করে বাক্যের আধেয় বা অর্থ।

গ্রিকদের মধ্যে প্রথম বাক্যশনাক্তির গৌরব দেয়া হয় প্রোতাগোরাসকে, তবে তাঁর বাক্যসংজ্ঞাটি সম্ভবত বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে। অনেকের মতে তিনি শনাক্ত করেছিলেন চার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রকম বাক্য;– 'প্রার্থনা', 'প্রশ্ন', 'বিবৃতি', ও 'অনুজ্ঞা'; আবার কারোকারো মতে তাঁর শনাক্ত বাক্য সাত শ্রেণীর;– 'পরোক্ষোক্তি', 'প্রশ্ন', 'উত্তর', 'অনুজ্ঞা', 'প্রতিবেদন', 'প্রার্থনা', ও 'আমন্ত্রণ'। তাঁর শনাক্ত বাক্যশ্রেণীগুলো দেখে মনে হয় তাঁর বাক্যসংজ্ঞা ছিলো আর্থ। প্লাতো *খেআতেতুস* গ্রন্থে সক্রেতিসের মুখে ভাষার একটি সংজ্ঞা দিয়েছিলেন। ওই ভাষাসংজ্ঞাটিকে গ্রহণ করা যায় বাক্যসংজ্ঞারূপে। সক্রেতিসের ভাষাসংজ্ঞাটি: 'ভাষা হচ্ছে 'ওনোমাতা' [নাম, বিশেষ্য, বিশেষ্যপদীয়, কর্তা] ও 'হ্রিমাতা'র [পদ, উক্তি, ক্রিয়া, ক্রিয়াপদীয়, বিধেয়, কর্ম] সাহায্যে চিন্তাভাবনার প্রকাশ, যা মুখনিঃসৃত বায়ুস্রোতে বক্তার চিন্তাভাবনাকে প্রতিফলিত করে।' এ-সংজ্ঞাটি নির্দেশ করে যে সক্রেতিস ভাষা ও বাক্যকে অভিন্ন মনে করতেন। তাঁর সংজ্ঞায় বাক্যের যে-দুটি উপাদানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, তাই পরবর্তীকালে 'উদ্দেশ্য' ও 'বিধেয়' নাম ধারণ করে। সক্রেতিসের মুখে প্লাতো যে-ভাষাসংজ্ঞা বসিয়েছেন, সেটিকেই গ্রহণ করতে পারি প্লাতোর বাক্যসংজ্ঞা ব'লে। এ-সংজ্ঞায় নির্ণীত হয়েছে বাক্যের মৌল উপাদান– 'ওনোমা' ও 'হ্রিমা' : 'বিশেষ্য' (উদ্দেশ্য) ও 'ক্রিয়া' (বিধেয়), যা রক্ষিত হয়েছে পরবর্তী প্রথাগত ব্যাকরণে। তিনি যে-মানদণ্ডে বাক্য ও বাক্যের মৌল উপাদান নির্ণয় করেছিলেন, তা আর্থ। আরিস্ততলও আর্থ, ও নৈয়ায়িক, মানদণ্ডভিত্তিক বাক্যসংজ্ঞা রচনা করেছিলেন। বাক্য সম্পর্কে আরিস্ততলের মত : 'বাক্য হচ্ছে তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি, যার বিভিন্ন অংশের অর্থ থাকতে পারে, তবে তা হ্যাঁ-বা না-সূচক কোনো বিবেচনা জ্ঞাপন করে না। উদাহরণস্বরূপ নেয়া যাক 'মরণশীল' শব্দটি। নিঃসন্দেহে এর অর্থ আছে, তবে এটি কোনো কিছুকে স্বীকার বা অস্বীকার করে না। স্বীকার বা অস্বীকার করার জন্যে এর সাথে অন্য কিছু যোগ করা দরকার।' তাঁর কাছে বাক্য পূর্ণ অর্থপ্রকাশক উক্তি। তিনি বাক্যের সংজ্ঞা রচনায় প্লাতোকেই অনুসরণ করেছেন।

দিওনিসিউস থ্রাক্স, পাশ্চাত্যের প্রথম ব্যাকরণরচয়িতা, তাঁর *গ্রাম্মাতিকি তেকনি*তে বাক্য সম্পর্কে আলোচনা করেন নি, তবে বাক্যের যে-সংজ্ঞাটি রচনা করেছিলেন তিনি, সেটিই তেইশ শো বছর ধ'রে গৃহীত হয়ে আসছে বাক্যের জনপ্রিয়তম ও প্রধান সংজ্ঞারূপে। থ্রাক্সের বাক্যসংজ্ঞা নিম্নরূপ : 'বাক্য হচ্ছে পূর্ণ অর্থবহ শব্দের সমষ্টি।' যে-শব্দগুচ্ছ পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে, তাকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন বাক্যরূপে। থ্রাক্স বাক্য বিশ্লেষণ করেন নি;– গ্রিক বাক্য বিশ্লেষণে প্রথম মনোযোগ দেন খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের ব্যাকরণবিদ আপোল্লোনিউস দিস্কোলুস। বাক্যসংগঠন সম্পর্কে দিস্কোলুসের মত : 'অক্ষরের সমাবেশে যেমন শব্দ গঠিত হয়, তেমনি প্রতিটি স্বাধীন বাক্য গঠিত হয় যথাযোগ্য ভাবের সমাবেশে।' দিস্কোলুসের সংজ্ঞা নির্দেশ করে যে শব্দের গ্রহণযোগ্য বিন্যাসেই বাক্য গ'ড়ে ওঠে না, বরং বাক্য গঠনের জন্যে দরকার গ্রহণযোগ্য ভাবের সমাবেশ। তাঁর সংজ্ঞাও আর্থ।

লাতিন ভাষার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী ব্যাকরণ রচনা করেন প্রিস্কিআন, ষষ্ঠ শতকে। আঠারো খণ্ডে সম্পূর্ণ তাঁর ব্যাপক ব্যাকরণগ্রন্থের শেষ দু-খণ্ডে তিনি বর্ণনা করেন লাতিন বাক্য। বাক্যের সংজ্ঞা রচনায় তিনি অনুসরণ করেন থ্রাক্সকে, যদিও তিনি অন্যান্য ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছিলেন দিস্কোলুসকে। প্রিস্কিআনের বাক্যসংজ্ঞা : 'বাক্য হচ্ছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শব্দের গ্রহণযোগ্য বিন্যাস, যা পূর্ণ অর্থ জ্ঞাপন করে।' এ-সংজ্ঞায় থ্রাক্সের প্রভাব স্পষ্ট। এ-ধারায়ই বাক্যের সংজ্ঞা রচনা করেছিলেন ত্রয়োদশ শতকের ব্যাকরণবিদ পিত্রুস ইস্পানুস। তাঁর সংজ্ঞা এমন : 'বাক্য হচ্ছে অর্থপূর্ণ উক্তি, যার বিভিন্ন অংশেরও অর্থ আছে।...সুষ্ঠু বাক্য শ্রোতার মনে একটি সম্পূর্ণ ভাব সঞ্চার করে, কিন্তু অশুদ্ধ বাক্য তেমন ভাব সঞ্চার করে না।' এটি প্রিস্কিআনের সংজ্ঞারই সম্প্রসারণ।

সংস্কৃত বাক্যসংজ্ঞা ও ধারণা ॥ পুরোনো ভারতে বাক্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ণয়ে বিপুল শ্রম করেছেন দার্শনিক ও ব্যাকরণবিদগণ। বাক্য সম্পর্কে অনন্ত তর্কবিতর্ক করেছেন তাঁরা : কখনো চ'লে গেছেন অতীন্দ্রিয়লোকে, পরম ব্রহ্মের বহিঃপ্রকাশরূপে দেখেছেন বাক্যকে; আবার কখনো বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞানীর মতো পর্যবেক্ষণ করেছেন বাক্যসংগঠন। বাক্যচিন্তায় দু-ভাগে বিভক্ত হ'য়ে গিয়েছিলেন তাঁরা;–এক গোত্রে ছিলেন 'বাক্যবাদী'গণ, যাঁদের বিশ্বাস বাক্যই একমাত্র সত্যবস্তু; অন্যগোত্রে ছিলেন 'পদবাদী'গণ, যাঁরা বিশ্বাস করতেন সবার ওপরে পদই সত্য, বাক্য নয়। বাক্যবাদীদের মতে বাক্য অখণ্ড-অবিভাজ্য একক, তা বিদ্যুচ্চমকের মতো জ্ব'লে উঠে ছড়ায় অর্থরশ্মি। পদবাদীদের মতে বাক্য খণ্ডনযোগ্য একক, যা গ'ড়ে ওঠে বিভিন্ন পদের সমবায়ে। তবে তাঁরা সবাই প্রধানত আর্থ মানদণ্ডে শনাক্ত করতে চেয়েছিলেন বাক্য। *বাক্যপদীয়* নামক গ্রন্থের রচয়িতা ভর্তৃহরি বাক্য সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণা ক'রে জানিয়েছেন যে সংস্কৃত দার্শনিক ও ব্যাকরণবিদগণ বাক্য সম্পর্কে কমপক্ষে আট রকম মত পোষণ করতেন। এ-মতসমূহকে দু-ভাগে ফেলা সম্ভব : একভাগে আছেন 'অখণ্ডবাদী' বা বাক্যবাদীগণ, অন্যভাগে আছেন 'খণ্ডবাদী' বা পদবাদীগণ। স্ফোটবাদী ব্যাকরণবিদগণ ছিলেন অখণ্ড-বা বাক্য-বাদী, আর মীমাংসক ও নৈয়ায়িকেরা ছিলেন খণ্ড-বা পদ-বাদী।

বাক্যের যে-সংস্কৃত সংজ্ঞাটি সবচেয়ে জনপ্রিয়, ও প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণে গৃহীত হয়েছে, সেটির রচয়িতা হিশেবে নাম পাওয়া যায় দুজনের : একজন বিখ্যাত নন্দনতাত্ত্বিক বিশ্বনাথ কবিরাজ, ও অন্যজন ব্যাকরণবিদ জগদীশ। বাক্যের সে-সংজ্ঞাটি : 'বাক্যংস্যাদযোগ্যতাকাঙ্ক্ষাসত্তিযুক্তঃ পদোচ্চয়' (বিশ্বনাথ), অর্থাৎ 'আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, ও আসত্তিযুক্ত পদসমুচ্চয়ই বাক্য।' সংজ্ঞাটির 'আকাঙ্ক্ষা', 'যোগ্যতা', ও 'আসত্তি' পারিভাষিক শব্দ, যার মধ্যে 'আকাঙ্ক্ষা' ও 'আসত্তি' বাঙলা ব্যাকরণে অনেক সময় ভুল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'আকাঙ্ক্ষা' বলতে বোঝানো হয় যে শুধু সহাবস্থানযোগ্য শব্দই বাক্যে ব্যবহৃত হ'তে পারে, সহাবস্থানঅযোগ্য শব্দ পারে না। আধুনিক পরিভাষায় একে 'সহাবস্থানবিধি' [কোঅকারেন্স রেস্ট্রিকশন] বলা হয়। 'যোগ্যতা' বোঝায় যে বাক্যে ব্যবহৃত শব্দসমূহকে অর্থগতভাবে সুসঙ্গত হ'তে হবে, বিসঙ্গত শব্দের বিন্যাসকে বাক্য ব'লে গ্রহণ করা হবে না। আধুনিক পরিভাষায় একে বলা হয় 'সঙ্গতিবিধি' [সিলেকশনাল রেস্ট্রিকশন]। 'আসত্তি' ('আসক্তি' নয়) বোঝায় যে বাক্যে যে-সমস্ত শব্দ ঘনিষ্ঠভাবে ব'সে এককের মতো কাজ করে, সেগুলো পাশাপাশি বা সন্নিকটে অবস্থান করবে, তাদের একটিকে অন্যটির থেকে বেশি দূরে সরিয়ে নেওয়া যাবে না। এ-সংজ্ঞায় যে-তিনটি মানদণ্ড পাওয়া যায়, তার মধ্যে 'আকাঙ্ক্ষা' ও 'আসত্তি' রৌপ, 'যোগ্যতা' আর্থ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাসের মতে প্রতিটি শব্দ মর্মমূলে বাক্যের শক্তি বহন করে, তাই শব্দমাত্রই বাক্য হ'তে পারে। মীমাংসকদের মতে ভাবের একত্বদ্যোতক শব্দসমষ্টিই বাক্য। তাঁরা বোঝাতে চান যে বাক্যে ব্যবহৃত শব্দসমূহের নিজস্ব অর্থ থাকলেও সেগুলো সবাই মিলে সৃষ্টি করে একক-বাক্যার্থ; তাই বাক্যের বিভিন্ন শব্দের নিজস্ব মূল্য নেই। বাক্যের অর্থ জ্ঞাপন করাতেই তাদের সার্থকতা। মীমাংসকেরা বাক্যে ক্রিয়াপদের প্রাধান্য বুঝতে পেরেছিলেন, এবং ক্রিয়াপদকেই বাক্যের প্রধান পদরূপে চিহ্নিত করেছিলেন। যেমন : কাত্যায়ন তাঁর *বার্তিক*-এ ক্রিয়াপদকেই বাক্যরূপে নির্দেশ করেছিলেন। ভর্তৃহরি বাক্য সম্পর্কে যে-আট রকম ধারণা খুঁজে পেয়েছিলেন, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি হচ্ছে যে ক্রিয়াপদ বা 'অখ্যাত শব্দ'ই বাক্যগঠনের জন্যে যথেষ্ট। মীমাংসকগণ, যাঁরা বিভক্ত ছিলেন দু-গোত্রে, বাক্য সম্পর্কেও পোষণ করতেন দু-মত। তাঁদের একগোত্রের নাম 'অভিহিতান্বয়বাদী', অন্যগোত্রের নাম 'অন্বিতাভিধানবাদী'। অভিহিতান্বয়বাদীদের মতে বাক্য হচ্ছে শব্দসমবায়, বা শব্দ-'সংঘাত', বা শব্দক্রম। অন্বিতাভিধানবাদীদের মতে বাক্য হচ্ছে ক্রিয়ারূপ বা আখ্যাত, বা 'আদিপদ'। সংস্কৃত বাক্যসংজ্ঞাসমূহে আর্থ মানদণ্ড বড়ো হ'য়ে দেখা দিয়েছিলো, যদিও রৌপ মানদণ্ডও অনুপস্থিত নয়।

প্রথাগত ইংরেজি বাক্যসংজ্ঞা ও ধারণা। প্রথাগত ইংরেজি ব্যাকরণবিদেরা বাক্যধারণা ও সংজ্ঞা পেয়েছিলেন গ্রিক-রোমান ব্যাকরণবিদদের কাছে থেকে। থ্রাক্স ও প্রিস্কিআনের বাক্যসংজ্ঞা তাঁরা কখনো অবিকল, কখনো কিছুটা বিকলরূপে ব্যবহার করেছেন তাঁদের ব্যাকরণপুস্তকে। ফলে রচিত হয়েছে বক্তব্যে প্রায়-অভিন্ন, কিন্তু ভাষায় কিছুটা ভিন্ন, কয়েক শো বাক্যসংজ্ঞা। তাঁরা প্রধান জোর দিয়েছেন থ্রাক্সকথিত 'সম্পূর্ণ অর্থ বা ভাব'-এর ওপর, এবং বাক্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁরা মেনে নিয়েছেন প্লাতোকে। প্লাতো প্রতিটি বাক্যকে যেমন 'বিশেষ্য' ও 'ক্রিয়া', বা 'উদ্দেশ্য' ও 'বিধেয়', খণ্ডে ভাগ করেছিলেন, ইংরেজি ব্যাকরণবিদেরাও তা-ই করেছেন। তাই ইংরেজি ব্যাকরণে প্রধানত দু-রকম বাক্যসংজ্ঞা পাওয়া যায়;–একটি আর্থ, অন্যটি উপাদানগত। আর্থ সংজ্ঞাগুলো সম্পূর্ণ মনোভাবের ওপর জোর দেয়, আর উপাদানগত সংজ্ঞাগুলো গুরুত্ব আরোপ করে বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় খণ্ডের ওপর। পাশ্চাত্য ভাষা-গবেষকেরা বাক্যসংজ্ঞা ও ধারণা সম্পর্কে গবেষণা করেছেন বারবার। জন রিজ (১৮৯৪) একশো চল্লিশটি বাক্যসংজ্ঞা পর্যালোচনা ক'রে কোনোটিকেই ঠিক মনে না ক'রে নিজেই রচনা করেছিলেন নতুন একটি সংজ্ঞা, যেটিকে অন্যরা গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি। ইউজিন সিইডেল (১৯৩৫) বিচার করেছেন আশিটির মতো গুরুত্বপূর্ণ বাক্যসংজ্ঞা, এবং ১৯৪১-এ কার্ল সুনডেন (১৯৪১) পরীক্ষা করেন সাম্প্রতিককালে রচিত বাক্যসংজ্ঞা- গুলো। তিনিও কোনো সংজ্ঞাকেই গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেন নি।

উল্লিখিত দু-ধরনের সংজ্ঞার একটি সংগ্রহ উপস্থিত করছি : (১)-এ গুচ্ছিত করা হলো আর্থ সংজ্ঞা, আর (২)-এ উপাদানগত সংজ্ঞা :

(১) ক 'বাক্য হচ্ছে সুগঠিত ও সুবিন্যস্ত শব্দের সমষ্টি, যা পূর্ণ ভাব রচনা করে।'১–(লৌথ (১৭৬২, ১১৮; উদ্ধৃত (গ্লিসন (১৯৬৫, ৯১))।

খ 'ভাষা গ'ড়ে ওঠে পৃথকপৃথক উক্তিতে, যার প্রতিটি স্বয়ংসম্পূর্ণ...এ উক্তিগুলোই বাক্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে-কোনো পূর্ণ অর্থই বাক্য।'২–(বেইন (১৮৭৯, ৮; উদ্ধৃত ফ্রিজ (১৯৫২, ১৩))।

গ 'বাক্য হচ্ছে শব্দসমষ্টি, যার সাহায্যে আমরা কোনো ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে কিছু বলি।'৩–(রো ও ওয়েব (১৮৯৭, ১))।

ঘ 'বাক্য হচ্ছে এমন শব্দগুচ্ছ যাতে কমপক্ষে একটি উদ্দেশ্য ও একটি বিধেয় বিদ্যমান থাকে, আর তাতে শব্দগুলো এমনভাবে বিন্যস্ত হয় যাতে একটি সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ পায়।'৪–(ম্যাকমোরডি (১৯১১, ১৪৯))।

ঙ 'সম্পূর্ণ ভাবজ্ঞাপক শব্দগুচ্ছই বাক্য।'৫–(নেসফিল্ড (১৮৯৫, ৫))।

চ 'বাক্য হচ্ছে পূর্ণভাবজ্ঞাপক শব্দগুচ্ছ। বাক্যে অবশ্যই একটি উদ্দেশ্য ও একটি বিধেয় থাকতে হবে।'৬–(হাউজ ও হারম্যান (১৯৩১, ১৪৫))।

ছ 'বাক্য হচ্ছে এমন শব্দগুচ্ছ যাতে থাকে একটি ক্রিয়া ও একটি কর্তা, এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় শব্দ, যাতে ভাবটি ব্যাকরণগতভাবে পূর্ণতা পায়।'৭–(জোন্স্ (১৯৩৫, ২))।

জ 'বাক্য হচ্ছে স্বয়ংসম্পূর্ণ শব্দগুচ্ছের সাহায্যে পূর্ণ ভাবের প্রকাশ।'৮–(ট্যানার (১৯২৮, ১৪))।

ঝ 'বাক্য হচ্ছে এক বা একাধিক শব্দের সাহায্যে ভাব বা অনুভূতির প্রকাশ,–বাক্যে শব্দগুলো এমন রূপে ও ভাবে বিন্যস্ত হয়, যাতে ঈপ্সিত অর্থ দ্যোতিত হয়।'৯–(কারমে (১৯৪৭, ৯৭))।

ঞ 'বাক্য হচ্ছে শব্দসমবায়, যা এক বা একাধিক বোধের সমবায়ে গঠিত অন্তত একটি পূর্ণভাব জ্ঞাপন করে।'১০–(ফকনার (১৯৫০, ১))।

ট 'বাক্য হচ্ছে রচনা-একক, যার ওপর স্থাপিত হয় ভাব।'১১–(ওয়ারফেল ও অন্যান্য (১৯৪৯, ৮০))।

ঠ 'বাক্য হচ্ছে এমন উক্তি, যার সাহায্যে বক্তা, বিরাম গ্রহণের আগে, ঈপ্সিত বক্তব্য প্রকাশ করেন।'১২–(গার্ডিনার (১৯৩২, ২০৮; উদ্ধৃত ফ্রিজ (১৯৫২, ১৪))।

(২) ক 'প্রত্যেক বাক্যের গোপন কথা নিহিত এখানে : আমরা সবসময় প্রথমে উল্লেখ করি কোনো বস্তু বা স্থান বা ব্যক্তি বা জিনিশের নাম, এবং তারপর আমরা ওই বস্তু বা স্থান বা ব্যক্তি বা জিনিশ সম্পর্কে কিছু বলি। এ-কাজ দুটি যদি না করি, তবে সম্পূর্ণ বাক্য গঠিত হয় না। যে-বস্তু, স্থান বা ব্যক্তি অথবা জিনিশ সম্পর্কে কিছু বলা হচ্ছে, তাই সব সময় হবে উদ্দেশ্য। ওই বস্তু, স্থান, ব্যক্তি অথবা জিনিশ সম্পর্কে যা ব্যক্ত হচ্ছে, তাই সব সময় হবে বিধেয়।'১৩–(ওয়ালকট ও অন্যান্য (১৯৪০, ১, ৬১-৬২; উদ্ধৃত ফ্রিজ (১৯৫২, ১৪))।

খ 'পূর্ণভাব প্রকাশের জন্যে দুটি জিনিশ দরকার : (১) একটি কর্তা, যা কোনো ব্যক্তি অথবা বস্তু অথবা ভাবের নাম করে, এবং যার সম্পর্কে কোনো উক্তি করা হয়, এবং (২) একটি বিধেয়, যা কর্তা বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনো উক্তি করে।'১৪–(বারকার (১৯৩৯, ৪; উদ্ধৃত ফ্রিজ (১৯৫২, ১৫))।

গ 'সংগঠন বা রূপ অনুসারে সংজ্ঞা রচনা করতে গেলে বলতে হয় যে বাক্য হচ্ছে ভাষার এক মৌল একক, শাব্দ যোগযোগ, যাতে কেন্দ্রবস্তুরূপে আছে একটি স্বাধীন ক্রিয়া, ও তার কর্তা।'১৫–(কিয়েরজেক ও গিবসন (১৯৬০, ৩৯))।

প্রথাগত ইংরেজি ব্যাকরণবিদেরা বাক্যের সংজ্ঞা রচনার সময় বাক্যের রূপের দিকে কিছুট মনোযোগ দিলেও তাঁদের মন বিশেষভাবে আকৃষ্ট অর্থের প্রতি। অর্থকেই তাঁরা যেনো বাক্য ব'লে মনে করেন, বাক্যের রূপটি দরকার হয় ওই অর্থ প্রকাশের জন্যে। প্রথাগত ব্যাকরণবিদদের কেউকেউ বাক্যের অর্থ পরিহার ক'রে বাক্যের রৌপ সংজ্ঞা রচনা করেছিলেন। তাঁদের একজন হচ্ছেন ফরাশি ভাষাবিজ্ঞানী মিইয়ে (১৯০৩)। তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাক্যসংজ্ঞা নিম্নরূপ : 'বাক্যের নিম্নরূপ সংজ্ঞা দেওয়া যায় : ব্যাকরণিক প্রক্রিয়ায় পরস্পরঅন্বিত শব্দগুচ্ছ, যা স্বয়ংসম্পূর্ণ, এবং ব্যাকরণগতভাবে অন্য কোনো শব্দগুচ্ছের ওপর নির্ভরশীল নয়।'১৬ মিইয়ের এ-সংজ্ঞাটিকে গণ্য করা যায় বাক্যের সাংগঠনিক সংজ্ঞার অন্যতম আদিউদাহরণ ব'লে। তাঁর সংজ্ঞা ভিত্তি ক'রে প্রথাগত ব্যাকরণবিদ ইয়েসপারসেন রচনা করেছিলেন বাক্যের নিম্নরূপ সংজ্ঞা : 'বাক্য হচ্ছে (আপেক্ষিকভাবে) সম্পূর্ণ ও স্বাধীন মনুষ্যোক্তি– এ-সম্পূর্ণতা ও স্বাধীনতা প্রকাশ পায় এর একাকী অবস্থানে বা এর একাকী অবস্থানের শক্তিতে, অর্থাৎ একে নিরপেক্ষভাবে উচ্চারণ করা যায়।'১৭ ইয়েসপরসেন বাক্যের অর্থকে যদিও বেশি গুরুত্ব দিতেন, তবু এখানে তিনি রচনা করেছেন সাংগঠনিক সংজ্ঞা। কিন্তু সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা তাঁর সংজ্ঞাকেও গ্রহণ করেন নি, করেছেন ব্লুমফিল্ডরচিত সংজ্ঞা, যার ওপর মিইয়ের প্রভাব বিদ্যমান।

প্রথাগত বাঙলা বাক্যসংজ্ঞা ও ধারণা৷৷ বাক্যসংজ্ঞা ও ধারণা প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণবিদেরা পেয়েছেন দুটি উৎস থেকে : সংস্কৃত ব্যাকরণ, ও প্রথাগত ইংরেজি ব্যাকরণ থেকে। বিশ্বনাথ কবিরাজ ও জগদীশের নামে প্রচলিত সংজ্ঞাটি–'আকাঙ্খা, যোগ্যতা, ও আসত্তিযুক্ত পদসমূহই বাক্য'– কিছু ভুলত্রুটিসহ সম্ভবত গত একশো বছর ধ'রে প্রায় অবিকলরূপে বাঙলা ব্যাকরণে ব্যবহৃত হচ্ছে, কিন্তু ইংরেজি- অনুসারী বাক্যসংজ্ঞার ঘটেছে নানা রকম বদল। কেননা বাঙলা ব্যাকরণরচয়িতাগণ নিজনিজ সময়ের প্রভাবশালী ইংরেজি ব্যাকরণরচয়িতাদের অনুকরণ করেন, এবং মূলের পরিবর্তনের সাথে অনুকৃত বস্তুরও ঘটে বদল। বাঙলা ব্যাকরণবিদসমাজ একটি মৌলিকত্ববর্জিত সমাজ;– তাঁদের ধারণা ভাষা ও বাঙলা ভাষা সম্বন্ধে সব কিছু আগেই বলা হয়ে গেছে, তাই তাঁদের কর্তব্য শুধু পুনরাবৃত্তি। বাক্যের সংজ্ঞারচনায়ও তাঁরা পুনরাবৃত্তিপ্রতিভার চমৎকার পরিচয় দিয়েছেন। নিচে তাঁদের একগুচ্ছ সংজ্ঞা সংগৃহীত হলো :

(৩) ক 'পদসকল পরস্পর অন্বিত হইয়া অভিপ্রেত অর্থকে যখন কহে, তখন সেই সমুদায়কে বাক্য কহি।'–(রামমোহন (১৮৩৩, ৩৬৮))।

খ 'আকাঙ্খা, যোগ্যতা ও আসত্তিযুক্ত পদসমূহকে বাক্য বলে।'–(প্রসন্নচন্দ্র (১৮৮৪, ২১৯))।

গ 'ক্রিয়াদিযুক্ত পদসমুদায়কে বাক্য কহে। এক পদের সহিত অন্য পদের "যোগ্যতা", "আকাঙ্খা" ও "আসত্তি" না থাকিলে বাক্য হয় না।'-(লালমোহন (সংবৎ ১৯১৯, ২০))।

ঘ 'দুই বা অধিক পদ একত্র থাকিয়া পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করিলে ঐ পদসমষ্টিকে বাক্য বলে। বাক্যে অন্ততঃ কর্তা ও ক্রিয়া–এই দুই পদ থাকা আবশ্যক, নতুবা অর্থ সম্পূর্ণ হয় না।'–(নকুলেশ্বর (?১৩০৫, ১))।

ঙ 'যে পদসমূহদ্বারা কোন একটি মনোভাব সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করা যায়, তাহাকে বাক্য বলে; অথবা যোগ্যতা, আকাঙ্খা, ও আসত্তিযুক্ত পদসমূহের নাম বাক্য।'–(হরনাথ (?১৯৩০, ২৫৯))।

চ 'পরস্পর অর্থসঙ্গতিযুক্ত পদসমূহকে বাক্য বলে।'–(প্রসন্নচন্দ্র (১৯৩৭, ১১৩))।

ছ 'যে পদসমূহের দ্বারা মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হয় তাহার নাম বাক্য।'–(জগদীশচন্দ্র (১৩৪০, ৩৩৮))।

জ 'যে পদ-বা শব্দ-সমষ্টির দ্বারা কোনোও বিষয়ে সম্পূর্ণ-রূপে বক্তার ভাব প্রকটিত হয়, সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পদ-বা শব্দ-সমষ্টিকে বাক্য বলে।'–(সুনীতিকুমার (১৯৩৯, ৪২৭))।

ঝ 'কোনও ভাষায় যে উক্তির সার্থকতা আছে, এবং গঠনের দিক হইতে যাহা স্বয়ংসম্পূর্ণ, সেইরূপ একক উক্তিকে ব্যাকরণে বাক্য বলা হয়।'–(সুনীতিকুমার (১৯৭২, ২৮৪))।

ঞ 'সুবিন্যস্ত পদসমষ্টির দ্বারা যদি বক্তার পুরাপুরি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায় তবে ঐ পদসমষ্টিকে 'বাক্য' নামে অভিহিত করা যাইতে পারে।'–(মু এনামুল (১৯৫২, ২১৭))।

ট 'একটি সম্পূর্ণ মনোভাব যে সমস্ত পদ দ্বারা প্রকাশ করা যায় তাহাদের সমষ্টিকে বাক্য বলে।' (মু শহীদুল্লাহ (১৩৫৬, ২৪০))।

ঠ 'কতকগুলি পদ যখন যথাযোগ্য ক্রম অনুসারে অন্বিত হইয়া একটি ভাবের আংশিক বা পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ দান করে তখন সেই পদগুলির সমষ্টিকে বাক্য বলে।'–(কালিদাস (?, ৩৮১))।

ওপরের সংজ্ঞাগুলোর অধিকাংশ গ্রিক-লাতিন অনুসারী প্রথাগত ইংরেজি বাক্যসংজ্ঞার অনুবাদ, বা অনুকরণে রচিত; এবং কোনোকোনোটি রৌপ মানদণ্ডভিত্তিক আধুনিক সংজ্ঞার অনুবাদ। যেমন : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়(৩জ) সংজ্ঞাটি রচনা করেছিলেন প্রথাগত ইংরেজি ব্যাকরণের অনুকরণে; আর (৩ঝ) সংজ্ঞাটি গঠন করেছেন ইয়েসপারসেনর সংজ্ঞার আদলে। আকাঙ্ক্ষা-আসত্তি-যোগ্যতার মানদণ্ডনির্ভরতাও অনেকের মধ্যে দেখা যায়। সংস্কৃত এ-বাক্য সংজ্ঞাটির ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছেন অনেক ব্যাকরণরচয়িতা। তাঁদের ত্রুটি ঘটেছে প্রধানত 'আকাঙ্ক্ষা' ও 'আসত্তি' ধারণা দুটি ব্যাখ্যায়। তাঁরা 'আকাঙ্ক্ষা'র পারিভাষিক অর্থের বদলে গ্রহণ করেছেন এর শব্দার্থ, তাই ঘটেছে ত্রুটি। সুনীতিকুমার (১৯৩৯, ৪২৮) 'আকাঙ্ক্ষা' ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে : 'কোনও বাক্য বা উক্তির পূর্ণ উদ্দেশ্য গ্রহণের জন্য শ্রোতার আগ্রহ বা আকাঙ্ক্ষা থাকে; এই আকাঙ্ক্ষা যতক্ষণ পর্যন্ত না মিটে, বা যতক্ষণ পর্যন্ত অর্থ পূর্ণ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বাক্যে অন্য নতুন পদ আসিবার আবশ্যকতা থাকে।' এখানে 'আকাঙ্ক্ষা'র আভিধানিক অর্থ ধ'রে বাক্যসংজ্ঞাটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণবিদেরা 'আকাঙ্ক্ষা' বলতে বুঝিয়েছেন বাক্যে পদের সহাবস্থানের বিধিনিষেধকে, আরো বলা বা জানার বাসনাকে নয়। 'আসত্তি' শব্দটি অজ্ঞতাবশত 'আসক্তি' রূপ পেয়েছে অনেকের হাতে। 'আসত্তি'র অর্থ 'নৈকট্য'; কিন্তু প্রথাগত অনেক ব্যাকরণপ্রণেতা এ-শব্দটিতেও আরো জানা বা বলার এক রকম কামনা লুকিয়ে আছে ভেবে এটিকে পরিণত করেছেন 'আসক্তি' শব্দে।

সাংগঠনিক বাক্যসংজ্ঞা ও ধারণা॥ প্রথাগত ব্যাকরণের বিরুদ্ধে প্রথম আপত্তি তোলেন সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা; এবং তাঁরা নানাভাবে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে প্রথাগত ব্যাকরণ অবৈজ্ঞানিক। প্রথাগত ব্যাকরণ ও সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান পরস্পরবিরোধী, একটির দৃষ্টিতে যা মূল্যবান অন্যটির চোখে তা তুচ্ছ। প্রথাগত ব্যাকরণ বিশ্বাসী সর্বজনীন তত্ত্বে ও অর্থে, সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান বিশ্বাসী প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব সংগঠনে ও রূপে। বাক্যক্ষেত্রে এ-বিরোধ চরমরূপে দেখা দেয় : সাংগঠনিকেরা দেখাতে থাকেন যে প্রথাগত ব্যাকরণের আর্থ মানদণ্ডে কোনো ভাষারই বাক্য নির্ণয় সম্ভব নয়। তাঁরা দাবি করেন বাক্য নির্ণয়ের জন্য রৌপ মানদণ্ড, যা ভাষায় ভাষায় ভিন্ন। প্রথাগত ব্যাকরণবিদদের মধ্যে মিইয়ে ও ইয়েসপারসেন সাংগঠনিকদের উদ্ভবের আগেই রচনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিলেন বাক্যের সাংগঠনিক সংজ্ঞা, যা সাংগঠনিকদের প্রভাবিত করেছে। 'বাক্য' ধারণার সাথে একটি নতুন ধারণা যুক্ত করেন সাংগঠনিকেরা, সেটি হচ্ছে 'উক্তি'।

ব্লুমফিল্ড, মিইয়ের অনুসরণে, বাক্যের যে-সংজ্ঞা রচনা করেছিলেন, সেটিই গৃহীত হয়েছে আদর্শ সাংগঠনিক বাক্যসংজ্ঞারূপে। সংজ্ঞাটি নিম্নরূপ : 'যে-কোনো উক্তি-অন্তর্গত বৃহত্তম রূপই বাক্য। সুতরাং, বাক্য হচ্ছে উক্তি-অন্তর্গত এমন রূপ, যা বৃহত্তর কোনো সংগঠনের অংশ নয়।'১৮– এ-সংজ্ঞার তাৎপর্য বোঝা যাবে ব্লুমফিল্ড (১৯৩৩, ১৭০) থেকে উদ্ধৃত নিচের ব্যাখ্যার সাহায্যে :

> যে-কোনো উক্তিতে কোনো ভাষিক রূপ উপস্থিত হয় অন্য কোনো বৃহত্তর রূপের উপাদান রূপে;–যেমন 'জন' উপস্থিত 'জন পালিয়ে গেছে' উক্তিতে; অথবা তা উপস্থিত হয় স্বাধীন রূপে, কোনো বৃহত্তর (জটিল) ভাষিক রূপের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে;–যেমন 'জন' উপস্থিত বিস্ময়সূচক উক্তি 'জন'!-এ। যখন কোনো ভাষিক রূপ কোনো বৃহত্তর রূপের অংশরূপে উপস্থিত হয়, তখন সেটি অবস্থিত 'অন্তর্ভুক্ত-অবস্থানে', অন্যথায় সেটি অবস্থিত থাকে 'স্বাধীন-অবস্থানে' এবং বাক্য গঠন করে।
>
> কোনো রূপ এক উক্তিতে উপস্থিত হ'তে পারে বাক্যরূপে, আবার অন্য কোনো উক্তিতে থাকতে পারে অন্তর্ভুক্ত-অবস্থানে। ওপরের বিস্ময়সূচক উক্তিতে 'জন' একটি বাক্য, কিন্তু বিস্ময়সূচক উক্তি 'দুর্ভাগা জন!'-এ 'জন' অবস্থিত অন্তর্ভুক্ত- অবস্থানে। দ্বিতীয় বিস্ময়সূচক উক্তিতে 'দুর্ভাগা জন' একটি বাক্য, কিন্তু 'দুর্ভাগা জন পালিয়ে গেছে' উক্তিতে তা অন্তর্ভুক্ত-অবস্থানে অবস্থিত। পুনরায় ওপরের উদাহরণে 'দুর্ভাগা জন পালিয়ে গেছে' একটি বাক্য, কিন্তু 'যখন কুকুরটি ঘেউঘেউ ক'রে উঠেছিলো, তখন দুর্ভাগা জন পালিয়ে গেছে' উক্তিতে তা অন্তর্ভুক্ত-অবস্থানে অবস্থিত।
>
> উক্তি গঠিত হ'তে পারে একাধিক বাক্যেও। এমন ঘটে যখন কোনো উক্তিতে সন্নিবিষ্ট হয় কয়েকটি ভাষিক রূপ, যাদের কোনো তাৎপর্যপূর্ণ প্রথাগত ব্যাকরণিক বিন্যাসের মাধ্যমে (অর্থাৎ কোনো সাংগঠনযোগে) বৃহত্তর কোনো রূপে আবদ্ধ করা না হয়। যেমন : 'কেমন আছো? আজ দিনটা চমৎকার। আজ বিকেলে কি তুমি টেনিস খেলবে?' এ-রূপ তিনটির মধ্যে বাস্তব যে-সম্পর্কই বিদ্যমান থাক-না-কেনো, কোনো ব্যাকরণিক প্রক্রিয়ায় এদের কোনো বৃহত্তর রূপে আবদ্ধ করা হয়নি। তাই এ-উক্তিটি তিনটি বাক্যের সমষ্টি।
>
> কোনো উক্তিতে অংশী বাক্যসমূহকে এ-কারণে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা হয় যে প্রতিটি বাক্যই একটি ক'রে স্বাধীন ভাষিক রূপ, যা কোনো ব্যাকরণিক প্রক্রিয়ায় বৃহত্তর কোনো ভাষিক রূপের অন্তর্ভুক্ত নয়। অধিকাংশ, সম্ভবত সব, ভাষায়ই নানা রকম ট্যাকসিমযোগে বাক্য পৃথক করা হয়, এবং বিভিন্ন শ্রেণীর বাক্য শনাক্ত করা হয়।

ব্লুমফিল্ডের সংজ্ঞানুসারে বাক্য হচ্ছে স্বয়ংসম্পূর্ণ সংগঠন, যা অন্য কোনো সংগঠনের অংশ নয়। সাংগঠনিকেরা সবাই মেনে নিয়েছেন তাঁর সংজ্ঞা, যদিও অনেকে একই বক্তব্য পেশ করেছেন বিভিন্ন ভাষায়। যেমন : লায়ন্স এ-সংজ্ঞাকেই পেশ করেছেন এভাবে: 'বাক্য হচ্ছে ব্যাকরণিক বর্ণনার বৃহত্তম একক।' অর্থাৎ যে-সমস্ত একক ভিত্তি ক'রে ভাষা বর্ণনা করা হয়, তার মধ্যে বৃহত্তমটি হচ্ছে বাক্য। হকেটও (১৯৫৮, ১৯৯) ব্লুমফিল্ডের সংজ্ঞাকেই ভিন্নরূপে প্রকাশ করেছেন : 'বাক্য হচ্ছে এমন ব্যাকরণিক রূপ, যা অন্য কোনো সংগঠনভুক্ত নয় : তা উপাদান নয়, উপাদানে গঠিত।' এ-সব সংজ্ঞা একটি কথা স্পষ্টভাবে জ্ঞাপন করে যে বাক্য ব্যাকরণিক বর্ণনার একটি একক, যা ব্যাকরণিক প্রণালিপদ্ধতি প্রয়োগেই শনাক্ত করা সম্ভব। বাক্যকে স্থূল অর্থে বাস্তব বস্তু ভাবা ঠিক নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাংগঠনিকেরা বাক্যপ্রসঙ্গে 'উক্তি' শব্দটি বারবার ব্যবহার করেন। 'উক্তি' কাকে বলে? কতোখানি কথাকে আমরা ধরতে পারি 'উক্তি' রূপে? উক্তিরও নানা সংজ্ঞা পাওয়া যায়। ব্লুমফিল্ডের (১৯২৬, ২৬) মতে 'যে-কোনো ভাষিক ক্রিয়াই উক্তি।' কিন্তু এর সাহায্যে উক্তি নির্ণয় কঠিন, কেননা এতে স্পষ্ট ক'রে বলা হয় নি একটি উক্তিতে কি পরিমাণ 'ভাষিক ক্রিয়া' স্থান পাবে। হ্যারিসের (১৯৫১, ১৪) মতে 'উক্তি হচ্ছে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির বাকাংশ, যার আগে-পরে নীরবতা বিরাজ করে।' ফ্রিজ (১৯৫২) বাক্যবর্ণনার সময় উক্তিতে 'ভাষিক ক্রিয়া'র পরিমাণ স্থির ক'রে নিতে চেয়েছিলেন। তিনি কাজ করেছিলেন রেকর্ড করা দূরালাপের ভাষা নিয়ে, এবং হ্যারিসের অনুসরণে তৈরি করেছিলেন 'উক্তি'র সংজ্ঞা। টেলিফোনে একজনের কথা শেষ হ'লে অন্যজন কথা শুরু করে। একজন যতোক্ষণ কথা বলে, ফ্রিজ সেটুকু কথাকে গ্রহণ করেছেন উক্তি হিশেবে, এবং তার নাম দিয়েছেন 'উক্তি-একক'। ফ্রিজ নানা রকম উক্তি বর্ণনা করেছেন; তার মধ্যে একরকম উক্তির নাম তিনি দিয়েছেন 'ন্যূনতম স্বাধীন উক্তি'। তাঁর কাছে 'ন্যূনতম স্বাধীন উক্তি'ই বাক্য। ফ্রিজ (১৯৫২) কাজ করেছেন একরাশ টেলিফোন-আলাপকে উপাত্ত হিশেবে গ্রহণ ক'রে, অর্থাৎ তাঁর কাছে ভাষা সীমিত সংখ্যক বাক্যের সমষ্টি।

রূপান্তরবাদী বাক্যসংজ্ঞা ও ধারণা॥ রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ভাষাবিজ্ঞানীরা পোষণ করেন ভাষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন ধারণা, এবং এ-ধারণা প্রকাশ পায় বাক্য কেন্দ্র ক'রে। প্রথাগত ব্যাকরণবিদেরা ভাষা বিশ্লেষণের সময় বিশেষ ও অশেষ গুরুত্ব দেন রূপতত্ত্বের ওপর; তাঁদের ব্যাকরণ প্রধানত শব্দশাস্ত্র। সাংগঠনিকেরা প্রধানত ধ্বনিতাত্ত্বিক, ও কিছুটা রূপতাত্ত্বিক। বাক্যতত্ত্ব তাঁদের ব্যর্থতার এলাকা। যেখানে ব্যর্থ হন সাংগঠনিকেরা, সেখান থেকে যাত্রা শুরু করেন রূপান্তরবাদীরা। তাঁদের ব্যাকরণ বাক্যকেন্দ্রিক : তাঁদের মতে প্রতিটি ভাষা অসংখ্য বাক্যের সমষ্টি;– তাই ব্যাকরণের কাজ হচ্ছে ভাষার সংখ্যাহীন বাক্য সৃষ্টি করা। রূপান্তরবাদী ব্যাকরণে বাক্য বর্ণনা বা বিশ্লেষণ করা হয় না, সৃষ্টি করা হয়; এবং সৃষ্টি করার সময় দেয়া হয় প্রতিটি বাক্যের তাৎপর্যপূর্ণ সাংগঠনিক বর্ণনা। বাক্য সম্পর্কে রূপান্তরবাদী ধারণাও অভিনব। প্রথাগত ও সাংগঠনিকদের মতে বাক্য এক রকম মূর্ত বস্তু; কিন্তু রূপান্তরবাদীরা বাক্যকে গ্রহণ করেন বিমূর্ত ব্যাকরণিক ধারণা হিশেবে। রূপান্তর ব্যাকরণে দুটি মূল্যবান ধারণার নাম 'ভাষাবোধ', ও 'ভাষাপ্রয়োগ'। ভাষাবোধসংশ্লিষ্ট ব্যাকরণিক একক হচ্ছে 'বাক্য', আর ভাষাপ্রয়োগসংশ্লিষ্ট ধারণা হচ্ছে 'উক্তি'।

প্রথাগত ব্যাকরণে বাক্যের সংজ্ঞা পাওয়া যায় বহু; সাংগঠনিকেরাও বাক্য বর্ণনার আগে বাক্যসংজ্ঞা দেন; কিন্তু রূপান্তর ব্যাকরণে বাক্যের সংজ্ঞা পাওয়া বেশ দুর্লভ ঘটনা। চোমস্কির রচনাবলিতে বাক্যসৃষ্টির কথা বারবার ব্যক্ত হয়; কিন্তু বাক্য বলতে তিনি কী বোঝেন, তা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন না। তিনি যেনো অনেকটা ধ'রে নেন যে ভাষাভাষী মাত্রই বাক্যবোধসম্পন্ন। তাই তাঁর প্রস্তাবিত ব্যাকরণের কাজ হচ্ছে ভাষাভাষীর বাক্যবোধ স্পষ্টভাবে উদঘাটন করা। নিচের উদ্ধৃতিটি লক্ষণীয় :

এখন থেকে আমি ধ'রে নেবো যে-কোনো ভাষা হচ্ছে একরাশ(সীমিত-সংখ্যক বা অসংখ্য) বাক্যের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> সমষ্টি, যার প্রতিটি সসীম দৈর্ঘ্যসম্পন্ন ও সীমিত সংখ্যক বস্তুতে গঠিত। সমস্ত স্বাভাবিক ভাষা, তাদের কথ্য অথবা লিখিত রূপে, এ-অর্থে ভাষা; কেননা প্রতিটি স্বাভাবিক ভাষায়ই আছে সীমিতসংখ্যক ধ্বনিমূল (অথবা বর্ণ) এবং প্রতিটি বাক্যকেই উপস্থাপিত করা যায় এ-সব ধ্বনিমূলের (অথবা বর্ণের) এক সীমিত পরম্পরারূপে, যদিও ভাষায় বাক্য অসংখ্য। অনুরূপভাবে, গণিতের কোনো সুশৃঙ্খল সিস্টেমে 'বাক্য'রাশিকেই গণ্য করা সম্ভব ভাষারূপে। কোনো ভাষা 'ভ'-র ভাষিক বিশ্লেষণের মৌল লক্ষ্য হচ্ছে ব্যাকরণসম্মত পরম্পরাসমূহকে অর্থাৎ 'ভ'-র বাক্যসমূহকে ব্যাকরণঅসম্মত পরম্পরাসমূহ অর্থাৎ যেগুলো 'ভ'-র বাক্য নয়, তা থেকে পৃথক করা, এবং ব্যাকরণসম্মত পরম্পরাসমূহের সংগঠন বিশ্লেষণ করা। তাই 'ভ'-র ব্যাকরণ হবে এমন একটি যন্ত্র বা কল, যা 'ভ'-র সমস্ত ব্যাকরণসম্মত পরম্পরা সৃষ্টি করবে, এবং কোনো ব্যাকরণঅসম্মত পরম্পরা সৃষ্টি করবে না।

এ-উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায় যে চোমস্কি বিশেষ 'ভাষাবস্তু'র পরম্পরাকে বিবেচনা করেন বাক্যরূপে। ওই পরম্পরা ধ্বনিমূলের, বর্ণের, বা অন্য কিছুর হ'তে পারে। কিন্তু ধ্বনিমূল বা বর্ণের পরম্পরারূপে বাক্য বর্ণনা এক ভয়ানক ব্যাপার; কেননা এতে ব্যাকরণ জড়িয়ে পড়বে অনন্ত জটিলতায়। তাই চোমস্কির কাছে বাক্য ধ্বনিমূলের নয়, রূপমূলের পরম্পরা। এ সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত (দ্র চোমস্কি (১৯৫৭, ১৮)) :

> আমরা প্রতিটি বাক্যকে মনে করতে পারি সীমিত দৈর্ঘ্যের ধ্বনিমূলপরম্পরা ব'লে। প্রতিটি ভাষা এক বিশাল-ব্যাপক ব্যাপার; এবং এটা অতি স্পষ্ট যে ব্যাকরণসম্মত ধ্বনিমূলপরম্পরার সহায়তায় ভাষা বর্ণনা করতে গেলে ব্যাকরণ এতো জটিল হ'য়ে উঠবে যে তার কোনো মূল্যই থাকবে না। এ-(ও অন্যান্য) কারণে ভাষিক বর্ণনা এগোয় 'উপস্থাপনা স্তর'ক্রমে। সরাসরি বাক্যের ধ্বনিমূলসংগঠন বর্ণনার বদলে ভাষাবিজ্ঞানী প্রতিষ্ঠা করেন 'রূপমূল' প্রভৃতি বস্তুর মতো 'উচ্চতর স্তর'; এবং স্বতন্ত্রভাবে বাক্যের রূপমূলসংগঠন ও রূপমূলের ধ্বনিমূলসংগঠন বর্ণনা করেন। এ-স্তর দুটির সম্মিলিত বর্ণনা সরাসরিভাবে বাক্যের ধ্বনিমূলসংগঠন বর্ণনার চেয়ে অনেক সরল কাজ। এখন আমরা পরীক্ষা করবো বাক্যের রূপমূলসংগঠন বর্ণনার বিভিন্ন পদ্ধতি।

www.amarboi.com

এ থেকে বোঝা যায় যে চোমস্কির নিকট বাক্য হচ্ছে রূপমূলপরম্পরা। তাই তিনি তাঁর প্রস্তাবিত ব্যাকরণের সাহায্যে সৃষ্টি করতে চান ব্যাকরণসম্মত রূপমূলপরম্পরারাশি, অর্থাৎ বাক্যরাশি। তিনি স্বায়ত্তশাসিত বাক্যতাত্ত্বিক, তাই অর্থ পরিহার ক'রে রূপমূলের শুদ্ধ পরম্পরা সৃষ্টি তাঁর লক্ষ্য। *আস্পেক্টস্*-কাঠামোর ব্যাকরণ পেশের সময়ও তিনি বাক্য সম্পর্কে অভিন্ন ধারণা পোষণ করেছেন। তাঁর একটি উক্তি : 'এটির বিষয় সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের বাক্যিক কক্ষ, অর্থাৎ সে-সূত্রসমূহ, যা ক্ষুদ্রতম বাক্যিক একক– (গঠক)-সমূহের সুগঠিত বিন্যাস নির্দেশ করে।' *সিন্ট্যাক্টিক স্ট্রাকচারস*-এ যে-ভাষাবস্তুদের নাম ছিলো 'রূপমূল', *আস্পেক্টস্*-এ তাদের নতুন নাম হয়েছে 'ক্ষুদ্রতম বাক্যিক একক' বা 'গঠক'; কিন্তু বাক্য সম্পর্কে চোমস্কির ধারণা বদলায় নি। তবে চোমস্কির এ-উক্তি বা ধারণাকে প্রথাগত অর্থে গ্রহণ করলে বিভ্রান্তি জন্ম নেবে।

রূপান্তর ব্যাকরণের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হচ্ছে 'ভাষাবোধ' ও 'ভাষাপ্রয়োগ', যার আলোতে নির্ণয় করতে হবে বাক্য। ভাষাবোধ বলতে বোঝানো হয় ভাষা সম্পর্কে ভাষাভাষীর সহজাত অসচেতন জ্ঞান বা বোধকে, আর বাস্তব পরিস্থিতিতে ভাষা ব্যবহারকে নির্দেশ করা হয় ভাষাপ্রয়োগ ব'লে। রূপান্তর ব্যাকরণে বাক্য হচ্ছে ভাষাবোধতত্ত্বের অন্তর্গত ধারণা, আর উক্তি হচ্ছে ভাষাপ্রয়োগতত্ত্বের অন্তর্গত ধারণা। বাক্য বিমূর্ত একক,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উক্তি মূর্ত একক। অনেক সময় বাক্য ও উক্তির মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক বিদ্যমান থাকতে পারে, আবার অনেক সময় আমরা এমন উক্তি উচ্চারণ করতে পারি, যার বাস্তবতা স্বীকার ক'রেও বলতে হবে যে ব্যাকরণিক কোনো বাক্যের সাথে ওই উক্তির কোনো সম্পর্ক সেই। উক্তিমাত্রই বাক্য নয়, বাক্য এক রকম ব্যাকরণিক বিমূর্ত একক। এ সম্পর্কে পোস্টালের ব্যাখ্যা স্মরণীয় :

> বাক্য এমন এক বোধ বা ধারণা, যা বিমূর্ত বস্তুজগতের অন্তর্ভুক্ত; তা তুলনীয় সঙ্গীতের *কনসার্টের* সাথে। *উক্তি* ধারণাটি আচরণ-জাগতিক বা প্রয়োগক্ষেত্রিক। যদিও শুনতে কেমনকেমন লাগতে পারে, তবুও বলা যায় যে উক্তিরাশি হচ্ছে *বাক্যউপস্থাপন*। বাক্যের বিমূর্ত সংগঠনই ভাষাপ্রয়োগের প্রধান নিয়ন্ত্রক। তবে আরো অনেক কিছু ভাষাপ্রয়োগকে নিয়ন্ত্রণ করে।...সুতরাং বাক্য ও ব্যাকরণ বিমূর্ত বস্তু। নানা বিমূর্ত বস্তুর সাথে পরিচিত আমরা দৈনন্দিন জীবনে, যেমন : সংখ্যা, বিধিবিধান, সিম্ফনি, গাড়িচালানোর নিয়মকানুন, রসিকতা। এ-সব বস্তুর একটি নঞার্থক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এরা কোনো বিশেষ স্থানে-কালে বস্তুগতভাবে বিরাজ করে না।...তবে এ-বিমূর্ত বস্তুদের মূর্ত বস্তুরূপে অথবা বিশেষ স্থানে- কালে উপস্থাপিত করা সম্ভব।...ভাষা বিমূর্ত বস্তু, তবে তা বিশেষ অর্থে এক অ-সাধারণ বিমূর্ত বস্তু। ভাষা অসীম, আর আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পরিচিতি অধিকাংশ বিমূর্ত বস্তু, গণিত ব্যতীত, সসীম।...বাক্য এমন এক ধারণা, যা নির্দেশ করে সে-সব বিশেষ বস্তুর প্রতি, যা প্রতিটি ভাষায় আছে অসংখ্য পরিমাণে। ব্যাকরণ ধারণাটি নির্দেশ করে সে-সসীম সিস্টেমের প্রতি, যা সংখ্যাহীন বাক্য শনাক্ত ও সৃষ্টি করে। ভাষা যেহেতু অসীম বিমূর্ত বস্তু, তাই তাকে দেখতে পারি দুটি ভিন্ন কিন্তু সমতুল্য দৃষ্টিতে। উদাহরণরূপে বলতে পারি যে ইংরেজি ভাষা অসংখ্য ইংরেজি বাক্যের সমষ্টি, অথবা অন্য ভাবে বলা যায় যে ইংরেজি ভাষা হচ্ছে সে-সসীম সিস্টেম, যা সৃষ্টি করে অসংখ্য বাক্য।

অর্থাৎ রূপান্তর ব্যাকরণে বাক্য এক বিমূর্ত তাত্ত্বিক ধারণা। ওই বাক্য আমরা পর্যবেক্ষণ করি বাস্তব ভাষাপ্রয়োগের সময়; এবং লক্ষ্য করি যে প্রতিটি বাক্য ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্যের সমাহার : ধ্বনিক, আর্থ, ও বাক্যিক বৈশিষ্ট্যের এক জটিল সমবায়ে গ'ড়ে ওঠে প্রতিটি বাক্য।

মূল্যায়ন॥ ভাষাবিজ্ঞানের তিনটি ধারা-প্রথাগত, সাংগঠনিক ও রূপান্তরবাদী-ভাষা ও বাক্য সম্পর্কে পোষণ করে বিভিন্ন, ও অনেকাংশে বিরোধী, ধারণা। প্রথাগত ব্যাকরণ আর্থ ও সর্বজনীনতামুখি। এ-ব্যাকরণের তত্ত্ব হচ্ছে যে বিশ্বের সব মানুষ সদৃশ : তারা অভিন্ন বিষয়ে ভাবে, চিন্তা করে, ও কথা বলে; তাই সব ভাষার বাক্যসংগঠন অভিন্ন। প্রথাগত ব্যাকরণবিদেরা অবশ্য লক্ষ্য করেছেন, ভাষায় ভাষায় সাংগঠনিক বৈসাদৃশ্য ব্যাপক, যা বিনষ্ট ক'রে দিতে পারে সর্বজনীনতাতত্ত্বকে। তাই তাঁরা আশ্রয় নেন অর্থের, কেননা বিভিন্ন ভাষায় মানুষেরা মোটামুটিভাবে সদৃশ ও সর্বজনীন ভাবই প্রকাশ ক'রে থাকে। বাক্যের সংজ্ঞা রচনার সময় আর্থ মানদণ্ডকে বড়ো ক'রে তোলেন তাঁরা এমন বিশ্বাসে যে ওই মানদণ্ড সমস্ত ভাষায় প্রয়োগ করা সম্ভব, এবং অভিন্ন উপায়ে শনাক্ত করা সম্ভব সমস্ত মানবভাষার বাক্য। সাংগঠনিকেরা বিরোধী আর্থ মানদণ্ড ও সর্বজনীনতার, অর্থাৎ প্রথাগত ব্যাকরণের। তাঁরা উৎসাহী ভাষার রূপসংগঠনে, পর্যবেক্ষণসম্ভব ভাষাবস্তুতে। বিভিন্ন ভাষার বাহ্য সাংগঠনিক বৈসাদৃশ্য সাংগঠনিকদের চোখে দেখা দিয়েছিলো বড়ো আকারে। তাঁরা সিদ্ধান্তে পৌচেছিলেন যে মানব ভাষাগুলোতে মিলের চেয়ে অমিল অধিক, এবং প্রতিটি ভাষারই রয়েছে একান্ত নিজস্ব ও অনন্য সংগঠন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিটি ভাষার অনন্য সংগঠন বর্ণনাকে তাঁরা নিজেদের লক্ষ্য ব'লে স্থির করেছিলেন। তাই বাক্যের সংজ্ঞা রচনার সময় তাঁরা আর্থ মানদণ্ড পরিহার ক'রে প্রয়োগ করেছেন রৌপ মানদণ্ড। তবে বাক্য ধারণায় প্রথাগত ও সাংগঠনিকদের মধ্যে এ-বিরোধ সত্ত্বেও মিল রয়েছে এক মূল জায়গায় : উভয় গোত্রের কাছে বাক্য একরকম বাস্তব বস্তু। কিন্তু বিরোধটাই বড়ো;– প্রথাগত ব্যাকরণবিদেরা অনেক বেশি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, ও সৃষ্টিশীল; অন্যদিকে সাংগঠনিকেরা ভাষার বাহ্যস্তরেই সীমাবদ্ধ ও অ-সৃষ্টিশীল। প্রথাগত ব্যাকরণবিদেরা স্পষ্টভাবে না বললেও বোঝা যায় তাঁরা প্রতিটি ভাষার বাক্যের অসংখ্যতায় বিশ্বাসী, আর সাংগঠনিকদের ধারণা হচ্ছে যে প্রতিটি ভাষা সীমিত সংখ্যক, যদিও বিপুল, বাক্যের সমষ্টি। প্রথাগত ও সাংগঠনিক ব্যাকরণ বাক্যকেন্দ্রিক নয়। প্রথাগত ব্যাকরণ প্রধানত শুদ্ধ শব্দগঠনের নিয়মকানুন শেখায়, আর সাংগঠনিক ব্যাকরণ গুরুত্ব আরোপ করে ভাষার ধ্বনি-ও রূপ-সংগঠন বর্ণনার ওপর। রূপান্তর ব্যাকরণ পেশ করে ভাষা ও বাক্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন মত। রূপান্তরবাদীদের মতে প্রতিটি ভাষা অজস্র ও অনন্ত বাক্যের সমষ্টি; ব্যাকরণের কাজ ওই অজস্র অনন্ত বাক্যরাশি সৃষ্টি করা। তাদের কাছে বাক্য একটি বিমূর্ত তাত্ত্বিক ধারণা, যা সর্বজনীন। বাক্য সৃষ্টি বা বর্ণনার জন্যে যে-তাত্ত্বিক কাঠামো ও প্রণালিপদ্ধতি তাঁরা উদ্ভাবন করেন, তা শুধু অভিনব নয়, সর্বাংশে বিজ্ঞানসম্মতও।

বাক্যের তিনটি প্রথাগত সংজ্ঞা– দুটি গ্রিক-লাতিন ও একটি সংস্কৃত– প্রথাগত ব্যাকরণবিদদের প্রভাবিত করেছে সবচেয়ে বেশি। বাক্যের সবচেয়ে প্রভাবশালী ও প্রিয় সংজ্ঞাটি– 'পূর্ণ মনোভাবজ্ঞাপক শব্দসমষ্টিই বাক্য'–রৌপ ও আর্থ মানদণ্ড একসাথে ব্যবহার করেছে বাক্য নির্ণয়ের জন্যে। সংজ্ঞাটিতে আছে দুটি শর্ত;– (এক) বাক্য শব্দসমষ্টি, এবং (খ) ওই শব্দগুচ্ছ পূর্ণ মনোভাব জ্ঞাপন বা প্রকাশ করে। যে-ভাষাসংগঠন মেটায় এ-শর্ত দুটি, তাকে গণ্য করা যায় বাক্যরূপে। শর্ত দুটির প্রথমটি রৌপ, দ্বিতীয়টি আর্থ। প্রথম শর্তটি নির্দেশ করে যে বিশেষ এক রকম ভাষা-এককে– শব্দে– গঠিত হয় বাক্য; কিন্তু যে-কোনো শব্দসমষ্টিই বাক্য নয়। বাক্য হয়ে ওঠার জন্যে একত্র-বিন্যস্ত শব্দগুচ্ছকে মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে হয়। সমস্যা জটিল হয়ে ওঠে এখানেই, কেননা 'পূর্ণ মনোভাব বা অর্থ' নির্ণয় করা শক্ত কাজ। কোনো কিছু সম্পর্কে কতোখানি ভাব প্রকাশ করা হ'লে বলা সম্ভব যে মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে, বা পূর্ণ মনোভাব, প্রকাশ পেয়েছে? যদি বলি যে 'মেয়েটি সুন্দর', তবে কি মনের ভাব উজাড় ক'রে দেয়া হলো সম্পূর্ণরূপে? নাকি মনোভাব পূর্ণতার জন্যে আরো বলা দরকার যে তার চোখ দুটি বিখ্যাত, ওষ্ঠ শহরবিশ্রুত, মাংস তরঙ্গসঙ্কুল? এটা নির্ণয়ের কোনো বস্তুগত উপায় নেই ব'লে বাক্যের এ-সংজ্ঞাটির সাহায্যে বাক্যশনাক্তি সম্ভব নয়। গ্রিক-উৎসজাত বাক্যের দ্বিতীয় সংজ্ঞাটি বাক্যের আধেয় ও উপাদানগত সংগঠন নির্দেশ করে;– বলা হয় যে পূর্ণ অর্থ প্রকাশের জন্যে বাক্যের দরকার দুটি বস্তু। এর প্রথমটির নাম উদ্দেশ্য, দ্বিতীয়টির নাম বিধেয়। বাক্যে উদ্দেশ্যরূপে উপস্থিত থাকে কোনো ব্যক্তি অথবা বস্তু অথবা ভাব, আর বিধেয়ের কাজ হলো উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনো বিবৃতি পেশ করা। এ-সংজ্ঞাটিতেও এমন কোনো মানদণ্ড নেই, যার সাহায্যে অবাক্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে পৃথক করা যায় বাক্য। এ-সংজ্ঞা অনেক সময় অবাক্যকে গ্রহণ করাবে বাক্যরূপে, আর বাক্যকে শনাক্ত করবে অবাক্যহিশেবে। 'মেয়েটি সুন্দর' উদাহরণে উদ্দেশ্যরূপে আছে একটি বিশেষ্যপদ বা ব্যক্তি, আর বিধেয়রূপে আছে একটি বিশেষণ, যা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মন্তব্য করছে। এ-উদাহরণটিকে প্রথাগত ব্যাকরণে বাক্যরূপে গ্রহণ করা হবে। কিন্তু একই উক্তিকে যদি সামান্য বদলে দিই, বলি 'সুন্দর মেয়েটি', তবে একে প্রথাগত ব্যাকরণে বাক্য হিশেবে গ্রহণ করা হবে না, যদিও সংজ্ঞানুসারে একে বাক্যরূপে গ্রহণ করা উচিত। এতেও আছে একটি বিশেষ্য, উদ্দেশ্যরূপে; এবং আছে একটি বিধেয়-বিশেষণ, যা উদ্দেশ্যের ডানে না ব'সে বাঁয়ে বসেছে। দ্বিতীয় উদাহরণটির অর্থ এবং প্রথমটির অর্থ প্রায় এক, তাই দ্বিতীয়টিকেও বাক্যরূপে গ্রহণ করা উচিত; কিন্তু এক অজানা কারণে প্রথাগত ব্যাকরণে দ্বিতীয়টিকে বাক্যরূপে স্বীকার করা হবে না। বাক্যে উদ্দেশ্য-বিধেয়ের উপস্থিতিকে যদি মানা হয় অপরিহার্য ব'লে, তবে বিশ্বের অধিকাংশ ভাষার অনুজ্ঞাসূচক বাক্যরাশিকে অবাক্যরূপে চিহ্নিত করতে হবে। 'যাও', 'এখানে আসো' জাতীয় বাক্যে কোনো উদ্দেশ্য নেই, আছে শুধু বিধেয়। তাই এগুলোকে গ্রহণ করা উচিত অবাক্যরূপে, কিন্তু প্রথাগত ব্যাকরণে এগুলোকে বিলুপ্ত উদ্দেশ্যসম্বলিত বাক্যরূপে গ্রহণ করা হয়। তাই দেখা যাচ্ছে পাশ্চাত্যের সবচেয়ে প্রভাবশালী বাক্যসংজ্ঞা দুটি ব্যর্থ। অবশ্য এ-দুটিকে শোচনীয়ভাবে বিফল বলা যাবে না, কেননা এ-দুটি বাক্যশনাক্তির সুশৃঙ্খল মানদণ্ড দিতে না পারলেও বাক্য ও বাক্যসংগঠন সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দেয়। বাক্যের জনপ্রিয় সংস্কৃত সংজ্ঞাটি— 'আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, ও আসত্তিযুক্ত পদসমুচ্চয়ই বাক্য'— যদিও ব্যর্থ, তবু উদঘাটন করে বাক্যের অনেক বৈশিষ্ট্য। সংজ্ঞাটিতে যে তিনটি শর্ত রয়েছে, তার দুটি রৌপ ও একটি আর্থ। 'আকাঙ্ক্ষা' ও 'আসত্তি' বাক্যে শব্দ বা পদের বিন্যাসের সূত্র নির্দেশ করে, 'যোগ্যতা' নির্দেশ করে আর্থসঙ্গতির বিধি। সংজ্ঞাটি একটি বড়ো জটিলতা থেকে মুক্ত : এক বাক্যে কতোখানি অর্থ বা মনোভাব প্রকাশ পেতে পারে, বা কোনো মনোভাব-অর্থ আদৌ প্রকাশ পাওয়া উচিত কি-না, সে-সম্পর্কে এটি নীরব। সংজ্ঞাটির 'আকাঙ্ক্ষা' জ্ঞাপন করে যে বাক্যে শব্দের বা পদের সহাবস্থানের বিশেষ বিধি রয়েছে, যে-কোনো শব্দের পরে যে-কোনো শব্দ বসতে পারে না। যেমন : 'একটি–' পদের পরে বসতে পারে 'ছেলে, মেয়ে, গরু' প্রভৃতি পদ, কিন্তু 'জল, করে' বসতে পারে না। আধুনিক পরিভাষায় এর নাম 'কোঅকারেন্স রেস্ট্রিকশন' বা 'সহাবস্থান বিধি'। প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণে 'আকাঙ্ক্ষা'র ভুল ব্যাখ্যা প্রায়ই পাওয়া যায়। প্রথাগত ব্যাকরণবিদেরা শব্দটির আভিধানিক অর্থ অনুসারে এর এমন আর্থ ব্যাখ্যা দেন, যা ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর। 'আসত্তি'ও রৌপ শর্ত; এর সাহায্যে নির্দেশ করা হয় যে বাক্যে যে-সব পদ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে জড়িত, তাদের অবস্থান হবে কাছাকাছি। যেমন : 'একটি মেয়ে সাত দিন ধ'রে ঘুম যাচ্ছে' বাক্যে 'একটি মেয়ে', 'সাত দিন ধ'রে', 'ঘুম যাচ্ছে' পদগুচ্ছভুক্ত শব্দরাশি পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে জড়িত; তাই তাদের অবস্থান হবে সন্নিকট। যদি এর কোনোটিকে দূরে সরিয়ে নেয়া হয়, তবে বাক্যে বিপর্যয় ঘটবে। 'আসত্তি' শব্দটিকে অনেক প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণবিদ ভ্রান্তিবশত 'আসক্তি' রূপে গ্রহণ ক'রে ভুল ব্যাখ্যা দেন। 'যোগ্যতা' শর্তটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর্থ; আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে একে বলা হয় 'সিলেকশনাল রেস্ট্রিকশন' বা 'সঙ্গতিবিধি'। শর্তটি দাবি করে যে বাক্যের বক্তব্যমাত্রই হবে সুসঙ্গত; বিসঙ্গত কোনো ভাব থাকবে না বাক্যে। 'যোগ্যতা'র মানদণ্ডে 'গোপাল কলা খায়' চমৎকার বাক্য, কেননা এর ভাব সুসঙ্গত; আর '*গোপাল রাজনীতি খায়' অশুদ্ধ, কেননা রাজনীতি খাদ্যসংগ্রহের সহায়ক হ'লেও তা খাদ্য নয়। রূপান্তর ব্যাকরণবিদগণ বাক্যের অর্থসঙ্গতি সম্পর্কে প্রচুর আলোচনা ক'রে সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে আর্থ ত্রুটি বা বিসঙ্গতি বাক্যিক ত্রুটি নয়, তাই বিসঙ্গত বাক্যকে শুদ্ধ বাক্যরূপে গ্রহণ করতে হবে। চোমস্কি (১৯৫৭, ১৫) রূপান্তর ব্যাকরণ প্রস্তাবের সময় 'রঙহীন সবুজ ভাবনাগুলো ভয়ংকরভাবে ঘুমোচ্ছে'র মতো একটি বিসঙ্গত বাক্যকে সুগঠিত বাক্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু পরে (১৯৬৫, ১১৩-১২০) মত বদলান। *আস্পেক্টস*-এ তিনি বিসঙ্গত বাক্যকে ব্যাকরণঅসম্মত ব'লে নির্দেশ করেন। কিন্তু রূপান্তরবাদীদের অনেকে দেখান যে বিসঙ্গতি বাক্যিক ত্রুটি নয়, আর্থ ত্রুটি; তাই বিসঙ্গতির জন্যে কোনো বাক্যকে গ্রহণঅযোগ্য ব'লে শনাক্ত করা যায় না। 'আমি গতকাল সেখানে যাবো', বা 'আগামীকাল আমি সেখানে গিয়েছিলাম'-এর মতো কালবোধচূর্ণকারী বাক্যও ব্যাকরণগতভাবে অশুদ্ধ নয়, যদিও তা বিসঙ্গত। তাই সংস্কৃত বাক্যসংজ্ঞার যোগ্যতা শর্তটি গ্রহণযোগ্য নয়। সব মিলিয়ে এ-সংজ্ঞাটির সাহায্যেও নির্ভুলভাবে বাক্য নির্ণয় অসম্ভব।

সাংগঠনিকদের বাক্যসংজ্ঞা ও ধারণা মৌলিক। অর্থ বা আধেয় পরিহার ক'রে ভাষা বর্ণনার জন্যে তাঁরা যে-বৃহত্তম ব্যাকরণিক একক নির্ণয় করেন, তার নাম বাক্য। বাক্যশনাক্তির জন্যে তাঁরা একটি আদিম ধারণার সহায়তা নেন, ও তার নাম দেন *উক্তি*। ভাষাপ্রয়োগের সময় উচ্চারিত হয় উক্তি; আর সে-উক্তিকে খণ্ডিত করা হয় স্বয়ংসম্পূর্ণ বিভিন্ন সংগঠনে, যা গঠিত নানা ছোটো উপাদানে। কিন্তু ওই সংগঠন কোনো বৃহত্তর সংগঠনের অংশ নয়। এ-সংগঠনই বাক্য। ব্লুমফিল্ডের বাক্যসংজ্ঞাটি, যা মেনে নিয়েছেন সাংগঠনিকেরা, ভাষাবর্ণনার বৃহত্তম একক নির্ণয় করে চমৎকারভাবে। রূপান্তরবাদীগণ বাক্যের এ-সংজ্ঞাটিকেই গ্রহণ করেছেন, তবে অনেকটা অন্যভাবে। সাংগঠনিকদের কাছে বাক্য ও উক্তি বাস্তব একক; কিন্তু রূপান্তরবাদীগণ এ-দুটিকে গ্রহণ করেন বিমূর্ত এককরূপে। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের লক্ষ্য পর্যবেক্ষণসম্ভব ভাষা-উপাত্ত বর্ণনা করা; তাই তাঁরা বাক্যকে বাস্তব এককরূপেই গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু রূপান্তরবাদীদের লক্ষ্য ভাষার অনন্ত অসীম বাক্য সৃষ্টি করা, যা কোনো বিশেষ উপাত্তে সীমাবদ্ধ নয়। বাক্য তাঁদের কাছে একটি বিমূর্ত ধারণা, এবং তার বাস্তব রূপ অনেক সময় পাওয়া যায় উক্তিতে। বাক্য ও উক্তি কখনোকখনো অভিন্নরূপ ধরতে পারে, তবে উক্তিমাত্রই বাক্য নয়। অবশ্য বাক্যমাত্রই উক্তি। রূপান্তর ব্যাকরণের লক্ষ্য এমন ব্যাকরণ রচনা, যা ভাষার সমস্ত বাক্য সৃষ্টি করবে, ও প্রতিটি বাক্যের সাংগঠনিক বর্ণনা দেবে। রূপান্তর ব্যাকরণ সাংগঠনিক ব্যাকরণের কিছু কিছু ধারণা গ্রহণ করলেও তা সাংগঠনিক ভাষিক তত্ত্বের বিরোধী, এবং অনেক বিষয়ে প্রথাগত ব্যাকরণের সাথে একমত। প্রথাগত ব্যাকরণ, তার সমস্ত বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও, বাক্যসংগঠন সম্পর্কে যে-গভীর বোধের পরিচয় দেয়, সাংগঠনিক ব্যাকরণ তা পারে না। রূপান্তর ব্যাকরণ জয় করেছে প্রথাগত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাকরণের অবৈজ্ঞানিকতা ও সাংগঠনিক ব্যাকরণের অদূরদৃষ্টি : বাক্যকে প্রধান একক ধ'রে রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ উদঘাটন করে ভাষার সমস্ত দৃশ্য-অদৃশ্য সূত্র।

টীকা

[১] Lowth (1762, 118) : 'A sentence is an assemblage of words, expressed in proper form, arranged in proper order and occurring to make a complete sense.'

[২] Bain (1879, 8) : 'Speech is made up of separate sayings, each complete in itself...these sayings are sentences. Any complete meaning is a sentence.'

[৩] Rowe and Webb (1897, 1) : 'A sentence is a combination of words by which we say something about a person or a thing.'

[৪] McMordie (1911, 149) : 'A sentence is a group of words containing at least one subject and one predicate, the words being so arranged as to express a complete thought.'

[৫] Nesfield (1895, 5) : 'A combination of words that makes a complete sense is called a sentence.'

[৬] House and Harman (1931,145) : 'A sentence is a group of words expressing a complete thought. A sentence must contain a subject and a predicate.'

[৭] Jones (1935, 2) : 'A sentence is a group of words that contains a verb and its subject and whatever else is necessary to make the thought grammatically complete.'

[৮] Tanner (1945, 14) : 'A sentence is the expression of a complete thought by means of a group of words that can stand alone.'

[৯] Curme (1947, 97) : 'A sentence is an expression of a thought or feeling by means of a word or words used in such a form and manner as to convey meaning intended.'

[১০] Faulkner (1950, 1) : 'A sentence is a combination of words which conveys at least one complete thought consisting of a combination of concepts.'

[১১] Warfel et al (1949, 80) : 'The unit of composition upon which thought is based is the sentence.'

[১২] Gardiner (1932, 208) : 'A sentence is an utterance which makes just as long a communication as the speaker has intended to make before giving himself a rest.'

[১৩] Walcott et al (1940, 1, 61, 62) : 'Here then is the secret of every sentence : first we always name some object or place or person or thing; and then, second, we say something about that object or place or person or thing. Unless we do these two things, we are not making complete sentences...The subject will always be the object, place, person, or thing that is being talked about. The predicate will always be what is said about the object, place, person, or thing.'

[১৪] Barker (1939, 4) : 'Two elements are necessary to the expression of a complete thought : (1) a subject which names a person or thing or idea about which a statement is made; and (2) a predicate which makes a statement about the subject.'

[১৫] Kierzek and Gibson (1960, 36) :'Defined in terms of form or pattern, a

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

sentence is a basic unit of language, a communication in words, having as its core at least one independent verb with its subject.'

[১৬] Meillet (1903, 32) : 'The sentence can be defined (as follows) : a group of words joined together by grammatical agreements (relating devices) and which not grammatically dependent upon any other group are complete in themselves.'

[১৭] Jespersen (1924, 307) : 'A sentence is a (relatively) complete and independent human utterance...The completeness and independence being shown by its standing alone or its capability of standing alone i.e., of being uttered by itself.'

[১৮] Bloomfield (1926, 28) : 'A maximum form in any utterance is a sentence. Thus, a sentence is a form which, in the given utterance, is not part of a larger construction.'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙলা ভাষাতত্ত্ব

ভূমিকা॥ বাঙলা ভাষা এক হাজার বছরেরও বেশি বয়স্ক, কিন্তু বাঙলা ভাষাতত্ত্বের বয়স মাত্র দু-শো চল্লিশ বছর (১৭৪৩-১৯৮৩)। ভাষাতত্ত্বের অসামান্য বিকাশ ঘটেছিলো ধ্রুপদী ভারতে, তবে ওই ভাষাতাত্ত্বিক ঐতিহ্য কোনো সহায়তা করে নি বাঙলা ভাষাতত্ত্বের উন্মেষে; বরং, মনে হয়, সংস্কৃতনিষ্ঠ ভারতীয় ভাষাতাত্ত্বিক ঐতিহ্য অনেকটা বাধা হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলো বাঙলা ভাষাতত্ত্বের উদ্ভবে। পাণিনির পরে সংস্কৃত ভাষাতাত্ত্বিকদের নতুন কিছু করার ছিলো না;– তখন তাঁদের নিয়তি হ'য়ে ওঠে ধ্রুপদী ব্যাকরণগ্রন্থের ভাষ্য আর উপভাষ্য রচনা, ও লোকান্তরিত সংস্কৃতের ঠাণ্ডাশীতল সূত্র পর্যালোচনা। আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলোর উদ্ভবের পরেও যে-ব্যাকরণবিদ-সম্প্রদায় নিষ্ঠার সাথে পুনরাবৃত্তি ক'রে চলেছিলেন প্রাচীন ভারতীয় ব্যাকরণ, তাঁদের চোখে শ্রদ্ধেয় ছিলো না ওই অশীল প্রাকৃতটি, যার নাম বাঙলা। ওই ভাষা অসংস্কৃত প্রাকৃত মানুষের, তাতে লিপিবদ্ধ হয় নি কোনো পুণ্যশ্লোক; তাই ওই ভাষা আকৃষ্ট করতে পারে না কোনো ব্রাহ্মণ বৈয়াকরণকে। বাঙলা ভাষাতত্ত্বের সূচনা ঘটে বাঙলা ভাষার উন্মেষের আটশো বছর পর; আর ওই সূচনাকারী কোনো বাঙালি বা ভারতীয় নন। বাঙলা ভাষাতত্ত্বের সূচনাকারী একজন বিদেশি, পর্তুগিজ, ধর্মযাজক : মানোএল দা আস্‌সুম্পসাঁউ। তিনি বাঙালি সহকারীদের সাহায্য, উপাত্তসংগ্রহে, পেয়েছিলেন ও নিয়েছিলেন প্রচুর; কিন্তু তাতে তাঁর মহিমা ম্লান হয় না সামান্যও। পাদ্রি মানোএল দা আস্‌সুম্পসাঁউ বাঙলা ভাষাতত্ত্বের প্রথম পুরুষ– এ-গৌরবের তিনি উজ্জ্বল অধিকারী। ঢাকার ভাওয়ালে, ১৭৩৪ খ্রিস্টীয় অব্দে, তিনি রচনা করেন বাঙলা ভাষার প্রথম শব্দকোষ ও খণ্ডিত ব্যাকরণ, যা *ভোকাবুলারিও এম ইদিওমা বেনগল্লা, ই পোর্তুগিজ : দিভিদিদো এম দুয়াস পার্তেস* নামে লিসবন থেকে বেরোয় ১৭৪৩ অব্দে। বইটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য ও অবিস্মরণীয় : এটি বাঙলা ভাষাতত্ত্বের সূচনাগ্রন্থ, রচিত হয়েছিলো পর্তুগিজ ও বাঙলা ভাষায়, বাঙলা এতে লিপিবদ্ধ হয়েছিলো রোমান বর্ণমালায়, এটি থেকে গেছে নিঃসঙ্গ বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো– এগুলো এর উল্লেখযোগ্যতা অবিস্মরণীয়তার বড়ো কারণ নিঃসন্দেহে; তবে এটি গুরুত্বপূর্ণ আরো একটি তাৎপর্যমণ্ডিত কারণে যে আস্‌সুম্পসাঁউ ব্যাকরণ রচনা ক'রে সূচনা করেন নি বাঙলা ভাষাতত্ত্বের, যদিও একটি খণ্ডিত ব্যাকরণ তিনি জড়িয়ে দিয়েছেন এর সাথে;–তিনি বাঙলা ভাষাতত্ত্বের সূচনা করেছিলেন অভিধান সংকলনের মাধ্যমে। অর্থাৎ বাঙলা ভাষার– ধ্বনির বা শব্দের বা বাক্যের– আভ্যন্তর সূত্র উদঘাটনের প্রয়াস থেকে জন্মে নি বাঙলা ভাষাতত্ত্ব; জন্ম নিয়েছে বাঙলা ভাষার শব্দরাশির অর্থকে বশ করার বাসনা থেকে। বাঙলা ভাষার পূর্ণরূপ আয়ত্তের কোনো অভিলাষ বা দুরঅভিলাষ পোষেণ নি বাঙলা ভাষার প্রথম ভাষ্যকার, ও তাঁর অব্যবহিত-পরবর্তীরা; তাই দেখা যায় উনিশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শতকে যখন বাঙলা ভাষাতত্ত্বের চর্চা পুরোদমে শুরু হ'য়ে যায়, তখন সংকলিত প্রকাশিত হ'তে থাকে, দশকেদশকে, অভিধানের পর অভিধান।

আঠারোশতকের চল্লিশের দশকে আস্‌সুম্পসাঁউর শব্দকোষ ও ব্যাকরণ বেরোলেও তা থেকে গিয়েছিলো এক ধর্মগোত্রের গ্রন্থরূপে। বাঙালি জীবনে ও সমাজে তার প্রবেশ ঘটে নি; আঠারো শতকের কোনো বাঙালি এর জন্যে যে কোনো আগ্রহ প্রকাশ করে নি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এটি একটি বন্ধ্যাগ্রন্থ– এর থেকে উৎসারিত হয় নি অন্য কোনো গ্রন্থ, বা এটি সৃষ্টি করে নি বাঙলা ভাষাবিশ্লেষণের কোনো ধারা– এটি থেকে গেছে বিদেশিদের ভেতরে, এক ধর্মগোত্রের অভ্যন্তরে, ভাষাতত্ত্ব-চর্যাপদরূপে। আস্‌সুম্পসাঁউর শব্দকোষ ও ব্যাকরণ প্রকাশের তিন দশক পর, ১৭৭৮-এ, হুগলি থেকে প্রকাশিত হয় ন্যাথনিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেডের বিশেষ-কারণে-বিখ্যাত ব্যাকরণ *এ গ্রামার অফ দি বেংগল ল্যাংগুয়েজ*। এ-ব্যাকরণ বইটি বিখ্যাত হয়ে আছে এক অব্যাকরণিক কারণে : এ-বইয়ের জন্যেই প্রথম ধাতুতে ঢালাই করা হয়েছিলো বাঙলা বর্ণমালা, যাতে মুদ্রিত হয়েছিলো বাঙলা উদাহরণগুচ্ছ। ১৭৮৮তে লণ্ডনে মুদ্রিত হয় নাম-না-জানা কোনো এক সংকলকের *দি ইন্ডিয়ান ভোকাবুলারি*;– এতে সংগৃহীত হয়েছিলো দেড় হাজারের মতো বাঙলা শব্দ। ১৭৯৩-এ আপজন মুদ্রাকর ও প্রকাশকরূপে প্রকাশ করেন *ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি* নামক এক শব্দকোষ। ১৭৯৯ অব্দে প্রকাশিত হয় হেনরি পিট্‌স্ ফরস্টারের *এ ভোকাবুলারি, ইন টু পার্টস, ইংলিশ অ্যাণ্ড বোংগালি অ্যাণ্ড ভাইস ভার্সা* নামক বিশাল অভিধানের প্রথম খণ্ড। আঠারোশতকের বাঙলা ভাষাতত্ত্ব সম্পূর্ণ এ-পাঁচটি গ্রন্থে : ধর্মীয় ও ভাষিক আগ্রহে পাঁচজন বিদেশি বিচ্ছিন্নভাবে চর্চা করেন বাঙলা ভাষাতত্ত্বের, যাঁদের তিনজন রুদ্ধ স্রোতের মতো থেকে যান আঠারোশতকেই; আর দু-জন– হ্যালহেড ও ফরস্টার– সৃষ্টি করেন বাঙলা ভাষাতত্ত্বের এক বহমান ধারা, যা ব'য়ে চলে উনিশ থেকে বিশশতকে। পিট্‌স্ ফরস্টার ব্যক্তিগতভাবে সাঁকো বেঁধে দিয়েছিলেন আঠারো ও উনিশশতকের মধ্যে– খ্রিস্টীয় ১৮০২ অব্দে তাঁর অভিধানের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ ক'রে। হ্যালহেডের ব্যাকরণও বন্ধ্যা ছিলো না; এটি উৎসাহিত করে পরবর্তীদের, যাঁরা এ-ব্যাকরণ থেকে আহরণ করেছেন প্রেরণা-উপাত্ত-ব্যাখ্যা। হ্যালহেডের ব্যাকরণ ও ফরস্টারের অভিধান আঠারোশতকি বাঙলা ভাষাতত্ত্বের ছিন্নবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাকে একটি মিলিত স্রোতরূপে বইয়ে দেয় উনিশশতকে–রচিত হ'তে থাকে ব্যাকরণপুস্তক, সংকলিত হ'তে থাকে অভিধান, শব্দকোষ এবং রূপ নিতে ও সুস্থিত হ'তে থাকে এক মান বাঙলা ভাষা।

উনিশশতকের শুরুতে আবির্ভাব ঘটে সুপরিকল্পিত-সচেতন বাঙলা গদ্যের;– কর্মী উনিশশতকের প্রথমার্ধে চতুর্দিকে সক্রিয় হ'য়ে ওঠে কর্মী গদ্য; আর বাঙলা ভাষা একটি আঞ্চলিক বা বহু-আঞ্চলিক ভাষা থেকে পরিণত হ'তে থাকে একটি প্রধান ভারতীয় ভাষায়– স্থির-সুস্থিত হ'তে থাকে তার লেখ্য ও কথ্য মানরূপ। পাঠ্যপুস্তকে, বিতর্কে, সাময়িকপত্রে বিকশিত হ'তে থাকে বাঙলা ভাষা ও তার গদ্যরূপ; বিভিন্ন লেখকের বহুমুখি প্রতিভা বিভিন্ন আঞ্চলিক, কথ্য ও লিখিত রূপের ভেতর থেকে ছেঁকে তুলতে থাকে তার মানরূপ। এর সাথে ঘনিষ্ঠ জড়িত থেকে বিকশিত হ'তে থাকে বাঙলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাষাতত্ত্ব। সংকলিত হ'তে থাকে দ্বিভাষিক, বহুভাষিক, ও একভাষিক অভিধান; রচিত হ'তে থাকে বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ– কখনো প্রথাগত ইংরেজি ব্যাকরণের অনুকরণে কখনো সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রায়-অবিকল কাঠামোতে; গ্রন্থেগ্রন্থে ও পত্রপত্রিকায় আবির্ভূত হ'তে থাকে অভিনব ও অভূতপূর্ব শব্দ, ও রচিত হ'তে থাকে আধুনিক জ্ঞানচর্চার ভাষা ও পরিভাষা, এবং বাঙলা বাক্যকাঠামো একবার এদিকে আরেকবার সেদিকে বেঁকে আয়ত্ত করতে থাকে তার নিজস্ব সংগঠন। আঠারোশতকি বাঙলা ভাষাতত্ত্ব একান্তভাবেই বিদেশিদের শাস্ত্র; উনিশশতকে বিদেশিদের সাথে যোগ দেন বাঙলা ভাষা-উৎসাহী বাঙালি অভিধানপ্রণেতা ও ব্যাকরণরচয়িতাগণ; এবং বাঙলা ভাষা বর্ণিত-বিশ্লেষিত হ'তে থাকে দেশি ও বিদেশি বোধি ও প্রথা অনুসারে। বাঙলা ভাষার আদি ভাষাতাত্ত্বিকেরা অবশ্য কোনো সচেতন ও সুপরিকল্পিত তত্ত্ব অবলম্বন ক'রে বাঙলা বর্ণনা-ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে উদ্যোগী হন নি; নিজেদের দশকের প্রয়োজন মেটানোর জন্যেই তাঁরা সংকলন করেন অভিধান, রচনা করেন ব্যাকরণপুস্তক। প্রথম পর্যায়ের বাঙলা ভাষাতাত্ত্বিকদের উদ্দেশ্য ছিলো বিদেশি শাসকদের বাঙলা শেখানো– তাদের সামনে অভিধানপ্রণেতা ও ব্যাকরণরচয়িতা উপস্থিত করেছেন নানারকম শব্দ ও বিচিত্র ব্যাকরণিক সূত্র;– বাঙলা ভাষার বিজ্ঞানসম্মত বর্ণনার ওপর গুরুত্ব দেয়ার কথা ভাবার সুযোগই হয় নি তাঁদের। অভিধানপ্রণেতারা তখন সংকলন করেন বিচিত্র ধরনের শব্দ, যার একটি বড়ো অংশ সম্ভবত কোনোদিন কারো প্রয়োজনে পড়ে নি; আর ব্যাকরণরচয়িতারা পাতায়পাতায় বিপদগ্রস্ত হন 'বিশৃঙ্খল' বাঙলা ভাষাকে শাসন ও সুশৃঙ্খল করতে যেয়ে। উনিশশতকী বাঙলা ভাষাতাত্ত্বিকেরা, দশম দশকের মধ্যভাগে *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা* প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত, সব এলাকাতেই ছিলেন প্রথাগত ও আনুশাসনিক : অভিধান-ব্যাকরণ প্রণয়নের সময় তাঁরা মেনে চলেছেন সংস্কৃত, ইংরেজি এমনকি লাতিন অভিধান-ব্যাকরণের আদর্শ, এবং বিভিন্ন রকম অনুশাসনে সমৃদ্ধ করেছেন গ্রন্থ। ইউরোপে উনিশশতকে উদ্ভব ঘটে তুলনামূলক-কালানুক্রমিক ভাষাতত্ত্বের; কিন্তু ওই ভাষাতত্ত্বের তত্ত্বপ্রণালিপদ্ধতির প্রভাব পড়ে নি বাঙলা ভাষাতাত্ত্বিকদের ওপর। উনিশশতকের শেষ দশকে তুলনামূলক-কালানুক্রমিক পদ্ধতির কিছুটা প্রয়োগ দেখা যায় সবার আগে রবীন্দ্রনাথের বাঙলা ভাষাবিষয়ক রচনায়। উনিশশতকের প্রথম ন-দশক ভ'রে বাঙলা ভাষাতাত্ত্বিকেরা প্রধানত রচনা করেন প্রথাগত-আনুশাসনিক অভিধান ও ব্যাকরণ; এবং গৌণত লিপ্ত হন বিশুদ্ধ বাঙলার শুদ্ধরূপবিষয়ক কলহে, সাধু-চলতির বিতর্কে; কিন্তু মোটামোটিভাবে এগোতে থাকেন তাঁরা প্রথাসম্মত পথ ধ'রেই যতোদিন না প্রকাশিত হয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অদ্বিতীয় গবেষণাপত্রিকা *বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা* (১৩০১ : ১৮৯৪)। উনিশশতকের প্রথম ন-দশকের অভিধানপ্রণেতাদের মধ্যে আছেন পীতাম্বর মুখোপাধ্যায় (১৮০৯), মোহনপ্রসাদ ঠাকুর (১৮১০), উইলিয়ম কেরি (১৮১৫), জন মেন্ডিস (১৮২২), তারাচাঁদ চক্রবর্তী (১৮২৭), জন মার্শম্যান (১৮২৭), উইলিয়ম মর্টন (১৮২৮), গ্রেভস চেম্বার্স হটন (১৮৩৩), রামকমল সেন (১৮৩৪), জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক (১২৩৮), জয়গোপাল তর্কালঙ্কার (১২৪৫), তারাচন্দ্র শর্মা (১২৪৫), নীলকমল মুস্তোফী (১২৪৫), জগন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৩৮), হলধর ন্যায়রত্ন (১২৪৬),

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাশীনাথ ভট্টাচার্য (১২৬২), কেশবচন্দ্র রায় (১২৬৮), গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন (১২৬৮), দিগম্বর ভট্টাচার্য (১৮৫২), মথুরানাথ তর্করত্ন (১৮৬২), বেণীমাধব দেবদাস (১৮৬৪), রামকমল বিদ্যালঙ্কার (১৮৬৬), শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় (১২৭১); এবং ব্যাকরণরচয়িতাদের মধ্যে আছেন উইলিয়ম কেরি (১৮০১), গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য (১৮১৬), উইলিয়ম ইয়েটস (১৮২০), গ্রেভস চেম্বার্স হটন (১৮২১), রামমোহন রায় (১৮২৬, ১৮৩৩) দেবীপ্রসাদ রায় (১৮৪১), সিটন কার (১৮৪৯), শ্যামাচরণ সরকার (১৮৫০), রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮৬২) জন বীম্‌স্‌ (১৮৭২), কেদারনাথ তর্করত্ন (১৮৭৮), নিত্যানন্দ চক্রবর্তী (১৮৭৮), নীলমণি মুখোপাধ্যায় (১৮৭৮), প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন (১৮৮৪)।

উনিশশতকের দশম দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রথাগত-আনুশাসনিক রীতিতেই রচিত হ'তে থাকে বাঙলা অভিধান ও ব্যাকরণ; এবং শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগের শুরু থেকে বিতর্ক শুরু হয় বাঙলা ভাষায় সংস্কৃত ও খাঁটি বাঙলা শব্দের প্রয়োগের আনুপাতিক হার সম্পর্কে। তখনো বাঙলা অনেকের কাছে প্রাকৃত ভাষা মাত্র; কারো কাছে এটি সংস্কৃতেরই একটি বিকারগ্রস্ত রূপ; এবং ভবিষ্যৎমুখি একগোত্রের কাছে এটি একটি নতুন, স্বাধীন, স্বায়ত্ত- শাসিত ভাষা, যার শারীর উপাদান যেমন ভিন্ন সংস্কৃত থেকে, তেমনি ভিন্ন তার আন্তর প্রকৃতিও আভ্যন্তর সূত্র। তবু নতুন দৃষ্টিতে কেউ বাঙলা ভাষা বর্ণনাবিশ্লেষণের উদ্যোগ নেন নি উনিশশতকের শেষ দশকের শেষাংশের আগে। ১৩০১ বাঙলা অব্দে প্রকাশিত হয় *বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা* ; এবং বাঙলা ভাষাতত্ত্বচর্চার ঘটে যুগান্তর। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে বাঙলা ভাষা-উৎসাহীরা, যাঁদের কেউই বিশুদ্ধ ভাষাতাত্ত্বিক নন কিন্তু আন্তরিকভাবে ভাষানুরাগী, পরিণত হন ভাষাতাত্ত্বিকে; এবং তাঁদের হাতে রচিত হ'তে থাকে বাঙলা ভাষার বহুমুখি ও অভিনব বর্ণনাবিশ্লেষণব্যাখ্যা। ১৩০১ থেকে নিয়মিতভাবে বেরোতে থাকে *সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা*, আর এটি আশ্রয় ক'রে গ'ড়ে ওঠে বাঙলা ভাষাতাত্ত্বিকদের এক নব্যগোত্র। জর্মান তুলনামূলক-কালানুক্রমিক ভাষাতত্ত্বে যেমন উদ্ভূত হয়েছিলেন 'ইয়ুংগ্রাম্মাতিকার' বা 'নবব্যাকরণ-বিদগণ', তেমন কোনো গোত্র পাওয়া যাবে না প্রায় আড়াই শো বছর বয়স্ক বাঙলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে; কিন্তু *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা* কেন্দ্র ক'রে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন নতুন দৃষ্টিঋদ্ধ এমন একগোত্র বাঙলা ভাষাতাত্ত্বিক, যাঁদের 'নবব্যাকরণবিদ' অভিধা দিলে অতিশয়োক্তি করা হয় না। সাহিত্য-পরিষদের মুখপত্রটি একান্তভাবে ভাষাতাত্ত্বিক পত্রিকা ছিলো না, কিন্তু বাঙলা ভাষা বর্ণনাবিশ্লেষণে এটি দিয়েছিলো ব্যাপক-গভীর-আন্তরিক মনোযোগ। বাঙলা ভাষার ধ্বনি, রূপ, বাঙলা ব্যাকরণকাঠামো, পরিভাষা, আঞ্চলিক উপভাষা প্রভৃতি বিষয়ে এটিতে প্রকাশিত হয়েছিলো প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ রচনা। বঙ্গীয়-সাহিত্য- পরিষদের উৎসাহ ছিলো 'খাঁটি বাঙলা' ভাষার ব্যাকরণ রচনার; তাই *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়* বেরোয় এমন সব অভিনব রচনা, যাতে বাঙলা ভাষাকে নিশ্চিতভাবে স্বীকার ক'রে নেয়া হয় এক স্বতন্ত্র-স্বাধীন-স্বায়ত্তশাসিত ভাষারূপে; এবং তাকে বর্ণনার জন্যে দাবি কারা হয় সংস্কৃত থেকে স্বতন্ত্র এক ব্যাকরণ-কাঠামো। তবে এ-সময়ে *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, *ভারতী* ও অন্যান্য পত্রিকায় চোখে পড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরোনোপন্থীদের একটি লঘু গোত্রও, যাঁদের চোখে বাঙলা স্বতন্ত্র ভাষা নয়, 'সংস্কৃতেরই কথিতাকার' মাত্র। বাঙলা তাঁদের কাছে সতী সংস্কৃতের অসতী আত্মজা;– তাঁরা বাঙলাকে সৎ পথে ফিরিয়ে আনার জন্যে বাঙলার ওপর আরোপ করতে চান সংস্কৃত ব্যাকরণের বিপুল বিধিবিধান। তাই উনিশশতকের শেষ দশকের দ্বিতীয়াংশে ও বিশশতকের প্রথম দশকে পাই বাঙলা ভাষাতাত্ত্বিক বা ব্যাকরণবিদদের দুটি গোত্র : একটি বাঙলা ভাষা ও ব্যাকরণের স্বায়ত্তশাসনে বিশ্বাসী, অপরটি বিশ্বাসী সংস্কৃতের আধিপত্যে। প্রথম বা বাঙলাপন্থী গোত্রে ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বিধুশেখর ভট্টাচার্য, যোগেশচন্দ্র রায়; আর দ্বিতীয় বা সংস্কৃতপন্থী গোত্রে ছিলেন শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীনাথ সেন ও অন্যান্য। ১৩০১-১৩৩০ সময়ের মধ্যে না-অতি আধুনিক না-প্রথাগত রীতিতে বাঙলা ভাষা সম্পর্কে যতো প্রবন্ধ বেরোয়, তার অধিকাংশই বেরোয় *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*য়। এ-সময়ের আরো কিছু পত্রপত্রিকা– *ভারতী, সাহিত্য*, ও *প্রবাসী*তে বেরিয়েছে বাঙলা ভাষার শৃঙ্খলাবিষয়ক নানারকম নিবন্ধ।

বিশশতকের তৃতীয় দশকের মধ্যভাগ থেকে ষষ্ঠ দশকের শেষ বছর পর্যন্ত সময়কে বলতে পারি 'কালানুক্রমিক ভাষাতত্ত্বের কাল'। উনিশশতকের শেষ দশকে, *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা* অবলম্বন ক'রে, যে-বর্ণনামূলক বাঙলা ভাষাতত্ত্বের উদ্ভব ঘটে, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে-ভাবে বিশ্লেষণ করেন বাঙলা উপসর্গ, যে-ভাবে বাঙলা শব্দতত্ত্ব বর্ণনাবিশ্লেষণ করেন রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যে-বর্ণনামূলক দৃষ্টি আয়ত্ত করেন বাঙলা কারকব্যাখ্যায়, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যে-ভাবে উদঘটান করতে চেষ্টা করেন বাঙলা শব্দগঠনের অ-সংস্কৃত সূত্র, তা বিস্ময়করভাবে স্তব্ধ হ'য়ে পড়ে। বিশশতকের প্রথম-দ্বিতীয় দশকে আবিষ্কৃতপ্রকাশিত হয় *হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা* (১৩২৩ : ১৯১৬) ও *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* (১৩২৩ : ১৯১৬); এবং বাঙালি ভাষাবিদেরা বাঙলা ভাষার সমকালীন অবস্থা থেকে চোখ সরিয়ে সমস্ত দৃষ্টি ও মনোযোগ নিবদ্ধ করেন বিলুপ্ত অতীতের ওপর। তৃতীয় দশকে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯২৬), ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৯২৮) লণ্ডন-প্যারিস থেকে আয়ত্ত ক'রে আসেন কালানুক্রমিক-তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, উদ্ধার করেন বাঙলা ভাষার লুপ্ত অতীতের অনেক অংশ, এবং বাঙলা ভাষার ইতিহাস রচনা ও বিভিন্ন শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে কেটে যায় কয়েক দশক। সুনীতিকুমার, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ও সুকুমার সেন বাঙলা ভাষা ও শব্দের ইতিহাস অনেকটা আলোকিত করেন; এবং এমন একটি ধারণার সৃষ্টি হয় বাঙলা ভাষা-অঞ্চলে যে ভাষার বিবর্তন বর্ণনাই ভাষাতত্ত্ব। এ-সময়ে বাঙলা ভাষা সম্পর্কে বর্ণনামূলক কাজ বিশেষ হয় নি, যা হয়েছে তার ওপরও অপ্রতিরোধ্য প্রভাব ফেলেছে ইতিহাস। আমাদের কালানুক্রমিক ভাষাতাত্ত্বিকেরা যখন বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ লিখেছেন, তখন তাঁরা স'রে যেতে পারেন নি প্রথাগত পথ থেকে : তাঁরা অনুসরণ করেছেন প্রথাগত ইংরেজি ও সংস্কৃত ব্যাকরণপ্রণেতাদের; এবং কালানুক্রমিক উপাত্তের সাহায্য নিয়েছেন সমকালীন বাঙলা ভাষা ব্যাখ্যা-বর্ণনায়।

বিশশতকের দ্বিতীয়দশকে পশ্চিমে উদ্ভব ঘটে সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের (দ্র বোয়াস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(১৯১১), সোস্যুর (১৯১৫), স্যাপির (১৯২১), ব্লুমফিল্ড (১৯৩৩), হ্যারিস (১৯৫১))। *মেমোআর স্যুর ল্য সিস্তেম প্রিমিতিফ দে ভোআইএল দঁও লে লঁগ অ্যাঁদো-এওরোপেআন* (১৮৭৯) নামক কালানুক্রমিক ভাষাতত্ত্বের একটি স্তম্ভগ্রন্থের রচয়িতা ফেদিনঁ দ্য সোস্যুর ক্রমশ স'রে আসেন কালানুক্রমিক-তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব থেকে, গুরুত্ব আরোপ করেন ভাষার সমকালীন অবস্থার বর্ণনার ওপর, এবং দাবি করেন যে কালানুক্রমিক ভাষাতত্ত্ব পরিহার ক'রে গ্রহণ করতে হবে কালকেন্দ্রিক ভাষাতত্ত্ব– বিশেষ ভাষার বিশেষ কালের বিশেষ অবস্থার বর্ণনাকে। তাঁর তত্ত্ব থেকে উৎসারিত হয়– আমেরিকায় ও ইউরোপে– ভাষাতত্ত্বের কয়েকটি ধারা : মার্কিন ধারা [স্যাপির, ব্লুমফিল্ড, হ্যারিস] (খ) প্রাগ ধারা [ত্রুবেৎস্কয়, ইয়াকবসন], (গ) কোপেনহেগেন ধারা [হিএলমশ্লেভ], (ঘ) জেনেভা ধারা [বালি, ফ্রেই], (ঙ) মস্কো ধারা [আভানেসভ, কুজনেকভ, সিদোরোভ], ও (চ) লণ্ডন ধারা [ফার্থ, হ্যালিডে]। এ-ধারাগুলোর মধ্যে তাত্ত্বিক ও প্রণালিগত ভিন্নতা রয়েছে অনেক, কিন্তু প্রতিটি ধারাই জোর দিয়েছে ভাষার বিশেষ অবস্থার নিরাসক্ত রৌপ বর্ণনার ওপর। বিশশতকের প্রথমার্ধ, পাশ্চাত্যে, সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের কাল; কিন্তু আমাদের দেশে ওই সময়টি কাটে কালানুক্রমিক ভাষাতত্ত্বের চর্চায়। বাঙলাদেশে বিজ্ঞানমনস্ক ভাষাতত্ত্বের চর্চা শুরু হয় পঞ্চাশ-দশকের দ্বিতীয়াংশে– প্রধানত মুহম্মদ আবদুল হাই সম্পাদিত *সাহিত্য পত্রিকা* (প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৭), ও *বাংলা একাডেমী পত্রিকা* (প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৭) অবলম্বন ক'রে। লণ্ডন ধারার বর্ণনামূলক ধ্বনিতত্ত্বে শিক্ষিত মুহম্মদ আবদুল হাই তাঁর বাঙলা ধ্বনিতত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধাবলির সাহায্যে বাঙলাদেশে সূচনা করেন বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের; এবং এমন একটি ধারণা সৃষ্টি করতে সমর্থ হন যে ধ্বনিবিজ্ঞানই ভাষাবিজ্ঞান। তিনি তরুণতরদের উৎসাহীও ক'রে তুলেছিলেন ধ্বনিবিজ্ঞান আয়ত্ত করতে; তাই দেখা যায় ষাট-দশকে যাঁরাই ভাষাশাস্ত্র অধ্যয়নে বিদেশে যান, তাঁরাই ধ্বনিতাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন ক'রে ফিরে আসেন। কিন্তু মুহম্মদ আবদুল হাই ব্যতীত আর কেউ বাঙলা ধ্বনিবর্ণনায় ব্যাপক ও নিরন্তর উৎসাহ দেখান নি।

বাঙলা ভাষাতাত্ত্বিক রচনাবলি রচিত হয়েছে, প্রধানত, দুটি ভাষায়– বাঙলা ও ইংরেজিতে। আস্‌সুম্পসাঁউর শব্দকোষ-ব্যাকরণ রচিত হয়েছিলো পর্তুগিজ ভাষায়; এ ছাড়া রুশ, জর্মান, ফরাশি ভাষায়ও রচিত হয়েছে কিছু রচনা;– কিন্তু সেগুলো বিচ্ছিন্ন র'য়ে গেছে মূল বাঙলা ভাষাতত্ত্ব ধারা থেকে। বাঙলা ভাষাতত্ত্বের সূচনায়ই ব্যবহৃত হয়েছিলো বিদেশি ভাষা– পর্তুগিজ; এরপর ইংরেজ অভিধান-ও ব্যাকরণ-প্রণেতাগণ বাঙলা ভাষা বর্ণনাবিশ্লেষণ করেন ইংরেজিতেই। উনিশশতকে বাঙালি ব্যাকরণপ্রণেতারা বিদেশিদের জন্যে ইংরেজিতে, আর বাঙালিদের জন্যে বাঙলায় রচনা করেন বাঙলা ব্যাকরণ-অভিধান। উনিশশতকের শেষ ও বিশশতকের প্রথম দশকের নবব্যাকরণবিদেরা বাঙলা ভাষাকেই গ্রহণ করেছিলেন বাঙলা বর্ণনা ব্যাখ্যার ভাষারূপে– ইংরেজিতে বাঙলা গবেষণার উৎসাহ ও দরকার তাঁদের ছিলো না। কিন্তু বিশশতকে শুরু হ'য়ে যায় পেশাগত গবেষণার শতাব্দী;– অন্যান্য শাস্ত্রীদের মতো ভাষাশাস্ত্রীরাও শুরু করেন বিদেশযাত্রা এবং বাঙলা ভাষাতত্ত্বের মুখ্য ভাষা হ'য়ে ওঠে ইংরেজি। বাঙলা ভাষাবিষয়ক গবেষণাগ্রন্থমাত্রই রচিত ইংরেজিতে, যেহেতু আমাদের ভাষাবিজ্ঞানীদের গবেষণাস্থল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইউরোপ-আমেরিকা, যদিও উপাত্ত বাঙলা ভাষা। বাঙলা ভাষাবিজ্ঞানীরা বিদেশে রচিত গবেষণাগ্রন্থে যতোটা পরিশ্রমী আন্তরিক সনিষ্ঠ, পরবর্তী রচনায় সাধারণত ততোটা নন; তাই বাঙলা ভাষাবিষয়ক অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থই, ইংরেজিতে রচিত-অপ্রকাশিত ব'লে, দূরে থেকে গেছে আমাদের থেকে। এ-গ্রন্থগুলো যদি রচিত হতো বাঙলা ভাষায়, তবে গ'ড়ে উঠতে পারতো বেশ শক্তিশালী বাঙলা ভাষাতাত্ত্বিক ধারা;– তা হয় নি ব'লে বাঙলা ভাষাতত্ত্ব বেশ দুর্বল– প্রধানত প্রথাগত প্রবন্ধ ও ব্যাকরণের সমষ্টি। বাঙলা ভাষাতাত্ত্বিকেরা তত্ত্বপ্রণালিপদ্ধতিতেও বিশেষ উৎসাহী নন। যাঁরা বিদেশে গবেষণা করেছেন, তাঁদের অবশ্যই আয়ত্ত করতে হয়েছে ভাষাবিশ্লেষণের নানা তত্ত্বপ্রণালিপদ্ধতি, কিন্তু তাঁরা তা বাঙলা ভাষায় পেশ করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। তুলনামূলক-কালানুক্রমিক ভাষাতত্ত্ব, ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, আঞ্চলিক ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক কোনো গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্যগ্রন্থ রচিত হয় নি বাঙলা ভাষায়। তাই বাঙলা ভাষাতাত্ত্বিক রচনাপুঞ্জ প'ড়ে বাঙলা ভাষার নানা শৃঙ্খলা সম্পর্কে কিছু পরিমাণে জ্ঞানী হওয়া সম্ভব, কিন্তু সম্ভব নয় ভাষাবিশ্লেষণের তত্ত্ব ও প্রণালিপদ্ধতি আয়ত্ত করা।

দু-শো চল্লিশ বছরে (১৭৪৩-১৯৮৩) রচিত বাঙলা ভাষাতাত্ত্বিক রচনাপুঞ্জকে বিন্যস্ত করা সম্ভব নিম্নশ্রেণীসমূহে : (ক) অভিধান, (খ) প্রথাগত ব্যাকরণ, ও ব্যাকরণ কাঠামো, (গ) ধ্বনিতত্ত্ব, (ঘ) রূপতত্ত্ব, (ঙ) বাক্যতত্ত্ব, (চ) বর্ণমালা ও বানান সংস্কার, (ছ) উপভাষাতত্ত্ব, (জ) কালানুক্রমিক-তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, (ঝ) ভাষা- পরিকল্পনা, (ঞ) ভাষা-বিতর্ক ও-আন্দোলন, (ট) পরিভাষা, ও (ঠ) বিবিধ। ওপরের শ্রেণীসমূহ যে সুস্পষ্টভাবে পৃথক পরস্পরের থেকে, তা নয়; বিভিন্ন এলাকার ওপর গুরুত্ব আরোপের জন্যেই এ-শ্রেণীবিভাগ। নইলে একাধিক শ্রেণীকে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব বৃহৎ কোনো শ্রেণীতে;– যেমন 'ব্যাকরণ' শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায় 'ধ্বনিতত্ত্ব', 'রূপতত্ত্ব', 'বাক্যতত্ত্ব'কে; আবার 'ভাষা-পরিকল্পনা' শ্রেণীতে গ্রহণ করা যায় 'বর্ণমালা ও বানান সংস্কার', 'ভাষা-বিতর্ক ও-আন্দোলন', 'পরিভাষা' প্রভৃতিকে। উল্লিখিত বারোটি শ্রেণী নির্দেশ করে বাঙলা ভাষার বিভিন্ন এলাকা ও স্তরের প্রতি বাঙলা ভাষাতাত্ত্বিকদের উৎসাহ; কিন্তু তা ব্যাপকতা-গভীরতা-অনুপুঙ্খতা নির্দেশ করে না। বাঙলা ভাষার কোনো এলাকা ও স্তরই ব্যাপক গভীরঅনুপুঙ্খভাবে বর্ণিতবিশ্লেষিত হয় নি। বাঙলা ভাষাতাত্ত্বিকদের প্রধান আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে অভিধানসংকলনে ও বিদ্যালয়পাঠ্য প্রথাগত ব্যাকরণপুস্তক রচনায়, এবং বাঙলা ভাষার– প্রধানত শব্দের– বিবর্তন বর্ণনায়। অনেক এলাকা স্পর্শও করেন নি তাঁরা– যেমন 'অর্থতত্ত্ব', যদি না অভিধানসংকলনকেই অর্থতাত্ত্বিক কাজ ব'লে গণ্য করি। বাক্যবর্ণনায়ও বিশেষ মনোযোগ দেন নি তাঁরা। বর্ণমালা সংস্কার সম্পর্কে যদিও বহু প্রবন্ধ রচিত হয়েছে, তবু বর্ণমালাবিন্যাস ও বর্ণমালার উদ্ভববিকাশ সম্পর্কে বাঙলা রচনা বা গ্রন্থ দুর্লভ। বিশশতকের দ্বিতীয়ার্ধের ভাষাতাত্ত্বিকেরা প্রধানত ধ্বনি ও আঞ্চলিক উপভাষা সম্পর্কে কাজ করেছেন, কিন্তু রূপতত্ত্বস্তর থেকে গেছে অবিশ্লেষিত। সাম্প্রতিক বাঙলাদেশে বাক্যতত্ত্ব ও সমাজভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা গুরুত্ব পাচ্ছে। সব মিলে দু-শো চল্লিশ বছরে গ'ড়ে উঠেছে বাঙলা ভাষাতত্ত্বের এমন এক ধারা, যা প্রথা ও আধুনিকত্বের মিশ্রণ, এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সফলতা-বিফলতায় বাঙলার সমাজ ও জীবনেরই সমান্তরাল।

অভিধানতত্ত্ব। শিক্ষিত সমাজে যে-ঐহিক গ্রন্থটি প্রত্যেক পারিবারিক পাঠাগারে স্থান পায়–বিস্তৃত জায়গা জুড়ে থাকে পুস্তকাসনের–সেটি অভিধান : বর্ণনাক্রমিকভাবে মুদ্রিত শব্দতালিকা, যাতে প্রতিটি শব্দের বানান, উচ্চারণ (বাঙলা অভিধানে সাধারণত উচ্চারণ নির্দেশিত হয় না), ব্যুৎপত্তি, ও এক বা একাধিক অর্থ নির্দেশিত হয়। অভিধানের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে শব্দের অর্থ–এক বা একাধিক–নির্দেশ করা; কিন্তু অভিধান ব্যবহারকারীরা শব্দের নির্ভুল বানান, উচ্চারণ, এবং অনেক সময় ব্যুৎপত্তি জানার জন্যেও ব্যবহার করে অভিধান। অনেকের কাছে অভিধান একটি অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় গ্রন্থ–ভাষিক বা শাব্দ শুদ্ধতার শেষ কথা যেনো লিখিত হ'য়ে আছে অভিধানে; কোনো সন্দেহ বা অশুদ্ধি নিরসনের জন্যে ওই গ্রন্থটির ঠিক পৃষ্ঠাটি খুললেই যেনো মিলবে শুদ্ধতার পরম রূপের পরিচয়। অর্থাৎ অভিধান-ব্যবহারকারীরা ও-প্রণেতারা অভিধানকে দেখেন একটি আনুশাসনিক গ্রন্থ হিশেবে। পশ্চিমে অভিধানের উদ্ভবও ঘটে আনুশাসনিক শাস্ত্র হিশেবে : ভাষার বিশৃঙ্খল শব্দরাশির মানরূপ সুস্থিত করার উদ্দেশ্যেই রচিত হয় অভিধান;– কোনো কোনো দেশে, যেমন ইতালি ও ফরাশিদেশে, প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে, এবং কোনোকোনো দেশে, যেমন ইংল্যাণ্ডে, একক ব্যক্তির শ্রমে। বিশ্বের আধুনিক ভাষাগুলো যখন দৈনন্দিন ও কিছুটা সাহিত্যিক প্রয়োজন মিটিয়ে আরো ব্যাপক দায়িত্বের ভার গ্রহণে উদ্যোগী হয়, যখন ওই ভাষা-অঞ্চলের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষারূপ থেকে উৎসারিত হ'তে থাকে এক-একটি মানভাষা, তখন সচেতনভাবে মান- ভাষারূপ স্থির করার জন্যে সংকলিত হয় আনুশাসনিক অভিধান–যার লক্ষ্য ভাষার বিশুদ্ধ অবিচল রূপ নির্দেশ, ও ভাষাকে অনিবার্য বিনাশ থেকে রক্ষা করা। তাই আধুনিক কালে সচেতন ভাষাপরিকল্পনায় যাঁরা প্রথম অংশ নেন, তাঁরা অভিধানপ্রণেতা। অভিধানপ্রণয়নের মাধ্যমে ভাষার স্থির শুদ্ধ মানরূপ শনাক্তির প্রথম পদক্ষেপ নেয় ইতালি, দ্বিতীয় পদক্ষেপ নেয় ফরাশিদেশ। ১৫৮২ অব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ইতালির 'আকাদেমিয়া দেল্লা ক্রুস্কা', যার মূল লক্ষ্য ছিলো বিশুদ্ধ ইতালীয় ভাষার রূপনির্ণয়। এ-উদ্দেশ্যে সংকলিত হয় আকাদেমির বিখ্যাত অভিধান *ভোকাবোলারিও দেইলি আকাদেমিচি দেল্লা ক্রুস্কা* (১৬১২)। ১৬৩৫ অব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ল্য আকাদেমি ফ্রঁসেজ' বা ফরাশি একাডেমি। ফরাশি একাডেমির উদ্দেশ্য :

'এ-একাডেমির প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে সম্ভাব্য সকল রকম যত্নে ও শ্রমে আমাদের ভাষার সুনির্দিষ্ট সূত্র রচনা করা, এবং একে এমন বিশুদ্ধ, বাকদক্ষ ও উপযুক্ত রূপ দেয়া যাতে এর মাধ্যমে সম্ভব হয় কলা ও বিজ্ঞানচর্চা।' ফরাশি একাডেমির কাম্য ছিলো এক পরিস্রুত বিশুদ্ধ সুশৃঙ্খল ফরাশি ভাষা, যা ব্যবহৃত হবে প্রাত্যহিক জীবনে, শোভন পরিস্থিতিতে, সাহিত্যে ও অন্যত্র। এ-উদ্দেশ্যে ফরাশি একাডেমি নেয় এক আনুশাসনিক অভিধান রচনার প্রকল্প; এবং একাডেমি প্রতিষ্ঠার উনষাট বছর পর, ১৬৯৪ অব্দে, প্রকাশিত হয় ফরাশি একাডেমির বিখ্যাত ফরাশি ভাষার অভিধান। ইতালীয় ও ফরাশি একাডেমির অভিধান ইতালীয় ও ফরাশি ভাষার মানরূপ সুস্থিতিতে, শব্দের মানরূপ প্রতিষ্ঠায়, পালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

আঠারোশতকের ইংল্যাণ্ডে, জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে, দেখা দেয় এক নতুন প্রবণতা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাকে বলতে পারি শৃঙ্খলা ও বিধিবিধানকাঙ্ক্ষা। আগের শতকগুলোতে ইংরেজ জাতি মেনে নিয়েছিলো ব্যক্তি বহুদ্যুতিময় স্বাতন্ত্র্য; কিন্তু আঠারোশতকে তারা সব কিছুকে পরিয়ে দিতে চায় নিয়মশৃঙ্খলার সূত্র, সবকিছুকে দেখতে চায় নিউটনীয় সৌরলোকের মতো শৃঙ্খলাশাসিত। আঠারোশতকের শৃঙ্খলা ও বিধিপ্রবণ ইংরেজজাতি যখন তাকায় আপন ভাষার দিকে, ও ধ্রুব-অবিচল-মৃত লাতিনের দিকে, তখন তাদের কাছে প্রতিভাত হয় যে ইংরেজি একটি বিশৃঙ্খল ভাষা : তার নেই কোনো ধ্রুব ব্যাকরণ, তার সূত্রগুলো অস্থির– যতোটা পালিত হয় তার থেকে অনেক বেশি থাকে অপ্রতিপালিত। লাতিনে সব কিছুই বিধিবদ্ধ ও সুস্থির– কী শুদ্ধ আর কী অশুদ্ধ তা প্রিসকিআনের পরামর্শ নিলেই বোঝা যায়; কিন্তু ইংরেজিতে সব কিছুই অনিশ্চিত। সুশৃঙ্খল নিউটনীয় সৌরলোক তখন তাঁদের কাছে ছিলো পরম ধ্রুব ব্যাপার; তাই আঠারোশতকে ইংরেজ তার বিশৃঙ্খল, ব্যাকরণহীন, মানরূপশূন্য ভাষাকে দিতে চায় মানরূপ, উদ্যোগী হয় তার পরিশুদ্ধি সাধনে ও স্থির অবিচল রূপ নির্ণয়ে। আঠারো শতকের ইংরেজ ভাষা-উৎসাহীরা ও ভাষাবিদেরা তিনটি লক্ষ্য সামনে রেখে কাজ করতে থাকেন : তাঁরা শনাক্ত করতে চান ইংরেজি ভাষার সূত্র ও শুদ্ধ প্রয়োগের মানরূপ, করতে চান পরিশুদ্ধিসাধন, অর্থাৎ ভাষার তথাকথিত ত্রুটিদোষগুলো ত্যাগ ক'রে তার বিকল্পে নির্দেশ করেন শুদ্ধ প্রয়োগ; ও স্থির করতে চান তার মান ধ্রুব অবিনাশী রূপ। ইংরেজি ভাষার শুদ্ধ স্থির মানরূপ লাভের জন্যে আঠারোশতকে শুরু হয় বিতর্ক, পেশ করা হয় নানা প্রস্তাব। এতে অংশ নেন সুইফট, ড্রাইডেন, জনসন প্রমুখ; এবং অনেকেই কামনা করেন ফরাশি একাডেমির মতো একটি ইংরেজি একাডেমি, যার প্রধান কাজ হবে ইংরেজি ভাষার একটি উন্নত আনুশাসনিক অভিধান প্রকাশ করা। ১৬৯৭ অব্দে ডিফো একাডেমি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেছিলেন, আর ১৭১২তে সুইফট তাঁর *ইংরেজি ভাষার বিশুদ্ধিকরণ, উন্নয়নবিধান, ও স্থিরকরণবিষয়ক প্রস্তাব*-এ ইংরেজি ভাষার দোষত্রুটি, অশুদ্ধতা,. অবক্ষয়ের প্রকৃতি ব্যাখ্যা ক'রে একাডেমি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। ইংরেজির মানরূপ নির্ণয় ও শব্দের বিশুদ্ধ রূপ শনাক্তির জন্যে প্রথমে একাডেমি প্রতিষ্ঠার তীব্র উৎসাহ দেখা গেলেও ক্রমে তা প্রশমিত হ'য়ে আসে, এমনকি প্রতিরোধেরও মুখোমুখি হয়। স্যামুয়েল জনসন ১৭৪৭-এ প্রকাশ করেন তাঁর অভিধান রচনার পরিকল্পনা; এবং দাবি করেন যে তিনি এমন 'অভিধান প্রণয়ন করবেন, যা স্থির-অবিচল রূপ দেবে ইংরেজি উচ্চারণের, এবং রক্ষা করবে ইংরেজি ভাষার বিশুদ্ধতা, নির্দেশ করবে তার সুনিশ্চিত ব্যবহারবিধি, যার ফলে ইংরেজি হ'য়ে উঠবে দীর্ঘায়ু'। ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে বেরোয় জনসনের বিখ্যাত অভিধান *এ ডিকশনারি অফ দি ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ* , যাকে ইংরেজ জাতি গ্রহণ করে এক মহৎ কীর্তিরূপে : ফরাশিরা যা সম্পন্ন করেছে একাডেমির সাহায্যে ইংরেজ তা করেছে এক ব্যক্তির শ্রমে-মেধায়– এ-তৃপ্তি পাওয়ার সাথে সাথে ভাষার মানরূপ শনাক্তির জন্যে একাডেমি প্রতিষ্ঠার সমস্ত স্বপ্ন ত্যাগ করে ইংরেজ।

জনসনের *এ ডিকশনারি অফ দি ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ* আনুশাসনিক অভিধানের মহৎ নিদর্শন, যদিও ওই অভিধানে বানান-উচ্চারণ-অর্থনির্দেশে ত্রুটির অভাব নেই, আর শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশে জনসনের ব্যর্থতা তো শোচনীয়। জনসনের অভিধান সৃষ্টি করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনুশাসনিক অভিধানের ধারা– যাতে অভিধানপ্রণেতা হ'য়ে ওঠেন ভাষার একনায়ক বা বিধানকর্তা। জনসন বিশ্বাস করতেন যে 'প্রত্যেক ভাষারই রয়েছে নিজস্ব অশুদ্ধতা ও অসামঞ্জস্য, যা শোধন অথবা নিষিদ্ধকরণ হচ্ছে অভিধানপ্রণেতার দায়িত্ব'। তিনি দেখা দিয়েছিলেন শব্দের বিধানকর্তারূপে;– ভাগ্যবান তিনি, অনেকটা শব্দসৌরলোকের নিউটন– ইংরেজ জাতি মেনে নিয়েছিলো তাঁকে, এবং ইংরেজি ভাষা পালন করেছে তাঁর অজস্র শাব্দ অনুশাসন। জনসন অভিধান সংকলন করেছিলেন ইংরেজি শব্দের বানান উচ্চারণ অর্থের অজর অমর শাশ্বত রূপ দেয়ার উদ্দেশ্যে, কিন্তু অভিধানপ্রণয়ন শেষ ক'রে তিনি বুঝতে পারেন যে তাঁর অভিলাষ মানুষের অমৃতকাঙ্ক্ষার মতোই দুরভিলাষমাত্র। ভাষা বড়ো দুর্বিনীত, তা কোনো একনায়ক বা বিধানকর্তার নির্দেশ মানে না;– ফরাশি একাডেমি ও তার অভিধানের পরেও বদলে গেছে ফরাশি ভাষার উদ্বায়ী ধ্বনিরাশি, বদলে গেছে রূপান্তরপ্রবণ শব্দের অবয়ব, আর নানাভাবে বিকশিত হয়েছে রহস্যময় অর্থ। ঠিক তেমনি জনসনের অভিধানের পরও ওই মহাগ্রন্থকে উপেক্ষা ক'রে স্তরেস্তরে পরিবর্তিত হয়েছে ইংরেজি ভাষা। কিন্তু জনসনের অভিধান একটি কাজ করে চমৎকারভাবে– প্রতিষ্ঠিত ক'রে দিয়ে যায় আনুশাসনিক অভিধানের প্রতাপান্বিত অবিনাশী ধারা; এবং ব্যবহারকারীরা অভিধানপ্রণেতাকে মেনে নেয় ভাষাবিধাতারূপে, ও তাঁর গ্রন্থ হ'য়ে ওঠে একরকম শাব্দ ধর্মগ্রন্থ, যাতে লিপিবদ্ধ হ'য়ে আছে শব্দের বানান উচ্চারণ ব্যুৎপত্তি অর্থ সম্পর্কে চরম বাণী! পাঠকদের এ-বোধ বেশ সুচারুরূপে জিইয়ে রাখে অভিধানপ্রকাশক ও ব্যবসায়ীরা;– দাবি করে যে তাদের অভিধানপ্রণেতাই ভাষাবিষয়ে পরম বিশেষজ্ঞ, ও চরম কথা বলার শেষ অধিকারী।

জনসনের অভিধানের একশো উনতিরিশ বছর পর ১৮৮৪ অব্দে, প্রকাশিত হয় এক নতুন– বর্ণনামূলক ধারার অভিধানের প্রথম খণ্ড, এবং শেষ খণ্ড বেরোয় ১৯২৮-এ। এ-অভিধানের আদিনাম *এ নিউ ইংলিশ ডিকশনারি অন হিস্টরিক্যাল প্রিনসিপলস*, যা তখন বিশ্রুত *দি অকসফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি* নামে। এ-অভিধানে প্রতিষ্ঠিত হয় অভিধানপ্রণয়নের এক নতুন ধারা, যা বর্ণনামূলক ও ঐতিহাসিক। এ-অভিধানের সংকলক নিজেকে বিধানকর্তা বা অনুশাসক হিশেবে দেখেন না নিজেকে, বরং ভূমিকা পালন করেন নিরাসক্ত, নিরপেক্ষ, বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনাকারীর। *অকসফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারির* লক্ষ্য নিম্নরূপ : 'এ-অভিধানের লক্ষ্য হচ্ছে সে-সমস্ত শব্দ বর্ণানুক্রমিকভাবে উপস্থাপিত করা, যেগুলো আদিতম কাল থেকে আজ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ হ'য়ে ইংরেজি শব্দভাণ্ডার সৃষ্টি করেছে। এতে পরিবেশিত হবে শব্দসমূহের রূপ, অর্থ-ইতিহাস, উচ্চারণ, ও ব্যুৎপত্তির সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য। এতে শুধু মান কথ্য ও সাহিত্যিক ভাষাই গৃহীত হবে না– তা এখন প্রচলিত বা অপ্রচলিত যাই হোক, বা হোক প্রাচীন–এতে প্রধান কৌশলিক শব্দাবলি, ও ব্যাপক পরিমাণ ঔপভাষিক ও অপভাষিক প্রয়োগও গৃহীত হবে।' ওপরে যে-লক্ষ্য ব্যক্ত হয়েছে অভিধানপ্রণয়নের, তাতে নেই কোনো আনুশাসনিক উদ্দেশ্য– ভাষার মানরূপ, শুদ্ধরূপ নির্দেশের, বা ভাষার অবিচল শাশ্বত ধ্রুব রূপ প্রতিষ্ঠার। এ-অভিধান বর্ণনামূলক : এতে সম্মানিত স্থান পায় ভাষায় ব্যবহৃত সমস্ত শব্দ কোনোরকম মূল্যায়ন ছাড়া। *অকসফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি*তে গৃহীত হয়েছে আদিতম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিপিবদ্ধ শব্দ থেকে প্রকাশকাল পর্যন্ত সমস্ত শব্দ, নির্দেশিত হয়েছে কোন শব্দটি কখন প্রথম ব্যবহৃত বা লিপিবদ্ধ হয় ইংরেজিতে, বর্ণনা করা হয়েছে প্রতিটি শব্দের কালেকালে অর্থবদলের ইতিহাস, এবং অপ্রচলিত শব্দের ক্ষেত্রে দেখানো হয়েছে, শব্দটি কোন বছর শেষবারের মতো লিপিবদ্ধ হয়েছে। অর্থাৎ এ-অভিধানে পাওয়া যায় ইংরেজি ভাষার প্রতিটি শব্দের জীবনী–তার উদ্ভব, বিকাশ ও লোকান্তরের সমস্ত তথ্য। *অকসফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি* অভিধানতত্ত্বের দিক দিয়ে নতুন-আধুনিক ধারার প্রবর্তক; এবং অভিধানপ্রণয়নে চূড়ান্ত মনীষার নিদর্শন। কিন্তু পৃথিবীব্যাপী এখনো আনুশাসনিক অভিধানই প্রাধান্য বিস্তার ক'রে আছে, বর্ণনামূলক অভিধান প্রণীত হয়েছে খুবই কম।

তৃতীয় একটি ধারার অভিধানের স্বপ্ন দেখছেন রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণবিদেরা। ওই অভিধানের রূপের খসড়া খণ্ডিত আকারে, বিভিন্ন প্রবন্ধে-গ্রন্থে, প্রকাশিত হ'লেও রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল অভিধান এখনো অরচিত, অদূর ভবিষ্যতে রচিত হওয়ারও সম্ভাবনা কম। রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল অভিধানতত্ত্বের উন্মেষ ঘটে চোমস্কির রচনায়। তিনি *আস্পেকটস* কাঠামোর ব্যাকরণের ভিত্তিকক্ষের একটি উপকক্ষরূপে পরিকল্পনা করেন এক আভিধানিক উপকক্ষ; এবং নির্দেশ করেন আভিধানিক উপকক্ষে বা 'শব্দকোষ'-এ প্রতিটি শব্দ-ভুক্তির রীতিও (দ্র হ্বেইনরাইখ (১৯৬৬), বোথা (১৯৬৮), ফিলমোর (১৯৬৯, ১৯৭১), স্টকওয়েল ও অন্যান্য (১৯৭৩))। চোমস্কির মতে 'অভিধান (বা শব্দকোষ) হচ্ছে একরাশ শব্দভুক্তি, যাতে প্রতিটি শব্দ-ভুক্তি হচ্ছে (ধ্ব, ব)-র যুগল, যেখানে 'ধ্ব' হচ্ছে শব্দটির ধ্বনিরূপ নির্দেশক স্বাতন্ত্র্যিক বৈশিষ্ট্যের ম্যাট্রিক্স, আর 'ব' হচ্ছে একগুচ্ছ বাক্যিক বৈশিষ্টের সমষ্টি (অর্থাৎ একটি মিশ্রপ্রতীক)।' চোমস্কি অভিধানে গৃহীত প্রতিটি শব্দের তাৎপর্যপূর্ণ ধ্বনিক-আর্থ-বাক্যিক বৈশিষ্ট্য নির্দেশের পক্ষপাতী; অর্থাৎ এতে অভিধান শুধু অভিধান থাকে না, তা হ'য়ে ওঠে ভাষার ব্যাকরণও। এ-অভিধান রচনার আগে ভাষার প্রতিটি শব্দের ধ্বনিবৈশিষ্ট্য বিজ্ঞানসম্মতভাবে নির্ণয় করা দরকার, স্থির করা দরকার তার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, উদঘাটন করা প্রয়োজন তার সমস্ত অর্থ, এবং বিবেচনা করা দরকার ভাষার সে-সমস্ত বাক্য, যার কোনো-না- কোনো প্রতিবেশে বসতে পারে গৃহীত শব্দটি। এ-তত্ত্বানুসারে অভিধান হ'য়ে ওঠে ভাষার পুঙ্খানুপুঙ্খ সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ। এ-অভিধান এতো উচ্চাভিলাষী যে অদূর ভবিষ্যতে কোনো ভাষারই ব্যাপক সৃষ্টিশীল অভিধান রচিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই!

বাঙলা অভিধান॥ বাঙলা ভাষাতত্ত্বের উদ্ভব ঘটেছিলো অভিধানসংকলনের মাধ্যমে; ওই অভিধানসংকলনে প্রেরণা হিশেবে কাজ করেছিলো ধর্ম। বাঙলা ভাষাতত্ত্বের প্রথম পুরুষ ও প্রথম অভিধানসংকলক মানোএল দা আস্‌সুম্পসাঁউ– ধর্মযাজক ও প্রচারক– জানতেন 'যে প্রচারক তার ধর্মগোষ্ঠীর ভাষা জানে না সে প্রচারক হওয়ার উপযুক্ত নয়'। বাঙলায় জেসাসের ধর্ম প্রচারের জন্যে তাঁর জানা দরকার ছিলো বাঙলা ভাষা। এ-উদ্দেশ্যে তিনি, ১৭৩৪ অব্দে, দেশি সহকারীদের সহযোগিতায় সংকলন করেন *ভোকাবুলারিও এম ইদিওমা বেনগল্লা, ই পোর্তুগিজ : দিভিদিদো এম দুয়াস পার্তেস*। লিসবন থেকে অভিধানটি, পর্তুগিজ ও বাঙলায় রচিত, প্রকাশিত হয় ১৭৪৩-এ। অভিধানটির শুরুতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আস্‌সুম্পসাঁউ যুক্ত করেন চল্লিশ পৃষ্ঠার এক বাঙলা ব্যাকরণ; এবং ৪১-৫৯২ পৃষ্ঠায় দু-ভাগে সংকলন করেন বাঙলা-পর্তুগিজ ও পর্তুগিজ-বাঙলা শব্দ। অভিধানটির বাঙলা-পর্তুগিজ অংশকেই মনে করা যেতে পারে মূল অভিধান ব'লে, কেননা পর্তুগিজ-বাঙলা অংশে প্রথম ভাগের শব্দগুলোই বিন্যস্ত হয়েছে পর্তুগিজ-বাঙলা শব্দকোষরূপে। এ-অভিধানে বাঙলা ও পর্তুগিজ উভয় ভাষাই লিপিবদ্ধ রোমান অক্ষরে। কোনো ভাষিক তত্ত্বকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে বা বাঙলা ভাষার একটি প্রভাবশালী আনুশাসনিক অভিধানপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে তিনি অভিধান সংকলন করেন নি। তাঁর অভিধানের লক্ষ্য ছিলো পর্তুগিজ ধর্মপ্রচারকগণ, যারা সে-সময়ে এ-দেশে ক্রাইস্টের ধর্ম প্রচারে লিপ্ত ছিলো বা লিপ্ত হ'তে পারতো ভবিষ্যতে। তাই তিনি সংকলন করেছিলেন তাঁর এলাকার– ঢাকার ভাওয়ালের– জনসাধারণের প্রাত্যহিক শব্দাবলি : শব্দসংকলনের জন্যে তিনি কোনো অমরকোষ বা বাঙলা কাব্যের দ্বারে যান নি, গিয়েছিলেন নিরক্ষর দরিদ্র মানুষের দরোজায়, যেখানে বিরাজ করে মর্মস্পর্শী দারিদ্র ও করুণাময় ঈশ্বর! বাঙলা অভিধান- সংকলনের প্রথম শতকেই উন্মেষ ঘটে অভিধানসংকলনের দুটি প্রবণতা : (ক) দৈনিন্দিন অষ্টপ্রাহরিক শব্দসংকলনপ্রবণতা, ও (খ) সংস্কৃত ও সংস্কৃতজাত মার্জিত, জীবনচ্যুত শব্দসংকলনপ্রবণতা। প্রথম প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় আস্‌সুম্পসাঁউ অভিধানে, এবং বিদেশিদের সংকলিত বাঙলা অভিধানে; আর দ্বিতীয় প্রবণতাটি লক্ষণীয় প্রধানত দেশি সংকলকদের অভিধানে। আস্‌সুম্পসাঁউ সংকলন করেছিলেন এমন অনেক শব্দ, যার একটি বড়ো অংশ এখনো অগৃহীত মান বাঙলা অভিধানসমূহে। 'আকল', 'বাদাম', 'গতর', 'মাকুন্দা', 'আব', 'আকুশ', 'আলিয়া', 'আলগুছি', 'আমুহা', 'চামচারা'র মতো অনেক শব্দ আছে তাঁর অভিধানে, যেগুলো টিকে আছে ঢাকা জেলার পল্লীতে, কিন্তু স্থান পায় নি অভিজাত অভিধানে। এটি আঞ্চলিক শব্দসংগ্রহ ব'লে আস্‌সুম্পসাঁউর অভিধানকে মেনে নিতে পারি বাঙলা উপভাষাতত্ত্বের প্রথম বই ব'লেও।

বাঙলা ভাষাতত্ত্বের প্রথম শতককে বলা যায় অভিধানের শতক। আস্‌সুম্পসাঁউর দ্বিভাষিক অভিধানটি বিচ্ছিন্ন থেকে যায়; কিন্তু ১৭৯৩-এ প্রকাশিত আপজনের (প্রকাশক) *ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি*, ও হেনরি পিট্‌স্‌ ফরস্টারের *এ ভোকাবুলারি, ইন টু পার্টস, ইংলিশ অ্যাণ্ড বোংগালি* র প্রথম (ইংরেজি-বাঙলা : ১৭৯৯) ও দ্বিতীয় খণ্ড (বাঙলা-ইংরেজি : ১৮০২) প্রকাশিত হ'য়ে সৃষ্টি করে এক অভিধানস্রোত; এবং এরপর প্রায় প্রত্যেক দশকে এক বা একাধিক বড়ো মাঝারি ছোটো অভিধান (সাধারণত দ্বিভাষিক) বেরিয়ে উনিশশতককে অজস্র উপচিকীর্ষু অভিধানে ভ'রে দেয়। অভিধানরাশির অধিকাংশই দ্বিভাষিক– ইংরেজি-বাঙলা; তবে একভাষিক (বাঙলা-বাঙলা) ও বহুভাষিক অভিধানও দুর্লভ নয়। অভিধানপ্রণয়নে প্রথম ও প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন বিদেশিরা; কিন্তু ক্রমশ এ-শাস্ত্রে যোগ দেন দেশি সংকলকেরা। বাঙালিদের মধ্যে প্রথম অভিধান প্রণয়ন করেন মোহনপ্রসাদ ঠাকুর (?১৯০৫), ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহকারী গ্রন্থাগারিক, *এ ভোকাবুলারি, বেংগলি অ্যাণ্ড ইংলিশ, ফর দি ইউস অফ স্টুডেণ্টস* (১৮১০) নামে। কিন্তু ফরস্টারের বিশাল পদক্ষেপের পর অভিধানপ্রণয়নে বিশালতর পদক্ষেপ নেন উইলিয়ম কেরি। তাঁর অভিধানের নাম *এ ডিকশনারি অফ দি*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেংগলি ল্যাংগুয়েজ, ইন হুইচ দি ওয়র্ডস আর ট্রেসড টু দেয়ার অরিজিন, অ্যাণ্ড দেয়ার ভেরিয়াস মিনিংস গিভেন (প্রথম খণ্ড : ১৮১৫; প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৮১৮; দ্বিতীয় খণ্ড (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ) : ১৮২৫)। কেরির অভিধানের বিশালত্ব অনেক গুণের সাথে ধরে আছে বহু ত্রুটি; কিন্তু এটিতে স্পষ্ট লক্ষ্য করি অভিধানপ্রণেতার একটি বিশ্বাস যে বাঙলা ভাষা অচিরেই একটি প্রধান ভাষা হ'য়ে উঠবে। ১৮৩৩-এ প্রকাশিত হয় জি সি হটনের মহিমামণ্ডিত *এ ডিকশনারি, বেংগলি অ্যাণ্ড স্যানসক্রিট/ অ্যাকসপ্লেইনড ইন ইংলিশ* , যার পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রায় তিন হাজারের কাছাকাছি। উনিশ শতকে আর যাঁরা অভিধান রচনা করেন, তাঁদের মধ্যে আছেন পীতাম্বর মুখোপাধ্যায় (১৮০৯), রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ (১৮১৭), ইয়েটস (১৮২০), রামকৃষ্ণ সেন (১৮২১), জন মেনডিস (১৮২২), তারাচাঁদ চক্রবর্তী (১৮২৭), মার্শম্যান (১৮২৭), উইলিয়ম মর্টন (১৮২৮), পিয়ার্সন (১৮২৯), জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক (১৮৩১), রামকমল সেন (১৮৩৪), ডি'রোজারিও (১৮৩৭), জয়গোপাল তর্কালঙ্কার (১৮৩৮), হলধর ন্যায়রত্ন (১২৪৬), দেবীপ্রসাদ রায় (১৮৪১), কেশবচন্দ্র রায় (১৮৬১), মথুরানাথ তর্করত্ন (১৮৬৩), নন্দকুমার কবিরত্ন (১৮৬৪), শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় (১২৭১), রামকমল বিদ্যালঙ্কার (১৮৬৬) প্রমুখ। বিশশতকের দুটি ব্যাপক বাঙলা অভিধান হচ্ছে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান* (১৩২৩), ও হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বঙ্গীয় শব্দকোষ* (১৩৪০-৫৩); এবং উপকারী ব্যবহারিক অভিধান হচ্ছে রাজশেখর বসুর *চলন্তিকা* (দ্বিস ১৩৪০) ও শৈলেন্দ্র বিশ্বাসের *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান* (১৯৫৫)।

বাঙলা অভিধানের উদ্ভবে ও রূপগঠনে পাশ্চাত্য– বিশেষত ইংরেজি– অভিধান ও বিদেশিরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে; সংস্কৃত অভিধান ভূমিকা নেয় অভিধান বিকাশের সময়। সংস্কৃতে পাওয়া যায় তিন ধরনের অভিধানগ্রন্থ : 'পর্যায়', 'নানার্থ', ও 'লিঙ্গ'। 'পর্যায়' শ্রেণীর গ্রন্থে বিন্যস্ত হয় একই বস্তু বা ধারণার বিভিন্ন নাম; 'নানার্থ'-এ প্রদত্ত হয় একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ; আর 'লিঙ্গ' শ্রেণীর গ্রন্থ নির্দেশ করে সংস্কৃত শব্দরাশির ব্যাকরণিক লিঙ্গ। 'পর্যায়' শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে অমর সিংহের *অমরকোষ* অমরত্ব লাভ করেছে। সংস্কৃত অভিধানশ্রেণী ছন্দোবদ্ধ পদ্যে রচিত শব্দের তালিকা, যা ব্যবহারকারীকে মুখস্থ ক'রে রাখতে হতো, কেননা তাতে শব্দাবলি বর্ণানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত নয়। আধুনিক অভিধানে বর্ণানুক্রমই অভিধানের প্রথম পরিচয়। অভিধানকে ব্যবহারোপযোগী হ'তে হ'লে বর্ণানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত হ'তেই হবে, কেননা অভিধানের কাজ স্মৃতিকে সহায়তা করা, পীড়িত করা নয়। আস্‌সুম্পসাঁউর অভিধান বাদ দিলে, ১৮৯৩-এ প্রকাশিত আপজনের অভিধান ও ১৭৯৯ ও ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ফরস্টারের অভিধান থেকে ইংরেজি-বাঙলা, বাঙলা-ইংরেজি, ও বাঙলা-বাঙলা অভিধানের যে ধারা গ'ড়ে ওঠে, তা ইংরেজি অভিধানের, বিশেষ ক'রে জনসনের অভিধানের, কাঠামোতে রচিত, ও প্রকৃতিতে আনুশাসনিক। বাঙলা ভাষার অভিধানরাশির মধ্যে একমাত্র আস্‌সুম্পসাঁউর অভিধানই অনানুশাসনিক বা বর্ণনামূলক; আর সমস্ত মান বাঙলা ভাষার অভিধানই আনুশাসনিক, যদিও তাদের মধ্যে বিদ্যমান অনুশাসনের মাত্রাভেদ।

আঠারোশতকের ইংল্যাণ্ডে যেমন উৎসাহ-উদ্বেগ দেখা দিয়েছিলো ইংরেজি ভাষার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্থির অবিচল মানরূপ বিধিবদ্ধকরণের, তেমন কিছু ঘটে নি আঠারোউনিশ এমনকি বিশশতকের বাঙলায়; কিন্তু ফরস্টার থেকে প্রায় সমস্ত অভিধানপ্রণেতা পালন করেন বাঙলা ভাষা-পরিকল্পনাকারীর দায়িত্ব। ফরস্টার অভিধান প্রণয়ন করেছিলেন বাঙলা ভাষার সমৃদ্ধি সাধনের জন্যে, এমন এক সময়ে যখন বাঙালি আপন ভাষা-সচেতনই ছিলো না। তিনি বাঙলা থেকে আরবি-ফারসির প্রভাব কমিয়ে বাঙলাকে পরিণত করতে চেয়েছিলেন এক সংস্কৃতলগ্ন বিশুদ্ধ ভাষায়। এ-প্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়, এবং এক বিশুদ্ধ বাঙলা সৃষ্টির জন্যে শুরু হয় বাঙলা ভাষার সংস্কৃতায়নপ্রক্রিয়া। কেরি (১৮১৫) তাঁর অভিধানের ভূমিকায় লিখেছেন, 'বাঙলার মানুষেরা যদিও বেশ ঘোরানোপেঁচানো ভাষায় কথা বলে, তবু তারা ব্যাকরণের সূত্র খুব বেশি লংঘন করে না। তারা অবশ্য ভাবপ্রকাশের বহু মার্জিত রীতি সম্পর্কে অজ্ঞ, ও কথোপকথনে বেশ গ্রাম্য; তবে তারা অন্যান্য অনেক জাতির চেয়ে শুদ্ধ। তবে স্বীকার করতেই হবে যে লেখনপ্রণালিতে তারা শোকাবহভাবে অশুদ্ধ, আর তাদের বানান ভুল এতো বেশি যে লেখক কোন শব্দটি লিখতে চেয়েছেন, তা স্থির করাই অনেক সময় অসম্ভব। সরকার ও ব্যবসায়ীরা কখনো পণ্ডিতন্মন্যতাবশত কখনো অজ্ঞতাবশত এ-অপকর্মে পালন করেছে পূর্ণ ভূমিকা।'
বাঙলাভাষাকে ঋদ্ধ করার জন্যেই অভিধান- প্রণেতারা ও উনিশশতকের প্রথম পর্যায়ের গদ্যরচয়িতারা শুরু করেন সংস্কৃতায়নপ্রক্রিয়া। অনেক অভিধানপ্রণেতা বাঙলা অভিধান প্রণয়নে বসে রচনা করেন সংস্কৃত অভিধান। আস্‌সুম্পসাঁউর অভিধানে যেখানে তদ্ভব ও দেশি শব্দের প্রধান্য– 'আচার', 'ঝাঁও', 'বাসন', 'বস্তা', 'ভাও' জাতীয় শব্দ যেখানে স্তম্ভপরম্পরায় বিন্যস্ত, আর দুরূহতম সংস্কৃত শব্দের নমুনা যেখানে 'আত্মা', 'ব্যাধি', 'ব্যাখ্যা', সেখানে ফরস্টারে পাওয়া যায় মার্জিত সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য, উইলিয়ম কেরির অভিধানে মুখোমুখি হ'তে হয় 'আমাশয়মূৰ্দ্ধ্যক্তরক্তাবাহকনাড়ী', 'ইতিকর্ত্তব্যতাকলাপ', 'পাদবৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠনমনকারিদীর্ঘ', 'অতিথ্যুপাসনাকাঙ্ক্ষী', 'এৎপরাভব-নিমিত্তক' প্রকৃতির শব্দ। অবশ্য এসব থেকে সরল শব্দ যে একেবারে পরিত্যক্ত, তা নয়; কেরির অভিধানে ওসব ভীতিকর শব্দের পাশে 'অক্ষয়', 'অদক্ষ', 'অশ্রু'র মতো সংস্কৃত-বাঙলা শব্দ যেমন মেলে, তেমনই মেলে 'ওষ' (কুয়াশা), 'ওটা' (গোয়ালের উচুঁ স্থান) প্রভৃতির মতো শব্দ, যেগুলো এখন সাধারণত আঞ্চলিক ব'লে মান বাঙলা অভিধান থেকে পরিত্যক্ত। অভিধানপ্রণেতাদের ও গদ্যরচয়িতাদের সংস্কৃতায়নপ্রক্রিয়া উনিশশতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই তিরস্কারের বিষয় হ'য়ে উঠেছে, এবং অনেকে একে বিবেচনা করেন চক্রান্ত ব'লেও; কিন্তু এ-প্রক্রিয়া নিন্দাযোগ্য নয়, প্রশংসাই তাঁদের প্রাপ্য। এসব অভিধান যখন প্রণীত হয়, তখন বাঙলা ছিলো নিতান্তই একটি আঞ্চলিক গরিব ভাষা; তাতে যে-সমস্ত শব্দ ব্যবহৃত হতো প্রাত্যহিক জীবনে, শুধু তা আশ্রয় ক'রে থাকলে বাঙলা ভাষার বিকাশ ঘটা অসম্ভব ছিলো। এসব অভিধানের অনেক শব্দই কোনোদিন ব্যবহৃত হয় নি– লেখায় ও কথোপকথনে; কিন্তু তাদের একটি বড়ো অংশ বাঙলা ভাষায় ব্যবহৃত-ব্যবহৃত হ'য়ে গ'ড়ে তুলেছে আধুনিক মান বাঙলা ভাষা। তাই বাঙলা ভাষার প্রথম ভাষা-পরিকল্পনাকারীর গৌরব, ও উপাধি, উনিশশতকের অভিধানপ্রণেতাদের প্রাপ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙলা ভাষার অধিকাংশ অভিধানই দ্বিভাষিক ও একভাষিক;– দ্বিভাষিক অভিধানের মধ্যে ইংরেজি-বাঙলা, ও বাঙলা-ইংরেজি অভিধানেরই প্রাধান্য। দ্বিভাষিক (ইংরেজি-বাঙলা, বাঙলা-ইংরেজি) অভিধানগুলোর মধ্যে আছে ফরস্টার (১৭৯৯, ১৮০২), মোহনপ্রসাদ (১৮১০), কেরি (১৮১৫, ১৮১৮, ১৮২৫), ইয়েটস (১৮২০), মেন্ডিস (১৮২২), মর্টন (১৮২৮), হটন (১৮৩৩), রামকমল (১৮৩৪) প্রভৃতি; এবং একভাষিক (বাঙলা-বাঙলা) অভিধানসমূহের মধ্যে আছে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ (১৮১৭), জগন্নাথ-প্রসাদ (১৮৩১), হলধর ন্যায়রত্ন (১২৪৬), কাশীনাথ (১২৬২), মথুরানাথ তর্করত্ন (১৮৬৩), ও বিশশতকের জ্ঞানেন্দ্রমোহন (১৩২৩), হরিচরণ (১৩৪০-৫৩)। বহুভাষিক অভিধানও রচিত হয়েছিলো কয়েকটি : রামকৃষ্ণ সেনের ইংরেজি-লাতিন-বাঙলা শব্দকোষ (১৮২১), ডি'রোজারিওর ইংরেজি-বাঙলা-হিন্দোস্থানি অভিধান (১৮৩৭), অজ্ঞাতনাম সংকলকের ইংরেজি-বাঙলা-মণিপুরী অভিধান (১৮৩৭), ও দেবীপ্রসাদ রায়ের পাঁচ ভাষার অভিধান *পলিগ্লট মুনশি* (১৮৪১)। ফারসি-বাঙলা অভিধানও রচিত হয়েছিলো কয়েকটি; যেমন জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের ফারসি-বাঙলা অভিধান (১৮৩৮), যার নাম *পারসীক অভিধান*, নীলকমল মুস্তোফীর *পারস্য ও বঙ্গীয় ভাষাভিধান* (১২৪৫), বিপ্রশ্রীমান মহেশের *পারস্য ভাষানুকল্পাভিধান* (১৮৩৯); এবং এ-ধারায়ই বিশশতকে রচিত হয়েছে গোল্ডস্যাকের *এ মুসলমানি বেংগলি-ইংলিশ ডিকশনারি* (১৯২৩), ও হরেন্দ্রচন্দ্র পাল (১৯৬৭), শেখ গোলাম মাকসুদ হিলালীর (১৯৬৭) গ্রন্থ। একটি ব্যতিক্রমী দ্বিভাষিক অভিধান রচনা ক'রে ছিলেন পাদ্রি রামখে (১৮৮৭) *বাঙ্গালা-গারো অভিধান* নামে। এ-ছাড়া সংকলিত হয় আঞ্চলিক বাঙলা ভাষার অভিধান, যার প্রধান নিদর্শন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (সম্পাদক, ১৯৬৫)।

মান বাঙলা ভাষার সমস্ত অভিধানই আনুশাসনিক, যদিও বাঙলা অভিধানের কোনো স্যামুয়েল জনসন নেই। ১৭৯৯ থেকেই অভিধানপ্রণেতারা আনুশাসনিক দৃষ্টিতে শব্দসংকলন করতে থাকেন, কিন্তু কোনো অভিধানই জনসনীয় অভিধানের মহিমাপ্রতাপ অর্জন করতে পারে নি। তাঁরা বাঙলা শব্দভাণ্ডারকে ব্যাপক ক'রে তুলেছিলেন সংস্কৃত অভিধান থেকে ঋণ ক'রে, কিন্তু কখনো, এমনকি আজো, ঠিক মতো শনাক্ত করতে পারেন নি বাঙলা ভাষার প্রকৃত শব্দভাণ্ডার। তাই উনিশশতকের মধ্যভাগ থেকেই বাঙলা ভাষার নিজস্ব শব্দ নির্ধারণের তর্ক শুরু হয়। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে জন বীম্‌স্‌ 'বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ' নামক অনুষ্ঠান পত্রে বাঙলা ভাষার সমৃদ্ধি সাধনের জন্যে একটি একাডেমি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেন, ও মত প্রকাশ করেন যে 'অভিধান প্রস্তুত করাই সভার মূল কর্ম্ম।' বীম্‌সের প্রস্তাবে যে-একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয় 'দি বেংগলি একাডেমি অফ লিটেরেচর' বা *বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ* নামে, তার ১৮৯৩-এর এক সভায় লিওটার্ড বাঙলা ভাষার অভিধান সংকলনের প্রস্তাব দেন। এর ফলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, বীম্‌সের পরামর্শে, অকসফোর্ড-অভিধানের ধরনে বাঙলা ভাষার অভিধান প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়, কিন্তু আজো তা বাস্তবায়িত হয় নি। বিশশতকের অভিধানপ্রণেতারা উনিশশতকের অভিধানপ্রণেতাদের সংস্কৃত শব্দমুখিতার জন্যে সাধারণত তিরস্কার করেন। যেমন যোগেশচন্দ্র রায় তাঁর অভিধানের ভূমিকায় বলেছেন, 'প্রচারিত অধিকাংশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙ্গালা-অভিধান মুখ্যত: সংস্কৃত-অভিধান বলা যাইতে পারে'; এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান* -এর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় ওই সমস্ত অভিধানকে 'বিভক্তি-বিহীন সংস্কৃত-শব্দবাহুল্যে' সংস্কৃতের ছাঁচে ঢালা ব'লে অভিযুক্ত করেন। তবু স্বীকার করতেই হবে যে এ-সমস্ত অভিধান বাঙলা শব্দভাণ্ডারের ব্যাপ্তিসাধনে পালন করেছে মহান ভূমিকা।

প্রথাগত ব্যাকরণ ও বাঙলা ব্যাকরণকাঠামো। 'ব্যাকরণ' শব্দের মূল অর্থ 'শুদ্ধশব্দ-নির্মাণবিদ্যা'; গ্রিক ধাতুজ 'গ্রামার' শব্দের অর্থ 'শুদ্ধবর্ণবিন্যাসবিদ্যা'; তবে উভয় শব্দেরই মূল অর্থ বদলে গেছে। এখন 'ব্যাকরণ' বা 'গ্রামার' বলতে বোঝায় এক শ্রেণীর ভাষাবিশ্লেষণাত্মক পুস্তক, যাতে সন্নিবিষ্ট হয় বিশেষ বিশেষ ভাষার শুদ্ধ প্রয়োগের সূত্রাবলি। এ-ধরনের পুস্তকের অর্থাৎ ব্যাকরণের আদি উদ্ভব ঘটে পুরোনোভারতে, ও গ্রিসে; এবং কালক্রমে ওই ব্যাকরণকাঠামো ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন ভাষা বর্ণনা-ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে। গ্রিক ব্যাকরণকাঠামো প্রথমে গৃহীত হয় লাতিন ভাষা ব্যাখ্যায়; এবং লাতিনের লোকান্তরের পর গ্রিক-ল্যাটিনের মিশ্র ব্যাকরণকাঠামো বিভিন্ন ইউরোপী ভাষা ব্যাখ্যার ব্যবহৃত হয়। এ-ব্যাকরণকাঠামোর অভিধা 'প্রথাগত ব্যাকরণ'। সংস্কৃত ব্যাকরণকাঠামোতে বর্ণিত হয় সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা। পরবর্তীকালে আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহ সংস্কৃত ও ইংরেজি ব্যাকরণের মিশ্র কাঠামোতে ব্যাখ্যাত হয়। 'প্রথাগত ব্যাকরণ' অভিধায় নির্দেশ করা যায় সে-সমস্ত ব্যাকরণকে, যেগুলো রচিত গ্রিক-লাতিন ও সংস্কৃত ব্যাকরণের আদলে। প্রথাগত ব্যাকরণ আনুশাসনিক : ভাষার সমস্ত শৃঙ্খলা বস্তুগতভাবে বর্ণনার বদলে তা নির্দেশ করে শুদ্ধ প্রয়োগের বিধিনিষেধ; অর্থাৎ ভাষায় কি শুদ্ধ আর কি অশুদ্ধ, তা নির্দেশ করাই প্রথাগত ব্যাকরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রথাগত ব্যাকরণবিদেরা সাধারণত কোনো 'উন্নত বিশুদ্ধ ধ্রুপদী' ভাষাকে শুদ্ধতার মান রূপে মেনে নিয়ে ওই ভাষার সমস্ত বিধিনিষেধ আরোপ করেন বর্ণিতব্য ভাষার ওপর। বর্ণিতব্য ভাষা যদি তথাকথিত উন্নত ভাষার বিধি মানতে না চায়, তবে তার অনেক প্রয়োগকে 'অশুদ্ধ' আখ্যা দিয়ে ব্যাকরণপ্রণেতারা উন্নত ভাষার নিয়ম জোরে চাপিয়ে দেন বর্ণিতব্য ভাষার ওপর। প্রথাগত ব্যাকরণ আর্থ;–তার সমস্ত ক্যাটেগরি শনাক্তির মানদণ্ড অর্থনির্ভর। তবে প্রথাগত ব্যাকরণবিদেরা গুরুত্ব দেন শব্দরূপ বর্ণনার ওপর; তাঁদের বিশ্বাস অনেকটা এমন যে পাঠকেরা যদি শুদ্ধ শব্দ গঠনের শৃঙ্খলা আয়ত্ত করতে পারে, তবে সেগুলোকে শুদ্ধ বাক্যে প্রয়োগ করতে তাদের কোনো কষ্ট হবে না।

সংস্কৃত ব্যাকরণের উদ্ভব ঘটেছিলো বেদাঙ্গরূপে;– বেদের শুদ্ধ উচ্চারণ, শুদ্ধ শব্দবিশ্লেষণ, ও শুদ্ধ অর্থনির্ণয়ের জন্যে রচিত হয়েছিলো যথাক্রমে 'শিক্ষা', 'ব্যাকরণ', ও 'নিরুক্ত' নামক বেদসহায়ক শাস্ত্র বা বেদাঙ্গ। 'শিক্ষা' হচ্ছে সংস্কৃত ধ্বনিতত্ত্ব, 'নিরুক্ত' হচ্ছে সংস্কৃত অর্থতত্ত্ব, আর 'ব্যাকরণ' হচ্ছে সংস্কৃত শব্দ-বা রূপ-তত্ত্ব। সংস্কৃত রূপতত্ত্ব শাস্ত্রের নাম ব্যাকরণ; এবং এ-নামই পরবর্তীকালে নাম হ'য়ে ওঠে ভাষা বিশ্লেষণ শাস্ত্রের 'ব্যাকরণ' শব্দের বদলে পতঞ্জলি ব্যবহার করেছিলেন 'শব্দানুশাসন' অভিধাটি; কিন্তু প্রাকপাণিনীয় 'ব্যাকরণ' অভিধাই বাঙলা ভাষাশাস্ত্রে গৃহীত হয়। সংস্কৃত ধ্বনিতাত্ত্বিক বর্ণনা পাওয়া যায় 'প্রাতিশাখ্য' ও 'শিক্ষা'– যেমন *ঋক-প্রাতিশাখ্য*, *অথর্ব*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাতিশাখ্য, সর্বসম্মতশিক্ষা প্রভৃতি– নামক রচনায়; যাস্কের *নিরুক্ত* হচ্ছে সংস্কৃত অর্থতত্ত্বের এক আদিগ্রন্থ; আর পাণিনির *অষ্টাধ্যায়ী* সংস্কৃত রূপতত্ত্ব বা ব্যাকরণের চরম নির্দশন। পাশ্চাত্যের প্রথম ব্যাকরণ হচ্ছে দিওনীসিউস থ্রাক্স্-এর গ্রিক ভাষার ব্যাকরণ *গ্রাম্মাতিকি তেক্নি– বর্ণকলা*। পঁচিশটি ক্ষুদ্র অনুচ্ছেদে বিভক্ত এ-ব্যাকরণে উদ্ভূত হয় পাশ্চাত্য প্রথাগত-আনুশাসনিক ব্যাকরণকাঠামো, যা দু-হাজার বছর ধ'রে আধিপত্য করে ইউরোপী ভাষাসমূহের ব্যাকরণের ওপর। থ্রাক্স্ যে-সব ক্যাটেগরি শনাক্ত করেছিলেন গ্রিক ভাষার, ও ওই শনাক্তিতে ব্যবহার করেছিলেন যে-কৌশল, তার প্রায় সবটাই গৃহীত হয় অন্যান্য ভাষার ব্যাকরণে। লাতিনের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ব্যাকরণ লিখেছিলেন, খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে, প্রিসকিআন;– তাঁর ব্যাকরণে পাওয়া যায় দুই গ্রিক ব্যাকরণরচয়িতা– থ্রাক্স্ ও দিস্কোলুস-এর প্রভাব। আঠারো শতকে ইংল্যাণ্ডে তর্ক বিতর্ক আন্দোলন দেখা দেয় ইংরেজি ভাষাকে স্থির সুশৃঙ্খল বিধিবদ্ধ করার। ওই আন্দোলনের সময় ইংরেজ ভাষাবিদদের মনে সব সময়ই জেগেছে সুশৃঙ্খল স্থির গ্রিক লাতিন ভাষার কথা, ও থ্রাক্স্-প্রিসকিআনের নাম। আঠারো শতকের ইংরেজি ব্যাকরণবিদদের লক্ষ্য ছিলো তিনটি : ইংরেজি নিয়মকানুনশৃঙ্খলা বিধিবদ্ধ ক'রে সেগুলোকে দিতে চেয়েছিলেন অবিচল সূত্ররূপ; অশুদ্ধ প্রয়োগসমূহ শনাক্ত ক'রে নির্দেশ করতে চেয়েছিলেন সেগুলোর শুদ্ধ প্রয়োগ; এবং বিতর্কিত ব্যাপারগুলোকে বিচার ক'রে নির্দেশ করতে চেয়েছিলেন তার সমাধান। অর্থাৎ অনুশাসন– সিদ্ধ-ও নিষিদ্ধ-করণই ছিলো তাঁদের লক্ষ্য। বিধানপ্রণয়নে তাঁরা যুক্তি, ব্যুৎপত্তি, ও গ্রিক-ল্যাটিন আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন নিয়ামকরূপে। এ-ইংরেজি ব্যাকরণরচয়িতাদের হাতেই রচিত হয় আধুনিক প্রথাগত আনুশাসনিক ব্যাকরণ, যা ইংরেজি সাম্রাজ্যবাদ আস্রয় ক'রে ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে।

বাঙলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণপ্রণেতারা বিদেশি। আস্সুম্পসাঁউ তাঁর অভিধানে জড়িত ক'রে দেন একটি খণ্ডিত বাঙলা ব্যাকরণ, যা রচিত গ্রিক-ল্যাটিন-পর্তুগিজ ব্যাকরণের আদর্শে। বাঙলা ভাষার প্রথম ও অখণ্ডিত ব্যাকরণ হচ্ছে নাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেডের *এ গ্রামার অফ দি বেংগল ল্যাংগুয়েজ* (১৭৭৮), যাকে লেখক আখ্যায়িত করেন 'বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং অভিধায়। হ্যালহেড বাঙলা ব্যাকরণ লিখেছিলেন 'ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং', অর্থাৎ ইংরেজের হিতসাধনের উদ্দেশ্যে। যাতে ইংরেজেরা বাঙলা ভাষা সহজে আয়ত্ত করতে পারে, তাই তিনি রচনা করেছিলেন তাঁর চমৎকার গ্রন্থটি। উনিশশতকে সৃষ্টি হয়, ইংরেজি ও বাঙলা ভাষায়, বাঙলা ব্যাকরণপুস্তকের এক অবিরাম ধারা– এং একই বইয়ে উভয় ভাষায়– বয়স্ক বিদেশি ও কিশোর দেশি ছাত্রদের বাঙলা শেখানোর লক্ষ্যে। বিশশতকের শুরুর বছরে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৩০৮) দাবি করেন যে 'বাঙ্গালা ভাষায় কিছু কম আড়াই শত বাঙ্গালা ব্যাকরণ লিখিত হইয়াছে'; কিন্তু তার একদশক পরে যোগেশচন্দ্র রায় (১৩১৯) বলেন যে তিনি তাঁর *বাঙ্গালা ভাষা* নামক ব্যাকরণ রচনার সময় দেখেছেন মাত্র চারটি ব্যাকরণপুস্তক– রামমোহন রায়ের *গৌড়ীয় ব্যাকরণ* (১৮৩৩), শ্যামাচরণ শর্মার *বাঙ্গালা ব্যাকরণ* (১২৫৯), নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণের *ভাষাবোধ বাঙ্গালা ব্যাকরণ* (১৩০৫ : চতুর্দশ মুদ্রণ) লোহারাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিরোরত্নের *বাঙ্গালা ব্যাকরণ* (সংবৎ ১৯৩৬)। তবে বাঙলা ব্যাকরণবিদসম্প্রদায় আড়াই শো ব্যাকরণপুস্তক রচনার মতো উর্বর, বা মাত্র চারখানি ব্যাকরণপুস্তক রচনার মতো বন্ধ্যা নন। উনিশশতকে ইংরেজিতে বাঙলা ব্যাকরণপ্রণেতাদের মধ্যে আছেন কেরি (১৮০১), গঙ্গাকিশোর (১৮১৬), কিথ (১৮২০), হটন (১৯২১), রামমোহন রায় (১৮২৬), শ্যামাচরণ সরকার (১৮৫০), বীম্‌স্‌ (১৮৭২), শ্যামাচরণ গাঙ্গুলি (১৮৭৭), যদুনাথ ভট্টাচার্য (১৮৭৯), কে পি ব্যানার্জি (১৮৯৩)। বাঙলায় বাঙলা ব্যাকরণ-প্রণেতাদের মধ্যে আছেন রামমোহন রায় (১৮৩৩), শ্যামাচরণ সরকার (১৮৫২), ব্রজনাথ বিদ্যালঙ্কার (১৮৭৮), নিত্যানন্দ চক্রবর্তী (১৮৭৮), নীলমণি মুখোপাধ্যায় (১৮৭৮), কেদারনাথ তর্করত্ন (১৮৭৮), চিন্তামণি গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮১), প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন (১৮৮৪), বীরেশ্বর পাঁড়ে (১৮৯১ : দ্বিতীয় সংস্করণ), নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ (১৩০৫ : চতুর্দশ মুদ্রণ)। বাঙলা ব্যাকরণ মাত্রই আনুশাসনিক ও শব্দকেন্দ্রিক। দু-শো বছরে প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণের যে-ধারা গ'ড়ে উঠেছে, তা তিন রকম ব্যাকরণের মিশ্রণে গঠিত : লাতিন, ইংরেজি, ও সংস্কৃত ব্যাকরণের অসুখী-অস্বস্তিকর মিলনে জন্মেছে বাঙলা ব্যাকরণপুস্তকপুঞ্জ। বাঙলা ব্যাকরণের আদিপ্রণেতারা বিদেশি ও বিভাষী; তাঁরা লাতিন ও ইংরেজি ব্যাকরণের ক্যাটেগরি আবিষ্কারের চেষ্টা করেন বাঙলা ভাষায়। পরে আসেন সংস্কৃত পণ্ডিতেরা, যাঁরা বাঙলাকে বিকৃত সংস্কৃত ভেবে সংস্কৃত ব্যাকরণের ক্যাটেগরিরাশি আরোপ করেন বাঙলার ওপর। বাঙলা ব্যাকরণ রচনায় উদ্যোগী হ'য়ে সংস্কৃত পণ্ডিতেরা সংস্কৃত থেকে নিয়ে আসেন অজস্র সংস্কৃত সূত্র, এবং সৃষ্টি করেন এক দুর্বল আনুশাসনিক শাস্ত্র, যা বাঙলা ভাষাকে একটি স্বাধীন-স্বায়ত্তশাসিত ভাষারূপে ব্যাখ্যা-বর্ণনা-বিশ্লেষণ করতে ব্যর্থ হয়। এ-ব্যাকরণসমূহকে লক্ষ্য ক'রেই রবীন্দ্রনাথ (১২৯২, ৩৪২) মন্তব্য করেছিলেন, 'প্রকৃত বাঙলা ব্যাকরণ একখানিও প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণের একটু ইতস্তত করিয়া তাহাকে বাঙলা ব্যাকরণ নাম দেওয়া হয়।' প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণের এ-ধারা উনিশশতকের শেষ দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত চলতে থাকে, যতোদিন না *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা* কেন্দ্র ক'রে বাঙলা ভাষার 'নবব্যাকরণবিদেরা' আত্মপ্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁরা কেউ ব্যাকরণরচয়িতা ছিলেন না;– এক দশকের মতো সময় ধ'রে তাঁরা বাঙলা ভাষা বর্ণনার জন্যে নতুন কাঠামো খুঁজে যে-যাঁর নিজ এলাকায় ফিরে যান, এবং প্রথাগত বাঙলা ব্যাকরণের ধারা বইতে থাকে প্রথাগত খাতেই। বিশশতকে রচিত বাঙলা ব্যাকরণপুস্তকগুলো প্রকৃতিপ্রণালিতে উনিশশতকি ব্যাকরণই, যদিও কোনোকোনোটি বেশ ব্যাপক।

বাঙলা ব্যাকরণকাঠামো ও 'নবব্যাকরণবিদ'গণ॥ উনিশশতকের শেষ দশকের শেষাংশ পর্যন্ত বাঙলা ভাষাতত্ত্ব সীমাবদ্ধ থাকে সাধারণত অভিধানে ও প্রথাগত ব্যাকরণে। মাঝেমাঝে বাঙলা শব্দসম্ভার, বাঙলা ভাষার চারিত্র, বর্ণমালা প্রভৃতি সম্পর্কে প্রকাশিত হয় কিছু বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ (দ্র বঙ্কিমচন্দ্র (১২৮৫), গ্রাডুএট (১২৮৮), রাজেন্দ্রলাল (১৮৬৬, ১৮৭৭), শ্যামাচরণ (১৮৭৭))। তখনো অনেকেই মেনে নিতে পারেন নি যে বাঙলা ('বাঙ্গালা', বা 'বাঙ্গলা') একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন স্বায়ত্তশাসিত ভাষা; এবং স্বতন্ত্র সংস্কৃত থেকে; তাই তার ব্যাকরণকাঠামোও অনিবার্যভাবে স্বতন্ত্র হবে সংস্কৃত ব্যাকরণকাঠামো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে। বাঙলা ভাষার স্বাতন্ত্র্য ও স্বায়ত্তশাসন, এবং বাঙলা ব্যাকরণকাঠামোর স্বাধিকার প্রথম, ও অনেকটা পরোক্ষভাবে, দাবি করা হয় *বালক*, ও *সাধনা* পত্রিকায় প্রকাশিত তরুণ রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি প্রবন্ধে– 'বাংলা উচ্চারণ' (১২৯২), 'স্বরবর্ণ অ' (১২৯৯), 'স্বরবর্ণ এ' (১২৯৯), ও 'টা টো টে' (১২৯৯)-তে। ১৩০১-এ (১৮৯৪) প্রকাশিত হয় "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা", যার চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ষের দু-সংখ্যায় প্রকাশিত হয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'উপসর্গের অর্থবিচার' (১৩০৪, ১৩০৫)। 'উপসর্গের অর্থবিচার' নামক দীর্ঘ ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন প্রবন্ধটিতেই সুস্পষ্টভাবে বিকশিত হয় নবব্যাকরণ- দৃষ্টি, যার লক্ষ্য বাঙলা ভাষাকে বাঙলা ভাষা হিশেবেই ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ করা। প্রবন্ধটি সংস্কৃতপন্থীদের আতঙ্কিত, ও নব্যপন্থীদের অনুপ্রাণিত করেছিলো। দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রবন্ধের প্রতিবাদে রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী রচনা করেন 'উপসর্গের অর্থবিচার নামক প্রবন্ধের সমালোচনা' (১৩০৫), এবং তাঁর প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ লিখেন 'উপসর্গ-সমালোচনা' (১৩০৬)। এ-প্রবন্ধ কেন্দ্র ক'রেই বাঙলা ভাষাবিদ সম্প্রদায় বিভক্ত হ'য়ে যান দু-দলে : একদলকে বলতে পারি 'নবব্যাকরণবিদ' বা বাঙলাপন্থী, ও অন্যদলকে বলতে পারি 'পুরোনো ব্যাকরণবিদ' বা সংস্কৃতপন্থী। দ্বিজেন্দ্রনাথ যে-আন্দোলনের সূচনা করেন, তাকে এগিয়ে নিয়ে যান রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তাঁদের বিরোধীগোত্রে সক্রিয়ভাবে অবস্থান করেন শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীনাথ সেন প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথের 'বাংলা শব্দদ্বৈত' (১৩০৭), 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ' (১৩০৮), 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' (১৩০৮) প্রতিষ্ঠিত করে তাঁকে নবব্যাকরণবিদসম্প্রদায়ের পুরোধারূপে। এ-আন্দোলনকে তীব্র-ব্যাপক ক'রে তোলে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' (১৩০৮) ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'বাঙ্গলা ব্যাকরণ' (১৩০৮), 'বাঙ্গালা কারক-প্রকরণ' (১৩১২), ও 'ধ্বনি-বিচার' (১৩১৪) প্রবন্ধ। এ-আন্দোলনকে প্রতিরোধের চেষ্টা করা হয় শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রীর 'নূতন বাঙ্গালা ব্যাকরণ' (১৩০৮), 'ব্যাকরণ ও বাঙ্গালা ভাষা' (১৩০৮), সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের 'ভাষার সহিত ব্যাকরণের সম্বন্ধ' (১৩০৮), 'বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ' (১৩১১), শ্রীনাথ সেনের 'প্রাকৃত ব্যাকরণ ও অভিধান' (১৩১৬) প্রবন্ধে। নবব্যাকরণবিদদের মুখপত্র ছিলো *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা*, সংস্কৃতপন্থীদের মুখপত্র ছিলো প্রধানত *ভারতী*। নব্য ও পুরোনোপন্থীদের বিতর্কের ছিলো দুটি অবিচ্ছেদ্য বিষয়– বাঙলা ভাষা ও ব্যাকরণকাঠামোর স্বাধিকার বনাম সংস্কৃত-অধীনতা।

নবব্যাকরণবিদ অর্থাৎ বাঙলাপন্থীরা নিশ্চিত ধ'রে নিয়েছিলেন যে বাঙলা একটি স্বতন্ত্র স্বায়ত্তশাসিত ভাষা;– সংস্কৃতের সাথে তার সম্পর্ক সুদূর। তখনকার প্রথাগত ধারণা– বাঙলা সংস্কৃতের কন্যা–তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিলো না, বরং তাঁরা বিশ্বাসী ছিলেন প্রাকৃতের সাথেই বাঙলা ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে। তাঁরা দেখেছেন ধ্বনিতে, শব্দে, বাক্যে, অর্থে সংস্কৃতের সাথে দুস্তর ব্যবধান বাঙলার। যদিও বাঙলা ভাষা আত্মস্থ ক'রেছে বিপুল পরিমাণ সংস্কৃত শব্দ, তবুও বাঙলা হ'য়ে উঠেছে একটি পৃথক ভাষা, যার ব্যাকরণ হবে পৃথক। কিন্তু বিরোধীপক্ষ বাঙলা ভাষার স্বায়ত্তশাসনে বিশ্বাসী ছিলেন না; বাঙলা তাঁদের কাছে সংস্কৃতেরই একরকম কথ্য বিকৃত প্রাকৃতরূপ, যাকে সংস্কার ক'রে পুনরায় সংস্কৃত ক'রে তোলা সম্ভব। শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রীর (১৩০৮) মতে বাঙলা ভাষা 'সাক্ষাৎ সম্বন্ধে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন'; আর 'ইহার গতি, স্থিতি সমুদয়ই সংস্কৃতের অনুরূপ।' তিনি এমন মতও প্রকাশ করেন যে বাঙলা 'একপ্রকার দেশান্তর প্রচলিত সংস্কৃত ভাষা'। শ্রীনাথ সেন, শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রীর মতোই, বিশ্বাস করেন যে 'বঙ্গভাষা সংস্কৃতের একপ্রকার কথিতাকার', এবং 'সংস্কৃত আমাদের সাহিত্যের ভাষা, বাঙ্গালা তাহার কথিত আকার'। তিনি বাঙলাকে বলেন 'বর্তমান প্রাকৃত'। রবীন্দ্রনাথ 'প্রাকৃত ও সংস্কৃত' (১৩০৮) প্রবন্ধে এ-মত খণ্ডন করেন এভাবে : 'বিশেষ সময়ের ও বিশেষ দেশের চলিত ভাষা অভিধানে প্রাকৃত শব্দে বিশেষরূপে নির্দিষ্ট হইয়া গেছে; অন্য দেশকালের প্রাকৃতকে 'প্রাকৃত' বলিতে গেলে কেঁচোকেও উদ্ভিদ বলা যাইতে পারে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্ষণ

নারীর ওপর পুরুষের বলপ্রয়োগের চরম রূপ ধর্ষণ, যাতে পুরুষ নারীর সম্মতি ছাড়া তার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়। পুরুষ সুবিধার জন্যে বা আক্রোশবশত নারীকে খুন করতে পারে– মাঝেমাঝেই করে; কিন্তু খুনের থেকেও মর্মান্তিক ধর্ষণ, কেননা খুন নারীটিকে কলঙ্কিত করে না। ধর্ষণ একান্ত পুরুষের কর্ম; নারীর পক্ষে পুরুষকে খুন করা সম্ভব, কিন্তু ধর্ষণ করা সম্ভব নয়। পুরুষের দেহসংগঠন এমন যে পুরুষ সম্মত আর শক্ত না হ'লে নারী তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক পাতাতে পারে না; কিন্তু উত্তেজিত পুরুষ যে-কোনো সময় নারীকে তার শিকারে পরিণত করতে পারে। অসম্মত নারীর সাথে জোর ক'রে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়াকে কয়েক দশক আগে সাধারণত বলা হতো *বলাৎকার*, এখন অকপটে বলা হয় *ধর্ষণ*। ধর্ষণ কোনো আধুনিক ব্যাপার নয়, এবং বিশেষ কোনো সমাজে সীমাবদ্ধ নয়। তবে কোনো কোনো সমাজ বিশেষভাবে ধর্ষণপ্রবণ, আর কোনো কোনো সমাজ অনেকটা ধর্ষণমুক্ত; যদিও সম্পূর্ণ ধর্ষণমুক্ত সমাজ ও সময় কখনোই ছিলো না, এখনো নেই। মানবসমাজ ধর্ষণের ইতিহাস লিখে রাখার দরকার বোধ করে নি; কিন্তু প্রাচীন পুরাণ ও উপাখ্যানে ধর্ষণের যে-বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে মনে হয় প্রাচীনেরা ধর্ষণকে অনেকটা ধর্মে ও দর্শনে পরিণত করেছিলো।

ভারতীয় পুরাণে পরাশর কর্তৃক সত্যবতীকে ধর্ষণের উপাখ্যান বিখ্যাত; আর দেবরাজ ইন্দ্র মাঝেমাঝেই স্বর্গমর্ত্য জুড়ে ধর্ষণ ক'রে বেড়াতো। গ্রিক পুরাণ ভ'রেই পাওয়া যায় ধর্ষণ, যাতে প্রধান ধর্ষণকারী দেবরাজ জিউস। গ্রিক পুরাণ জানিয়ে দেয় নারীদেহ পুরুষের কামাক্রমণের চিরকালীন লক্ষ্যবস্তু; এবং এতে এমন একটি বাণীও পাওয়া যায় যে আক্রমণ ও অধিকার করা যেতে পারে নারীকে, লুণ্ঠন করা যেতে পারে তার দেহ, যদি না সে বের করতে পারে আক্রমণকারীকে প্রতিহত করার কোনো চরম উপায়। আক্রমণকারীকে প্রতিহত করার এক উপায় হচ্ছে মৃত্যুবরণ, মৃত্যুই নারীর ধ্রুব সখা; তবে গ্রিক পুরাণে ধর্ষণকারীকে প্রতিহত করার নাটকীয় উপায় রূপান্তরগ্রহণ। ধর্ষণকারীকে প্রতিহত করার চেষ্টা করতে করতে, পেরে না উঠে, শেষ মুহূর্তে নারী নিজের শরীরকে রূপান্তরিত করে কোনো প্রাকৃতিক বস্তুতে; যেমন দাফনে অ্যাপোলোর কামক্ষুধা থেকে বাঁচার জন্যে রূপান্তরিত হয় লরেলতরুতে। তবে যারা পলাতে পারে না, বিশেষ ক'রে ধর্ষণকারী যখন কোনো দেবতা, তখন তাদের শরীরের ঘটে আরেক রূপান্তর; তারা গর্ভবতী হয়, প্রসব করে বীরসন্তান, যারা নগরপত্তন করে, সৃষ্টি করে সভ্যতা। পুরাণের নানা ব্যাখ্যা সম্ভব। গ্রিক পুরাণের ধর্ষণ সরাসরি কাম ও নারীপুরুষের ভূমিকা নির্দেশ করতে পারে; আবার নির্দেশ করতে পারে বিয়ে ও বিয়ের বাইরে নারনারীর আচরণের বিধিবিধান। পৌরাণিক ধর্ষণ অস্তিত্ব, ধর্ম ও রাজনীতিক ব্যাপারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতীকও হ'তে পারে। গ্রিক পুরাণ পুরুষাধিপত্যবাদী সমাজের সৃষ্টি; তাই ধর্ষণ নির্দেশ করতে পারে পুরুষাধিপত্য ও শিশ্নের শক্তি, যার রূপ দেখা যায় দেবরাজ, 'দেবতা ও মানুষের পিতা', জিউসের ক্রিয়াকলাপে। অলিম্পাসে অধিষ্ঠিত দেবরাজের শক্তির শেষ নেই, যা ঝলকে ওঠে তার রাজদণ্ড ও বজ্রে; এবং তার কামশক্তি আর কামনাও অনন্ত। সে তার কামশক্তি অবাধে প্রয়োগ করে দেবী আর মানবীদের ওপর। পৌরাণিক ধর্ষণের তাৎপর্য যাই হোক, তা প্রমাণ করে ধর্ষণ মানুষের সমান বয়সী। ব্রাউনমিলার বলেছেন, 'শুরুতে পুরুষ ছিলো প্রাকৃতিক লুণ্ঠনকারী আর নারী ছিলো প্রাকৃতিক শিকার'; এবং আজো তাই রয়ে গেছে।

পৃথিবীতে পৌরাণিক কাল আর নেই, দেবতারা আর ধর্ষণ করে না; তবে দেবতাদের স্থান নিয়েছে আজ পুরুষেরা; প্রায়-অবাধ ধর্ষণ চলছে পৃথিবী জুড়ে। ধর্ষণ এখন দেখা দিয়েছে মারাত্মক মড়করূপে;– আমেরিকার মতো শিল্পোন্নত সমাজে যেমন চলছে ধর্ষণ, তেমনি চলছে বাঙলাদেশের মতো অনুন্নত সমাজে। বাঙলাদেশ এখন সবচেয়ে ধর্ষণপ্রবণ সমাজের একটি; মনে হচ্ছে পৌরাণিক দেবতারা আর ঋষিরা দলবেঁধে জন্মলাভ করেছে বাঙলাদেশে। ধর্ষণের সব সংবাদ অবশ্য জানা যায় না; সামাজিক কলঙ্কের ভয়ে ধর্ষিতরাই তা চেপে রাখে; কিন্তু যতোটুকু প্রকাশ পায়, তাতেই শিউরে উঠতে হয়। বাঙলাদেশে ধর্ষণ সবচেয়ে বিকশিত সামাজিক কর্মকাণ্ড, পৃথিবীতে যার কোনো তুলনা মেলে না। বাঙলাদেশে এককভাবে ধর্ষণ করা হয়, এবং দলবদ্ধ ধর্ষণ করা হয়; এবং ধর্ষণের পর ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হয়। এখানে পিতা ধর্ষণ করে কন্যাকে (কয়েক বছর আগে মধ্যপ্রাচ্য থেকে ফিরে এক পিতা ধর্ষণ করে তার তিন কন্যাকে), জামাতা ধর্ষণ করে শাশুড়ীকে, সহপাঠী ধর্ষণ করে সহপাঠিনীকে, আমলা ধর্ষণ করে কার্যালয়ের মেথরানিকে, গৃহশিক্ষক ধর্ষণ করে ছাত্রীকে, ইমাম ধর্ষণ করে আমপারা পড়তে আসা কিশোরীকে, দুলাভাই ধর্ষণ করে শ্যালিকাকে, শ্বশুর ধর্ষণ করে পুত্রবধুকে, দেবর ধর্ষণ করে ভাবীকে; এবং দেশ জুড়ে চলছে অসংখ্য অসম্পর্কিত ধর্ষণ। চলছে দলবদ্ধ ধর্ষণ;– রাতে গ্রাম ঘেরাও ক'রে পুলিশ দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করে গৃহবধুদের (কয়েক বছর আগে ঠাকুরগাঁয়ে ঘটে এ-ঘটনা); নিজেদের গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে পুলিশ দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ ক'রে হত্যা করে একটি বালিকাকে; ১৯৯৫র আগস্ট মাসে, দিনাজপুরে, যার প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে সারা শহর, এবং প্রাণ দেয় সাতজন; মহাবিদ্যালয়ে প্রেমিকের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ছাত্ররা দলগতভাবে ধর্ষণ করে ছাত্রীকে (ব্রজমোহন কলেজ, ১৯৯৫); মাস্তানরা বাসায় ঢুকে পিতামাতার চোখের সামনে দলগতভাবে ধর্ষণ করে কন্যাদের (বিভিন্ন শহর ও গ্রামে)। বাঙলাদেশ আজ ধর্ষণকারীদের দ্বারা অবরুদ্ধ। বাঙলাদেশে নারী বাস করছে নিরন্তর ধর্ষণভীতির মধ্যে। চাষীর মেয়ে মাঠে যাবে–সে আর কোনো ভয় পাচ্ছে না, ভয় পাচ্ছে ধর্ষণের; মেয়েটি ইস্কুলে বা মহাবিদ্যালয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে–সে আর কোনো ভয় পাচ্ছে না, ভয় পাচ্ছে ধর্ষণের; মেয়েটি বাইরে যাবে–সে আর কোনো ভয় পাচ্ছে না, কিন্তু ভয় পাচ্ছে ধর্ষণের। সুজান গ্রিফিন বলেছেন, 'আমি কখনোই ধর্ষণের ভয় থেকে মুক্ত থাকতে পারি নি'। বাঙলাদেশে প্রতিটি নারী এখন সুজান গ্রিফিন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্ষিত হওয়া নারীর জন্যে মৃত্যুর থেকেও মারাত্মক; ধর্ষিত হওয়ার অভিজ্ঞতা ধসিয়ে দেয় ধর্ষিত নারীর জীবনের ভিত্তিকেই। ধর্ষিত হওয়ার মুহূর্তে নারী গভীরতম অন্ধকারে পতিত হয়; তার যদি সঙ্গমের পূর্বঅভিজ্ঞতা না থাকে তাহলে যন্ত্রণা আর বিভীষিকা তাকে পাগল ক'রে তুলতে পারে। ধর্ষণ অনেকের ওপর ফেলে দীর্ঘপ্রসারী প্রভাব– নষ্ট হয়ে যায় তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক গ'ড়ে তোলার শক্তি, তারা আর কোনো পুরুষের সাথেই জড়িত হ'তে পারে না, পুরুষের প্রতিটি আচরণ তাদের কাছে ধর্ষণ ব'লে মনে হয়; বদলে যায় তাদের আচরণ, মূল্যবোধ, এবং সব সময়ই তারা থাকে শঙ্কিত। ধর্ষিত নারী আণবিক বোমাগ্রস্ত নগরী, যার কিছুই আর আগের মতো থাকে না। কিন্তু ধর্ষিত হওয়ার পর সমাজ তার সাথে সুব্যবহার করে না, তার জন্যে বেদনার্ত হয় না, করুণা করে না। ধর্ষিত অধিকাংশ নারীই ধর্ষণকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে না, কেননা সমাজ অনেকটা ধর্ষণকারীর পক্ষেই। তাই অধিকাংশ ধর্ষিত নারীই ধর্ষণকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ না তুলে ঘটনাটিকে ভাগ্য ব'লে মেনে নেয়। ধর্ষিত নারী কিছুটা সান্ত্বনা পেতে পারতো বিচার বিভাগের কাছ থেকে; কিন্তু বিচার বিভাগ, যা পুরুষেরই সৃষ্টি, তাকে নিয়ে অনেকটা খেলায় মেতে ওঠে। বিচার বিভাগের সাহায্য চাওয়ার পর ধর্ষিত নারী ধর্ষিত হওয়ার বিভীষিকার পর পড়ে বিচারব্যবস্থার বিভীষিকার মধ্যে। পৃথিবী জুড়েই বিচার বিভাগের ক্রিয়াকলাপ ধর্ষিতদের পীড়িত করে প্রচণ্ডভাবে; বিচার বিভাগের আচরণে ধর্ষিতদের মনে হয় তারা ধর্ষিত হচ্ছে আবার। ধর্ষণের অভিযোগের পর কাজ শুরু করে পুলিশ; তারা তথাকথিত সত্য ঘটনা বের করার নামে নির্মম অশ্লীলভাবে জেরা করতে থাকে ধর্ষিতদের, যেনো ধর্ষিতরাই অপরাধী; যেনো তারা দেবতুল্য পুরুষকে কলঙ্কিত করার উদ্দেশ্যেই ধর্ষণের অভিযোগ আনে। পুলিশ মনে করে কোনো নারী যদি সত্যিই ধর্ষিতা হয়, তার শরীরে নানা রকম চিহ্ন থাকবেই। নারী বাধা দেবে, ধর্ষণকারী তাকে আঘাত করবে; তার দাগ ফুটে থাকবে ধর্ষিতের শরীরে। দাগগুলো সাক্ষী দেবে যে নারীটি ধর্ষিত। যদি কোনো নারী এমন দাগ ছাড়া পুলিশের কাছে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ করে, পুলিশ তাকে একটা মিথ্যাবাদী ছাড়া আর কিছু মনে করে না। *পলিটিক্যাল রিভিউ*তে প্রকাশিত রচনায় এক গোয়েন্দা সার্জেন্ট তার সহকর্মীদের দিয়েছে এ-উপদেশ:

> মনে রাখতে হবে যে শিশুদের বেলা ছাড়া বয়স্ক মহিলাদের ক্ষেত্রে সন্ত্রাস ব্যতীত ধর্ষণ অসম্ভব, তাই তাদের শরীরে সন্ত্রাসের চিহ্ন থাকবেই। যদি কোনো নারী শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন ছাড়া থানায় এসে ধর্ষণের অভিযোগ তোলে, তাহলে তাকে খুব কঠোরভাবে জেরা করতে হবে। যদি তার অভিযোগ সম্বন্ধে সামান্যও সন্দেহ জাগে, তবে তাকে সরাসরি মিথ্যাবাদী বলতে হবে। যে-মেয়েরা গর্ভবতী বা বেশি রাতে বাসায় ফেরে, তাদের ওপর কড়া দৃষ্টি দিতে হবে, কেননা এমন ধরনের মেয়েরা খুব বদমাশ; তারা সহজেই ধর্ষণ বা অশোভন আক্রমণের অভিযোগ তোলে। তাদের কোনো সহানুভূতি দেখাবে না।

এ-উপদেশ থেকেই বোঝা যায় ধর্ষিত নারী কতোটা সহযোগিতা পায় পুলিশের। যেমন শুধু ভিখিরি হ'লেই চলবে না, হ'তে হবে অন্ধ খোঁড়া কুষ্ঠরোগী; তেমনি নারী শুধু ধর্ষিত হ'লেই চলবে না, তার শরীরে মারাত্মক আঘাতের দাগ থাকতেই হবে; তা যতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গভীর আর প্রশস্ত হয় ততোই ভালো। বিচার বিভাগ জানতে চায়, সে কি একটুও সুখ পেয়েছে? তাহলে চলবে না। বিলেতের এক বিচারক, সত্তরের দশকে, ধর্ষিতদের উপদেশ দিয়েছিলো : 'আপনারা দু-পা চেপে রাখবেন।' এক লেখিকা উত্তর দিয়েছিলেন, 'ধর্ষিত হওয়ার সময় দু-পা চেপে রাখার কথা মনে থাকে না।' বিচার বিভাগ আসলে ধর্ষিত নারীর কাছে কী চায়? চায় তার মৃত্যু। বিচার বিভাগ বলে, তোমার উচিত ছিলো ধর্ষণকারীকে বাধা দেয়া, যদিও তার হাতে একটা ছুরিকা ছিলো, যদিও তার হাতে একটা আগ্নেয়াস্ত্র ছিলো, যদিও সে তোমার থেকে শক্তিমান; এবং তোমার উচিত ছিলো মৃত্যুবরণ। বিচার বিভাগ বা পুরুষতন্ত্র ধর্ষিত নারীর থেকে মৃত নারী পছন্দ করে। ধর্ষিত নারী অভিযোগ তোলে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে; মৃত নারী মেনে নেয় পুরুষতন্ত্রকে।

ধর্ষিত নারী পুলিশ পার হয়ে বিচারালয়ে যাওয়ার পর শুরু হয় নতুন বিভীষিকা; পুলিশের নিষ্ঠুর আচরণের পর বিচারালয় মেতে ওঠে আরো নিষ্ঠুর আচরণে। পুরুষ ধর্ষিত নারীর অভিযোগ বিচারের যে-প্রক্রিয়া বের করেছে, তা দেখে মনে হয় ধর্ষণকারীর বিচার তাদের লক্ষ্য নয়, তাদের লক্ষ্য ধর্ষিত নারীর বিচার। যেনো ধর্ষিত হয়ে সে অপরাধ করেছে; বিচারালয় সে-অপরাধটুকুই খুঁজে বের করতে চায়। বিচার চলার সময় পুরুষটির বদলে বিচারালয়ের সব মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে নারীটির ওপর। বিচারালয়ে প্রথমেই নারীটির চরিত্রের ওপর লেপন করা হয় একরাশ কলঙ্ককালিমা; খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বের করা হয় তার যৌনজীবনের ইতিহাস। অবিবাহিত নারী ধর্ষিত হ'লেই তার জীবন কলঙ্কিত হয়ে যায়; কিন্তু বিচার বিভাগের কাছে তা-ই যথেষ্ট নয়; বারবার তার কাছে জানতে চাওয়া হয় তার সঙ্গমের অভিজ্ঞতা আছে কি না, থাকলে তা কেমন, কার কার সাথে সে সঙ্গম করেছে, সঙ্গমে সে সুখ পায় কিনা প্রভৃতি। আসামীর উকিল নিজের মক্কেলকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্যে নিয়ে থাকে কয়েকটি কৌশল : সে বারবার প্রশ্ন করে ধর্ষণের ঘটনা সম্পর্কে;– কখন ধর্ষণ করা হয়েছে, কীভাবে করা হয়েছে, কতোক্ষণ করেছে, এসব সম্পর্কে সে বিরতিহীন প্রশ্ন করতে থাকে। নারীটিকে বারবার বর্ণনা করতে হয় নিজের ধর্ষিত হওয়ার উপাখ্যান। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই নারীর বিবৃতির মধ্যে অসঙ্গতি বের করা, আর দেখানো যে ঘটনাটিতে নারীটির সম্মতি ছিলো। যে-সব ক্ষেত্রে ধর্ষিত আর ধর্ষণকারী পূর্বপরিচিত সেখানে ব্যবহার করা হয় আরেক কৌশল। এ-ক্ষেত্রে চলতে থাকে কুৎসিত প্রশ্নের ঝড়, যার লক্ষ্য প্রমাণ করা যে তাদের মধ্যে আগে থেকেই যৌনসম্পর্ক ছিলো; এটা নতুন কিছু নয়, এবং ধর্ষণ নয়। তারপর রয়েছে চিরকালীন কৌশলটি, যার কাজ প্রমাণ করা যে নারীটি অসতী, আর দেখিয়ে দেয়া যে এমন অসতীর পক্ষে এমন স্থানকালে সঙ্গমে সম্মতি দেয়াই স্বাভাবিক। মনে করা যাক নারীটি সন্ধ্যার পর (বাঙলাদেশে) বা মধ্যরাতে (পশ্চিমে) বাসায় ফিরছিলো। তখন দাবি করা হবে যে-নারী সন্ধ্যার পর বা মধ্যরাতে বাড়ি ফেরে, তার চরিত্র ভালো নয়, তাই তার পক্ষে সম্মতি দেয়াই স্বাভাবিক।

এ তো উকিলের কাজ, আর উকিলের কাজ উকিল করবেই। ধর্ষিত নারীটি তাকে পয়সা দেয় নি, দিয়েছে ধর্ষণকারী; তাই সে সীমা পেরিয়ে গিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করবে মক্কেলকে। কিন্তু বিচারক কী করে? যখন উকিল অশ্লীল জেরা করতে থাকে নারীটিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন মাননীয় বিচারকেরা কী করে? অপরাধমূলক বিচারে আইন শুধু প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করারই অনুমতি দেয়; কিন্তু ধর্ষণের মামলায় বিচারকেরা উকিলকে দেয় লাগামহীন স্বাধীনতা, যা পরিবেশকে ক'রে তোলে সবার জন্যে উপভোগ্য; আর নারীটির জন্যে পুনরায় ধর্ষিত হওয়ার সমান। বিচারকেরা উকিলদের শুধু অবাধ স্বাধীনতাই দেয় না, মাঝেমাঝে নিজেরাও আপত্তিকর মন্তব্যের পর মন্তব্য ক'রে উকিলদের উৎসাহিত আর ধর্ষিতকে পীড়িত ক'রে থাকে। ১৯৮২ সালে বিলেতে এক বিচারক মন্তব্য করে:

> যে-নারীরা না বলে তারা সব সময় না বোঝায় না। বিষয়টা শুধু না বলার নয়, বিষয়টা হচ্ছে সে কীভাবে না বলছে, কীভাবে সে নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করছে। সে যদি এটা না চায় তাহলে তার উচিত তার দু-পা চেপে বন্ধ ক'রে রাখা। বলপ্রয়োগ ছাড়া তার ভেতরে ঢোকা সম্ভব নয়; তাই তার শরীরে বলপ্রয়োগের চিহ্ন থাকবেই।

ধর্ষিত হওয়া যেনো নারীরই অপরাধ–কেনো সে দু-পা চেপে সব কিছু বন্ধ ক'রে রাখে নি? ধর্ষণের বিচার ধর্ষিতাদের জন্যে চরম বিভীষিকার ব্যাপার। নিউজিল্যান্ডে ধর্ষণ সম্পর্কে গবেষকেরা জানিয়েছেন ধর্ষিতরা বিচারের পীড়নকে খারাপ মনে করে ধর্ষণের থেকেও; যা অনেকটা ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সমতুল্য। ধর্ষিত নারী বিচার চাইতে গেলে ধর্ষিত হয় কমপক্ষে তিনবার– দুবার রূপকার্থে।

নারীর ওপর বলপ্রয়োগের চরম রূপ ধর্ষণ, কিন্তু এ-সম্পর্কে ইতিহাসরচয়িতারা সাধারণত চুপ থাকতেই পছন্দ করেছেন। ব্যুশার বলেছেন, 'আজকের পুরুষ ঐতিহাসিকদের পক্ষে স্বস্তির সাথে আলোচনার জন্যে ধর্ষণ খুবই ঝুঁকিপূর্ণ, খুবই রাজনীতিক বিষয়'। পুরুষের লেখা অপরাধের ইতিহাসে ধর্ষণ গুরুত্ব পায় নি; তাকে গণ্য করা হয়েছে তুচ্ছ ব্যাপার ব'লে। ধর্ষণের বিভীষিকা প্রথম তুলে ধরেন আধুনিক নারীবাদীরা; এবং প্রস্তাব করেন ধর্ষণের তত্ত্ব। তাঁরা দাবি করেন ধর্ষণকে শুধু কিছু ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের বিকৃত কাজ ব'লে একপাশে সরিয়ে রাখা যায় না; ব্যাপারটিকে বুঝতে হবে লৈঙ্গিক সম্পর্ক ও লৈঙ্গিক রাজনীতি, কলঙ্কিত ও নিন্দিতকরণ, সন্ত্রাস ও অপরাধের ভাষায়। কেইট মিলেটই প্রথম 'বলপ্রয়োগ' নামে ধর্ষণ বিষয়টি আলোচনা করেন; দেখান যে পিতৃতন্ত্রে নারীর ওপর পুরুষাধিপত্য প্রতিষ্ঠার কৌশলগুলোর একটি ধর্ষণ। ১৯৭৫-এ বেরোয় ধর্ষণ সম্পর্কে সুজান ব্রাউনমিলারের সাড়াজাগানো বই *আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে : পুরুষ, নারী ও ধর্ষণ*। তাঁর বইয়ের প্রধান প্রতিপাদ্য হচ্ছে ধর্ষণ সব সময়ই কাজ করেছে এক প্রধান সামাজিক শক্তিরূপে, পুরুষাধিপত্য প্রতিষ্ঠার কেন্দ্রীয় উপাদানরূপে। এরপর বেরিয়েছে বহু বই : ক্যারোলিন হার্সের *ধর্ষণ নিয়ে সমস্যা* (১৯৭৭), সুজান গ্রিফিনের *ধর্ষণ : চেতনার শক্তি* (১৯৭৮), রুথ ই হলের *যে-কোনো নারীকে জিজ্ঞেস করুন* (১৯৮৫) প্রভৃতি, ও আরো বহু বই ও নিবন্ধ।

পুরুষ কেনো ধর্ষণ করে? এ-সম্পর্কে পাওয়া যায় তিনটি তত্ত্ব : একটি নারীবাদীদের, একটি সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীদের, ও একটি জীববিজ্ঞানীদের। সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীদের তত্ত্বে ধর্ষণ একটা সামাজিক ব্যাধি, যার উদ্ভব ঘটেছে আধুনিক শিল্পনির্ভর সমাজের জটিলতা থেকে। এ-তত্ত্বটি বাতিল হয়ে যায় সহজেই; কেননা ধর্ষণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুধু আধুনিক শিল্পনির্ভর সমাজে সীমাবদ্ধ নয়। ধর্ষণ আগেও ছিলো, এখনও আছে; শিল্পোন্নত সমাজে যেমন রয়েছে ধর্ষণ, তেমনি রয়েছে এ-কালের আদিম ও অর্ধআদিম সমাজগুলোতে। ধর্ষণ আন্তঃসাংস্কৃতিক। ধর্ষণ সম্পর্কে নারীবাদী ও জীববিজ্ঞানীদের তত্ত্বের সমন্বয় করলে পাওয়া যায় ধর্ষণ সম্পর্কে বেশ স্বচ্ছ ধারণা। ধর্ষণ সম্পর্কে নারীবাদীদের তত্ত্বের মূলকথা হচ্ছে নারীর ওপর পিতৃতান্ত্রিক পুরুষাধিপত্যের একটি কৌশল হিশেবেই পিতৃতন্ত্র লালন ক'রে আসছে ধর্ষণ; আর জীববিজ্ঞানীদের তত্ত্বের সারকথা হচ্ছে বিবর্তনের ফলেই পুরুষের কামতৃপ্তির একটি প্রক্রিয়ারূপে উদ্ভূত হয়েছে ধর্ষণ। নারীবাদীরা ধর্ষণ সম্পর্কে দুটি সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন : প্রথমটি হচ্ছে ধর্ষণ শুধু ধর্ষণকারীর আলোকে বোঝা সম্ভব নয়, বুঝতে হবে পুরুষের সমগ্র মূল্যবোধের আলোকে; আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ধর্ষণ যতোটা অবদমিত কামের প্রকাশ তারচেয়ে অনেক বেশি প্রকাশ নারীবিদ্বেষের।

কেইট মিলেট *লৈঙ্গিক রাজনীতি* (১৯৬৯) গ্রন্থে ধর্ষণের যে-তত্ত্ব প্রস্তাব করেছিলেন, তাই সম্প্রসারিত ক'রে ব্রাউনমিলার *আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে* (১৯৭৫) গ্রন্থে প্রস্তাব করেন ধর্ষণের বিস্তৃত তত্ত্ব। তাঁর তত্ত্বই এখন ধর্ষণের নারীবাদী তত্ত্ব হিশেবে গৃহীত। নারীবাদীরা নারীর অস্তিত্বকে দেখেন পিতৃতান্ত্রিক পীড়ন ও আধিপত্যের কাঠামোতে; তাঁরা মনে করেন পিতৃতন্ত্রের উদ্ভবই নারীর দুরবস্থার মূলে। কেউ কেউ পিতৃতন্ত্র ও পীড়নকে একার্থক ব'লেই মনে করেন। যেমন, মেরি ড্যালি পিতৃতন্ত্রের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে : 'পিতৃতন্ত্র, ধর্ষণবাদের ধর্ম'। ব্রাউনমিলার ধর্ষণের স্বরূপ দেখাতে গিয়ে দাবি করেন যে প্রকৃত ধর্ষণকারী কোনো ব্যক্তি নয়, প্রকৃত ধর্ষক হচ্ছে পিতৃতন্ত্র। তাঁর মতে ধর্ষণ পিতৃতন্ত্রের জন্যে দরকার; কেননা ধর্ষণ পিতৃতন্ত্রের আধিপত্যের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ নয়, ধর্ষণ পিতৃতন্ত্রকে বিপন্ন করে না; বরং কাজ করে পিতৃতন্ত্রের সেনাবাহিনীর মতো। পিতৃতন্ত্র 'পৌরুষ'কে দেখে যে-মুগ্ধ চোখে, আর পোষণ করে যে-নারীবিদ্বেষ, তাতে গ'ড়ে ওঠে এমন গণমনস্তত্ত্ব, যা উৎসাহিত করে ধর্ষণকে। পুরুষের মধ্যে কেউ কেউ ধর্ষণের কাজ করে, সবাই করে না; তবে সব পুরুষই সম্ভাব্য ধর্ষণকারী। সুযোগ পেলে, যেমন যুদ্ধের সময় অবরোধকারী সেনাবাহিনী উল্লাসের সাথে করে (স্মরণীয় : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কোরিয়ায় জাপানি বাহিনী; ১৯৭১-এ বাঙলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী) সব পুরুষই ধর্ষণের কাজটি করতে পারে; আর বহু স্বামী বাসর ঘরে ও অন্যান্য সময় যে-যৌন আচরণ করে, তা ধর্ষণের পর্যায়ে পড়ে। বহু স্বামী নিয়মিতভাবে ধর্ষণ করে স্ত্রীদের। ইতিহাস ভ'রেই ধর্ষণ চ'লে আসছে, যদিও তা স্বীকার করা হয় নি। ব্রাউনমিলারের মতে ধর্ষণ বৈধতা দেয় পিতৃতন্ত্রকে। কর্ম হিশেবে ধর্ষণ বর্বরভাবে নারীকে করে পুরুষের ইচ্ছার অধীন; আর ভীতি হিশেবে ধর্ষণ সব সময় খবরদারি করে নারীর আচরণের ওপর। ধর্ষণ সীমিত করে নারীর স্বাধীনতা; প্রচার করে পিতৃতন্ত্রের ভাবাদর্শ যে পুরুষের রক্ষণাবেক্ষণ নারীর সব সময়ই দরকার। নারী যেখানেই যায় কোনো-না-কোনো মহৎ পুরুষ তার অভিভাবকত্ব করে; তাকে আগলে রাখতে চায়। এটা দেখেই মে ওয়েস্ট পরিহাস ক'রে বলেছিলেন, 'কী মজার, যে-পুরুষেরই সাথে দেখা হয় সে-ই আমাকে রক্ষা করতে চায়; আমি বুঝতে পারি না কী থেকে'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রাউনমিলার বের করতে চেয়েছেন ধর্ষণের প্রতি পিতৃতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি। আদি বাইবেলের ইহুদি বিধান থেকে সামন্ততন্ত্রের বিধান পর্যন্ত সমাজ ধর্ষণকে দেখেছে কী চোখে? বাইবেলি আর সামন্ত সমাজের চোখে ধর্ষণ কোনো নারীর কাছে কোনো পুরুষের অপরাধ নয়; ধর্ষণ ছিলো এক পুরুষের কাছে আরেক পুরুষের অপরাধ। ধর্ষণ বিবেচিত হতো চৌর্যবৃত্তি ব'লে, যাতে একটি পুরুষ চুরি করতো আরেক পুরুষের ধন; –ওই বিধানে চোর কোনো নারীর কাছে অপরাধ করতো না, করতো আরেক পুরুষের কাছে। অপরাধটি ছিলো যে চোর কোনো নারীকে চুরি করেছে তার বৈধ মালিকের– পিতা বা স্বামীর– কাছে থেকে; এবং হরণ করেছে তার সতীত্ব, যার মালিক তার পিতা বা স্বামী। নারীটি যদি অবিবাহিত হতো, ধর্ষণের ফলে নষ্ট হয়ে যেতো বিয়ের বাজারে তার পণ্যমূল্য; সতীত্ব নষ্ট হওয়ায় তার পরিবারের ওপর পড়তো কলঙ্ক। তখনকার বিচারব্যবস্থা পরিবারের প্রধানকে, পিতা বা স্বামীকে, ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যবস্থা করতো। ধর্ষিত মেয়েটিকে পাঠিয়ে দেয়া হতো যাজিকাশ্রমে, বা বিয়ে দেয়া হতো হরণকারী বা ধর্ষণকারীর সাথে। ধর্ষণের ফলে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত যে-নারী, তা স্থির করতে কয়েক হাজার বছর লেগেছিলো পিতৃতন্ত্রের।

ব্রাউনমিলার ও নারীবাদীদের মতে ধর্ষণ কিছু বিকৃত মনোব্যাধিগ্রস্ত মানুষের কাজ নয়, সমাজেরই কাজ; ধর্ষণ বিকারগ্রস্তের রোগ নয়, পিতৃতন্ত্রেরই রোগ। ব্রাউনমিলার বলেছেন, 'প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আজ পর্যন্ত, আমার বিশ্বাস, ধর্ষণ এক চরম ভূমিকা পালন ক'রে এসেছে; এটা এক সচেতন ভীতিপ্রদর্শনপ্রক্রিয়া, যার সাহায্যে সব পুরুষ সব নারীকে রাখে সন্ত্রস্ত অবস্থায়।' নারী বাস করে ধর্ষণকারীর দীর্ঘ ছায়ার নিচে। ধর্ষণ নারীর ওপর পুরুষের বলপ্রয়োগের মূল অস্ত্র; ধর্ষণ এক রাজনীতিক অপরাধ, নারীকে অধীনে রাখার পুরুষের চরম উপায়। ধর্ষণ যে এক রাজনীতিক অস্ত্র, এ-মতের বিকাশ ঘটে যুক্তরাষ্ট্রে; কেননা সেখানেই লৈঙ্গিক রাজনীতিতে ধর্ষণ একটি বড়ো হাতিয়ার ব'লে গণ্য হয়। যুক্তরাষ্ট্রে ধর্ষণের পরিমাণ ভীতিকরভাবে বেশি; ১৯৭৯ সালে জানা যায় ৭৫, ৯৮৯টি ধর্ষণের ঘটনা; এরপর আরো বাড়ে ধর্ষণের পরিমাণ। যুক্তরাষ্ট্রেই ধর্ষণকে রাজনীতিক রূপ দিয়েছে পুরুষেরাই; ব্ল্যাক প্যান্থার নেতা এলড্রিজ ক্লিভার কালোদের সংগ্রামের কৌশল হিশেবে অনুসারীদের নির্দেশ দেয় শ্বেত নারীদের ধর্ষণের। ধর্ষণ যে অনেকটা রাজনীতিক ব্যাপার এটা বোঝা যায় দখলকারী সেনাবাহিনী কর্তৃক অধিকৃত অঞ্চলের নারীদের ধর্ষণের ঘটনায়। ব্রাউনমিলার মনে করেন ধর্ষণের উদ্ভব ঘটেছে আদিকাল থেকে পুরুষের দেহ ও মনস্তত্ত্বের বিবর্তনের ফলে; তবু এটা একটি রাজনীতিক অপরাধ। পুরুষই শুধু ধর্ষণ করতে পারে, নারী পারে না। পুরুষের শরীরসংগঠন ধর্ষণের যোগ্যতাসম্পন্ন। ব্রাউনমিলার বলেছেন, 'ধর্ষণ করার জন্যে পুরুষের শারীরিক যোগ্যতাই সৃষ্টি করেছে পুরুষের ভাবাদর্শ, যার নাম ধর্ষণ।'

ধর্ষণের পরিমাণ সব দেশে সমান নয়, সংস্কৃতি থেকে সংস্কৃতিতে পার্থক্য রয়েছে ধর্ষণহারের। সব সমাজ ধর্ষণকারীদের সমানভাবে অনুপ্রাণিত করে না। কিছু সমাজ অনেকটা ধর্ষণমুক্ত, কিছু সমাজ প্রচণ্ড ধর্ষণপ্রবণ। পশ্চিম সুমাত্রা প্রায়ধর্ষণমুক্ত; সেখানে ধর্ষণকারী নিজেকে ছোটো করে, ছোটো করে তার আত্মীয়পরিজনকে। সেখানে সবাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিহাস করে তার পৌরুষকে; তার ভাগ্যে জোটে পীড়ন, কখনো মৃত্যু; অনেক সময় সে নির্বাসিত হয় গ্রাম থেকে, যেখানে সে আর ফিরে আসতে পারে না। কিছু সমাজ ধর্ষণপ্রবণ, যেমন বাঙলাদেশ। কোন সমাজ উৎসাহিত করে ধর্ষণ? যে-সমাজ বিশৃঙ্খল, যে-সমাজে মৌলবাদের বিকাশ ঘটছে কিন্তু মৌলবাদী কঠোরতা নেই, যে-সমাজ পুরুষাধিপত্যবাদী, যে-সমাজে কারোই নিরাপত্তা নেই, আর নারী যেহেতু সমাজে সবচেয়ে অসহায়, তাই সেখানে ধর্ষণ প্রকটরূপে দেখা দেয়। বাঙলাদেশে মাস্তান ছাড়া সবাই অসহায়; তাই বাঙলাদেশ হয়ে উঠেছে ধর্ষণের লীলাভূমি। ম্যালিনোস্কি বলেছেন, 'কাম, বিস্তৃততম অর্থে, শুধু দুটি মানুষের শারীর সম্পর্ক নয়, এটা এক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শক্তি।' নৃতাত্ত্বিকরা মনে করেন নারীপুরুষের লৈঙ্গিক পার্থক্যের পেছনে প্রাকৃতিক যে-ভিত্তিই থাকুক-না-কেনো, নারী আর পুরুষ, কাম আর সন্তান উৎপাদন সাংস্কৃতিক ব্যাপার। বিভিন্ন সংস্কৃতিতে ধর্ষণের ব্যাপার দেখে এ-মতটিকেই মেনে নিতে হয়। পুরুষ জন্মসূত্রেই পাশবিক বা ধর্ষণপ্রবণ এটা কোনো কাজের কথা নয়; মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি দিয়ে ধর্ষণের ব্যাপার ব্যাখ্যা করা যায় না। কামের জৈবিক ভিত্তি অবশ্যই রয়েছে, তবে বিভিন্ন সংস্কৃতিতে ধর্ষণের ঘটনার যে ভিন্নতা দেখা যায়, তাতে এটা স্পষ্ট যে সংস্কৃতি মানুষের কামপ্রবৃত্তিকে প্রবলভাবেই চালিত করে। ধর্ষণ পুরুষাধিপত্যের সামাজিক ভাবাদর্শেরই প্রকাশ। ধর্ষণপ্রবণ সমাজে নারীর ক্ষমতা আর আধিপত্য নেই, নারী সেখানে কোনো সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিতে পারে না– যদিও কোনো নারী হঠাৎ সরকারপ্রধান হয়ে যেতে পারে; সেখানকার পুরুষেরা ঘৃণা করে নারীর সিদ্ধান্ত। ধর্ষণপ্রবণ সমাজে পৌরুষ বলতে বোঝানো হয় হিংস্রতা আর কঠোরতা। বাঙলাদেশ এমনই এক সমাজ।

AMARBOI.COM

জীববিজ্ঞানীরা বিবর্তনবাদের আলোকে ব্যাখ্যা করেন ধর্ষণ ব্যাপারটিকে। তাঁদের মতে ধর্ষণ পুরুষের এমন আচরণ, যা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বিবর্তনতত্ত্বের বিরোধী। তবে তাঁরা মনে করেন ধর্ষণ হয়তো বিবর্তনের ফলে উদ্ভূত বিশেষ শর্তনির্ভর এক আচরণ। এ-মত অনুসারে ধর্ষণে লিপ্ত হয় সে-পুরুষেরাই, যারা কাঙ্ক্ষিত সঙ্গিনীকে পাওয়ার প্রতিযোগিতায় ব্যর্থ, যারা প্রয়োজনীয় সম্পদ আর মর্যাদার অধিকারী নয়। এ-মতের ভিত্তি হচ্ছে বলপ্রয়োগে সঙ্গমের তুলনামূলক জীববিজ্ঞান। জীববিজ্ঞানীরা প্যানোর্পা প্রজাতির বৃশ্চিকমক্ষিকার আচরণ পর্যবেক্ষণ ক'রে কীভাবে বলপ্রয়োগে সঙ্গমের উদ্ভব ঘটেছে, সে-সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন। ব্যাপারটি এমন। পুরুষ প্যানোর্পা ক'রে থাকে তিন রকম যৌন আচরণ। প্রথম আচরণ দুটি বেশ মধুর, বেশ সফল পুরুষের আচরণ : এ-ক্ষেত্রে পুরুষ প্যানোর্পা বিনামূল্যে কাম চরিতার্থ করতে চায় না; সে সঙ্গম চায় খাদ্যের বিনিময়ে– সে সঙ্গমের আগে নারী প্যানোর্পার সামনে খাবার রাখে; নারী প্যানোর্পাটি যখন খাবার খেতে থাকে, তখন পুরুষটি সঙ্গমের কাজ সম্পন্ন করে। তৃতীয় আচরণটি হচ্ছে সবল সঙ্গম বা বলাৎকার বা ধর্ষণ। এ-ক্ষেত্রে পুরুষ প্যানোর্পা নারী প্যানোর্পাকে কোনো সঙ্গমপূর্ব খাবার দিতে পারে না, তাই নারী প্যানোর্পাকে সে আকৃষ্ট করতে পারে না। নারী প্যানোর্পা তার আবেদনে সম্মত হয় না ব'লে সে বলপ্রয়োগ করে। পাশ দিয়ে কোনো নারী প্যানোর্পা যাচ্ছে দেখলেই পুরুষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্যানোর্পা তার দিকে ছুটে যায়, নিজের নমনীয় তলপেট বাড়িয়ে দেয়। যদি সে নারীটির একটি পা বা পাখা আটকে ধরতে পারে, তবে সে নারী প্যানোর্পাটিকে স্থাপন করে নিজের জন্যে সুবিধাজনকভাবে, বলপ্রয়োগে কাবু ক'রে ফেলে নারী প্যানোর্পাটিকে, এবং শক্ত ক'রে ধ'রে সঙ্গমের কাজ সম্পন্ন করে। পুরো কাজের সময় সে নারী প্যানোর্পাটিকে শক্তভাবে ধ'রে রাখে। পুরুষ প্যানোর্পার এ-বলাৎকারকে কিছুতেই অস্বাভাবিক বা বিকৃত আচরণ বলা যায় না;–প্যানোর্পাদের সমাজ রাষ্ট্র সভ্যতা বিজ্ঞান দর্শন মনোবিজ্ঞান নেই। কিছু কিছু পুরুষ প্যানোর্পার মধ্যে এ–ধরনের আচরণের বিকাশ ঘটেছে বিবর্তনের ফলেই।

নারী প্যানোর্পার আচরণও লক্ষ্য করার মতো;– যে-পুরুষ প্যানোর্পা তাকে সঙ্গমপূর্ব দেনমোহর বা খাবার দিতে পারে, তার সাথে নারী প্যানোর্পা বেশ মধুর আচরণ করে; আর যে-পুরুষ প্যানোর্পা সঙ্গমপূর্ব খাবার দিতে পারে না, তাকে সে নিজের কাছে ঘেষতে দেয় না, তার কাছ থেকে সে দ্রুত পালিয়ে বাঁচে। এমন গরিব পুরুষ প্যানোর্পা তাকে ধ'রে ফেললে সে তার কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্যে লড়াই করে; কিন্তু সম্পদশালী পুরুষ প্যানোর্পা সঙ্গম করতে চাইলে সে বাধা দেয় না। নারী প্যানোর্পার সাথে সঙ্গমের জন্যে পুরুষ প্যানোর্পা কৌশল তিনটির কোনটি প্রয়োগ করবে, তা নির্ভর করে খাবারের সুলভতা-দুর্লভতার ওপর। এগুলোর খাদ্য হচ্ছে মরা সন্ধিপদী পতঙ্গ। সঙ্গমের অধিকার লাভের জন্যে পুরুষ প্যানোর্পা প্রথম যে-কৌশলটি প্রয়োগ করে, সেটিই শ্রেষ্ঠ কৌশল;–সে নারী প্যানোর্পার সামনে মরা পতঙ্গ নিবেদন করে। মরা পতঙ্গের অভাবে সে বেছে নেয় দ্বিতীয় কৌশলটি;–সে নারীটিকে নিবেদন করে নিজের ভেতর থেকে নিঃসৃত লালা। কিন্তু লালাও যদি সে দেনমোহর হিশেবে দিতে না পারে, তখন বেছে নেয় চরম কৌশলটি–সে নারী প্যানোর্পাটিকে জোর ক'রে ধ'রে সঙ্গম করে। পুরুষ প্যানোর্পার দেহের আকৃতিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বড়ো আকারের পুরুষ প্যানোর্পা সাধারণত খাবার বা লালা নিবেদন করতে পারে, তাই তার বলাৎকার করার দরকার পড়ে না; বলাৎকার সাধারণত ক'রে থাকে ছোটো আকারের পুরুষ প্যানোর্পা।

পুরুষ প্যানোর্পা সঙ্গমের কোন পদ্ধতি গ্রহণ করবে, তা নির্ভর করে তার যোগ্যতার ওপর; আর তার যোগ্যতার বিচারক হচ্ছে নারী প্যানোর্পা। নারী প্যানোর্পার কাছে সে-পুরুষ প্যানোর্পাই সবচেয়ে যোগ্য, যে খাবার হিশেবে মরা পতঙ্গ সরবরাহ করতে পারে। যে-পুরুষ প্যানোর্পা লালা নিবেদন করে, আর যে-পুরুষ প্যানোর্পা মরা পতঙ্গ নিবেদন করে, তাদের মধ্যে পতঙ্গশালী প্যানোর্পার সাথেই সে সঙ্গমে সম্মত হয়। যে খাবার বা লালা কিছুই যোগাতে পারে না, শুধু জোর ক'রে সঙ্গম করতে চায়, এমন পুরুষের সাথে সে মিলতেই রাজি হয় না; তার উদ্যোগকে সে সব শক্তি দিয়ে বাধা দেয়। পুরুষ প্যানোর্পার বলপ্রয়োগে সঙ্গম নারী প্যানোর্পার পছন্দ নয়; শুধু জোর ক'রেই পুরুষ প্যানোর্পা নারী প্যানোর্পার ওপর এমন কাজ সম্পন্ন করে।

সঙ্গমের অধিকার লাভের জন্যে পুরুষ প্যানোর্পারা যে-প্রতিযোগিতার ভেতর দিয়ে যায়, তার প্রকৃতি দেখে সিদ্ধান্তে পৌছোনো সম্ভব যে যেখানে সঙ্গমের সঙ্গিনী লাভ সম্পদের ওপর নির্ভরশীল, সেখানে একটি বিকল্প আচরণরূপে বিকশিত হ'তে পারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলপ্রয়োগে সঙ্গম। যখন নারী তার সঙ্গী বেছে নেয় পুরুষের সম্পদ ও মর্যাদা অনুসারে, আর পুরুষদের মধ্যে একদল থাকে সম্পদশালী ও মর্যাদাসম্পন্ন, এবং আরেকদল থাকে সম্পদ ও মর্যাদাহীন, তখন সম্পদ আর মর্যাদাহীনেরা ধর্ষণকেই বেছে নিতে পারে কার্যকর বিকল্পরূপে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে প্যানোর্পার আচরণ থেকে আহরিত এ-সিদ্ধান্ত মানুষের ক্ষেত্রে প্রোযোজ্য কি না? আমরা কি বলবো যেহেতু কিছু কিছু অমনুষ্য প্রাণীর পুরুষেরা বিশেষ কারণে বলপ্রয়োগে সঙ্গমে লিপ্ত হয়, তাই মনুষ্য পুরুষেরাও লিপ্ত হবে বলাৎকারে? আমরা কি বলবো যে বিবর্তনের ফলে যেমন প্যানোর্পার মধ্যে একটি বিকল্প আচরণ হিশেবে দেখা দিয়েছে বলপ্রয়োগে সঙ্গম, একইভাবে বিবর্তনের ফলেই মানুষ পুরুষের মধ্যে বিকশিত হয়েছে বলাৎকার বা ধর্ষণ? প্যানোর্পার আচরণ দিয়ে আমরা মানুষের আচরণকে গ্রহণযোগ্য করতে পারি না।

তবে বহুপত্নীক বিবাহসংশ্রয়ে যেখানে পুরুষদের মধ্যে রয়েছে যৌন প্রতিযোগিতা, সেখানে বিবর্তনমূলক নির্বাচন কীভাবে কাজ করতে পারে, তা খুঁজে দেখতে পারি। বিয়ে করা তো আসলে কামপ্রতিযোগিতা। বহুপত্নীক বিবাহ এমন সংশ্রয়, যাতে কম সংখ্যক পুরুষ যৌন সম্পর্কে মিলিত হ'তে পারে বহুসংখ্যক নারীর সাথে। এ-পদ্ধতিতে পুরুষদের মধ্যে চলে সাফল্যের প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা, কেননা সফল পুরুষেরাই শুধু লাভ করতে পারে কাম্য– সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী আবেদনময়ী– নারী। সফল পুরুষেরা আকর্ষণীয় নারীর কাছে। মানুষ প্রজাতির মধ্যে পুরুষের বহুপত্নীত্বের ব্যাপারটি অনেকটা বিবর্তনের ফলেই উদ্ভূত হয়েছে ব'লে অনেকে মনে করেন। অনেক সমাজে হারেমে বহুপত্নী রাখা অনুমোদিত। এমন সমাজে কিছু পুরুষ বহু নারীর সাথে মিলিত হয়, অধিকাংশ পুরুষ এক সময়ে এক নারীর সাথে মিলিত হয়, আর বহু পুরুষ কোনো নারীর সাথেই মিলনের সুযোগ পায় না। সব সমাজেই কমবেশি বহুপত্নীকতা রয়েছে। মানব সমাজের এ-বহুপত্নীকতা প্রত্যক্ষভাবে নারী লাভের জন্যে সৃষ্টি করে পুরুষের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা, আর পরোক্ষভাবে সৃষ্টি করে ধন ও মর্যাদা লাভের প্রতিযোগিতা। ধন ও মর্যাদা পিতৃতন্ত্রের নারীর কাছে খুবই আকর্ষণীয়।

ধর্ষণ হচ্ছে পুরুষ কর্তৃক বলপ্রয়োগে নারীসঙ্গম। বলপ্রয়োগে সঙ্গম হচ্ছে সে-সঙ্গম, যাতে নারীর স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন সম্মতি নেই। এতে সব সময় বলপ্রয়োগের দরকার পড়ে না। ধর্ষণ পুরুষের এমন আচরণ, যা নারীকে তার সঙ্গী নির্বাচনের অধিকার দেয় না। বিবর্তনবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্ষণ তখনই সংঘটিত হয়, যখন পুরুষ নারীর পছন্দকে বিপর্যস্ত ক'রে বলপ্রয়োগে তার সাথে সঙ্গম করে। এটা নারীর দুটি বিবর্তনমূলক স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে : নারীর যৌনসঙ্গী বাছাইয়ের অধিকার নষ্ট করে, আর ধন ও মর্যাদার বিনিময়ে নিজের শরীর দানের অধিকারকে অস্বীকার করে। থর্নহিল ও অন্যান্য (১৯৮৬) সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে বিবর্তনের একটি পরিণতিরূপেই বিকাশ ঘটেছে ধর্ষণের। তাঁরা নারীবাদীদের ধর্ষণতত্ত্বকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। তাঁদের মতে পুরুষাধিপত্যই যদি থাকতো ধর্ষণের মূলে, তাহলে পুরুষ ক্ষমতাশালী বয়স্ক নারীদের ধর্ষণ করতো; কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় ধর্ষণকারীদের লক্ষ্য সাধারণত যুবতী ও দরিদ্র নারী। তাঁদের মতে নারীবাদীদের তত্ত্ব জ্ঞাপন করে যে সব শ্রেণী ও বয়সের পুরুষেরাই ধর্ষণকারী; তাও সত্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়; ধর্ষণকারীরা সাধারণত তরুণ ও দরিদ্র।

জীববিজ্ঞানীদের ধর্ষণতত্ত্বে বেশ সত্য রয়েছে, যাকে বলতে পারি জীবতাত্ত্বিক সত্য; নারীবাদীদের তত্ত্বে রয়েছে সামাজিকসাংস্কৃতিক সত্য, যা, বিবর্তনের বর্তমান পর্যায়ে, জীববৈজ্ঞানিক সত্যের থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। জীববিজ্ঞানের সূত্রে দাবি করতে পারি যে হত্যা, স্বৈচারাচার, পীড়ন, লুণ্ঠন, শোষণ প্রভৃতি প্রবণতা উদ্ভূত হয়েছে বিবর্তনের ফলেই; তবে বিবর্তনের সূত্রের সাহায্যে সামাজিকরাজনীতিক অন্যায়কে বিধানসম্মত করা যায় না। মানুষ প্যালেয়াপী নয়, মানুষ সামাজিকসাংস্কৃতিক প্রাণী; এবং মানুষের বর্তমান পর্যায়ে কেউ অন্য কারো ওপর আধিপত্য করার অধিকার রাখে না। পুরুষের ধর্ষণের প্রবণতা রয়েছে, কোনো সন্দেহ নেই; না থাকলে পুরুষ ধর্ষণ করতো না; কিন্তু ধর্ষণে তাকে উৎসাহ দেয় পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। ধর্ষণরোধের উপায় হচ্ছে সমাজরাষ্ট্রের সব এলাকায় নারীর প্রতিষ্ঠা, পুরুষের সমান প্রতিষ্ঠা; তবে তাতেও হয়তো ধর্ষণ লুপ্ত হবে না। ধর্ষণ প্রতিরোধের জন্যে নারীকে হয়ে উঠতে হবে পুরুষের সমকক্ষ– ঘরে ও বাইরে, এবং শারীরিক শক্তিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনা

নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনার বিকাশ গত আড়াই দশকের সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনার এলাকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নারীবাদীরা যেমন আক্রমণ করেছেন ও বদলে দিতে চেয়েছেন পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক ও রাজনীতিক কাঠামো, তেমনি আক্রমণ করেছেন ও বদলে দিতে চেয়েছেন পুরুষতান্ত্রিক সমস্ত লিঙ্গবাদী চিন্তাধারা। পিতৃতান্ত্রিক চিন্তা, আবেগ, উপলব্ধি, ও প্রচারের এক প্রধান এলাকা সাহিত্য। গত কয়েক হাজার বছরের বিশ্বসাহিত্য পুরুষতান্ত্রিকতার বিশ্ব; পুরুষ সৃষ্টি করেছে ওই সাহিত্য, তৈরি করেছে তার তত্ত্ব, করেছে মূল্যায়ন। সাহিত্য সৃষ্টি ও ব্যাখ্যার সমগ্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে; সেখান থেকে নারী শুধু বাদই পড়ে নি, তাতে তৈরি করা হয়েছে নারীর মিথ্যে ভাবমূর্তি, নিন্দিত হয়েছে নারী। পুরুষ আশা করে নি যে নারী সৃষ্টি করবে সাহিত্য, তবু নারী সাহিত্য সৃষ্টি করেছে, তবে তা মূল্য পায় নি পুরুষের কাছে, বা পুরুষ তার অপব্যাখ্যা করেছে। বিশ্বসংস্কৃতির অজস্র পুরাণে পুরুষকেই দেখানো হয়েছে সৃষ্টিশীল ব'লে; সৃষ্টিশীলতার সব এলাকায়– ধর্ম, শিল্পকলা, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে স্বীকৃতি পেয়েছে শুধু পুরুষের সৃষ্টিশীলতা। সব ধর্মেই বিধাতা পুরুষ, যে শূন্যতা থেকে সৃষ্টি করেছে বিশ্ব। শেলি, কোলরিজ, কিট্স্, রাসকিন লেখককে দেখেছেন পুরোহিত, ধর্মপ্রবর্তক, যোদ্ধা, বিধানপ্রণেতা, বা সম্রাটরূপে; অর্থাৎ পুরুষের চোখে পুরুষই সৃষ্টিশীল। পুরুষের চোখে নারীও পুরুষেরই সৃষ্টি। ওই নারীর, পিগম্যালিঅনের আইভরি তরুণীর মতো, কোনো নাম বা সত্তা বা কণ্ঠস্বর নেই। নারী বস্তু, নারী অপর। নারী শুধু বস্তু নয়, পুরুষের চোখে নারী শিল্পকর্ম; নারী মর্মর মূর্তি, বা পুতুল, বা কবিতা, নারী কখনো ভাস্কর বা কবি নয়। শেক্সপিয়রের ওথেলো (৪:২) দেসদিমোনার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে : 'এই শুভ্র কাগজ, এই উৎকৃষ্টতম বইটি,/কি তৈরি হয়েছিলো এতে 'বেশ্যা' লেখার জন্যে?' নারী লেখে না, লিখিত হয়, নারী কবিতাকল্পনালতা; নারী আঁকে না, অঙ্কিত হয়; নারী ভাস্কর হয় না, ভাস্কর্য হয়।

হেনরি জেমসের *এক মহিলার ছবিতে* শুদ্ধ এক তরুণীকে বর্ণনা করা হয়েছে 'কাগজের একটি শূন্য পৃষ্ঠা' রূপে; সে 'এতো সুন্দর ও মসৃণ পৃষ্ঠা যে তাকে এক সময় ভ'রে তুলতে হবে মানসিক উন্নতিসাধক পাঠে।' জেমসের চোখে অভিজ্ঞ নারী এমন কাগজ, 'যার ওপর নানান হাত লিখেছে নানান পাঠ।' কনরাডের *বিজয়*-এ অ্যালমা 'এক অপরিচিত ভাষার লিপির মতো', বা 'নিরক্ষরের কাছে যে-কোনো লিপির মতো'। সমালোচকেরাও সাহিত্যপাঠকে বর্ণনা করেন লৈঙ্গিক ভাষায়। দেরিদা কলমকে শিশ্নের সাথে, আর যোনিচ্ছদকে কাগজের সাথে অভিন্ন ক'রে দেখেছেন। কলম-শিশ্ন লিখে চলে কুমারী পৃষ্ঠার ওপর, এ-বোধের ঐতিহ্য বেশ দীর্ঘ। এ-বোধ অনুসারে লেখক পুরুষ, ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রধান; নারী তার অক্রিয় সৃষ্টি, গৌণ বস্তু, যার নেই কোনো স্বায়ত্তশাসিত সত্তা, যার কখনোবা স্ববিরোধী অর্থ রয়েছে কিন্তু কোনো অভিপ্রায় নেই। এ-ধারা সংস্কৃতিসৃষ্টির প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেয় নারীকে, এবং গণ্য করে শিল্পকর্মরূপে। উনিশশতকে অনেক নারী লেখক হ'তে গিয়ে সমস্যায় পড়েন, কেননা কলম তাঁদের জন্যে নয়; কলম ধরা তাঁদের কাছে মনে হয় দানবিক কাজ, তাই তাঁরা নেন নানা কৌশল। এ-কৌশলগুলো সান্ড্রা এম গিলবার্ট ও সুজান গুবার বর্ণনা করেছেন *দি ম্যাড ওম্যান ইন দি অ্যাটিক : দি ওম্যান রাইটার অ্যান্ড দি নাইনটিন্থ-সেঞ্চুরি লিটেরেরি ইমাজিনেশন* (১৯৭৯) বা *চিলেকোঠার পাগলী*তে। সুজান গুবার আইসাক ডিনেসেনের 'শূন্যপৃষ্ঠা' নামের একটি গল্প ব্যাখ্যা ক'রে দেখিয়েছেন পুরুষতান্ত্রিক ঐতিহ্য বিশ্বাস করে যে নারীর পক্ষে শিল্পী হওয়া অসম্ভব, তবে সে নিজেকে রূপান্তরিত করতে পারে শিল্পকর্মে। তিনি আরো দেখিয়েছেন অনেক নারী বোধ করে যে শরীরই তাদের শিল্পসৃষ্টির একমাত্র মাধ্যম। এর ফলে নারী শিল্পী ও তার শিল্পকর্মের মধ্যে কোনো দূরত্ব থাকে না। নারীদেহ যে-সব রূপক সরবরাহ করে, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে রক্তের রূপক, তাই নারীর শিল্পসৃষ্টি হয়ে ওঠে একধরনের যন্ত্রণাকর ক্ষত। প্রসবে ও লেখায় নারীর নিয়তি যন্ত্রণা।

নারীবাদীরা পুরুষের সৃষ্টিশীলতাতত্ত্ব মানেন নি, এবং পুরুষের সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনারীতিকে সংশোধন করার জন্যে গ'ড়ে তোলেন নিজেদের সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনারীতি। এ-ক্ষেত্রে গত আড়াই দশকে সবচেয়ে বিপ্লবাত্মক কাজ করেছেন তাঁরাই, যদিও পুরুষতান্ত্রিক সমালোচকেরা আজো দ্বিধা করেন তা স্বীকার করতে। অনেকে শুধু দ্বিধা নয় ক্ষুব্ধ বোধ করেন। তাঁদের মতে নারীবাদী সাহিত্য সমালোচনার কাজ 'মহৎ পুরুষ লেখকদের ধ্বংস করা'; এটা 'সমালোচনার মুখোশ প'রে নারীবাদী অপপ্রচার'। নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনার লক্ষ্য সব সময়ই রাজনীতিক; এর প্রচেষ্টা পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার ত্রুটি বের করা। নারীবাদী সমালোচনার একটি ধারা দেখা দিয়েছিলো মেরি ওলস্টোনক্র্যাফ্‌টের *ভিন্ডিকেশন অফ দি রাইট্‌স্ অফ ওম্যান*-এই (১৭৯২), যেখানে তিনি পুনর্বিচার ও তিরস্কার করেন রুশো ও পুরুষতন্ত্রের নানা মহাপুরুষকে; তবে এর ধারাবাহিক বিকাশ ঘটে নি। তাই উনিশশতকে নারীবাদী সমালোচনা, স্ট্যান্টনের *নারীর বাইবেল* (১৮৯৫) ছাড়া, বিশেষ চোখে পড়ে না। এ-শতকেও ১৯৬৯-এর মধ্যে নারীবাদী সমালোচনার বই বেরোয় গুটিকয় : ভার্জিনিয়া উল্‌ফের *এ রুম অফ ওআন্স ঔন : কারো নিজের ঘর* (১৯২৭), সিমোন দ্য বোভোয়ারের *দ্বিতীয় লিঙ্গ* (১৯৪৯), ক্যাথরিন এম রজার্সের *দি ট্রাবলসাম হেল্পমেট : বিরক্তিকর সহধর্মিণী* (১৯৬৬), মেরি এলমানের *থিংকিং অ্যাবাউট উইমেন : নারীদের সম্পর্কে ভাবনাচিন্তা* (১৯৬৮), এবং কেইট মিলেটের *সেক্সুয়াল পলিটিক্স : লৈঙ্গিক রাজনীতি* (১৯৬৯)। নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনার বিকাশ ঘটে নারীবাদী সংগ্রামের এক শক্তিশালী অঙ্গরূপে। নারীবাদী সংগ্রাম চায় পিতৃতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস বা রূপান্তরিত করতে; সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনা করতে চায় একই কাজ, ভিন্নভাবে ভিন্ন এলাকায়। তাই তত্ত্ব ও সমালোচনায় নারীবাদীদের মিলন ঘটাতে হয়েছে রাজনীতি ও সমালোচনার। প্রথাগত পুরুষি সমালোচনার মানদণ্ডে চলতে পারে না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারীবাদী সমালোচকের, তাঁদের খুঁজতে হয়েছে ভিন্ন মানদণ্ড। নারীবাদী সমালোচনা ভালো লাগার কথা নয় প্রথাগত পুরুষ সমালোচক ও পুরুষি প্রতিষ্ঠানগুলোর। নারীবাদী সমালোচকদের সামনে খোলা ছিলো দুটি পথ : প্রচলিত মানদণ্ডের সাথে সন্ধি ক'রে পুরুষের স্বীকৃতি আদায় করা, অথবা প্রতিষ্ঠিত মানদণ্ডগুলোকে ঘৃণাভরে বর্জন ক'রে নিজেদের নতুন মানদণ্ড তৈরি করা। নারীবাদীরা বেছে নেন দ্বিতীয় পথ। নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনার দুটি ধারা রয়েছে : একটি ইঙ্গমার্কিন, অন্যটি ফরাশি। এর মাঝে ইঙ্গমার্কিন ধারাটিই অর্জন করেছে প্রাধান্য।

বিশশতকের ষাটের দশকের শেষ থেকে, আন্তর্জাতিক নারীবাদের এক প্রবল শাখারূপে, বিপ্লবাত্মক বিকাশ শুরু হয় নারীবাদী সমালোচনা ও সাহিত্যতত্ত্বের, এবং অনেকখানি বদলে দেয় সাহিত্য মূল্যায়নের প্রথাগত রীতি। বিশ্ব জুড়ে এতোকাল ধ'রে নেয়া হয়েছে যে পুরুষই লেখক, পাঠক, সমালোচক; নারীবাদীরা দেখান নারী সমালোচক ও পাঠক সাহিত্য উপলব্ধি করেন ভিন্নভাবে, ও সাহিত্যের কাছে তাঁদের প্রত্যাশা ভিন্ন। তাঁরা আরো দেখান যে বিশ্ব জুড়েই নারীরা সৃষ্টি করেছেন গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য। পুরুষের সভ্যতা জুড়ে কয়েক হাজার বছর ধ'রে সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনা থেকেছে পুরুষের অধিকারে, নারীবাদীরা ঢোকেন সেখানে, পুনর্মূল্যায়নের উদ্যোগ নেন পূর্ববর্তী সমগ্র সাহিত্যে। নারীবাদী সমালোচনার প্রধান মানদণ্ড লিঙ্গ। নারীবাদীরা বিকাশ ঘটান সাহিত্য সৃষ্টি, পাঠ, ও সমালোচনার লৈঙ্গিক স্বাতন্ত্র্যের তত্ত্ব। তাঁদের তত্ত্ব ও সমালোচনারীতি কোনো একক উৎস থেকে জন্মে নি, তাঁদের নেই কোনো পুণ্য বা ঐশী গ্রন্থ বা মহামাতা। যেমন রয়েছেন মার্ক্সীয়দের মার্ক্স, সাংগঠনিকদের সোস্যুর, মনোবিজ্ঞানবাদীদের ফ্রয়েড বা লাকাঁ, বিসংগঠনবাদীদের দেরিদা, নারীদের নেই তেমন কেউ। নারীরা নিরীশ্বর। একাধিক উৎসকে কাজে লাগিয়েছেন তাঁরা। তাঁরা নারীসাহিত্য পড়েছেন, জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, নৃতত্ত্বে গবেষণারত নারীবাদীদের সাথে ভাববিনিময় করেছেন, প্রচলিত সাহিত্যতত্ত্বের পুনর্মূল্যায়ন করেছেন, কৌশল ধার করেছেন মার্ক্সবাদ, ভাষাবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, বিসংগঠনবাদ থেকে, এবং গ'ড়ে তুলেছেন নিজেদের তত্ত্ব ও রীতি। যদিও আজো কোনো সমন্বিত সাহিত্যতত্ত্ব তাঁরা গ'ড়ে তুলতে পারেন নি– অনেকে তা চানও না, তবু সমন্বিত সাহিত্যতত্ত্বের দিকে তাঁরা এগিয়েছেন অনেকখানি। নারীবাদী সাহিত্যতাত্ত্বিক বা সমালোচককে যে নারীই হ'তে হবে, তা নয়; তবে নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনার বিকাশ ঘটান নারীরাই; তাঁরাই লড়াই করেন এর জন্যে, কখনো কখনো বিপদগ্রস্তও হন। তাঁরা চেষ্টা করেন তত্ত্ব ও ব্যক্তিতার সমন্বয় ঘটাতে। তাঁরা খোঁজেন নিজেদের একান্ত ভাষা, আঙ্গিক, কণ্ঠস্বর, সংগঠন, যা নিয়ে তাঁরা ঢুকতে পারেন পুরুষাধীন একটি এলাকায়। নারীবাদী সাহিত্যতাত্ত্বিক ও সমালোচকেরা কখনো ক্রুদ্ধ আর তিরস্কারমুখর, কখনো আবেগাতুর ও গীতিময়; আর তাঁদের তত্ত্ব ও সমালোচনায় মূর্ত তাঁদের নারীমুক্তির রাজনীতি। নারীবাদ নারীদের মহাজাগরণ, সাহিত্য সমালোচনায় ঘটে ওই মহাজাগরণেরই প্রকাশ। নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনা এক বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব, যাতে রয়েছে প্রতিষ্ঠিত কাঠামো ভাঙার উত্তেজনা ও নতুন দৃষ্টি আবিষ্কারের সাধনা। তাঁরা প্রকাশ করেছেন নানা নারীবাদী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রিকা, যাতে নিয়মিতভাবে বেরোয় নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনা বিষয়ক প্রবন্ধ। এগুলোর মধ্যে রয়েছে *ক্যামেরা অ্যাবস্কিউয়্যারা* : লস অ্যাঞ্জেলেস, *কোন্ডিশন্স* : ব্রুকলিন, *কানেকশন্স* : অকল্যান্ড, *ক্রিটিক্যাল ইনক্যোয়ারি* : শিকাগো, *ডায়াক্রিটিক্স* : ইথাকা, *ফেমিনিস্ট রিভিউ* : লন্ডন, *হেকেট* : কুইন্সল্যান্ড, *হের‍্যাসিজ* : নিউ ইঅর্ক, *এম/এফ* : লন্ডন, *সেইজ* : আটলান্টা, *সিনিস্টার উইজডম* : রকল্যান্ড প্রভৃতি।

নারীবাদী সাহিত্য সমালোচনার উন্মেষের বছরগুলোতে জোর দেয়া হয় পুরুষের লেখা সাহিত্যে লিঙ্গবাদ ও নারীবিদ্বেষের স্বরূপ উদঘাটনের ওপর। তাঁরা দেখান পুরুষ তৈরি করেছে ছকবাঁধা নারীভাবমূর্তি, সৃষ্টি করেছে দেবী ও দানবী; দেখান ধর্মগ্রন্থে, ধ্রুপদী ও জনপ্রিয় সাহিত্যে নারীকে পীড়ন ও অপব্যবহার করা হয়েছে নানাভাবে, আর নারীকে বাদ দেয়া হয়েছে সাহিত্যের ইতিহাস থেকে। সমাজে যেমন চলে নারীপীড়ন, নারী যেমন হয় ধর্ষণের শিকার, তেমনি যুগেযুগে সাহিত্যে পীড়িতধর্ষিত হয়েছে নারী। তাঁরা পুরুষের 'মহৎ' সাহিত্য ঘেঁটে দেখান যে তাতে নারীবিদ্বেষ পুরুষের নিশ্বাসের মতো। প্রচুর মহৎ সাহিত্যের মহিমা তাঁরা হরণ করেন। এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ কেইট মিলেট। মিলেটের *লৈঙ্গিক রাজনীতি* **(১৯৬৯) আধুনিক** নারীবাদের সবচেয়ে সাড়াজাগানো বই, পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, যাতে মিলন ঘটে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সমালোচনার; আর কাজ করে ধ্বংসাত্মক বোমার মতো। এটি শুধু সাহিত্য সমালোচনা নয়; এর রয়েছে তিনটি ভাগ : 'লৈঙ্গিক রাজনীতি', 'ঐতিহাসিক পটভূমি', এবং 'সাহিত্যিক প্রতিফলন'। প্রথম ভাগে মিলেট দেখান নারীপুরুষের লৈঙ্গিক রাজনীতির স্বরূপ, দ্বিতীয় ভাগে লেখেন উনিশবিশশতকের নারীমুক্তি আন্দোলনের নিয়তির ইতিহাস, তৃতীয় ভাগে উদ্ঘাটন করেন ডি এইচ লরেন্স, হেনরি মিলার, নরমান মেইলার, ও জাঁ জোনের লেখায় লৈঙ্গিক রাজনীতির রূপ। টোরিল মোই (১৯৮৫), যিনি অন্যায়ভাবেই কঠোর সমালোচনা করেছেন মিলেটের, তিনিও স্বীকার করেছেন, 'এটি সৃষ্টি করে যে-অভিঘাত, তাতে এটি হয়ে ওঠে পরবর্তী ইঙ্গমার্কিন নারীবাদী সমালোচনামূলক সমস্ত গ্রন্থের জননী ও অগ্রদূত, এবং ১৯৭০ ও ১৯৮০র নারীবাদীরা কখনোই মিলেটের পথিকৃৎ প্রবন্ধটির কাছে ঋণ স্বীকার বা তার সাথে দ্বিমত পোষণ করতে অস্বীকার করেন নি।' মিলেট বেরিয়ে আসেন সে-সময়ের মার্কিন নবসমালোচনার রীতি থেকে; নবসমালোচনা রীতির বিরোধিতা ক'রে তিনি যুক্তি দেন যে ঠিক মতো সাহিত্য বুঝতে হ'লে অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিবেশকে। মিলেটের সমালোচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য অসম্ভব অভাবিত প্রতিভাদীপ্ত সাহস। ১৯৬৯-এ যখন 'মহৎ' লেখকদের কাছে বিনীত থাকাই ছিলো সাহিত্য সমালোচনার আদব, তখন লরেন্স, মিলার, মেইলার, জাঁ জোনের সাথে প্রচণ্ড বেয়াদবি করেন মিলেট। তাঁর আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন এ-আধুনিকেরা। মিলেট লেখককে বিধাতা হিশেবে মানেন নি; তিনি পাঠককে ক'রে তোলেন লেখকের প্রতিদ্বন্দ্বী, এবং প্রশ্ন করেন পংক্তিতে পংক্তিতে। মিলেট সমালোচক-পাঠক হিশেবে বিনীত বা ভদ্রমহিলাসুলভ নন; তিনি লেখকের মুখোমুখি দাঁড়ান উদ্ধত বালকের মতো, প্রতি মুহূর্তে বিরোধিতা করেন লেখকের আধিপত্যের। তিনি মূর্তিভগ্নকারী; তাঁর সমালোচনা পড়ার পর ওই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধুনিক প্রধানদের ভাবমূর্তি আর আগের মতো থাকে না; তাঁরা ধ'সে পড়েন। মিলেটের রীতির একটু নমুনা দিচ্ছি। মিলেট (১৯৬৯) লরেন্স সম্পর্কে আলোচনার শুরুতে *লেডি চ্যাটার্লির প্রেমিক* (১৯২৮) থেকে উদ্ধৃত করেন প্রচণ্ড লিঙ্গবাদী এ-অংশটুকু :

"তোমাকে আমি দেখতে চাই!"

সে [মেলর্স] তার শার্ট খুলে ফেললো এবং লেডি জেইনের [যোনির অপভাষা] দিকে তাকিয়ে স্থিরভাবে দাঁড়ালো। নিচু জানালা দিয়ে সূর্যরশ্মি ঢুকে তার উরু আর কৃশ উদরকে, এবং জ্বলজ্বলে স্বর্ণ-লাল কেশের ছোটো মেঘের ভেতর থেকে জেগে ওঠা কৃষ্ণাভ ও তপ্ত চেহারার দাঁড়ানো শিশ্নকে আলোকিত ক'রে তুললো।

"কী অদ্ভুত!" সে ধীরে ধীরে বললো। "কী অদ্ভুতভাবে সে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে! কী বিশাল! এবং কী কৃষ্ণাভ এবং সুনিশ্চিত! সে কি তার মতো?"

পুরুষটি তার পাতলা শাদা শরীরের সম্মুখভাগের নিচের দিকে তাকিয়ে হাসলো। ছোট্ট বুকের মাঝখানে কেশের রঙ কৃষ্ণাভ, প্রায় কৃষ্ণ। কিন্তু উদরের মূলদেশে, যেখান থেকে শিশ্নটি মোটা ও ধনুকাকৃতি খিলানের মতো উঠে এসেছে, সেখানকার কেশ সোনা-লাল, ছোটো মেঘের মতো জ্বলজ্বলে।

"কী গর্বিত!" সে গুনগুন করলো, অস্বস্তি। "এবং কী প্রভুসুলভ! এখন বুঝতে পারছি কেনো পুরুষেরা এতো কর্তৃত্বপরায়ণ। কিন্তু সে [শিশ্ন] সত্যিই সুন্দর। অন্যেকটি মানুষের মতো! একটু ভীতিকর! তবে সত্যিই সুন্দর! এবং সে *আমার* দিকে আসছে!—" সে ভয়ে ও উত্তেজনায় অধর কামড়ে ধরলো।

পুরুষটি নীরবে নিচে তার শক্ত শিশ্নের দিকে তাকালো। ওটির কোনো বদল ঘটে নি।

... "ভোদা, তুই যা চাচ তা অইল ভোদা, কও তুই লেডি জেইনরে চাচ। জন টমাস [শিশ্নের অপভাষা] লেডি জেইনরে চায়!—"

"আহা, তাকে ক্ষেপিয়ো না," বিছানায় হাঁটু ভর ক'রে তার দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে এগোতে কোনি বললো। সে দু-হাতে তার কৃশ কটি ধ'রে তাকে নিজের দিকে টানলো যাতে তার ঝুলন্ত আন্দোলিত স্তনদুটি স্পর্শ করলো উত্তেজিত, উত্থিত শিশ্নের শীর্ষ, এবং তাতে লাগলো তরল পদার্থের ফোঁটা। সে পুরুষটিকে শক্তভাবে জড়িয়ে ধরলো।

"শোও!" সে বললো। "শোও। আমাকে হ'তে দাও!"

সে এখন খুবই তাড়ার মধ্যে।

মিলেট বলেন *লেডি চাটার্লির প্রেমিক* একটি আপাত-ধর্মীয় রচনা, যাতে এক আধুনিক নারীর আত্মার মুক্তি ঘটানো হয়েছে লেখকের নিজস্ব ধর্মমত 'শিশ্নের রহস্যে'র সাহায্যে। এখানে আবির্ভাব ঘটেছে শিশ্নদেবতার। অলিভার মেলর্স হচ্ছে চূড়ান্ত লরেন্সীয় পুরুষ, মনুষ্যদেব, সে মারাত্মক যৌনপীড়নে সক্ষম, তবে এ-উপন্যাসে কোনো যৌনপীড়ন নেই। এতে কনস্ট্যান্স চাটার্লিকে দেয়া হয়েছে ঈশ্বরদর্শনের অনুমতি। এ-বইটি অলিভার মেলর্সের শিশ্নের পূজানুষ্ঠান; এতে পুরুষের মহিমাকে উন্নীত করা হয়েছে এক অতীন্দ্রিয় ধর্মে। এটা লৈঙ্গিক রাজনীতির সবচেয়ে কর্তৃত্বপরায়ণ রূপ। লৈঙ্গিক রাজনীতিকদের মধ্যে লরেন্স সবচেয়ে প্রতিভাবান ও একাগ্র; তিনি সবচেয়ে নিপুণও, কেননা তিনি লৈঙ্গিক বার্তা জ্ঞাপন করেন নারীর চেতনার মাধ্যমে। নারীটিই আমাদের জানায় যে সোনালি যৌনকেশের জ্যোতিশ্চক্রের ভেতর থেকে জেগে ওঠা দাঁড়ানো শিশ্নটি সত্যিই 'গর্বিত', আর 'প্রভুসুলভ', এবং সর্বোপরি, 'সুন্দর'। সেটি 'কৃষ্ণাভ এবং সুনিশ্চিত', আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ভীতিকর' ও 'অদ্ভুত', যা নারীকে যেমন 'ভীত' করে তেমনি করে 'উত্তেজিত'। শিশ্নের দাঁড়ানো নারীকে দীক্ষিত করে এ-ধর্মে যে পুরুষাধিপত্য শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। কোনি চমৎকার শিষ্যের মতো সাড়া দেয়, 'এখন বুঝতে পারছি কেনো পুরুষেরা এতো কর্তৃত্বপরায়ণ।' এ-বইয়ের সঙ্গমদৃশ্যগুলো লেখা হয়েছে ফ্রয়েডীয় বিধিমতে যে 'নারী অক্রিয়, পুরুষ সক্রিয়।' এতে শিশ্নই সব, কোনি হচ্ছে 'ভোদা', যে-বস্তুর ওপর ক্রিয়া করা হয়। এভাবে বিশ্লেষণ ক'রে মিলেট লরেন্সকে মহিমাহীন ক'রে তুলেছেন।

মিলেটের মতো তীব্রভাবে না হ'লে একই কাজ করেন মেরি এলমান *থিংকিং অ্যাবাউট উইমেন : নারীদের সম্পর্কে ভাবনাচিন্তায়* (১৯৬৮)। তাঁর বইটি বেরোয় মিলেটের *লৈঙ্গিক রাজনীতির* এক বছর আগে, কিন্তু এটা, একান্তভাবেই সাহিত্যকেন্দ্রিক বই ব'লে, ততোটা সাড়া জাগায় নি। এলমান পিতৃতন্ত্রকে সামাজিক ও রাজনীতিকভাবে আক্রমণ করেন নি, তিনি আক্রমণ করেন সাহিত্যে রূপায়িত পুরুষতান্ত্রিক লিঙ্গবাদকে। মিলেটের *লৈঙ্গিক রাজনীতি* ও তাঁর *নারীদের সম্পর্কে ভাবনাচিন্তায়* জন্মে নারীবাদী সমালোচনার একটি ধারা, যা *নারীভাবমূর্তি সমালোচনা* নামে পরিচিত। পুরুষদের লেখায় নারীর ছক খোঁজেন এলমান, দেখান যে পুরুষ সমালোচকেরা নারীর লেখা বই আলোচনার সময়ও ব্যবহার করেন লৈঙ্গিক ধারণা। তাঁর মতে পশ্চিমি সংস্কৃতির বড়ো বৈশিষ্ট্য 'লৈঙ্গিক সাদৃশ্যমূলক চিন্তা', অর্থাৎ যে-কোনো চিন্তায়ই নারী বা পুরুষ ধারণাটি জেগে ওঠে, আর প্রধান হয়ে ওঠে পুরুষ ধারণাটি। পশ্চিম বা দু-গোলার্ধেরই সমস্ত চিন্তার মূলে আছে লিঙ্গভিন্নতার বোধ। সাহিত্য সমালোচনায়ও, তিনি দেখান, অত্যন্ত প্রবল লৈঙ্গিক চিন্তা; তিনি এর নাম দেন 'ফ্যালিক ক্রিটিসিজম' বা 'শৈশ্নিক সমালোচনা'। তাঁর মতে পুরুষ সমালোচকদের কাছে নারীর লেখা বইও নারী, সম্ভোগের সামগ্রী; ওই বই সমালোচনার নামে তাঁরা মাপামাপি করেন বইয়ের বক্ষ ও নিতম্ব। পুরুষ লেখক-সমালোচকদের লেখায় তিনি খুঁজে পান নারী ও নারীত্বের এগারোটি ছক; সেগুলো হচ্ছে নিরবয়বতা, অক্রিয়তা, অস্থিরতা, বন্দীত্ব, ধার্মিকতা, বস্তুজ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা, অযৌক্তিকতা, পরের ইচ্ছাপূরণে সম্মতি, দানবী ও মুখরা স্ত্রী।

নারীবাদী সমালোচনার এক উর্বর ধারা *নারীভাবমূর্তিমূলক সমালোচনা*। এ-ধারার অজস্র নিবন্ধ ও বই বেরিয়েছে। ১৯৭২-এ সুজান কোপেলম্যান কোরনিলনের সম্পাদনায় বেরোয় নারীভাবমূর্তিমূলক সমালোচনাসংগ্রহ *ইমেজেজ অফ উইমেন ইন ফিকশন : ফেমিনিস্ট পারস্পেকটিভ্‌স্ :: কথাসাহিত্যে নারীভাবমূর্তি : নারীবাদী প্রেক্ষিত।* এ-বইতে উনিশবিশশতকের বেশ কয়েকজন নারী ও পুরুষ ঔপন্যাসিকের আঁকা নারীর ভাবমূর্তি তুলে ধরে প্রচণ্ড সমালোচনা করা হয় ওই সব অবাস্তব নারীচরিত্রের। অবাস্তব নারী সৃষ্টির জন্যে শুধু পুরুষেরাই অভিযুক্ত হয় নি এ-প্রবন্ধগুচ্ছে, বরং দেখানো হয় যে এ-কাজে পুরুষদের থেকে অনেক নিকৃষ্ট নারী লেখকেরা। অবাস্তব নারী সৃষ্টি ক'রে নারী লেখকেরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন নিজেদের লিঙ্গের সাথে। এ-ধরনের সমালোচনায় মিলিয়ে দেখা হয় লেখকের ও পাঠকের অভিজ্ঞতাকে; আর পাঠকের অভিজ্ঞতার সাথে যদি না মেলে লেখকের অভিজ্ঞতা, তাহলে অভিযোগ তোলা হয় লেখকের বিরুদ্ধে। নারীভাবমূর্তি সমালোচকেরা আত্মজীবনীকে ব্যবহার করেন সমালোচনার মানদণ্ডরূপে;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁরা মনে করেন কোনো সমালোচনাই মুক্ত নয় নিজের মূল্যবোধ থেকে। প্রতিটি মানুষ, এবং লেখকও, কথা বলেন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনীতিক, ও ব্যক্তিগত ব্যাপারে গ'ড়ে ওঠা বিশেষ অবস্থান থেকে। এ-পরিপ্রেক্ষিত সীমাবদ্ধ, একে সর্বজনীন ব'লে চালানো খুবই আধিপত্যমূলক কাজ। নারীভাবমূর্তি সমালোচনার কাজ সাহিত্যে রূপায়িত মিথ্যে নারীভাবমূর্তির স্বরূপ বের করা। ওই মিথ্যে ভাবমূর্তি যেমন পুরুষ লেখকেরা তৈরি করেছেন, তেমনি করেছেন নারী লেখকেরাও। এতে খুব বেশি গুরুত্ব দেয়া হয় বাস্তবতা ও অভিজ্ঞতার ওপর; মনে করা হয় বাস্তবতা ও অভিজ্ঞতা উপস্থাপনই সাহিত্যের লক্ষ্য। তাই এ-সমালোচনা আধুনিকতাবিরোধী, সব ধরনের আধুনিক রীতিকেই আক্রমণ করা এর স্বভাব। তাঁদের মানদণ্ডে সে-সাহিত্যের মূল্য কম, যা তাঁদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য নয়; তাকেই তাঁরা বাতিল করেন যা তাঁদের অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়ে না।

লিঙ্গবাদ ও নারীভাবমূর্তি বের করার পর, ১৯৭৫ থেকে, নারীবাদী সমালোচনার বিষয় হন নারী লেখকেরা; নারীবাদী সমালোচনা হয়ে ওঠে নারীকেন্দ্রিক। নারীবাদীরা আবিষ্কার করেন যে নারী লেখকদের ছিলো নিজেদের এক ধরনের সাহিত্য, যে-সাহিত্যের ঐতিহাসিক ও বিষয়গত সামঞ্জস্য, আন্তঃশৈল্পিক গুরুত্ব স্বীকৃতি পায় নি পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধের কাছে। তাঁরা বলেন *নারীকল্পনাপ্রতিভার* কথা। ১৯৭১-এ শোঅল্টার দাবি করেন নারী লেখকদের রয়েছে এক বিশেষ ইতিহাস, যা গুরুত্বের সাথে বিবেচনাযোগ্য। নারীরা আলোচনা করেন নারীরচিত সাহিত্য, এটা হয়ে ওঠে ইঙ্গমার্কিন নারীবাদী সমালোচনার প্রধান প্রবণতা। সত্তর দশকের শেষের দিকে বেরোয় এ-ধারার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বই; যেমন এলেন মোয়ের্সের *লিটেরেরি উইমেন : সাহিত্যিক নারী* (১৯৭৬), ইলেইন শোঅল্টারের *এ লিটেরেচার অফ দেয়ার ওৌন : তাঁদের নিজেদের সাহিত্য* (১৯৭৭), শিরিল এল ব্রাউন ও কারেন ওলসন সম্পাদিত *ফেমিনিস্ট ক্রিটিসিজম : এসেইজ অন থিয়োরি, পোয়েট্রি অ্যান্ড প্রোউজ :: নারীবাদী সমালোচনা : তত্ত্ব, কবিতা ও গদ্য বিষয়ক প্রবন্ধ* (১৯৭৮), এবং সান্ড্রা গিলবার্ট ও সুজান গুবারের *দি ম্যাডওম্যান ইন দি অ্যাটিক : চিলেকোঠার পাগলী* (১৯৭৯)। এ-বইগুলোতে শনাক্ত করা হয় সাহিত্যে নারী-ঐতিহ্যের পৃথক ধারা; দেখানো হয় নারীর লিঙ্গ নয়, সমাজই স্থির ক'রে দেয় নারীর বিশ্বদৃষ্টি ও সাহিত্যে তার উপস্থাপন। এলেন মোয়ের্স *সাহিত্যিক নারী*তে সবার আগে উদ্যোগ নেন নারীসাহিত্যের ইতিহাস লেখার। তাঁর মতে পুরুষ-ঐতিহ্যের তলে বা পাশাপাশি নারীসাহিত্য এক গতিশীল ও শক্তিমান অন্তঃস্রোত। বইটিতে কোনো তত্ত্ব প্রস্তাব না ক'রেই তিনি দেখান যে পুরুষের পাশাপাশি দেখা দিয়েছিলেন মহৎ নারী লেখকেরাও, কিন্তু তাঁরা মূল্য পান নি। ইলেইন শোঅল্টার *তাঁদের নিজেদের সাহিত্য*-এ বর্ণনা করেন ব্রোন্টিদের থেকে বর্তমান পর্যন্ত লেখা ইংরেজি উপন্যাসের ইতিহাস; দেখান এ-ধারার বিকাশের রীতি সাহিত্যিক উপসংস্কৃতি বিকাশের রীতির মতো। তিনি নির্দেশ করেন এ-ধারা বিকাশের তিনটি পর্ব। প্রথম পর্বটি হয় বেশ দীর্ঘ; এ-পর্বে *অনুকরণ* করা হয় আধিপত্যশীল ঐতিহ্যকে, এবং *অন্তরীকরণ* করা হয় শিল্পকলার মান ও সামাজিক ভূমিকা; দ্বিতীয় পর্বে দেখা দেয় এসব ধারণা ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মূল্যবোধের বিরুদ্ধে *প্রতিবাদ*, দাবি করা হয় স্বায়ত্তশাসন; সব শেষে দেখা দেয় *আত্ম-আবিষ্কার*-এর পর্ব। এ-পর্ব তিনটির নাম তিনি দেন *ফেমিনিন, ফেমিনিস্ট* এবং *ফিমেল*। তাঁর মতে ইংরেজি সাহিত্যে ফেমিনিন পর্ব শুরু হয় ১৮৪০-এর দশকে, যখন নারী লেখকেরা দেখা দেন পুরুষছদ্মনামে। এ-পর্ব সমাপ্ত হয় ১৮৮০ সালে জর্জ এলিঅটের মৃত্যুতে। ফেমিনিস্ট পর্বের কাল ১৮৮০ থেকে ১৯২০; এবং ফিমেল পর্ব ১৯২০-এ শুরু হয়ে এখনো চলছে। সাহিত্যের ইতিহাস ও নারীবাদী সমালোচনায় শোঅল্টারের বড়ো কৃতিত্ব বিস্মৃত ও উপেক্ষিত নারী লেখকদের পুনরাবিষ্কার।

সান্ড্রা এম গিলবার্ট ও সুজান গুবারের *চিলেকোঠার পাগলী* বিশাল বই। এতে আলোচিত হন জেইন অস্টিন, মেরি শেলি, ব্রোন্টি বোনেরা, জর্জ এলিঅট, এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং, ক্রিস্টিনা রসেটি, এবং এমিলি ডিকিনসন। তাঁরা তুলে ধরেন উনিশশতকের 'সুস্পষ্টভাবে পৃথক নারীসাহিত্যধারা'র প্রকৃতি, এবং প্রস্তাব করেন নারীর সাহিত্য-সৃষ্টিশীলতা সম্পর্কে এক অভিনব তত্ত্ব। তাঁরা দেখান উনিশশতকে পিতৃতান্ত্রিক ভাবাদর্শ এমন বিশ্বাস সৃষ্টি করে যে শৈল্পিক সৃষ্টিশীলতা একান্ত পুরুষের গুণ। লেখক রচনার 'জনক', বিধাতার আদলে তিনি স্রষ্টা বা প্রণেতা বা গ্রন্থকার। সৃষ্টিশীলতার এ-শিশ্নতান্ত্রিক উপকথার মধ্যে নারী লেখকদের দাঁড়াতে হয় কঠিন অবস্থার মুখোমুখি। সৃষ্টিশীলতাকে পিতৃতন্ত্র যেহেতু গণ্য করে পুরুষালি কাজ ব'লে, তাই নারীভাবমূর্তিও তৈরি হয়েছে পুরুষের কল্পনায়। নারী অধিকার পায় নি নারী বা নারীত্ব সম্পর্কে ভাবমূর্তি সৃষ্টির, তাদের বাধ্য করা হয়েছে পুরুষের কল্পিত ভাবাদর্শের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে। গিলবার্ট ও গুবার বিশ্লেষণ করেন পিতৃতন্ত্রে নারীশিল্পীর অবস্থান। তাঁরা দেখান পিতৃতন্ত্রের তৈরি নারীধারণা নারী ও নারীশিল্পীর মধ্যে বাধা সৃষ্টি করে, নারী ও নারীশিল্পীর মধ্যে তৈরি করে জটিলতা। এর ফলে নারী লেখক হ'তে গিয়ে ভোগে তীব্র উদ্বেগে, কেননা তার অধিকার নেই লেখক হওয়ার। পিতৃতন্ত্রে লেখক অবধারিতভাবে পুরুষ, আর নারী পুরুষের দাসী; তাই নারী কীভাবে ধরবে কলম, হবে লেখক? নারী লেখকেরা এ-সংকট থেকে মুক্তির জন্যে নেন এক কৌশল : তাঁরা তাঁদের সাহিত্যের বাহ্যসংগঠন ও আন্তর তাৎপর্যের মধ্যে রাখেন দূরত্ব। বাইরে তাঁরা মেনে নেন পিতৃতন্ত্রের বিধান, কিন্তু ভেতরে গোপন ক'রে রাখেন ধ্বংসাত্মক তাৎপর্য, কাজ করেন পিতৃতান্ত্রিক বিধানের বিরুদ্ধে। এমিলি ডিকিনসন বলেছিলেন, 'সত্য বলো, তবে তির্যকভাবে বলো'; তাঁরা নেন ওই তির্যক ভঙ্গি। তাঁদের মতে নারীর কণ্ঠস্বর ছলনাময়, তবে সত্য। তাঁরা যে-চিলেকোঠার পাগলীর কথা বলেছেন, সে কে? ওই পাগলীটি আর কেউ নয়, সে নারী লেখকের 'ডবল', নারী লেখকের উদ্বেগ ও ক্রোধের উন্মাদিনী রূপ। পিতৃতন্ত্রের চাপে উনিশশতকের নারী লেখকদের প্রায় প্রত্যেকে সৃষ্টি করেন একেকটি পাগলী, যে তাঁরই আরেক সত্তা। এ-পাগলী সৃষ্টি ছিলো তাঁদের এক সাহিত্যিক কৌশল, যা উনিশশতকের নারীদের লেখা উপন্যাসকে দিয়েছে বিপ্লবাত্মক প্রকৃতি।

নারীবাদীরা নারীসাহিত্যের ওপর যে-গুরুত্ব অরোপ করেন, তাতে দেশে দেশে পুনরাবিষ্কৃত হয় বিপুল পরিমাণে নারীসাহিত্য। সেগুলোকে নতুনভাবে পড়েন তাঁরা। তাঁরা পুনরাবিষ্কার করেন বহু বিস্মৃত নারী লেখককে, প্রকাশ করেন তাঁদের চিঠিপত্র ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিনপঞ্জি, এবং দেখান যে নারীসাহিত্যের রয়েছে এক বিশেষ স্বভাব। নারীবাদী সমালোচনার প্রথম সুফল পান আঠারোউনিশশতকের নারী লেখকেরা, যাঁদের বই শিকার হয়েছিলো উপেক্ষা আর বিস্মৃতির। নারীবাদী প্রকাশনা থেকে ১৯৭২-এ পুনঃপ্রকাশিত হয় রেবেকা হার্ডিং ড্যাভিসের উপন্যাস *লাইফ ইন দি আয়রন মিলস* (১৮৬১), ১৯৭৩-এ পুনঃপ্রকাশিত হয় শার্লোট পার্কিন্স গিলম্যানের ছোটগল্প 'দি ইয়েলো ওয়ালপেপার' (১৮৯২), বেরোয় বিস্মৃত নারী লেখকদের নানা রচনাসংগ্রহ। এসব লেখায় পাওয়া যায় নীরব বিদ্রোহ, এমনকি আমূলবাদী মনোভাব; এবং নারীবাদীরা খুঁজতে শুরু করেন কেনো এসব লেখা বাদ পড়েছিলো 'প্রধান রচনা'র পংক্তি থেকে? ১৯৭৮-এ বরোয় নিনা বায়ামের *ওম্যানস ফিকশন : এ গাইড টু নোভেলস বাই অ্যান্ড অ্যাবাউট উইমেন ইন আমেরিকা, ১৮২০-১৮৭০*। এতে দেখানো হয় যে উনিশশতকের অধিকাংশ জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকই ছিলেন নারী, তাঁরা 'বেস্ট-সেলার' লিখেছিলেন, কিন্তু বাদ প'ড়ে গেছেন সাহিত্যের প্রধান পংক্তি থেকে। বেস্ট-সেলার উৎকৃষ্ট সাহিত্য হয় না ঠিকই, কিন্তু নারীবাদীরা মনে করেন ওই নারী লেখকদের কেউ কেউ স্বীকৃতি পেতে পারতেন।

১৯৭০ থেকে নারীবাদীরা বিকাশ ঘটাতে থাকেন *নারীর নন্দনতত্ত্ব* ব'লে একটি ধারণার, তাঁরা বলতে থাকেন নারীর বিশেষ *সাহিত্যচৈতন্য*-এর কথা। অ্যাড্রিয়েন রিচ, মার্জে পিয়ের্সি, জুডি শিকাগো, সুজান গ্রিফিন, অ্যালিস ওয়াকার প্রমুখের রচনায় দেখা দেয় নারীর নন্দনতত্ত্বের ধারণা; তাঁরা দাবি করেন *নারীসংস্কৃতি* ব'লে এক বিশেষ সংস্কৃতি। তবে নারীর নন্দনতত্ত্বের ধারণা নিয়ে বিতর্ক বেধেছে; অনেকে একে নারীসমকামবাদী চৈতন্য, ও নারীসমকামবাদী স্বাতন্ত্র্যবাদের সাথে এক ক'রে দেখেন। অ্যাড্রিয়েন রিচ লিখেছেন :

> প্রত্যেক নারীর মধ্যে রয়েছে একটি নারীসমকামী, সে অভিভূত হয় নারীশক্তি দিয়ে, সে আকর্ষণ বোধ করে শক্তিশালী নারীর প্রতি, সে খোঁজে এমন সাহিত্য যাতে প্রকাশ পায় ওই শক্তি ও জোর। আমাদের আন্তর নারীসমকামীটিই আমাদের চালায় কল্পনাদীপ্ত অনুভবের দিকে, আর ভাষায় প্রকাশ করে নারীর সাথে নারীর পূর্ণ সম্পর্ক। আমাদের আন্তর নারীসমকামীটিই শুধু সৃষ্টিশীল, কেননা পিতাদের দায়িত্বশীল কন্যারা ভাড়াটে লেখকমাত্র।

অনেকে অবশ্য মেনে নিতে রাজি হন নি যে নারীসত্তা শুধু একটি বিশেষ সাহিত্যশৈলীর মধ্যেই প্রকাশ পায়, বা নারীর সৃষ্টিশীলতা প্রকাশ পায় নারীসমকামে। ১৯৮০ থেকে নারীসমকামবাদী নন্দনতত্ত্ব ভিন্ন হয়ে যায় নারীনন্দনতত্ত্ব থেকে।

নারীবাদী সমালোচকেরা নিজেরা পুনর্বিচার ক'রে দেখতে চান সাহিত্যের সব কিছু, তাঁরা রাজি নন পুরুষের মূল্যায়ন বিনীতভাবে মেনে নিতে। তাঁদের বিরুদ্ধে পুরুষের অভিযোগ হচ্ছে তাঁরা ছুঁড়ে ফেলে দিতে চান হাজার বছরের পাশ্চাত্য সংস্কৃতি। নারীবাদী সমালোচকদের একটি চাবিশব্দ 'পুনঃ' বা 'আবার'। 'ইতিহাস পুনর্লিখনের' কথা বলেছেন ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্, অ্যাড্রিয়েন রিচ বলেছেন নারীর লেখা শুরু হ'তে হবে অতীতকে পুনরাবলোকন বা সংশোধন ক'রে, নারীত্ব পুনরাবিষ্কারের কথা বলেছেন ক্যারোলিন হিলবার্ন, জোন কেলি বলেছেন, 'নারীদের পুনরুদ্ধার করতে হবে ইতিহাসে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং ইতিহাসকে পুনরুদ্ধার করতে হবে নারীর কাছে'। পুরুষ এতোদিন যেভাবে সাহিত্য পড়েছে, সেভাবে নয়, পড়তে হবে নারীর, নারীবাদীর চোখে; তখন ওই সাহিত্য ভ'রে ছড়ানো দেখা যাবে লিঙ্গের পীড়ন। ওই পীড়নে বিকৃতরূপে গ'ড়ে উঠেছে নারী। সান্ড্রা গিলবার্ট 'নারীবাদী সমালোচকেরা কী চান? অগ্নিগিরি থেকে পোস্টকার্ড' (১৯৮০) প্রবন্ধে বলেন, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি পুরুষ লেখকদের ভাণ্ডার, পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া পুরুষ লেখকদের সম্পত্তি। ওই সম্পত্তিতে নারীর অধিকার প্রায় নেই। তাঁর মতে, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির স্রষ্টা গম্ভীর পণ্ডিত, সংরক্ত কবি, আর চিন্তাক্লিষ্ট দার্শনিকেরা সবাই পুরুষ, মহাজগত তাঁদেরই উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত সম্পত্তি। তাঁর মতে পুরুষের সব শক্তি ছিলো, ছিলো বাকশক্তিও, কিন্তু নারীদের পালন করতে হয়েছে নীরবতা; পুরুষ তাদের দিয়েছে যে-ভাষা, তা হচ্ছে নীরবতা। যে-নারীরা নীরবতাব্রত পালনে রাজি হন নি, তাঁদের কী হয়েছে? তাঁরা হারিয়ে গেছেন অন্ধকারে, বা তাঁদের ভুল বোঝা আর অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। নারীদের রচনা হয়তো মহৎ সাহিত্য হয় নি, তা হয়তো খুবই বশমানা; তবে ওই লেখার ভেতরে রয়ে গেছে বিপজ্জনক বস্তু, যা অনেক সময় অগ্নিগিরির মতো, এবং গভীরভাবে *রিভিশনারি*– সংশোধনপন্থী।

অ্যানেট কোলোডনিও (১৯৮০) বলেন একই কথা; বলেন যে নারী সাহিত্য সৃষ্টি করতে গিয়ে দেখে তার কোনো ঐতিহ্য নেই। সাহিত্যের মহৎ ঐতিহ্য ব'লে যা গৃহীত, নারী লেখকেরা একাত্ম বোধ করতে পারেন নি তার সাথে, ওই ঐতিহ্যকে মনে করতে পারেন নি নিজেদের ব'লে। পুরুষ যেমন লিখতে ব'সেই মনে করে একটা মহৎ বস্তু সে উপহার দিচ্ছে মানবজাতিকে, নারী লেখকেরা তা মনে করতে পারেন নি; মহৎ কিছু বা শিল্পকলা সৃষ্টি করছেন, এমন ভাবাও সম্ভব হয় নি তাঁদের পক্ষে; তাঁরা, অধিকাংশ সময়, নিজেদের বিচ্ছিন্ন ক'রে রেখেছেন 'লেখকদের' থেকে। তাঁরা বারবার জানিয়েছেন পণ্ডিতদের জন্যে তাঁরা গল্প লিখছেন না, লিখছেন সাধারণদের জন্যে, যারা 'সাহিত্য' থেকে দূরবর্তী। নিনা বায়াম বলেছেন, সবাই আশা করতো যে নারী লেখকেরা লিখবেন নারীদের জন্যে, তাঁরা সাহিত্যের মহৎ ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। তাঁরাও কখনো নিজেদের মিল্টন বা স্পেন্সারের উত্তরসূরী ব'লে মনে করেন নি। ১৮৯৯-এ কেইট শপিনের *দি অ্যাওকেনিং* উপন্যাসটি প্রকাশের পর পাঠকেরা বেশ বিব্রত বোধ করে; উপন্যাসটিতে তিনি বিবাহবহির্ভূত যৌনতার যে-বিবরণ দেন, তা কোনো নারী ঔপন্যাসিকের কাছে পাঠক প্রত্যাশা করে নি। নারীর কাছে চাওয়া হয় 'ভদ্র উপন্যাস'। বায়াম (১৯৮১) দেখান মার্কিন সাহিত্য পাঠ ও সমালোচনায় সক্রিয় যে-তত্ত্ব, তা নারী লেখকদের মহৎ সাহিত্যের পংক্তি, ক্যান্যন, থেকে বাদ দেয়। তিনি দেখান ১৭৭৪-১৭৯৯ কালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে আটতিরিশটি উপন্যাস বেরোয়। এগুলোর নটির লেখকের নাম আজো অজানা, হয়তো সেগুলো লিখেছিলেন নারীরাই; বাকি উনতিরিশটি লেখেন আঠারোজন লেখক, যাঁদের চারজন নারী। তাঁদের একজন, সুজানা রোওসন, একাই লেখেন ছটি উপন্যাস। তাঁর উপন্যাস *শার্লোট* প্রথম প্রকাশের দশকে তিনবার, ১৮০০-১৮১০ সালের মধ্যে উনিশবার, উনিশশতকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে আশিবার ছাপা হয়। হ্যানা মুরের *দি ককেট* উনিশশতকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিরিশবার ছাপা হয়। নারী ঔপন্যাসিক হ্যারিয়েট বিশার স্টোর *আংকেল টম্‌স্ কেবিন* মার্কিন সাহিত্যের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি বিক্রিত উপন্যাস। উনিশশতকে আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি পঠিত ঔপন্যাসিক ছিলেন ই ডি ই এন সাউথওয়ার্থ, একজন নারী। এসব সত্ত্বেও তাঁরা মার্কিন সাহিত্যের ঐতিহাসিক ও সমালোচকদের কাছে মূল্য পান নি; তাঁরা বাইরে থাকেন সাহিত্যের মহৎ ধারার। কেনো এমন হয়েছে? এর এক কারণ, বায়ামের মতে, পক্ষপাত; সমালোচকেরা পছন্দ করেন না নারীদের লেখক হিশেবে দেখতে, তাঁরা বিশ্বাস করেন না যে নারীরা লেখক হ'তে পারে; তাই চোখের সামনের নারী লেখকদেরও দেখতে পান না তাঁরা। আরেকটি কারণ হয়তো নারী লেখকেরা মহৎ কিছু লিখে উঠতে পারেন নি। পারেন নি এটা অনেকখানি সত্য, তবে না পারার রয়েছে সামাজিক কারণ। এটা ভুলে গিয়ে পুরুষ সমালোচকেরা নারী লেখকদের উপেক্ষা করেন প্রধানত লৈঙ্গিক কারণে; তাঁরা সাহিত্যকে মনে করেন মূলত পুরুষের কাজ ব'লে।

লিলিআন রবিনসনও (১৯৮৩) আক্রমণ করেছেন সাহিত্য মূল্যায়নের প্রতিষ্ঠিত ক্যান্যন বা মানদণ্ড ও রুচিকে। তাঁর মতে প্রধান/অপ্রধান ব্যাপারগুলো ভদ্রলোকের চুক্তি। ওই ভদ্রলোকেরা সুবিধাভোগী শ্রেণী ও পুংলিঙ্গের অর্ন্তভুক্ত। সাহিত্যের যে-ক্যান্যন স্বীকৃত, তা সম্পূর্ণরূপে ভদ্রলোকদের সৃষ্টি; তাই তাদের রুচির বাইরের কোনো কিছুই মহৎ ব'লে গণ্য হয় না। পশ্চিমের মহৎ বইগুলো সবই পুরুষের লেখা, সেখানে কোনো নারীর বই নেই; কখনো তাতে অস্টিন, ব্রোন্টি বোনেরা, জর্জ এলিঅট, বা এমিলি ডিকিনসনের স্থান হয়, কিন্তু তাঁরাও থাকেন বেশ নিচে। এ-অবস্থা কাটানোর জন্যে লিলিআন রবিনসন নারীবাদী সমালোচনার দুটি দায়িত্ব নির্দেশ করেন : নতুনভাবে পড়তে হবে সমগ্র ঐতিহ্যকে, পুনর্ব্যাখ্যা করতে হবে নারীচরিত্রগুলো, শনাক্ত করতে হবে লিঙ্গবাদী ভাবাদর্শ, এবং দাঁড়াতে হবে তার মুখোমুখি। আর প্রয়াস চালাতে হবে নারী লেখকদের ক্যান্যনভুক্ত করার। মেরি ওলস্টোনক্র্যাফ্‌ট্, কেইট মিলেট, ইভা ফিজেস, এলিজাবেথ জেনওয়ে, জারমেইন গ্রিয়ার, ক্যারোলিন হিলব্রুন করেছেন তাই; তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন মহৎ বইগুলোর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। মহৎ সাহিত্য পুনর্মূল্যায়ন করলে কি দেখা যাবে নারীর লেখা অনেক মহৎ সাহিত্য বাদ প'ড়ে গেছে সাহিত্যের মহৎ ঐতিহ্য থেকে? তাঁরা কি কোনো *হ্যামলেট, যুদ্ধ ও শান্তি, বা গীতাঞ্জলি* লিখেছেন, যা স্বীকৃতি পায় নি পুরুষের? নিনা বায়াম স্বীকার করেছেন অমন কোনো ঘটনা ঘটে নি। ১৮২০-১৮৭০ সালের মধ্যে লেখা মার্কিন নারী ঔপন্যাসিকদের উপন্যাস সম্পর্কে তিনি বলেছেন ওগুলোতে নান্দনিক, মননগত, নৈতিক জটিলতা ও শিল্পিতার অভাব রয়েছে, যা আমরা প্রত্যাশা করি মহৎ সাহিত্যের কাছে। ওই সময়ের নারী ঔপন্যাসিকদের রচনা নানাভাবে আকর্ষণীয়, কিন্তু কোনো বিস্মৃত জেন অস্টিন বা জর্জ এলিঅট আবিষ্কার করা যায় না তাঁদের মধ্যে, বা এমন কোনো উপন্যাস খুঁজে পাওয়া যায় না, যা *দি স্কারলেট লেটার*-এর মানের। তবু তিনি মনে করেন সাহিত্য মূল্যায়নের যে-মানদণ্ড আমেরিকায় ব্যবহৃত হয়, তা পুরুষের কাজের প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ। ওই মানদণ্ডে শেলাইয়ের থেকে তিমি শিকার অনেক বেশি মহৎ কাজ ব'লে গণ্য হয়, তাই নারী বাদ পড়ে। এক নতুন ধরনের উপন্যাস দেখা দিয়েছে সম্প্রতি, যেগুলোকে বলা হয় *নারীবাদী উপন্যাস*।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবসায়িকভাবে এগুলো অত্যন্ত সফল। এ-ধরনের উপন্যাস নারীবাদী প্রকাশনাসংস্থা, এমনকি ব্যবসায়িক প্রকাশনাসংস্থা থেকেও বেরোচ্ছে। তবে এগুলোর সবই কি নারীবাদী উপন্যাস? এগুলো কি উপকারে আসছে নারীবাদী আন্দোলনের, নাকি শুধুই প্রথাগত বিনোদন সামগ্রীর কাজ করছে এগুলো? ঔপন্যাসিক নারী হ'লেই নারীবাদী হন, তিনি যা লেখেন তাই কি হয় নারীবাদী উপন্যাস? কিছু উপন্যাস নারীকেন্দ্রিক, তবে নারীকেন্দ্রিক উপন্যাসমাত্রই নারীবাদী উপন্যাস নয়। নারীকেন্দ্রিক উপন্যাস নতুন ব্যাপার নয়; অনেক আগে থেকেই নারীরা নারীদের জন্যে নারীকেন্দ্রিক উপন্যাস লিখে আসছেন, যেমন ঘটেছে রোম্যান্টিক উপন্যাসে। ওই সব উপন্যাসের চেতনা, সেগুলোতে চিত্রিত লিঙ্গ, জাতি, ও শ্রেণী-আনুগত্যের ব্যাপারগুলো নারীবাদবিরোধী। তাই নারীকেন্দ্রিক উপন্যাসমাত্রই নারীবাদী উপন্যাস নয়, তা চরিত্রগতভাবে ভিন্ন।

ইলেইন শোঅল্টার (১৯৭৯) দুটি রীতিতে ভাগ করেছেন নারীবাদী সমালোচনাকে। প্রথম রীতিতে নারীবাদী সমালোচক হচ্ছেন *পাঠক হিশেবে নারী*; তিনি পুরুষ লেখকদের সাহিত্য প'ড়ে তার লৈঙ্গিক ইঙ্গিতগুলো খুঁজে বের করেন। শোঅল্টার এ-রীতির সমালোচনাকে বলেন *নারীবাদী সমালোচনা*। এ-রীতিতে বিচার করা হয় ভাবাদর্শগুলো, বের করা হয় নারীভাবমূর্তি ও নারীছক, খোঁজা হয় কোথায় প্রাপ্য মর্যাদা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে নারী লেখককে, আর রটনা করা হয়েছে নারী সম্পর্কে কুৎসা। দ্বিতীয় রীতির সমালোচনার বিষয় *লেখক হিশেবে নারী*; এতে বিচার করা হয় নারীসাহিত্য, নারীসাহিত্যের ইতিহাস, বিষয়, শ্রেণী, ও সংগঠন। এতে আলোচিত হয় নারীর সৃষ্টিশীলতার প্রকৃতি, ভাষাবিজ্ঞান, নারীর ভাষার সমস্যা, ও বিশেষ বিশেষ নারী লেখক। শোঅল্টার এ-রীতির সমালোচনাকে বলেছেন *গাইনোক্রিটিক* বা *গাইনোক্রিটিসিজম*। তাঁর মতে নারীবাদী সমালোচনা রাজনীতিক ও বিতর্কমূলক, যা বহু কিছু নিয়েছে মার্ক্সীয় সমাজবিজ্ঞান ও নন্দনতত্ত্ব থেকে; আর তাঁর প্রস্তাবিত গাইনোক্রিটিক স্বয়ংসম্পূর্ণ ও নিরীক্ষাধর্মী। শোঅল্টারকথিত নারীবাদী সমালোচনা অনেকটা আদি টেস্টামেন্টের মতো, যার কাজ 'অতীতের পাপ ও ভুলভ্রান্তি খোঁজা', আর গাইনোক্রিটিক অনেকটা নতুন টেস্টামেন্টের মতো, যার কাজ 'কল্পনাপ্রতিভার শোভা' খোঁজা। প্রথম রীতিটি ন্যায়পরায়ণ, রাগী, ও ভর্ৎসনাপূর্ণ; দ্বিতীয় রীতিটি নিরাসক্ত। দুটি রীতিই দরকারী; কেননা আদর্শের জেরিমাইঅ্যারাই শুধু 'দাসত্বের মিশর থেকে' নারীদের মুক্তি দিয়ে পৌঁছে দিতে পারেন মানবতাবাদের প্রতিশ্রুত ভূখণ্ডে।

নারীবাদীরা কতোখানি আগ্রহী সাহিত্য ও সমালোচনাতত্ত্বে? তত্ত্ব জিনিশটি পুরুষের সম্পত্তি; সব তত্ত্বের তারাই স্রষ্টা, নারীর তাতে কোনো অংশ নেই, যদিও নারী ধারাবাহিকভাবে হয়েছে তত্ত্বের শিকার। এখন নারীবাদীরা মনে করেন সেখানে তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়েও নারীবাদী সমালোচনার কোনো তাত্ত্বিক ভিত্তি ছিলো না; ১৯৭৫-এ শোঅল্টার বলেছিলেন কোনো তত্ত্বই নারীবাদী ভাবাদর্শ ও পদ্ধতি ধারণের জন্যে যথেষ্ট নয়। কোলোড্নি বলেন, নারীবাদী সমালোচনা দেখা দিয়েছে 'কোনো সমঞ্জস ধারা বা সমন্বিত লক্ষ্যের বদলে একরাশ পরস্পরবদলসম্ভব কৌশল হিশেবে।' এর পরও সমন্বিত তত্ত্ব গ'ড়ে ওঠে নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃষ্ণনারীবাদীরা অভিযোগ করেন যে নারীবাদী সমালোচনা কৃষ্ণ ও তৃতীয় বিশ্বের নারী লেখকদের সম্পর্কে পালন করে 'প্রকাণ্ড নীরবতা'; তাঁরা চান কৃষ্ণনারীবাদী সমালোচনা, যা বিবেচনার মধ্যে নেবে জাতিক ও লৈঙ্গিক উভয় ব্যাপার; মার্ক্সীয় নারীবাদীরা গুরুত্ব দেন শ্রেণী ও লিঙ্গ দুয়েরই ওপর; নারীবাদী সাহিত্য-ঐতিহাসিকেরা পুনরুদ্ধার করতে চান এক লুপ্ত ঐতিহ্য; বিসংগঠনবাদীরা চান এমন সমালোচনা, যা একই সঙ্গে পাঠগত ও নারীবাদী। প্রথম দিকে অনেক নারীবাদীই কোনো তাত্ত্বিক কাঠামো তৈরি করতে চান নি নারীবাদী সমালোচনার; তাঁরা মনে করেছিলেন তত্ত্ব নারীবাদের মতো গতিশীল ব্যাপারকে সীমাবদ্ধ ক'রে ফেলবে। তাঁরা চেয়েছিলেন নারীবাদী সমালোচনাকে খোলা রাখতে। সত্তরের দশকে সাংগঠনিক, উত্তরসাংগঠনিক, বিসাংগঠনিক ইত্যাদি যে-সমস্ত বিতর্ক দেখা দেয়, নারীবাদীদের কাছে সেগুলোকে মনে হয় উষর ও ছদ্মবস্তুনিষ্ঠ। ওই সমস্ত ক্ষতিকর পুরুষতান্ত্রিক রচনার কবল থেকে তাঁরা মুক্ত থাকতে চান। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ থেকে শুরু ক'রে মেরি ড্যালি, অ্যাড্রিয়েন রিচ, মার্গারেট ডুরাস, ও আরো অনেকে উপহাস করেন 'পুংপাণ্ডিত্যের নপুংসক আত্মপ্রেম'কে, এবং মুক্ত থাকতে চান পিতৃতান্ত্রিক পদ্ধতিপুজো থেকে। তবে নারীবাদীরা আজ আর তত্ত্ববিমুখ নন। স্যান্ড্রা গিলবার্ট (১৯৮০) বলেন, 'যে-সব ছদ্মপ্রশ্ন ও উত্তর, পাঠ ও যৌনতা, আঙ্গিক ও লিঙ্গ, মনোলৈঙ্গিক সত্তা ও সাংস্কৃতিক সত্তার সম্পর্ককে ছায়াবৃত ক'রে রেখেছে' নারীবাদী সমালোচনা 'সে-সবের পাঠোদ্ধার ও রহস্য উন্মোচন' করতে চায়। সংশোধনপন্থী নারীবাদী সমালোচনা অনেকটা গ'ড়ে উঠেছে চলতি সমালোচনা কাঠামো ভিত্তি ক'রেই। তবু নারীবাদীরা লেগে আছেন পুরুষের সমালোচনা রীতি সংশোধন ও তাকে মানবিক ক'রে তুলতে, এবং তাকে নিরন্তর আক্রমণ ক'রে চলছেন। পুরুষের সমালোচনাতত্ত্ব হচ্ছে সৃষ্টিশীলতা, সাহিত্যের ইতিহাস বা সাহিত্য ব্যাখ্যার সে-তত্ত্ব, যার ভিত্তি পুরুষের অভিজ্ঞতা, তবে তা পেশ করা হয় সর্বজনীন ব'লে। শোঅল্টারের (১৯৮১) মতে নারীবাদীরা যতোদিন পুরুষকেন্দ্রিক সমালোচনাকাঠামো ভিত্তি হিশেবে ব্যবহার করবে, এমনকি তা সংশোধন ক'রে যোগ করবে কিছুটা নতুনত্ব, ততোদিন নারীরা নতুন কিছুই শিখবে না। তাঁর মতে পুরুষের ধারণা দিয়ে চলবে না নারীদের; লাকাঁ, দেরিদায় নারীর চলবে না; কেননা এতে নারী মেনে চলে পুরুষ প্রভুদেরই। তিনি চান একটি একান্ত নারীবাদী সমালোচনারীতি, যা হবে নারীকেন্দ্রিক, স্বাধীন, ও মননগতভাবে সুসমঞ্জস। তাঁর মতে নারীবাদী সমালোচনাকে 'বের করতে হবে নিজ বিষয়, নিজ পদ্ধতি, নিজ তত্ত্ব, এবং নিজ কণ্ঠস্বর।'

এলেন সিজো বলেছেন, 'আরো দেহ, তাই আরো লেখা।' নারীবাদীদের কেউ কেউ জৈব বা দেহবাদী সমালোচনারও প্রস্তাব করেছেন। এতে দেহই হয়ে ওঠে রচনা বা বই। দেহকে সমালোচনার মানদণ্ড করা বিপজ্জনক, কেননা সব জাতিই বিশ্বাস করে যে নারী দৈহিকভাবে দুর্বল, তার মস্তিষ্কও দুর্বল। জৈব নারীবাদী সমালোচকেরা অবশ্য দৈহিক হীনতা স্বীকার করেন না, কিন্তু মনে করেন নারীর শরীর তার লেখাকেও স্বতন্ত্র ক'রে তোলে। পিতৃতন্ত্রের বিশ্বাস হচ্ছে লেখক জনক, যার কলম অনেকটা শিশ্নের মতোই জন্মদানের হাতিয়ার। গিলবার্ট ও গুবার প্রশ্ন করেছেন, 'যদি কলম হয়ে ওঠে একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রূপক-শিশ্ন, তাহলে কোন অঙ্গ থেকে নারী উৎপাদন করবে পাঠ বা রচনা?' উত্তরে শোঅল্টার (১৯৮১, ২৫০) বলেছেন, নারী পাঠ বা রচনা জন্ম দেয় মস্তিষ্ক থেকে, বা ওয়ার্ড-প্রসেসর থেকে, যা একটি রূপক-জরায়ু। সাহিত্যিক পিতৃত্বের রূপক নারীদের পীড়ন করছে আবহমান কাল ধ'রে; তবে আঠারোউনিশশতকে সাহিত্যিক মাতৃত্বের রূপকও বেশ বড়ো হয়ে উঠেছিলো, যাতে সাহিত্যসৃষ্টি হয়ে ওঠে গর্ভধারণ ও প্রসবের মতো ব্যাপার। বিশেষ ক'রে ফ্রান্সে ও আমেরিকায় কোনো কোনো আমূল নারীবাদী মনে করেন এসব রূপককে নিতে হবে গুরুত্বের সাথে, নারীপুরুষের জৈব পার্থক্যকে দেখতে হবে নতুনভাবে, এবং খুঁজতে হবে দেহের সাথে লেখার সম্পর্ক। তাঁরা মনে করেন নারীর লেখা বেরোয় দেহ থেকে, তাদের দৈহিক পার্থক্য তাদের লেখার উৎসও। অ্যাড্রিয়েন রিচ বলেন:

> আমরা এখনো যতোটা বুঝতে পেরেছি, নারীদেহের রয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি আমূল তাৎপর্য। পিতৃতান্ত্রিক চিন্তা তার সংকীর্ণ নির্দেশ অনুসারে নারীদেহকে সীমাবদ্ধ ক'রে ফেলেছে। এ-কারণে নারীবাদী দৃষ্টি স'রে এসেছে নারীর জৈবসংগঠন থেকে; আমি বিশ্বাস করি তা একদিন আমাদের দেহকে নিয়তি মনে না ক'রে সম্পদ ব'লেই গণ্য করবে। পরিপূর্ণ মানবিক জীবন যাপনের জন্যে আমাদের দেহকে নিয়ন্ত্রণ করাই শুধু আমাদের জন্যে জরুরি নয়, আমাদের স্পর্শ করতে হবে আমাদের দেহের ঐক্য ও অনুনাদকে, যা আমাদের মননের দৈহিক ভিত্তি।

নারীবাদী জৈব সমালোচনায় খোঁজা হয় কীভাবে দেহ ব্যবহৃত হয় চিত্রকল্পের উৎসরূপে; আর নারীবাদী জৈব সমালোচনা, যা উৎসারিত করা হয় সমালোচকের দেহ থেকে, হয়ে থাকে অন্তরঙ্গ, স্বীকারোক্তিমূলক, ও আঙ্গিকগতভাবে অভিনব। তবে নারীসত্তার খোঁজে বেরিয়ে দেহকেই তার কেন্দ্র ব'লে গণ্য করা ভয়ঙ্কর কাজ, কেননা দেহকেই পুরুষতন্ত্র ব্যবহার করেছে নারীশোষণের প্রধান যুক্তিরূপে। নারীর দেহেই খুঁজতে হবে নারীর সৃষ্টিশীলতা? এর চমৎকার উত্তর দিয়েছেন ন্যান্সি মিলার; তিনি বলেছেন নারীর সাহিত্যিক স্বাতন্ত্র্য খুঁজতে হবে 'তার দেহের লেখায় নয়, বরং তার লেখার দেহে'।

বোনি জিমারম্যান (১৯৮১) 'যা কখনো ছিলো না' নামক একটি তীব্র প্রবন্ধে তুলে ধরেন এমন এক বিষয়, যা পিতৃতন্ত্রের বিধানে নিষিদ্ধ, আর নারীবাদীরাও চান চেপে রাখতে। তিনি আলোচনা করেন নারীসমকামবাদী সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনারীতি। নারীসমকামবাদকে উপেক্ষার বিরুদ্ধে তিনি জানান প্রবল প্রতিবাদ। নারীসমকাম নিষিদ্ধ ব্যাপার, তা যে ছিলো আর আছে, তা-ই কেউ স্বীকার করতে চায় নি ও চায় না; কিন্তু সত্য হচ্ছে তা ছিলো, এবং আছে। নারীসমকামবাদী সাহিত্যতত্ত্ব প্রস্তাবের সূচনায়ই প্রশ্ন ওঠে যে নারীর যৌন ও প্রীতির সম্পর্ক কতোখানি প্রভাব ফেলে তার লেখা, পড়া, ও চিন্তার ওপর? নারীসমকামবাদী নন্দনতত্ত্ব কি পৃথক হবে নারীবাদী নন্দনতত্ত্ব থেকে? কী হবে নারীসমকামবাদী সমালোচকের কাজ? সম্ভব কি কোনো নারীসমকামবাদী মানদণ্ড বা বিধান প্রতিষ্ঠা করা? নারীসমকামবাদীরা কি বিকাশ ঘটাতে পারেন এমন কোনো অন্তর্দৃষ্টির, যা ঋদ্ধ করবে সমগ্র সমালোচনাশাস্ত্রকে? নারীসমকামবাদী সমালোচনার কিছু বিষয় সম্পর্কে প্রায় সব নারীসমকামবাদীই একমত। তাঁরা মনে করেন এমন নয় যে নারীসত্তা স্থির করতে হবে শুধু পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কিত ক'রেই, নারীসাহিত্যকেও যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরুষসাহিত্যের সাথে সম্পর্কিত ক'রে দেখতে হবে, তাও নয়; তাঁদের মতে নারীর সাথে নারীর তীব্র সম্পর্কও নারীর জীবনের বড়ো ব্যাপার, এবং নারীর যৌন ও আবেগগত প্রবণতা গভীরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তার চেতনা ও সৃষ্টিশীলতাকে। পিতৃতন্ত্র স্বীকার করে শুধু বিষমকামকে; নারীসমকামবাদীদের মতে বিষমকামই একমাত্র স্বাভাবিক যৌন ও আবেগগত সম্পর্ক নয়। বিষমকামকেই শুধু স্বাভাবিক ভাবা পিতৃতন্ত্রের শিক্ষামাত্র। জিমারম্যান দেখান যে নারীবাদীরাও দীক্ষিত পিতৃতন্ত্রের বিষমকামবাদে; তাই নারীবাদী সংগ্রহ থেকে বাদ পড়েন নারীসমকামী রেনি ভিভিয়েন ও র‍্যাডক্লিফ হল, বা সংকলিত হয় ক্যাথেরিন ফিলিপ্‌স্‌, ও অ্যাড্রিয়েন রিচের বিষমকামী বা নিষ্কাম রচনা, যদিও তাঁরা বিখ্যাত নারীসমকামী লেখার জন্যে। জিমারম্যান (১৯৮১) বলেন :

> যখন পরিকল্পিতভাবে বিন্যস্ত কোনো সংগ্রহে থাকে স্ত্রী, মাতা, যৌনসামগ্রী, তরুণী, বৃদ্ধা, এবং মুক্ত নারী প্রভৃতি বিভাগ, কিন্তু থাকে না নারীসমকামী– তখন তা বিষমকামবাদ। নারীবাদী সংগ্রহে বিষমকামবাদ– পুংকেন্দ্রিক সংগ্রহে লিঙ্গবাদের মতো– মুছে ফেলে নারীসমকামবাদী অস্তিত্ব এবং লালন করে এ-মিথ্যেটি যে নারী শুধু পুরুষের মধ্যেই খোঁজে কাম ও আবেগের তৃপ্তি, বা একেবারেই খোঁজে না।

নারীসমকামবাদীরা অভিযোগ করেন নারীবাদী পত্রিকা– *ফেমিনিস্ট স্টাডিজ, উইমেন্স স্টাডিজ, উইমেন অ্যান্ড লিটেরেচার* প্রভৃতিতে যে নারীসমকামবাদী রচনা বেরোয় না, তার মূলে রয়েছে বিষমকামবাদ, বা পরিকল্পিত উদ্দেশ্য। অধিকাংশ নারীসমকামবাদী লেখা প্রথম বেরোয় বিকল্প, অপ্রাতিষ্ঠানিক নারীসমকামবাদী পত্রিকা *সিনিস্টার উইজডম, কোন্ডিশন্স* প্রভৃতিতে। বিষমকামবাদের প্রতাপ দেখা যায় নারীবাদী সমালোচনার গুরুত্বপূর্ণ সব সংগ্রহে, যেমন *দি অথোরিটি অফ এক্সপেরিএন্স* বা *শেক্সপিয়র্‌স্‌ সিস্টার্‌স্‌*-এ নেই কোনো নারীসমকামবাদী প্রবন্ধ। নারীবাদী সমালোচকেরা চেপে গেছেন নারীসমকামবাদকে; তাই নারীসমকামবাদী সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনার ভিত্তি স্থাপন করতে এগিয়ে আসেন নারীসমকামবাদীরাই। ১৯৫৬তে বেরোয় জেনেট ফস্টারের *সেক্স ভ্যারিয়েন্ট উইমেন ইন লিটেরেচার,* ১৯৬৭তে জেন ড্যামন (ছদ্মনাম), জ্যান ওয়াটসন, ও রবিন জর্ডানের *দি লেসবিয়ান ইন লিটেরেচার : এ বিবলিওগ্রাফি।*

নারীসমকামবাদী সমালোচনার মূলে, নারীবাদী সমালোচনার মতোই, রয়েছে রাজনীতিক ভাবাদর্শ। তাঁদের মতে নারীসমকাম এক সুস্থ জীবনপদ্ধতি, নারীরা যা যাপন করেছে ও করছে সব দেশে ও কালে। তাই তাঁরা দূর করতে চান এর ওপর চাপানো নিষেধ। এতে সফল হওয়ার এক উপায় নারীদের পুরুষের মূল্যবোধ থেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে নিয়ে একান্তভাবে নারীসমাজভুক্ত করা। এক ধরনের নারীস্থান গ'ড়ে তোলা। র‍্যাডিক্যালেসবিয়ান বা আমূলনারীসমকামবাদীরা মনে করেন যে নারীর কাছে নারীই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, নারীরা মিলে গ'ড়ে তুলবে এক নতুন চৈতন্য, তারা নিজেদের কেন্দ্র খুঁজবে নিজেদের ভেতরে। তাঁদের মতে বিষমকামবাদ এক রাজনীতিক সংস্থা, তা ব্যক্তিগত পছন্দের ব্যাপার নয়। নারীসমকামবাদীরা বিকাশ ঘটাতে চান একান্ত নারীসমকামী নারীবাদী প্রেক্ষিত; তাই তাঁদের প্রশ্ন : কখন কোনো রচনা হয়ে ওঠে, বা তার লেখক হন নারীসমকামবাদী? এটা নির্ভর করে *নারীসমকামী* বলতে কী বোঝায়, তার ওপর। নারীসমকামী বলতে কি বোঝাবে শুধু সে-নারীদেরই, অন্য নারীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাথে যাঁদের যৌন অভিজ্ঞতার প্রমাণ রয়েছে? এটা অসম্ভব কাজ। অনেকেই তো তার কোনো প্রমাণ রেখে যান নি। তাছাড়া এতে নারীসমকাম হয়ে ওঠে শুধুই যৌন ব্যাপার। অ্যাড্রিয়েন রিচের মতে নারীসমকামবাদ শুধু অন্য নারীর সাথে যৌনসংসর্গ নয়, তা নারীর সংসর্গে নারীর অভিজ্ঞতা, নারীর সাথে নারীর আন্তর জীবনের ঐক্য, রাজনীতিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে নারীদের ঐক্য। তবে নারীদের সব ধরনের সম্পর্ককেই যদি নারীসমকামী সম্পর্ক বলা হয়, তাতে অসুবিধা দেখা দেয়; নারীদের মধ্যে নারীসমকামী ও অসমকামী সম্পর্কের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। অনেকে নারীসমকামবাদের রাজনীতিক সংজ্ঞাও দিয়েছেন; বলেছেন নারীসমকাম হচ্ছে শক্তি, স্বাধীনতা, ও পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। লিলিআন ফ্যাডারম্যান *সারপাসিং দি লাভ অফ ম্যান : রোম্যান্টিক ফ্রেন্ডশিপ অ্যান্ড লাভ বিটুইন উইমেন ফ্রম দি রেনেসাঁস টু দি প্রিসেন্ট* (১৯৮১) বইতে দিয়েছেন নারীসমকামবাদের মাঝপথি সংজ্ঞা :

> 'নারীসমকামী' বলতে বোঝায় সে-সম্পর্ক, যাতে দুটি নারীর তীব্রতম আবেগ ও প্রীতি ধাবিত হয় পরস্পরের দিকে। এ-সম্পর্কে থাকতে পারে কম বা বেশি যৌন সংসর্গ, এমনকি একেবারে নাও থাকতে পারে। এতে দুটি নারী পছন্দ করে তাদের অধিকাংশ সময় একসাথে কাটাতে এবং জীবনের অধিকাংশ ব্যাপার তারা যাপন করে পরস্পরের সাথে।

নারীসমকামবাদী সমালোচকের একটি দায়িত্ব নারীসমকামবাদের ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করা, যাতে তা হয়ে উঠতে পারে শ্রদ্ধেয়। জেন রুল *লেসবিয়ান ইমেজেজ : নারীসমকামবাদী ভাবমূর্তিতে* (১৯৭৩) প্রথম নারীসমকামবাদের ঐতিহ্য আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। এটি নারীসমকামবাদী সমালোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বই। এর পর ডোলোরেস ক্লাইস *ওম্যান প্লাস ওম্যান : নারী যোগ নারী* (১৯৭৪), লুইসে বারনিকোও *দি ওয়ার্ল্ড স্প্লিট্ ওপেন : ফালি ক'রে খোলা পৃথিবী* (১৯৭৪) বইতে প্রতিষ্ঠা করেন নারীসমকামবাদের এক মহৎ ঐতিহ্য। তাঁরা স্যাফো থেকে শুরু ক'রে তাঁদের ধারায় পান মেরি ওলস্টোনক্র্যাফ্ট্, এমিলি ডিকিন্সন, ভার্জিনিয়া উল্ফ্, ভিটা স্যাকভিল-ওয়েস্ট, এথেল স্মাইথি, জারট্রুড স্টেইন, র‍্যাডক্লিফ হল, নাটালি বার্নি, কোলেৎ, রেনি ভিভিয়েন, রোমেইন ব্রুক্স্, ও আরো অনেককে। নারীসমকামবাদী সমালোচনার এক বৈশিষ্ট্য ঐতিহ্য আবিষ্কার হ'লেও এই এর একমাত্র লক্ষ্য নয়; নারীসমকামবাদীরা খুঁজেছেন উপন্যাসে নারীসমকামীর ভাবমূর্তি, ছক প্রভৃতি। বার্থা হ্যারিস দেখিয়েছেন উপন্যাসে নারীসমকামী চিত্রিত হয় দানবীরূপে, যে ভেঙেচুরে ফেলে নারীর আনুগত্য, অক্রিয়তা, সতীত্বের প্রথাগত ধারণা। তাঁরা রচনাশৈলী ও সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়েও কিছু কাজ করেছেন। নারীসমকামবাদীদের কাছে ভাষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা শতাব্দীপরম্পরায় তাদের মুখ খুলতে দেয়া হয় নি, তাদের ভাষা কেড়ে নেয়া হয়েছিলো। এক সময় তাঁরা সাংকেতিক ভাষায় কথা বলেছেন, এখন চালাচ্ছেন নানা নিরীক্ষা। তাঁদের ব্যাকরণ অপ্রথাগত, কথা বলেন তাঁরা ঘটমান বর্তমান কালে, নিয়মিতভাবে তৈরি করেন নতুন শব্দ।

নারীবাদ, এবং নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনার এক গুরুত্বপূর্ণ ধারার বিকাশ ঘটে ফরাশিদেশে। একে বলা হয় ফরাশি নারীবাদ। ফরাশি ও বিশ্বনারীবাদের মহত্তম তাত্ত্বিক সিমোন দ্য বোভোয়ার। তাঁর কাছে, অন্যদের মতো, ফরাশি নবনারীবাদীরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঋণী, ও ঋণস্বীকারে অকুণ্ঠ। তিনি নারীবাদী সাহিত্য সমালোচনারও সূত্রপাত করেছিলেন *দ্বিতীয় লিঙ্গ*-এ, লিঙ্গবাদের রূপ দেখিয়েছিলেন পাঁচজন– মঁথেরলঁ, ডি এইচ লরেন্স, ক্লদেল, ব্রেতোঁ, স্তাঁদাল– লেখকের উপন্যাস ও কবিতায়। তবে ১৯৬৮র ছাত্রবিদ্রোহ থেকে উদ্ভূত ফরাশি নবনারীবাদীরা সাহিত্য সমালোচনায় তাঁকে অনুসরণ করেন নি। ১৯৭০ থেকে ফরাশি নারীবাদী সাহিত্যতত্ত্বের উৎস হয় দেরিদীয় বিসংগঠন ও লাকঁর ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের সাংগঠনিক ভাষ্য। তাঁরা পুরুষ প্রভুদের ধারণা নিয়েই করেন নারীবাদী কাজ। ১৯৭৪-এর মধ্যে ফরাশি নারীবাদীরা তাঁদের ভয়াবহ মননশীল নারীবাদীতত্ত্বের অনেকটা রচনা ক'রে ফেলেন; কিন্তু অতিমননশীলতাভারাক্রান্ত ওই তত্ত্ব বাইরে গৃহীত হ'তে সময় নেয়। মার্ক্স, নিটশে, হাইডেগার, দেরিদা, লাকঁর চিন্তায় তাঁদের তত্ত্ব পরিপূর্ণ, যা অফরাশি পাঠকের কাছে বিপন্নকরভাবে দুরূহ। এলেন সিজোর দুরূহজটিল ভাষারীতি, ল্যুস ইরিগারের গ্রিক বর্ণমালামোহ, জুলিয়া ক্রিস্তেভার এক বাক্যে পাঁচসাতজন তাত্ত্বিককে উল্লেখ করার প্রবণতা পাঠকের মনে ভয় জাগায়। ইঙ্গমার্কিন নারীবাদীরা যেমন সৃষ্টি করেন বিপুল পরিমাণ নারীবাদী সাহিত্য সমালোচনা, ঠিক সে-ধরনের সমালোচনা ফরাশি নারীবাদীরা লিখেছেন কম ; তাঁরা লিখেছেন পাঠগত, ভাষাতাত্ত্বিক, সাংকেতিক বা মনোবিশ্লেষণাত্মক তত্ত্বের সমস্যা সম্পর্কে, এবং লিখেছেন এমন রচনা, যাতে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে কবিতা ও তত্ত্ব। তাঁরা ইঙ্গমার্কিন নারীবাদীদের মতো প্রশ্ন তোলেন নি 'মহৎ' সাহিত্যের মহত্ত্ব সম্বন্ধে, তাঁরা তা মেনে নিয়েছেন; তাই তাঁরা ইঙ্গমার্কিন নারীবাদীদের মতো সফলভাবে রুখে দাঁড়াতে পারেন নি পুরুষতান্ত্রিক সাহিত্যের পীড়নমূলক সামাজিক ও রাজনীতিক চক্রান্তের মুখোমুখি। পুরুষেরা যে-সমস্ত বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পছন্দ করে ফরাশিদেশে, তাঁরাও ব্যস্ত থেকেছেন তা নিয়েই; তবে তা বিশ্লেষণ করেছেন নারীবাদী দৃষ্টিতে। ফরাশি নারীবাদীদের কাছে ভাষা প্রধান গুরুত্বের বস্তু। ফরাশি নবনারীবাদের তিন প্রধান এলেন সিজো, ল্যুস ইরিগারে, ও জুলিয়া ক্রিস্তেভা।

এলেন সিজো ১৯৭৫-১৯৭৭ সময়ের মধ্যে লেখেন একরাশ তাত্ত্বিক রচনা, যাতে খোঁজা হয় নারী, নারীত্ব, নারীবাদ, ও লেখার সম্পর্ক। তাঁর লেখার মধ্যে রয়েছে *ল্য জ্যন নে* (ক্যাথেরিন ক্লেমঁওর সাথে, ১৯৭৫), 'মেদুসার হাস্য' (১৯৭৫), 'নপুংসকীকরণ না শিরচ্ছেদীকরণ?' (১৯৭৬), *ল্য ভ্যন্যু লেক্রিত্যুর : লেখায় আসা* (১৯৭৭)। তাঁর লেখায় কিছু কেন্দ্রীয় ধারণা ও চিত্রকল্প ফিরে ফিরে আসে, আর তাঁর লেখা হয়ে ওঠে এমন যেনো তা সরলরৈখিকভাবে পড়ার জন্যে নয়। তাঁর লেখা কাব্যিক, রূপকভরা, চিত্রকল্পের বিশ্লেষণঅসম্ভব জালের মতো। দেরিদার মতে পশ্চিমি পরাবিদ্যা আলোচনার ভিত্তি পুরুষ, পুরুষের একটি অতিশায়িত আদর্শায়িত রূপ গঠন ক'রে সমস্ত চিন্তার কেন্দ্রে বসানো হয়েছে পুরুষকে। দর্শনের সূচনাকাল থেকে পুরুষ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এমন এক জ্ঞানতত্ত্বের কেন্দ্রে, যা গ'ড়ে উঠেছে ক্রমস্তরিকভাবে বিন্যস্ত একরাশ দ্বিমুখি ধারণায়। তাতে পুরুষ সব সময় অধিকার ক'রে আছে সুবিধাজনক স্থান : সত্তা/অপর, কর্তা/কর্ম, উপস্থিতি/অনুপস্থিতি, বিধি বা শৃঙ্খলা/বিশৃঙ্খলা, পুরুষ/নারী প্রভৃতি দ্বিমুখি ধারণায় পুরুষই মূল ধারণা। ফরাশি নারীবাদীরা দেখান পুরুষ নারীকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই ক্রমস্তরিক বিন্যাসের ঋণাত্মক প্রান্তের দিকে *ঠেলে* দিয়েছে, এবং নারীকে জড়িয়ে দিয়েছে সে-সব ধারণার সাথে যেগুলো বোঝায় 'মানুষ-নয়'। পুরুষ এভাবে অধিকার করেছে কেন্দ্রিকতা ও ক্ষমতা। তাঁরা পুরুষাধিপত্যবাদী পরাবিদ্যাকে বুঝিয়ে থাকেন একটি শব্দে, শব্দটি 'ফ্যালোসেন্ট্রিজম' বা 'শিশ্নকেন্দ্রিকতা', যাতে শিশ্নই কেন্দ্র, পুরুষই সব। পিতৃতন্ত্রে নারীপুরুষের মূল্য কী, তা দেখানোর জন্যে সিজো পেশ করেছেন তাঁর 'পিতৃতান্ত্রিক দ্বিমুখি বৈপরীত্য'-এর তালিকা : সক্রিয়/অক্রিয়, সূর্য/চন্দ্র, সংস্কৃতি/প্রকৃতি, দিন/রাত, পিতা/মাতা, মস্তিষ্ক/আবেগ, বোধগম্য/ভাবাবেগপরায়ণ প্রভৃতি; এবং দেখিয়েছেন এ-তালিকার ধনাত্মক বৈশিষ্ট্যগুলো সবই পুরুষের, ঋণাত্মক বৈশিষ্ট্যগুলো নারীর। এ-ধরনের চিন্তায় সিজো সক্রিয় দেখেছেন মৃত্যুকে। তাঁর মতে দ্বিমুখি বৈপরীত্যের একটি ধারণাকে অর্থপূর্ণ হওয়ার জন্যে দরকার অপরটির বিনাশ; তাই আধিপত্যের জন্যে লড়াই ক'রে চলছে ধারণাগুলো। এতে বিজয় = সক্রিয়তা, আর পরাজয় = অক্রিয়তা। পিতৃতন্ত্রে পুরুষই সব সময় বিজয়ী। তাই নারী অভিন্ন মৃত্যুর সাথে। সিজো সৃষ্টি করতে চেয়েছেন *এক্রিত্যুর ফেমিনিন* বা *নারীর লেখা* ব'লে একটি ধারণা। তাঁর মতে নারীর লেখার অভিমুখ ভিন্নতার দিকে, যার লক্ষ্য শিশ্নবাক্যকেন্দ্রিক–*ফ্যালোগোসেন্ট্রিক*–যুক্তি উপেক্ষা করা। তিনি নির্দেশ করেছেন লেখারও লিঙ্গ; তবে ওই লিঙ্গ লেখকের লিঙ্গের ওপর নির্ভরশীল নয়। তাঁর মতে অনেক নারীই এমন লেখা লিখেছেন, যা আসলে পুংলিঙ্গ। তবে তিনি লিঙ্গ ধারণাই ত্যাগ করতে চান।

লুস ইরিগারের প্রথম বই *চিত্তভ্রংশতার ভাষা* (১৯৭৩) বেশ সুদূর নারীবাদী লক্ষ্য থেকে, কিন্তু দ্বিতীয় বই *অপর নারীর অবতল দর্পণ*-এ (১৯৭৪) তিনি নারীবাদের জন্যে পেশ করেন গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব, এবং এ-বইয়ের জন্যে তিনি বহিষ্কৃত হন লাকঁর ফ্রয়েডীয় ইস্কুল থেকে। বইটি অতিবিতর্কিত। ১৯৭৭-এ বেরোয় *এই লিঙ্গ যা একটি নয়,* এর পর বেরোয় *এবং একজন অপরজনকে ছাড়া আলোড়িত হয় না* (১৯৭৯), *ফ্রিডরিখ নিটশের জলীয় প্রেমিক* (১৯৮০), *মায়ের সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ* (১৯৮১), *প্রাথমিক সংরাগ* (১৯৮২)। তাঁর *অবতল দর্পণ*-এর প্রথম ভাগে রয়েছে ফ্রয়েডের নারীমনোবিজ্ঞানের কঠোর সমালোচনা, তবে তিনি মিলেটের মতো মনোবিজ্ঞানকে সহজাতভাবে প্রতিক্রিয়াশীল ব'লে বাদ দেন নি। বইটি তিনি ফ্রয়েডকে দিয়ে শুরু এবং প্লাতোকে দিয়ে শেষ ক'রে নষ্ট ক'রে দেন স্বাভাবিক কালানুক্রম। এ-বইয়ের গঠনের সাথে মিল রয়েছে স্ত্রীরোগবিদদের ব্যবহৃত অবতল দর্পণের, যা দিয়ে তারা নারীদেহের নানা রন্ধ্র পর্যবেক্ষণ করে। তাঁর রচনাপদ্ধতি বিসাংগঠনিক। জুলিয়া ক্রিস্তেভা বুলগেরীয়, ১৯৬৬তে আসেন প্যারিসে। রোলাঁ বার্ত তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, 'জুলিয়া ক্রিস্তেভা বস্তুর স্থান বদলে দেন; তিনি ধ্বংস করেন অতিসাম্প্রতিক পূর্বধারণা...তিনি ধ্বংস করেন কর্তৃত্ব, একযৌক্তিক বিজ্ঞানের কর্তৃত্ব'। তাঁর বইয়ের মধ্যে রয়েছে *কাব্যভাষার বিপ্লব* (১৯৭৪), *ভাষায় কামনাবাসনা* (১৯৮০), *বিভীষিকার ক্ষমতা* (১৯৮০) প্রভৃতি। ক্রিস্তেভার প্রধান প্রবণতা ভাষার সমস্যা বিশ্লেষণ। তাঁর মতে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের ভাবাদর্শগত ও দার্শনিক ভিত্তিটি কর্তৃত্বপরায়ণ ও পীড়নবাদী। ক্রিস্তেভা, রুশ ভাষাবিজ্ঞানী ভোলোসিনোভের মতো, ভেঙে দিতে চান ভাষাবিজ্ঞান, অলঙ্কারশাস্ত্র ও কাব্যতত্ত্বের মধ্যবর্তী দেয়াল, এবং তৈরি করতে চান একটি নতুন ক্ষেত্র, যার নাম *পাঠগত তত্ত্ব*।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারীদের নারীরা :
নারীদের উপন্যাসে নারীভাবমূর্তি

উপন্যাসের উদ্ভব ঘটেছিলো নানা উদ্দেশ্যে; তার একটি নারীদের নীতিশিক্ষা দেয়া, অর্থাৎ শুরু থেকেই উপন্যাসের বিশেষ লক্ষ্যবস্তু নারীরা। পশ্চিমের পুঁজিবাদী পুরুষেরা চেয়েছিলো নারী উপন্যাস উপভোগ ও উপন্যাসের ফল ভোগ করবে, সতী হবে, এবং রমণীর গুণে সুখে ভ'রে উঠবে সংসার। তখন তারা ভাবে নি ওই নারীও উপন্যাস লিখবে একদিন, শোনাবে নিজের মর্মান্তিক পুরুষপীড়িত জীবনকাহিনী। পুরুষ নারীর সৃষ্টিশীলতায় বিশ্বাস করে নি কখনো, আজো সন্দেহের চোখে দেখে নারীর সমস্ত সৃষ্টিকে; সাধারণত তাকে স্বীকৃতি দেয় না, বা দেয় নিজেরই স্বার্থে। বাঙলা ভাষায় প্রথম উপন্যাস লেখার উদ্যোগ নিয়েছিলেন এক বিদেশিনী, হেনা ক্যাথেরিন মুলেন্স্, যিনি *ফুলমণি ও করুণার বিবরণ* (১৮৫২) নামের একটি উপন্যাস-খসড়ায় নারীদের দিতে চেয়েছিলেন খ্রিস্টীয় করুণার শিক্ষা, পুরুষের ছক অনুসারে ঢালাই করতে চেয়েছিলেন নারীদের। বাঙালি নারীরা যখন প্রথম উপন্যাস লেখা শুরু করে, তখন পুরুষ এ-কাজকে অনাচার ব'লেই গণ্য করে; আজো বাঙালি পুরুষ তাদের সম্পূর্ণরূপে স্বীকার ক'রে নেয় নি। তবে বাঙালি নারী উপন্যাসে হাত দিতে দেরি করে নি; পুরুষের প্রথম উদ্যোগের দু-দশকের মধ্যেই বেরোয় নারীর প্রথম উপন্যাস : স্বর্ণকুমারী দেবীর *দীপনির্বাণ* (১৮৭৬)। তাঁর অন্য কয়েকটি উপন্যাস *ছিন্ন মুকুল* (১৮৭৬), *বিদ্রোহ* (১৮৯০), *স্নেহলতা* (১৮৯২), *ফুলের মালা* (১৮৯৪), *হুগলীর ইমামবাড়ী* (১৮৯৪), *কাহাকে* (১৮৯৮)। অল্প পরেই দেখা দেন জনপ্রিয় অনুরূপা দেবী ও নিরুপমা দেবী, তাঁরা দুজনে লেখেন প্রচুর উপন্যাস। নিরুপমার উপন্যাস *অন্নপূর্ণার মন্দির, দিদি* (১৯১৫), *বিধিলিপি* (১৯১৭), *শ্যামলী* (১৯১৮); অনুরূপার উপন্যাস *মন্ত্রশক্তি* (১৯১৫), *মহানিশা* (১৯১৯), *মা* (১৯২০), *গরিবের মেয়ে, পথহারা, ত্রিবেণী* (১৯২৮), *জ্যোতিঃহারা; চক্র*; এবং দেখা দেন প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, শৈলবালা ঘোষজায়া, সীতা দেবী, শান্তা দেবী, ও আরো অনেকে। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌ বলেছিলেন যে উপন্যাস নারীর একান্ত শিল্পাঙ্গিক, বাঙালি নারীরা তাঁর কথাকে অনেকখানি সত্যে পরিণত করেছে।

বাঙালি নারী ঔপন্যাসিকদের উপন্যাস জনপ্রিয় হয়েছিলো, কিন্তু তা পুরুষের কাছে গুরুত্ব পায় নি; বরং উপহাসের সামগ্রী হয়েছে। তাঁরা প্রচুর উপন্যাস লিখেছেন, বিক্রিও হয়েছে প্রচুর; তবে তা হয়ে আছে এক উপসংস্কৃতিধারা, যেনো তা নারীদের জন্যে নারীদের লেখা, পুরুষের মূলধারার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র নারীদের উপন্যাসকে দেখেছেন আত্মম্ভরী পুংসুলভ করুণা ও উপহাসের চোখে। তিনি বাঙালি নারী ঔপন্যাসিকদের গোণার মধ্যেই ধরেন নি, তখনো তাঁরা দেখা দেন নি ব'লেই শুধু নয়, দেখা দিলেও পুছতেন না তিনি তাঁদের; তিনি পশ্চিমের প্রধান নারী ঔপন্যাসিকদেরও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করুণা করেছেন। *কমলাকান্তের দপ্তর*-এ (১৮৭৫) 'মনুষ্য ফল' রচনায় কমলাকান্তের মুখে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন :

> তার পরে মালা– এটি স্ত্রীলোকের বিদ্যা– কখন আধখানা বৈ পূরা দেখিতে পাইলাম না। নারিকেলের মালা বড় কাজে লাগে না; স্ত্রীলোকের বিদ্যাও বড় নয়। মেরি সমরবিল বিজ্ঞান লিখিয়াছেন, জেন অষ্টেন্ বা জর্জ এলিয়ট উপন্যাস লিখিয়াছেন–মন্দ হয় নাই, কিন্তু দুই মালার মাপে।

কমলাকান্তের মতকে বঙ্কিমের মত ব'লেই ধরতে পারি, এতে প্রকাশ পেয়েছে উগ্র পুংতান্ত্রিক মনোভাব। যে-জর্জ এলিয়টকে 'মালার মাপের' ঔপন্যাসিক ব'লে বাতিল ক'রে দিয়েছেন বঙ্কিম, বাঙলার প্রথম নারী ঔপন্যাসিক স্বর্ণকুমারীর দেবীর *কাহাকে* (১৮৯৮) উপন্যাসের চরিত্ররা তাঁকে নিয়ে তর্ক করেছে, তুলনা করেছে শেক্সপিয়রের সাথে। স্বর্ণকুমারী ডাক্তার বিনয়কুমারের মুখে দিয়েছেন তাঁর নিজেরই কথা, যা পুরুষতান্ত্রিকদের কাছে গণ্য হবে ক্ষমার অযোগ্য অবিনয় ব'লে। এটা বুঝিয়ে দেয় নারীরা সব সময়ই সন্দেহ বোধ করেছে পুরুষের মূল্যায়ন সম্বন্ধে; তারা নিজেরাও মূল্যায়ন করেছে সব কিছু, যদিও তা প্রকাশ করার সুযোগ ও সাহস পায় নি। সুযোগ পেলেই তারা ভিন্ন মত প্রকাশ করতে দ্বিধা করে নি। স্বর্ণকুমারীর চোখে জর্জ এলিয়ট এক শেক্সপিয়র, তাঁর চোখে বঙ্কিম কী, তা জানা যায় নি; কিন্তু তিনি যদি জর্জ এলিয়ট ও বঙ্কিমের তুলনা করতেন, তাহলে বঙ্কিমকে হয়তো গণ্য করতেন জর্জ এলিয়টের তুলনায় খুবই তুচ্ছ ঔপন্যাসিকরূপে। পুরুষ মেনে নিতে পারে নি নারীর সাহিত্যসাধনাকে, কেননা এটা পুরুষের এলাকা; তাই নারীকে পুরুষ বার বার ফেরত পাঠাতে চেয়েছে ঘরের ভেতরে, সরাসরি রান্নাঘরে। যেমন জগদীশ্বরী দেবীর *দ্রৌপদী* কাব্য সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন (১৩১২) বলেছেন :

AMARBOI.COM

> গ্রন্থকর্ত্রী যদি কাব্যশালা হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া রন্ধনশালার ভার গ্রহণ করেন, তবে অনেক উপাদেয় সামগ্রী প্রস্তুত হইতে পারে–সে স্বাভাবিক পন্থা ছাড়িয়া তিনি ভিন্ন উপায়ে লোকরঞ্জনের প্রয়াসী হইয়া মোটেই ভাল করেন নাই।

দীনেশচন্দ্র সাহিত্য সমালোচনায় ব'সে ভুলতে পারেন নি যে কবিটি নারী, তাঁর কাজ রান্না করা। পশ্চিমের পুরুষতান্ত্রিক সমালোচকেরা নারীসাহিত্য সমালোচনার নামে সাধারণত মাপেন বইয়ের বক্ষ ও নিতম্ব, সম্ভোগ করেন নারীদের বই; বাঙালি সমালোচকেরা তা পারেন না সমাজিক কারণে, তাই তাঁরা খাদ্যের মতো আস্বাদন করেন নারীসাহিত্য। স্বামী হিশেবে যেমন তাঁরা পরখ করেন স্ত্রীর রান্না, সমালোচক হিশেবে তেমনি স্বাদ নেন সাহিত্যরান্নার। বাঙালি পুরুষের কাছে নারীসাহিত্য এক ধরনের পাকপ্রণালি, যা আসল পাকপ্রণালির থেকে নিকৃষ্ট। রান্নাবান্নার থেকে উৎকৃষ্ট, নারীর জন্যে শ্রেষ্ঠ, কাজ হচ্ছে স্বামীসেবা; তাই নারীসাহিত্য তখন প্রশংসা পেয়েছে, যখন তা স্বামী ও সংসারসেবার গান গেয়েছে। *ভারতী*তে (১৩১৬) অজ্ঞাতনাম এক সমালোচক শরৎকুমারীর *শুভবিবাহ* উপন্যাসটি আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'সাহিত্য-সেবারতা, নিষ্ঠাবতী শরৎকুমারীর পতিভক্তি ও সংসারপালনদক্ষতা প্রভৃতি প্রকৃতই অনুকরণীয়।' তাঁর সাহিত্যের মূল্য নেই, মূল্যবান তাঁর পতিভক্তি ও সংসারপালনদক্ষতা। নারী কিছু লিখেছে, এটাই আপত্তিকর; তার ওপর যদি তাতে থাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাণ্ডিত্য, তবে তা হয়ে ওঠে দ্বিগুণ আপত্তিকর। পুরুষের প্রিয় হচ্ছে মূর্খ নির্বোধ নারী, পুরুষের কাছে প্রিয় নারীর শান্ত সরলতা; নারী যখন শান্ত সরলতার সীমা পেরিয়ে যায়, তখন সহ্য করা অসম্ভব হয়ে ওঠে পুরুষের পক্ষে। শরৎচন্দ্র, যিনি নারীর পক্ষে লিখেছিলেন *নারীর মূল্য* (১৩২০), তিনিও নারীর পাণ্ডিত্যের ঝাঁজ সহ্য করতে পারেন নি। অনিলা দেবী ছদ্মনামে শরৎচন্দ্র লেখেন 'নারীর লেখা' (১৩১৯) নামে একটি নারীসাহিত্যবিদ্বেষী প্রবন্ধ। নারীনামের ছদ্মবেশে লুকিয়ে নারীকে আক্রমণ করা পুরুষের এক প্রিয় হীন স্বভাব। এতে তিনি উপহাস করেন নারী লেখকদের– আমোদিনী ঘোষজায়া, অনরূপ দেবী ও নিরুপমা দেবীকে; পরিহাস করেন তাঁদের পাণ্ডিত্যকে, উপহাস করেন তাঁদের অভিজ্ঞতার অভাবকে। ধরেন তাঁদের নানা রকমের ভুল, এবং উড়িয়ে দেন নারীসাহিত্যকে, যেনো সাহিত্যচর্চা নারীদের জন্যে অনধিকারচর্চা। কুমুদিনীমোহন নিয়োগী (১৩২৯) এক লেখিকাকে প্রশংসা ক'রে লিখেছেন : 'তাঁর রচনার একটি প্রধান বিশেষত্ব–সরলতা আর শান্ত সংযত ভাব। অনেক নারীর রচনায় দেখি, পাণ্ডিত্যের ঝাঁজ এমনি তীব্র হল্কা ফুটাইয়া রহিয়াছে যে গা একেবারে জ্বলিয়া যায়। এই ঝাঁজ ইন্দিরা দেবীর রচনায় মোটেই নাই।' ঝাঁজ সৃষ্টির অধিকার শুধু পুরুষের; নারী ঝাঁজ সৃষ্টি করবে না, এমন কিছু করবে না যা পুরুষের অহমিকাকে পীড়িত করতে পারে। নারী যদি সাহিত্য সৃষ্টি করতেই চায়, তাহলে সে এমনভাবে করবে, যা উপাদেয় হবে পুরুষের রসনায়।

প্রভুর দর্শনে দীক্ষিত হয় অসংখ্য দাসদাসী, অসংখ্য নারীও দীক্ষিত হয় পুরুষের মন্ত্রে; আজো অনেক নারী গলগল ক'রে উচ্চারণ করে প্রভুপুরুষের মন্ত্র। যেমন, নগেন্দ্রবালা সরস্বতী *নারীধর্ম* কাব্যের ভূমিকায় লিখেছেন, 'সংসারে রমণীগণ প্রেমপ্রীতির আকরস্বরূপ। তাহাদেরই স্নেহ-মমতা-পবিত্রতায় সংসার শান্তিময়, এই জন্যই হিন্দু সংসারে রমণীগণ দেবীবৎপূজনীয়া। কিরূপে রমণীগণ নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন পূর্ব্বক নারীধর্ম্ম রক্ষা করিয়া– সংসারে অমৃত স্রোত প্রবাহিত করিতে পারেন, কিরূপে নারীচরিত্রে প্রকৃত দেবীচরিত্র প্রতিভাত হইতে পারে, এই নারীধর্ম্মে তাহারই আলোচনা করিয়াছি।' এতে খুব প্রীত হওয়ার কথা পুরুষের, যেমন হয়েছেন চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় (১৩১০)। তিনি *নারীধর্ম্ম*-এর প্রশংসা করেছেন এভাবে :

> মোটের উপর এগ্রন্থ পাঠে আমরা বড় প্রীত হইয়াছি–প্রীত হইবার আর একটি বিশেষ কারণ এই যে, শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা এতদিন কবিতার আলোচনা করিয়া যশঃসঞ্চয়ে ব্রতিনী ছিলেন–এখন তিনি সংসারধর্ম্মের সংস্কারে মন দিয়াছেন; নিরবচ্ছিন্ন কবিতা রচনাই যে রমণীজীবনের চরম লক্ষ্য নহে, এবং তাহাতে যে রমণীর তৃপ্তি হয় না, ইহা তিনি বুঝিয়াছেন।

কবিতা লিখতে গিয়ে নগেন্দ্রবালা যে ভুল ও অপরাধ করেছিলেন, তা বুঝতে পেরে তিনি যে আবার মন দিয়েছেন 'রমণীজীবনের চরম লক্ষ্য' সংসারধর্মে, এতে সমগ্র পুরুষসমাজেরই প্রীত বোধ করার কথা। নারীর সাহিত্যচর্চা পুরুষের চোখে বিকার, নারীর বিখ্যাত হওয়ার বাসনা অমার্জনীয় অপরাধ; তবু নারী সাহিত্য সৃষ্টি করেছে। এ-অপরাধের শাস্তি নারীর প্রাপ্য; পুরুষ তাকে শাস্তি দিয়েছে তার সাহিত্যকে অস্বীকার ক'রে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরুষসমাজের এ-স্বভাব, এবং তাদের মন্ত্রে দীক্ষিত সংসারধর্মী অজস্র নারীর নারীপ্রতিভাবিরোধিতা বুঝতে পেরেছিলেন *ভারতীর* 'বঙ্গনারী' (১৩৩৯)। তিনি 'স্ত্রীলেখিকা' নামের এক রচনায় লিখেছিলেন :

> মাসিক পত্রের পৃষ্ঠা উল্টাইতে উল্টাইতে তাহার যে নমুনা পাওয়া যায়, তাহাতে আমাদের দেশে লিখিতে সমর্থ,-সুতরাং "শিক্ষিতা"দের মধ্যেও Mrs. Grundyর প্রাদুর্ভাব দেখিয়া দমিয়া যাইতে হয়। ইহা অবশ্য আশ্চর্য্যের কথা নহে,-সকল দেশেই ইহাঁদের দর্শন পাওয়া যায়; এবং সর্ব্বত্রই ইহাঁরা করতালি পাইয়া থাকেন। তবে মেয়েদের উঠিতে হইলে ঘরে বাহিরে কি পরিমাণ বাধা অতিক্রম করিতে হইবে, ইহাঁরা কেবল তাহাই মনে করাইয়া দেন। মেয়েদের বিষয় যে রকম অসঙ্কোচে হীনভাবে ইহাঁরা বলিতে পারেন, পুরুষের পক্ষে অবশ্য তাহা সম্ভব নয়। আর সর্ব্বত্রই ইহাঁদের বদ্ধ ও স্থূল দৃষ্টি এবং মনের পরিধির সঙ্কীর্ণতা পীড়া দেয়। 'দাস মনোভাব' যে ইহাঁদের কতটা মজ্জাগত তাহা বলাই বাহুল্য।...বাস্তবিকই, বর্ত্তমান পৃথিবীব্যাপী নারী-জাগরণের দিনে তাহার কোন তরঙ্গই ইহাঁদের স্পর্শও করে নাই, বাঙ্গালী ঘরের বদ্ধ একান্ত দূষিত, হীন, খুঁটিনাটি ছাড়াইয়া কল্পনাও একতিল উপরে উঠিতে পারে নাই।...ইহাঁদের মধ্যে কাহারও কাহারও মেয়েদের জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও অপূর্ব্ব কিছু করিবার চেষ্টা দেখা যায়। ইহাঁরা তাহাতেই একটী মৌলিক পথ আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ইহাঁরা ধারণা করিতে পারেন না,-ইহাও তাঁহাদের "নারীত্ব" হইতে প্রাপ্ত অদ্ভুত কোন পদার্থ নয়,-অপর পক্ষেরই শিখানো বুলি। তাঁহারাই ত মেয়েদের "পুরুষের মত" করিয়া কিছু করিতে জোরের সহিত বারণ করিয়া আসিতেছেন। বাস্তবিকই ইহাঁদেরও মেয়েদের সকল শিক্ষাদীক্ষা গোড়া হইতে মেয়েলি করিয়া ফেলিবার আগ্রহ দেখিয়া দুঃখও হয়। ইহাঁরা অপর পক্ষের চারটী বেশ গিলিয়াছেন বোঝা যায়। মেয়েরা ইহাঁদের মতে চলিয়া "বুদ্ধিমতী" না হইয়া "প্রাণময়ী" বনিতে থাকিলে তাঁহাদের আর সুনিদ্রার ব্যাঘাত হইবার কোন কারণ থাকিবে না।

নারীর শত্রু শুধু পুরুষ নয়, তাদের শত্রু হিশেবে রয়েছে পুরুষমন্ত্রে দীক্ষিত একপাল নারীও। এরা পুরুষের চর হিশেবে কাজ করে, নারীর সাংঘাতিক ক্ষতি করে।

বাঙালি পুরুষ, সব জাতির পুরুষের মতোই, নারীসাহিত্যকে অনুমোদন করে নি, নারীসাহিত্যকে দেখেছে রান্নাবান্না বা সংসারসেবারূপে; নারী লেখকদের মধ্যে তারা খুঁজেছে আদর্শ স্ত্রীকে। নারী লেখক, বা তার লেখা মূল্যবান নয় পুরুষের কাছে; তাই বাঙালি নারীসাহিত্যের কোনো ইতিহাস আজো লেখা হয় নি, তাঁদের প্রতিভার প্রকৃতি বিচার ও মূল্যায়ন হয় নি; এমনকি তাঁদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তথ্যও বেশ দুষ্প্রাপ্য। স্বর্ণকুমারী দেবী, অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, সীতা দেবী, শান্তা দেবী ও আরো অনেকের সব বইয়ের নামও খুঁজে পাওয়া যায় না আজ, পাওয়া যায় না তাঁদের বইয়ের প্রকাশের তারিখ। তাঁরা শিকার হয়েছেন পুরুষতান্ত্রিক উপেক্ষার। পুরুষ সমালোচকেরা ধ'লেই নেন তাঁদের সাহিত্য অপাঠ্য; বিশেষ ক'রে যাঁদের বই জনপ্রিয় হয়েছিলো তাঁরা সম্পূর্ণ অপাঠ্য, এমন একটি ধারণা প্রচলিত রয়েছে। তাঁদের বইয়ে সমালোচকেরা, যেমন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৬৯), খোঁজেন 'নারীর সুর-বৈশিষ্ট্যের' পরিচয়। এ-'সুর বৈশিষ্ট্য' কিন্তু নারীর নিজস্ব সুর নয়, তাঁরা খোঁজেন নারীর কণ্ঠ থেকে কতোখানি উঠেছে পুরুষের শেখানো সুর। তাঁরা খোঁজেন পুরুষের বিধিবদ্ধ নারীত্ব, যা এক বানানো জিনিশ। পুরুষ তৈরি করেছে নারীর একরাশ ছক : নারী দেবী বা দানবী, নারী অক্রিয়, নারী মাতা, স্ত্রী, কন্যা, সেবিকা, নারীর জীবন ধন্য হয় আত্মোৎসর্গে। পুরুষের চোখে নারী চূড়ান্ত মর্ষকামী, যে ধন্য বোধ ও স্বর্গলাভ করে চরম পীড়নের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যে। নারী এ-ছক মানে নি, কিন্তু বাধ্য হয়েছে মেনে নিতে। বাঙলার নারীরা যখন উপন্যাস লেখায় হাত দেন, তখন কি তাঁরা এ-ছক মেনে চলেন? তাঁরা কি পুরুষতন্ত্রের দীক্ষাকেই পুনঃপ্রচারের জন্যে ধরেন লেখনি? সব নারী ঔপন্যাসিকের সব উপন্যাস আমি প'ড়ে উঠতে পারি নি,-তাঁদের বই আজ দুষ্প্রাপ্য; বহু কষ্টে আমি সংগ্রহ করেছি ছটি উপন্যাস : স্বর্ণকুমারী দেবীর *কাহাকে* (১৮৯৮), শৈলবালা ঘোষজায়ার *জন্ম-অপরাধী* (?), অনুরূপা দেবীর *মন্ত্রশক্তি* (১৯১৫), নিরুপমা দেবীর *দিদি* (১৯১৫), ও *শ্যামলী* (১৯১৮), শান্তা দেবীর *জীবনদোলা* (?)। এঁরাই আমাদের আদি নারী ঔপন্যাসিক। এঁরা কেউ জর্জ এলিয়ট, বা বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ নন; বাঙলা উপন্যাসধারার কোনো শ্রেষ্ঠ উপন্যাস তাঁরা কেউ লেখেন নি। তাঁরা বেশ গৌণ ঔপন্যাসিক; তবে তাঁদের গৌণতার মূলে কোনো সহজাত কারণ নেই, রয়েছে সামাজিক কারণ। যে-নারীর সৃষ্টিশীলতাকেই স্বীকার করে নি পুরুষ, তাঁরা কলম ধ'রেই মহান সাহিত্য সৃষ্টি করবেন, এটা আশা করা অন্যায়। তবে ইংরেজি উপন্যাসে যেমন নারী ঔপন্যাসিকেরা তেমনি তাঁরাও পুরুষ-ঐতিহ্যের পাশাপাশি সৃষ্টি করেন একটি গতিশীল অন্তঃস্রোত, সুস্পষ্টভাবে পৃথক এক নারীসাহিত্যধারা। তাঁদের সাহিত্য বহুলাংশে আমূলবাদী, এবং নারীকেন্দ্রিক; এমনকি যাঁরা রক্ষণশীল, তাঁরাও নারীর দুর্দশার কথা ভুলে যান নি। আদি বাঙালি নারী ঔপন্যাসিকেরা সাধ্বী স্ত্রীরূপে কলম ধরেন নি, তাঁরা কলম ধরেন পুরুষতন্ত্রের বহু ছক ভেঙে ফেলার জন্যে। তাঁরা বিশ্বাস করেন নি পুরুষের তৈরি নারীভাবমূর্তিতে, শুরু থেকেই বাঙালি নারী ঔপন্যাসিকেরা ভাবমূর্তির থেকে বেশি গুরুত্ব দেন নারীর বাস্তবতার ওপর, এবং লিপ্ত থাকেন পুরুষের সঙ্গে নিরন্তর বিরোধে। এ-বিরোধ স্বর্ণকুমারী, শৈলবালা, শান্তার মধ্যে তীব্র; অনুরূপা ও নিরুপমা যদিও অনেকখানি দীক্ষিত ছিলেন পুরুষের বিধানে, কিন্তু নারীপুরুষের যখন বিরোধ বেধেছে তখন তাঁরাও পক্ষ নিয়েছেন নারীর। পুরুষ, স্বামী, বিধাতা প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণের সময় নারী ঔপন্যাসিকেরা ভক্তির থেকে অভক্তিই দেখিয়েছেন বেশি, আর জ্ঞাপন করেছেন এমন বাণী যে নারীর দুর্দশার মূলে রয়েছে পুরুষ। নারী ঔপন্যাসিকদের উপন্যাস প্রধানত পুরুষদ্রোহিতার উপন্যাস, যাতে এমন একটি ইঙ্গিত মেলে যে পৃথিবীতে পুরুষ না থাকলে নারীর জীবন সুখের হতো। নারী ঔপন্যাসিকদের নারীদের জীবনে ভয়াবহ শব্দ 'বিবাহ', যা নারীদের প্রধান সংকট, যা সম্পন্ন না হ'লে তাদের জীবন ধ্বংস হয়, আর সম্পন্ন হ'লেও ধ্বংস হয়।

স্বর্ণকুমারী দেবী প্রথম বাঙালি নারী ঔপন্যাসিক, এবং তিনিই আমার নেয়া পাঁচজনের মধ্যে আধুনিকতম চেতনাসম্পন্ন, শিল্পিতায়ও শ্রেষ্ঠ। তাঁর যে-উপন্যাসটি আমি নিয়েছি, সেটির নাম *কাহাকে* (১৮৯৮), যাতে কাজ করেছে প্রবল নারীবাদী মনোভাব। দ্য বোভোয়ার নারীর জীবনে প্রেমের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উদ্ধৃত করেছেন বায়রনের যে-দুটি পংক্তি, Man's love is of man's life a thing apart/'Tis woman's whole existence, স্বর্ণকুমারী তাঁর উপন্যাস শুরু করেছেন সে-পংক্তি দুটি উদ্ধৃত ক'রে, এবং তাঁর নায়িকা মণি বলেছে :

> এ কথা যিনি বলিয়াছেন, তিনি একজন পুরুষ। পুরুষ হইয়া রমণীর অন্তর্গত প্রকৃতি এমন হুবহু ঠিকটি কি করিয়া ধরিলেন, ভারি আশ্চর্য্য মনে হয়। আমি ত আমার জীবনের দিকে চাহিয়া এ কথার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্যতা অনুভব করি। যতদূর অতীতে চলিয়া যাই, যখন হইতে জ্ঞানের বিকাশ মনে করিতে পারি, তখন হইতে দেখিতে পাই-কেবল ভালবাসিয়াই আসিতেছি, ভালবাসা ও জীবন আমার পক্ষে একই কথা; সে পদার্থটাকে আমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে জীবনটা একেবারে শূন্য অপদার্থ হইয়া পড়ে- আমার আমিত্বই লোপ পাইয়া যায়।

প্রেম সম্পর্কে মণির ব্যাখ্যা অবশ্য দ্য বোভোয়ারের ব্যাখ্যার মতো নয়, তবে সে ক্রমশ এগিয়েছে সে-দিকেই। মণি বা মৃণালিনী *কাহাকে*র নায়িকা, সে নিজের প্রেম ও বিয়ের উপাখ্যান বলেছে নিজেই। নিজের জীবন, প্রেম, ও বিয়ের কাহিনী সে যেভাবে অকপটে বলেছে, তাতেই নষ্ট হয়ে গেছে লজ্জাবতী নারীর ছকটি। মণি অক্রিয় নয়, নিজের গল্প অকপটে বলার মধ্যেই তার সক্রিয়তার পরিচয় মেলে, এবং সে সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণও করে পরিস্থিতি। সারা উপন্যাসেই টের পাওয়া যায় যে তার শুধু হৃদয় নয়, একটি মস্তিষ্ক রয়েছে, এবং মস্তিষ্কটিই বেশি সক্রিয়। তার জীবনকাহিনী জটিল নয়, এবং সে বাঙলার অধিকাংশ নারীর দুটি অভিশাপ থেকে মুক্ত;-সে দরিদ্রকন্যা নয়, ও অশিক্ষিত নয়; তবু বিয়েই সৃষ্টি করে তার জীবনের সমস্যা। মণি ছোটো বা বিনয়কুমারের সাথে তার বাল্যপ্রেম, যৌবনে ব্যারিস্টার রমানাথের সাথে ব্যর্থ প্রণয়, অবশেষে বাল্যপ্রেমিক ডাক্তার বিনয়কুমারের সাথে রোমাঞ্চকর রোম্যান্টিক মিলনের কাহিনী অকপটে বলেছে। মণির কথা বলার ভঙ্গি থেকে বোঝা যায় নারীমুক্তি আন্দোলনের বাণীর সাথে সে পরিচিত, আমূল নারীবাদী না হ'লেও সে নারীবাদী। সে পুরুষবিদ্বেষী নয়, কিন্তু পুরুষের সাথে তার লিঙ্গের যে বিরোধ রয়েছে, সেটা কখনো স্পষ্ট কখনো প্রচ্ছন্নভাবে সে জানাতে দ্বিধা করে নি। শুরুতেই নিজের বয়সের কথা বলতে গিয়ে সে বলে, 'তখন আমার বয়স কত? সাল তারিখ ধরিয়া এখনি তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারিতেছি না।...পুরুষে সম্ভবতঃ আমার সারল্যে অবিশ্বাস করিয়া ইহার মধ্য হইতে গূঢ় অভিপ্রায় টানিয়া বাহির করিবেন, কিন্তু স্ত্রীলোক বুঝিবেন, বাস্তবিক পক্ষে সাল তারিখ মনে করিয়া রাখা আমাদের পক্ষে কিরূপ কঠিন ব্যাপার।' সে ধ'রেই নিয়েছে নারীরা তার কথায় বিশ্বাস করবে, কিন্তু 'পুরুষে সম্ভবতঃ' অবিশ্বাস করবে; অর্থাৎ পুরুষ ও নারী বিশ্বাস করে না পরস্পরকে, তারা জড়িত অবিশ্বাসের সম্পর্কে। শুধু পুরুষকে নয়, পুরুষের মধ্যে যে প্রধান, তাকেও মণি দেখে একই দৃষ্টিতে; সে বলে, 'বিধাতা পুরুষ তাহা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন।' যা সম্ভব হ'তে পারতো, হওয়াই স্বাভাবিক ছিলো, তা যে অসম্ভব হয়ে উঠেছে, তার মূলে রয়েছে একটি পুরুষ- বিধাতাপুরুষ, যে নারীর প্রতিপক্ষ। সে যেভাবে নিজের বয়স জানিয়েছে, তাতেও সে ভেঙে ফেলেছে প্রথাগত নারীভাবমূর্তি, প্রকাশ করেছে পুরুষের সাথে বিরোধ; সে বলেছে, 'ধরিয়া লওয়া যাক, আমার বয়স তখন আঠার উনিশ, আমি এখনো অবিবাহিত। শুনিয়া কি কেহ আশ্চর্য্য হইতেছেন?' বোঝা যায় তার লক্ষ্য পুরুষ, তার আইবুড়ীত্বে বিস্মিত হবে পুরুষই, কেননা সেটি এক ভিন্ন প্রজাতি।

মণি তার প্রেমের কথা বলেছে অকপটে, প্রেমে প্রথাগত অক্রিয়তার বদলে পালন করেছে সক্রিয় ভূমিকা, অমান্য করেছে পিতৃতান্ত্রিক বিধান যে নারীর প্রেম শুধু স্বামীরই জন্যে। মণি বলেছে, 'আমি ভালবাসি, বিবাহের পূর্ব্বেই ভালবাসি, তিনি যে স্বামী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হইবেন, এমনতর আশা করিয়াও ভালবাসি নাই। কেবল তাহাই নহে, এই ভালবাসাই আমার একমাত্র প্রথম ও শেষ ভালবাসা নহে।' উনিশশতকের শেষ দশকের পক্ষে খুবই ভয়ঙ্কর কথা বলেছে সে অবলীলায় যে সে ভালোবেসেছে বিয়ের আগেই, পুরুষটিকে ভবিষ্যৎ স্বামী ভেবেও ভালোবাসে নি, এবং চরম ভয়ঙ্কর কথা হচ্ছে সে প্রেমে পড়েছে একাধিকবার। নিষ্ঠাবতী সতী নারীর ভাবিমূর্তি সে ভেঙেচুরে দিয়েছে। প্রেমে সে বিশ্বাস করে সাম্যে, শুধু নারীই পুজো করবে প্রেমিককে, আর প্রেমিক পুজো করবে না প্রেমিকাকে, এটা তার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়; সে বলে : 'সে রমণীই ধন্য–যে তাহার মনোদেবতার সন্ধান পাইয়া এই পরিপূর্ণ উথলিত আবেগময় প্রাণের পূজায় জীবন সার্থক করিতে পারে; আর সেই পুরুষই ধন্য, যে এই পূজারতা হৃদয়ের দেবতারূপে বরিত হইয়া তাহার পূজায় জীবন উৎসর্গ করিয়া জীবনের উদ্দেশ্য সফল করিতে পারে, আর সেই প্রেমই প্রকৃত প্রেম, যাহা এই উভয়ের আত্মহারা পূজায় অধিষ্ঠিত হইয়া প্রবলভাবে চিরবিরাজমান।' পুরুষ অবশ্য এমন প্রেমে বিশ্বাস করে না, পুরুষ চায় বহু হৃদয় ও দেহের দেবতা হ'তে। প্রেম সম্পর্কে প্রথাগত ধারণা সে বাতিল ক'রে দিয়েছে স্পষ্টভাবে, শৈশবের প্রেমও যে ইন্দ্রিয় কামনাতুর হ'তে পারে, তাও সে জানিয়েছে; বলেছে, 'শৈশব ও যৌবনপ্রেমে তফাৎ অল্পই', বলেছে, 'ভাবিতাম, ছোটু ত আমাকে চুম্বন করে না; তবে বাবার মত আমাকে ভালবাসে না, আমি কেন তবে ভালবাসিব?' শৈশবের নিষ্পাপতার মধ্যে সে মিশিয়ে দিয়েছে একটু পাপ, এবং যৌবনের প্রেমকে স্থান দিয়েছে পিতৃপ্রেমের ওপরে : 'আমি পিতাকে ভালবাসি, তাঁহার সুখের জন্য আত্মবিসর্জ্জনেও কুণ্ঠিত নহি–কিন্তু তিনি এখন আর আমার জীবনের একমাত্র সুখদুঃখ আশ্রয় অবলম্বন, আকাঙ্ক্ষা কামনা পূজা আরাধনা, দেবতাসর্বস্ব নহেন।' পিতাকে সরিয়ে দিয়ে সে প্রথাগত কন্যার ভাবমূর্তি বিপন্ন করেছে সম্পূর্ণরূপে। পিতৃতন্ত্রের ভালো লাগতো যদি সে বলতো পিতাই তার দেবতাসর্বস্ব, কিন্তু মণি সেখানে বসিয়েছে তার প্রেমকে, প্রেমিককে। প্রেম তার কাছে যেরূপে দেখা দিয়েছে, তাও সে জানিয়েছে : 'তাহার পর আট দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, তাহার পর আমি ভালও বাসিয়াছি, শৈশবের স্নিগ্ধ কোমল ভালবাসা নহে, যাহাকে লোকে বলে প্রেম–যৌবনের সেই জ্বলন্ত অনুরাগ– তাহারও অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে।' মণি অভিনব নারী, যে ছক ভেঙেছে, স্বায়ত্তশাসিত মানুষ হয়ে উঠেছে।

প্রেমে পড়ার প্রথাগত রোম্যান্টিক সূত্রটিকেও সে অস্বীকার করেছে; বলেছে, 'প্রথম দর্শনেই কি আমি প্রাণসমর্পণ করিয়াছিলাম? মোটেই নহে।' সে প্রেমে পড়েছে ধীরে ধীরে, তার বাল্যস্মৃতি তাকে যৌবনে ঠেলে দিয়েছে প্রেমের দিকে। বাল্যকালে পাঠশালায় তার প্রথম প্রেমিক ছোটু যে-গানটি তাকে শুনিয়েছিলো, সেটি অনেক বছর পর সে শুনতে পায় রমানাথের কণ্ঠে; তার ফল হচ্ছে : 'কিন্তু গানটি গাহিলেই সমস্ত বিপর্য্যয় হইয়া পড়িত।...গানটির যে কি মোহ ছিল জানি না, শুনিতে শুনিতে বাল্যের স্মৃতিধারা পূর্ণ প্রবাহে উথলিয়া কুমারীহৃদয়ের অতৃপ্ত প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে স্ফীত উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিল।...তিনি চলিয়া যাইবার পরেও সমস্ত রাত্রি ধরিয়া কেমন মেঘাচ্ছন্ন থাকিতাম–স্বপ্নে জাগরণে ঐ একইরূপ ভাব আমাকে অভিভূত করিয়া রাখিত; পরদিন নিদ্রাভঙ্গের পর হইতে সে ভাব অল্পে অল্পে দূর হইয়া যাইত।' তবে প্রেম নারীজীবনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা বিয়ে; মণির জীবনেও বিয়েই বড়ো হয়ে দেখা দেয়। সে দেখতে পায় যাকে সে হৃদয় দিয়েছে, সমাজের চোখে সে তার স্বামী হওয়ার যোগ্য হ'লেও তার হৃদয়ের যোগ্য নয়। ফলে যে-সংকট দেখা দেয় তার জীবনে, তাতে সে এমন এক আন্তর-বাহ্যিক লড়াইয়ে নামে যাতে সে বদলে দেয় প্রথাগত নারীর ভাবমূর্তি। বিয়ে হচ্ছে একটি স্বামীর জন্য, মণিও চারদিকে পরিবৃত হয়ে পড়ে স্বামীর ভাবমূর্তি দিয়ে : 'চারিদিক হইতেই আমি শুনিতে লাগিলাম, বুঝিতে লাগিলাম, তিনি আমার স্বামী হইবেন, কোন বঙ্গবালার মনে এই বিশ্বাসের কিরূপ প্রবল প্রভাব, তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক আছে কি?' স্বামী সম্পর্কে শিশুকাল থেকেই মেয়েদের মনে তৈরি করা হয় এক দেবভাবমূর্তি, মেয়েরা বড়ো হয় ওই মূর্তিটিকে পুজো ক'রে ক'রে, মণিও তার বাইরে নয়। স্বামীর যে-ছক তার সামনে ছিলো, সেটি সম্বন্ধে সে বলেছে : 'স্বামী যেমনই হৌন, তিনি রমণীর একমাত্র পূজ্য আরাধ্য দেবতা, প্রাণের প্রিয়তম, জীবনের সর্বস্ব-এই বাক্য, এই ভাব, এই সংস্কার আজন্মকাল হইতে আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া বসিতেছে, সুতরাং বিশেষ কারণে স্পষ্ট বীতরাগ না থাকিলে এই বিশ্বাসই প্রেমাঙ্কুরিত করিবার যথেষ্ট কারণ।' মণি, অন্য মেয়েদের মতো, বড়ো হয়েছে স্বামী ভাবমূর্তির পদতলে, ওই পায়ের নিচে নিজের মাথাটি রেখেই বেড়েছে সে; এবং 'আত্মদানে অন্যকে সুখী করিব নারীপ্রকৃতির এই যে সর্বগ্রাসী আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছাপ্রবণতা, নারীপ্রেমের শিরায় মজ্জায় যে আকাঙ্ক্ষা শোণিতাকারে প্রবাহিত বর্ত্তমান, তাহার সফলতাতেই, তাহার বিশ্বাসেই রমণী-হৃদয় পরিপূর্ণ, বিকসিত, জীবনজন্ম সার্থক, চরিতার্থ; আবার এ বিশ্বাসেই সে ভ্রান্ত, কলঙ্কিত, মহাপাপী। প্রেমময়ী রমণী ইহার জন্য কতদূর আত্মত্যাগ করিতেছে; আর কতদূর না করিতে পারে?' তবে স্বামী ভাবমূর্তির পায়ে আত্মদানের পাশাপাশি সব নারীই পোষে স্বামী ভাবমূর্তির সাথে একটা বিরোধ, এটা নারী ঔপন্যাসিকদের প্রায় সব উপন্যাসেই স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্নভাবে দেখা যায়, এবং মণির মধ্যে তা স্পষ্ট দেখা দেয় প্রেমে পড়ার অল্প পরেই।

বাঙালি নারীকে পিতৃতন্ত্র দিয়েছে স্বামীভক্তির পাঠ, পুরুষে আস্থা; কিন্তু বাঙালি নারীপুরুষের সম্পর্ক একটু ঘাঁটলে ধরা পড়ে তাদের পারস্পরিক অনাস্থা। পুরুষ তার নারী-অনাস্থা উচ্চকণ্ঠে প্রচার ক'রে আসছে পিতৃতন্ত্রের শুরু থেকে, নানা সংহিতা লিখেছে নারীঘৃণার; আর নারী তা বিষের মতো লালন ক'রে এসেছে নিজের বুকে। মণি যার ওপর আস্থা স্থাপন করতে যাচ্ছিলো, অচিরেই তার ওপর তার আস্থা নষ্ট হয়ে যায়। যে-রমানাথের সঙ্গে সে প্রণয়ে জড়িত, যে তার স্বামী হ'তে যাচ্ছে, মণি জানতে পারে সে সৎ নয়; বিলেতে সে এক নারীকে কথা দিয়েছিলো। মণি বলেছে, 'স্বপ্নে দেখিলাম, যেন আমার বিবাহ হইতেছে, আমি আগ্রহদৃষ্টিতে বরের দিকে চাহিলাম, কিন্তু মনে হইল, এ সে নহে।' শুরু হয় তার সংকট; সে নতুন প্রজাতির নারী, যে প্রথাগত ছক অনুসারে চলে না। তার প্রেম বিপর্যস্ত, তবে সে নিজে বিপর্যস্ত নয়। সে বলেছে, 'কিন্তু এ নৈরাশ্যে করুণ কষ্টের দারুণতা, অসহনীয়তা উপলব্ধি করিলাম না; কিংবা সে যেমনই হৌক, তবু আমার দেবতা-তবু তাঁহার চরণে হৃদয় বিকাইব, মনে এমনতর ভাবেরও উদয় হইল না। পরিপূর্ণ বিশ্বাসে প্রতারিত বোধ করিয়া এ যেন প্রত্যাখ্যাত ভিক্ষুক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুর্ব্বাসা মুনির ন্যায় গর্ব্বাহত নিরাশাক্ষুব্ধ হইলাম, প্রতারকের উপর ভীষণ ক্রোধের উদয় হইল। কেবল তাহার উপর নহে, নিজের উপরেও ক্রুদ্ধ হইলাম-কি করিয়া আমি এমন লোককে দেবতা মনে করিয়াছিলাম!' প্রথাগত কতকগুলো বিশ্বাস ও বোধ সে ত্যাগ করেছে : প্রণয়সম্পর্ক নষ্ট হওয়ায় সে 'করুণ কষ্টের দারুণতা, অসহনীয়তা উপলব্ধি' করে নি, যা তার কাছে প্রত্যাশিত ছিলো, এবং 'সে যেমনই হৌক, তবু আমার দেবতা– তবু তাঁহার চরণে হৃদয় বিকাইব, মনে এমনতর ভাবেরও উদয় হইল না।' সে পুরুষের ছক অনুসারে তৈরি নয়, প্রতারককে দেবতা গণ্য করার বদলে তার ওপর সে হয় ক্রুদ্ধ। তার বোন তার মতো নয়, সে পুরুষের ছক অনুসারী; তার দিদি তার কাছে তুলে ধরে পুরুষতান্ত্রিক বাস্তব পরিস্থিতি : 'সে পুরুষ মানুষ, তার কি, তোর সঙ্গে না হ'লে এখনি অন্য আর একজন সেধে মেয়ে দেবে, আর তোর নামে এ থেকে এত কথা উঠবে যে, পরে বিয়ে হওয়াই ভার হবে।' পুরুষতন্ত্রে পুরুষ চিরনিষ্পাপ, সে দণ্ডিত হওয়ার বদলে পায় পুরস্কার; তার জন্যে নারীর অভাব হয় না, বরং নারীরাই অভাব বোধ করে তার। মণি ছকভাঙা; সে জানায়, 'নাই বা বিয়ে হ'ল, আমি ত সেজন্য কিছুমাত্র ব্যস্ত নই।' ছক থেকে স'রে এসেছে সে, বিয়েকে সে নিয়তি মনে করে না।

নারীর জন্যে পুরুষ মানদণ্ড স্থির ক'রে রেখেছে, তাকে হ'তে হবে সতীসাধ্বী; মণি স্বামীর জন্যে স্থির করে নতুন মানদণ্ড : 'যে আমার ক্ষমার পাত্র, সে আমার প্রণয়ী আমার স্বামী হইবার যোগ্য নহে; আমার স্বামীতে আমি সুর্য্যের মত জ্যোতিষ্মান গৌরবমণি দেখিতে চাই। সংসার যেমনই হৌক, পৃথিবীতে সে আমাকে স্বর্গ দেখাইবে, আমি তাহাতে দেবতা পাইব।' পুরুষ যেমন জন্মজন্মান্তর ধ'রে সতী চায়, মণিও চায় সৎ পুরুষ : 'আমার স্বামীর বর্ত্তমানটুকু লইয়াই আমি সন্তুষ্ট নহি, অতীতে, বর্ত্তমানে, ভবিষ্যতে তাঁহার সমস্ত জীবনে আমি আপনাকে বিরাজিত দেখিতে চাই, তাঁহার জীবনের কোন ভাগ যে আমাছাড়া ছিল বা তাহার সম্ভাবনা আছে, আমার সর্ব্বগ্রাসী প্রেমাকাঙ্ক্ষা এ চিন্তা সহ্য করিতে পারে না, এ সম্বন্ধে আমার হৃদয় পুরুষের ন্যায়, পুরুষ পত্নীতে যেরূপ অক্ষুণ্ন অমর পবিত্রতা, অনাদি অনন্ত নিষ্ঠতা চাহেন, আমি তেমন আমার স্বামীর সমস্ত জীবনই আমার বলিয়া অনুভব করিতে চাহি।' এতোদিন ধ'রে নারীর কাছে পুরুষ যা চেয়ে এসেছে, মণি তা-ই দাবি করে পুরুষের কাছে; দ্বৈতমানদণ্ড লোপ ক'রে দিয়ে সে হয়ে উঠেছে পুরুষের সমান : 'আমি কি করিয়া বুঝাইব যে, আমি তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারি, বিবাহ করিতে পারি– তিনি আমার স্বামী হইতে পারেন। কিন্তু আমার হৃদয়ের আদর্শ আকাঙক্ষা তিনি পূর্ণ করিতে পারিবেন না,...রমণীতে এরূপ পৌরুষিক হৃদয়ভাবের কি সহানুভূতি আছে?' মণি তার হৃদয়ভাবকে 'পৌরুষিক' ব'লে আখ্যা দিয়েছে, তবে সেও জানে ভাবে কোনো লৈঙ্গিক পার্থক্য নেই; সংস্কৃতিই ওই পার্থক্য সৃষ্টি ক'রে রেখেছে। সে অস্বীকার করেছে ওই লৈঙ্গিক পার্থক্যটুকু।

মণি নতুন মূল্যবোধসম্পন্ন অভিনব নারী, তার বিচারও অভিনব; তা গভীর সত্যকে বের ক'রে আনে। রমানাথ আত্মপক্ষ সমর্থন ক'রে জানায় সে ইংরেজ নারীটিকে কোনো প্রতিশ্রুতি দেয় নি, ওই নারীই তার প্রতি মোহগ্রস্ত হয়েছিলো; তাই সে কোনো অপরাধ করে নি। তার আত্মপক্ষ সমর্থনের সাথে সায় দেয় প্রথাগত সবাই, কিন্তু মণি সায় দিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারে নি; সে বরং সহানুভূতি বোধ করেছে প্রতারিত ইংরেজ নারীটির প্রতি : 'তিনি যাহা বলিলেন, তাহাতে সেই ইংরাজ-ললনার উপরই বর্ত্তমান সমাজপ্রথার দোষ অধিক পৌঁছায়।...জানি না, এই বিবরণের জন্য সকলে সেই মুগ্ধা অভিযুক্তা রমণীকে কিরূপ দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, আমার কিন্তু এ কথায় তাঁহার উপর বরঞ্চ মমতা হইল এবং অভিযোগীর উপর যে বড় শ্রদ্ধা বাড়িল–তাহাও নহে।' সে জানে বর্তমান সমাজপ্রথা যাকে অপরাধ মনে করে, তা আসলে অপরাধ নয়; আর যাকে অপরাধ মনে করে না, তাই আসলে অপরাধ। নারীর এক ছক হচ্ছে নারী ক্ষমাশীল, তার কাজ পুরুষকে ক্ষমা ক'রে দেবতার পংক্তিতে বসানো। মনি এর বিরোধী : 'যেন ভালবাসিলে লোকে ন্যায়ান্যায় জ্ঞান পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলে, অন্যায়কে-দোষকে পূজা করাই যেন ভালবাসা! আমি তাঁহাকে যেরূপ ভাল লোক মনে করিয়া ভালবাসিয়াছিলাম–তিনি যে তাহা নহেন, সে যেন আমারি দোষ!' মণি পুরুষের অত্যাচার ও নারীর অবস্থা সম্পর্কে ভালোভাবেই অবহিত : 'যাহারা স্ত্রীলোকের আবদার সহ্য করিতে না পারিয়া খড়গহস্তে তাহার দমন করিয়া থাকেন, মুহূর্ত্তের জন্য যদি কেবল তাঁহারা দিব্যহৃদয় লাভ করিয়া অনুভব করিতে পারেন,...তবে সংসারের রূপ এবং স্ত্রীলোকের ভাগ্য যে অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই!' সে জানে বিয়ে তাকে করতে হবে, তবে চায় এমন স্বামী, যা পিতৃতন্ত্র তখনো তৈরি করার কথা ভাবে নি; তার জন্ম হয়েছে শুধু মণির মতো নারীবাদীর ভাবনায় : 'যাঁহাকে একবার স্বামী মনে করিয়াছি-তিনিই আমার স্বামী হইবেন। তাঁহাকে বিবাহ করিব-কিন্তু প্রবঞ্চনা করিব না; আমার মনের ভাব খুলিয়া বলিব, যদি ইহাতেও তিনি আমাকে বিবাহ করিতে চাহেন, আমি তাঁহারি। সমস্ত শুনিয়াও অবশ্যই তিনি আমাকে বিবাহ করিবেন, তাঁহার প্রেম অটল অচল, আমি যাহাই হই, তিনি দেবতা, তাঁহার প্রেমে তিনি পতিত– আমাকে উদ্ধার করিবেন।' প্রথাগত নারীর যে-বাসনার কোনো অধিকার নেই, মণি তা-ই দাবি করেছে।

মণির একটি সুবিধা হচ্ছে বিয়ে না হ'লেও সে দুর্দশায় থাকতো না, বিয়ে না হ'লে তার জীবন বিপন্ন হতো না; তবে তার অবস্থায় থেকেও অধিকাংশ তরুণীই ব্যারিস্টার রমানাথের গলায় মালা দিতে ব্যগ্র হতো, কেননা তারা পিতৃতন্ত্রের বাণীতে দীক্ষিত, এবং শারীরিক সুখের জন্যে তারা দ্বিধাহীনভাবে বিক্রি করতে পারে নিজেদের দেহ। রমানাথ যখন তাকে জানায় যে বিয়ে না হ'লে মণির অসুবিধা হবে, তখন সে প্রত্যাখ্যান করে রমানাথকে; বলে, 'সুবিধার জন্য আমি বিবাহ করতে চাই নে–আপনার সুখ যখন এর উপর নির্ভর কচ্ছে না– তখন আমি অব্যাহতি প্রার্থনা করি।' পুরুষ তাকে দয়া ক'রে বিয়ে ক'রে উদ্ধার করবে, এমন উদ্ধার সে চায় না। মৃণালিনী যদিও জানে 'সুপাত্রে ন্যস্ত হওয়াই কন্যাজীবনের চরম সৌভাগ্য, পরম সার্থকতা', তবু সে বলতে রাজি হয় নি যে 'আপনি ভাল বাসুন না বাসুন, তাতে কিছু আসে যায় না, 'আমার মঙ্গলের জন্যই আমি বিয়ে করতে প্রস্তুত!' রমানাথের সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পর যার সাথে সে প্রেমে, এবং শেষে বিয়েতে জড়িত হয়, সে-ডাক্তার বিনয়কুমার বিলেতের নারীদের প্রশংসা ক'রে বলেছে, 'আমার সবচেয়ে ভাল লাগত সে দেশের মেয়েদের স্বাধীনতা, আত্মনির্ভর ভাব। দিন দিন সে দেশে স্ত্রীলোকের কার্য্যক্ষেত্র বাড়ছে– এমন কি, পলিটিক্সে পর্য্যন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহারা হস্তক্ষেপ করেছে।' এটা মণিরও ভালো লাগে, সেও চায় নারীকে ঘর থেকে বাইরে যেতে দেখতে। স্মরণ করতে পারি যে কংগ্রেসের অধিবেশনে যে-বাঙালি নারী প্রথম অংশ নিয়েছিলেন, তিনি মণির স্রষ্টা বা মূলসত্তা স্বর্ণকুমারী দেবী। পরিস্থিতি এমন হয়ে ওঠে এক সময় যে মণি তার বাবাকে চিঠি লেখে : 'বাবা আমার বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই;...আমি খুব ভাল করিয়া হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিতেছি, বিবাহে আমার সুখ নাই।' এটা শুধু কথার কথা নয়, আসলে বিয়েতে নারীর কোনো সুখ নেই, যদিও বিয়ে করা ছাড়া তাদের কোনো বিকল্প সুখও নেই। তবে তার পিতা তাকে দিয়েছে বাস্তবসম্মত পরামর্শ : 'আমাদের দেশের যে রকম অবস্থা, অবিবাহিত স্ত্রীলোকের পক্ষেই বরঞ্চ এসব কাজে বাধা বিঘ্ন অধিক।... স্ত্রীলোকের ঐহিক, পারমার্থিক, সকল প্রকার মঙ্গলের জন্যই বিবাহ শ্রেষ্ঠ, প্রশস্ত পথ।' এবং সে মেনে নিয়েছে, 'আমি মর্ম্মে মর্ম্মে দুর্ব্বল বঙ্গনারী, আজ্ঞাবর্ত্তী দুহিতা। জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারি–কিন্তু ইহার পরে বিবাহ সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি করা আমার পক্ষে অসম্ভব।' পরে সে রোমঞ্চকরভাবে বিয়ে করেছে ডাক্তার বিনয়কুমারকে, এবং উপন্যাসের সুপরিকল্পিত প্লট অনুসারে দেখতে পেয়েছে তার প্রথম প্রেমই অনন্ত প্রেম, ডাক্তার বিনয়কুমারই তার বাল্যপ্রেমিক ছোটু। তবে মণি ভেঙে দিয়েছে কুমারীর প্রথাগত ভাবমূর্তি, সে স্বামীকে দেবতা ব'লে মনে করে নি, বিয়েতেই নারীজীবনের সার্থকতা ব'লে বিশ্বাস করে নি, এবং বিশ্বাস করে নি পিতৃতান্ত্রিক সতীত্বে।

শৈলবালা ঘোষজায়ার *জন্ম-অপরাধী* নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এক অসামান্য, সম্ভবত বাঙলা ভাষায় অনন্য, উপন্যাস; নামকরণ থেকে শেষ পংক্তি পর্যন্ত এতে লিপিবদ্ধ হয়েছে পিতৃতন্ত্রের হাতে নারীর নিপীড়িত হওয়ার শোচনীয় উপাখ্যান। শৈলবালার আর কোনো বই আমি পড়ি নি, তিনি প্রথাগত না প্রথাবিরোধী ছিলেন তাও জানি না, জানি না নারীমুক্তির বাণীতে তিনি দীক্ষিত ছিলেন কিনা, কিন্তু *জন্ম-অপরাধী*তে নারীজীবনের যে-মর্মস্পর্শী রূপ তিনি এঁকেছেন, তা এটিকে হয়তো বাঙলা ভাষায় লেখা শ্রেষ্ঠ নারীবাদী উপন্যাসে পরিণত করেছে। তিনি বিদ্রোহ বা প্রতিবাদের রূপ আঁকেন নি, নারীমুক্তির কৃত্রিম কৌশল উদ্ভাবন করেন নি, যেমন করেছেন বেগম রোকেয়া ও শান্তা দেবী; তিনি লিখেছেন নারীর অবিরাম পীড়িত দণ্ডিত জীবনী : এ-পীড়িত রূপ কাজ করে কল্পিত বিদ্রোহী রূপের থেকে অনেক তীব্র মর্মস্পর্শীভাবে। *জন্ম-অপরাধী* নামটিই প্রগাঢ় তাৎপর্যপূর্ণ, তা নির্মমভাবে তুলে ধরে পিতৃতন্ত্রে নারীর অস্তিত্বের বিভীষিকা। শৈলবালা উপস্থাপিত করেছেন পীড়ন আর পীড়নের রূপ, যেনো পিতৃতন্ত্র নারীর ওপর যতো পীড়ন করেছে তা একযোগে ভোগ করেছে তার নায়িকা অপেরা। অপেরাকে তিনি ক'রে তুলেছেন পীড়িত নির্যাতিত সমগ্র বঙ্গনারীর আদিরূপ। তিনি ছক ভাঙেন নি, ছকের মধ্যে রেখেই পীড়নের মধ্য দিয়ে ভেঙে দিয়েছেন নারী-ছকটি। শৈলবালা ঘোষজায়ার নায়িকা অপেরার জন্ম-অপরাধ দুটি : প্রথম অপরাধ সে নারী, দ্বিতীয় অপরাধ সে দরিদ্র ঘরের অনাথ মেয়ে। তার বিয়ে হয়েছিলো প্রকৌশলী বিনোদলালের সাথে, তবে তার স্বামী এক হিংস্র পাষণ্ড। অপেরা বিদ্রোহী নয়, সে পুরুষতন্ত্রের ছক মেনে নিয়েই বেঁচে থাকতে চেয়েছে; কিন্তু তাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঁচতে দেয়া হয় নি। তাই সে মনে দাগ কাটে প্রতিবাদীর থেকে অনেক বেশি, তার শোচনীয় জীবনই হয়ে ওঠে এক নিরন্তর নিঃশব্দ বিদ্রোহ। 'সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হইয়া সহস্র অপমান তিরস্কার সহিয়াও সে উদ্ধতভাবে কখনও প্রতিবাদ করিত না'; সে চেয়েছে শুধু একটু বেঁচে থাকতে। তাঁর পিতামাতা নেই, তাব বোন ও ভগ্নিপতি তাকে স্নেহেই পালন করে, এবং প্রথাগতভাবে সৎপাত্রে দানও করে। কিন্তু বিয়ের পরই তার জীবন হয়ে ওঠে নরক। সে জীবন যাপন করেছে শুধু বাল্যকালে : 'এক বছর বয়সে মা ও চার বছর বয়সে তাহার বাবা মারা গিয়াছেন।...একটুখানি জ্ঞান হইতেই বই শ্লেট বগলে করিয়া গাড়ী চড়িয়া স্কুলে যাতায়াত-বছর বছর ফার্ষ্ট হইয়া ক্লাশে ওঠার তীব্র আনন্দ উত্তেজনা! এমন করিয়া কোন দিক দিয়া কয় বছর কাটিয়া যাইবার পর যখন থার্ড ক্লাশের সীমা ডিঙ্গাইয়া সেকেণ্ড ক্লাশে উঠিল, তখন হঠাৎ তাহার স্কুল যাওয়া বন্ধ হইল...সূর্য্য-চন্দ্র-যম-বরুণ-বাসবের সমকক্ষ শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকের পত্নীত্ব পদে সমারূঢ় হইয়া রাঁচিতে চলিয়া আসিল।' সে বইশ্লেট হাতে ইস্কুলে যেতো, বছর বছর শ্রেণীতে প্রথম হতো, পুরুষ হ'লে তার জীবন হতো সাফল্যে পরিপূর্ণ, কিন্তু তার অপরাধ সে নারী। তাই তার জীবন সম্পূর্ণ ব্যর্থ। শৈলবালা পাতায় পাতায় শ্লেষ করেছেন পুরুষ, ঈশ্বর, ধর্মকে; কথায় কথায় ব্যবহার করেছেন পরিহাসসূচক বিস্ময়চিহ্ন, যেমন এখানে অপেরার বরটিকে পরিহাস করেছেন 'সূর্য্য-চন্দ্র-যম-বরুণ-বাসবের সমকক্ষ শিক্ষিত বাঙ্গালী' যুবক ব'লে। বিয়ের পর সম্ভাবনাময় কিশোরীটির জীবনের সমস্ত সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায় তার জীবনই। তার জীবনের নাম পীড়ন।

পিতৃতন্ত্রে নারীর কোনো সম্মান নেই, অপেরারও কোনো সম্মান নেই শ্বশুরবাড়িতে : 'অপেরা খুব ভাল করিয়াই জানে, এ বাড়ীতে তাহার সম্মানের মূল্য কতটুকু।– অতএব নিস্ফল মনস্তাপ বিসর্জ্জন দিয়া সমস্ত অন্যায় অপমান নিঃশব্দে মাথায় তুলিয়া লইয়া, শ্রান্ত ক্লান্ত কুটুম্ব-সন্তানকে সাদর শিষ্টাচার জানাইয়া–শ্বশুরবাড়ীর সম্মান বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য একটা বিপদের দায় ঘাড়ে তুলিয়া লইতে হইবে।' শ্বশুরবাড়িতে তার সম্মান নেই, কিন্তু তার দায়িত্ব শ্বশুরবাড়ির সম্মান রাখা। অপেরার স্বামী শিক্ষিত পাষণ্ড, ধর্ষকামী; তার কাজ অপেরারকে নিয়মিত শারীরিক নির্যাতন করা; যেমন, '"দূর হয়ে যাও–স্বেচ্ছাচারিণী স্ত্রীলোক!"–বলিয়া বিনোদ সক্রোধে অপেরার বাঁ পাঁজরে সজোরে কনুইয়ের গুঁতা মারিলেন। অপেরা ছিট্‌কাইয়া গিয়া মেঝের উপর পড়িল।' অপেরা এ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে কী করতে পারে? সে প্রতিবাদ করবে? সে যে-প্রতিবাদ জানায়, তা পিতৃতন্ত্রের জন্মকাল থেকে জানিয়ে এসেছে নারী : 'মুহূর্ত্তে তাহার শান্ত নম্র মুখমণ্ডলে দৃপ্ত-বিদ্রোহের বিদ্যুদগ্নি ঝলসিয়া উঠিল,– কিন্তু সে কেবল মুহূর্ত্তের জন্যই! পরক্ষণেই সংযত হইয়া নিঃশব্দে বাহিরে চলিয়া আসিল।' শৈলবালা নারীর অব্যক্ত বিদ্রোহের আবেগ সকাতর ভাষায় প্রকাশ করেছেন : 'হায় গো বিধাতা, তোমার সুপবিত্র বিধানের নিকট সশ্রদ্ধ সম্মানে মাথা নোয়াইয়া হাসিমুখে যেখানে আত্মোৎসর্গ করিয়া চলাই নারীহৃদয়ের স্বভাব-ধর্ম্ম-সেখানে কেনই যে এমন অস্বাভাবিক অধর্ম্মের উত্তেজনায় বর্ব্বর নৃশংসতা জাগিয়া ওঠে, সে প্রশ্নের উত্তর তুমিই জান নারায়ণ!' বিনোদলাল আনন্দ পায় স্ত্রীনির্যাতনে; যেমন, 'অমনি তিনি হঠাৎ বিছানা ছাড়িয়া লাফাইয়া পড়িয়া, চক্ষের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিমেষে মেঝে হইতে একপাটি পম্প-সু তুলিয়া লইয়া, বিনা বাক্যে অপেরার কর্ণমূলে সশব্দে ফটাস করিয়া বসাইয়া দিলেন।' বিনোদলাল পাষণ্ড, কিন্তু সে পুরুষ ও সম্মানিত; তাই লেখক তার পাশবিকতা বর্ণনার সময়ও ব্যবহার করেছেন সম্মানসূচক ক্রিয়ারূপ 'দিলেন'; অপেরার কোনো সম্মান নেই, তাই নির্যাতিত হয়ে সে যখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, তখন তার জন্যে ক্রিয়ারূপ হচ্ছে সম্মানহীন 'আসিল'। অপেরার সবই অপরাধ; অপেরা বাপের বাড়ি গেছে, তাই তার স্বামীর কথা হচ্ছে, 'তার মত স্ত্রীর পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে, তাকে খুন করে ফেলা।' শুধু তার স্বামী নয়, তার শ্বশুরবাড়ির অন্য পুরুষেরাও সমান হিংস্র; তার বট্‌ঠাকুর বলে, '"আমার পরিবার যদি ওরকম হত, তাহলে আমি তাকে লাথির ওপর লাথি, জুতোর ওপর জুতো, ঝাঁটার ওপর ঝাঁটা মারতাম!– লাঠির চোটে ভূত জব্দ, মেয়েমানুষ তো কোন ছার! শাসন থাকলে মেয়েমানুষ কখনো অমন স্বেচ্ছাচারিণী হতে পারে!"' পুরুষের যে-হিংস্রতার ছবি এঁকেছেন শৈলবালা, তা পুরুষ সম্পর্কে তাঁর মৌল ধারণার প্রকাশ; তিনি পুরুষকে দেখেছেন হিংস্র পশুরূপে। নারীপুরুষের ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কও পশুবৃত্তি : 'শুধু পশুবৃত্তির উত্তেজনায় যে ক্ষণিক আকর্ষণ, ক্ষণিক সম্মিলন– তাহাই কি দাম্পত্য ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা? ধিক্, এত বড় সাংঘাতিক প্রবঞ্চনা, এত বড় মর্ম্মান্তিক লাঞ্ছনা মানুষের জীবনে যে আর নাই!'

অপেরার সবই অপরাধ; সে কিছুটা লেখাপড়া জানে, এটা তার অপরাধ; সে একটু পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন থাকতে চায়, এও তার অপরাধ। তার স্বামী লেখাপড়া সম্পর্কে পোষে এমন শ্রদ্ধাবোধ : 'মেয়ে মানুষের লেখাপড়া শেখা! দুচক্ষে যা দেখতে পারি নে, তাই জুটেছে ঘরে।...জুতিয়ে অন্নি মুখ ছিঁড়ে দিতে পারি!' সে বিশ্বাস করে, 'যে মেয়ে মানুষ লেখাপড়া শিখেছে, তার কি ভদ্রস্থ আছে? সে ত বেশ্যা!' সে পরিষ্কারপরিচ্ছন্নও থাকতে পারবে না, কেননা তাও নারীর অপরাধ। শৈলবালা প্রশ্ন করেছেন, 'হিন্দুসমাজের কোন্ শাস্ত্রের কোন্ খানে এক জায়গায় বুঝি লেখা আছে, এমনতর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার 'বাই' যে মেয়েমানুষের থাকে, তাহারা নাকি নিতান্ত শীঘ্রই অধঃপাতে যায়!' তার জীবনই অপরাধ, তাই তার প্রাপ্য নিরন্তর শাস্তি : 'কিন্তু নিরুপায় সে! হতভাগ্য বাংলা দেশের ভদ্রগৃহস্থ গৃহের, হতভাগিনী বধু সে! গুরুজনের সম্মান লঙ্ঘনের অপরাধ-আশঙ্কা তাহার পায়ে পায়ে!– মিথ্যা সাক্ষ্য ও অন্যায় প্রমাণের জোরে, বিনা অপরাধে সহস্র দণ্ড ভোগ করিতে হইলেও, নিজের নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে কোন কৈফিয়ৎ তাহার মুখ ফুটিয়া উচ্চারণ করিবার অধিকার নাই,– তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! জাতিনাশের চেয়েও বেশী অপরাধের দায়ে তাকে পড়িতে হইবে! ইহাই আমাদের বাংলা দেশের ভদ্রগৃহস্থ গৃহের গার্হস্থ্যবিধি! বাংলা দেশের অজ্ঞ বিজ্ঞ সকলেই একটা সুমহান মোটা নীতি শিখিয়াছে,– "হলুদ জব্দ শিলে আর বউ জব্দ কীলে"।'

অপেরার, সমস্ত নির্যাতিত নারীর মতোই, প্রতিবাদের অধিকার নেই; এমনকি অধিকার নেই চোখের জলের : 'কেহ আসিয়া দেখিয়া ফেলে, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিল। ছিঃ, একি চপলতা করিতেছে? স্বামীর অসদ্ব্যবহার– ইহাই যে তাহার প্রাক্তন! এ কর্ম্মভোগ নারী-জীবনের কর্ত্তব্য বলিয়া শান্ত সহিষ্ণু ভাবে বহন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিতে হইবে।' নারীজীবন পেয়েছে সে জীবনের বদলে পীড়ন উপভোগের জন্যে, তাই পীড়নভোগই তার পুণ্য। অপেরা মর্ষকামী নয়, পীড়িত হয়ে সে কোনো সুখ পায় না; অন্য সমস্ত নারীর মতো পীড়ন ভোগ করাই তার প্রতিবাদ। তার ভেতরটা যখন গর্জন ক'রে ওঠে, তখনও তাকে থাকতে হয় নিঃশব্দ নারী : 'অপেরার স্তব্ধ-ব্যথাহত নারীত্ব দৃপ্ত-অভিমানে অন্তরের মধ্যে গর্জ্জিয়া উঠিল,– কিন্তু সেটা প্রকাশ করিবার অধিকার তাহার নাই! তাহা হইলেই না কি– স্বামীর গুরু-সম্মানকে লঘু করিয়া দেওয়ার পাপে পড়িতে হইবে!' পীড়ন সহ্য করতে একদিন সে রূপান্তরিত হয়ে যায় : 'এখন কাঁদিয়া হাল্কা হইতে তাহার প্রবৃত্তি হয় না, লজ্জা করে রাগও হয়!' এটা প্রতিবাদের বিপরীত রূপ, পীড়ন ভোগ করেই সে জানায় তার প্রতিবাদ।

শৈলবালা পুরুষকে দেখেছেন হিংস্র অমানবিক জন্তুরূপে, যাদের কাজ নারীপীড়ন :

> সংসারের শক্তিমান, স্বার্থপর, নিষ্ঠুর, দাম্ভিক, সুখ-সম্ভোগ-বিলাসী, মহারত্ন পুরুষগুলির ফরমাস অনুসারে সৃষ্টিকে নিখুঁত সুন্দর রূপে গড়িয়া তোলা বিধাতার শক্তিতে কুলাইয়া উঠে নাই। কাযেই সে-হেন বিশিষ্টগুণ সম্পন্ন প্রবল শক্তিমান পুরুষেরা যখন তাঁহাদের ইচ্ছা অভিরুচির ক্রীতদাসী দুর্ব্বল প্রাণীগুলিকে, তাঁহাদের মত যথেচ্ছাচার সহিবার পক্ষে একান্ত অযোগ্য–অলস, নিৰ্জ্জীব, অথবা বিদ্রোহভাবাপন্ন হইতে দেখেন, তখন তাঁহারা বিধাতার মুণ্ড ভোজনে উদ্যত হন! স্বেচ্ছাচারী পুরুষ তাঁহারা–তাঁহারা কি বিধাতার স্বাধীনতা সহ্য করিতে পারেন? তাই তাঁহারা বিধির বিধান উল্টাইয়া দিবার জন্য অপরূপ বিধানের সৃষ্টি করেন! তাঁহাদের ফরমাসী মাপের অযোগ্য যে জন একান্ত নিরুপায় ভাবে তাঁহাদের করায়ত্ত হইয়া পড়ে–সেটাকে চাবকাইয়া দুরস্ত করিবার জন্য তাঁহারা অমানুষিক শক্তিতে বন-মানুষী প্রতিভা দেখাইবার জন্য কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন।

পুরুষের প্রকৃতি সম্পর্কে এখানে শৈলবালা প্রকাশ করেছেন তীব্রতম ঘৃণা; পুরুষ স্বেচ্ছাচারী, অত্যাচারী, যে-বিধাতার বিধানকেও বদলে দেয় নারীপীড়নের জন্যে। নারী কী ক'রে এর প্রতিবাদ করবে, যেখানে সব কিছুই নারীর বিপক্ষে? শৈলবালা এটা ব্যাখ্য করেছেন এভাবে :

> বাঙ্গালার পল্লীগৃহে অকাটমূর্খ ভদ্রনামের ইতর শ্রেণীর স্বামীস্ত্রীর বিবাদে মারধোর গালমন্দের পর এমনই ভাবে বাড়ী হইতে খেদাইয়া দিবার প্রথা প্রচলিত আছে বটে, তবে সেটা–সে শ্রেণীর মূর্খ-ইতর স্বামীদের পক্ষেও শোভনীয়,–স্ত্রীদের পক্ষেও সহনীয়! স্বামীদের এই অত্যাচার সমর্থনার্থে, কোন শাস্ত্র হইতে নাকি সার-সঙ্কলন করিয়া, মূর্খে নয়, অনেক বিদ্বানেও নাকি প্রবল বিজ্ঞতা সহ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে, স্বামী সহস্র অন্যায় করুন কিন্তু স্ত্রী যদি তাহার বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ করে, তবে পরজন্মে তাহাকে কুক্কুরীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে।
>
> ইহার পর মূর্খ, অধম, শাস্ত্রজ্ঞানহীন, তৃণাদপি তুচ্ছ নারী জাতি কোন সাহসে কথা কহিবে? পৃথিবীতে জন্মগ্রহণই যাহাদের একটা মহৎ অপরাধ বলিয়া গণ্য–সূতিকাগার হইতে মৃত্যুকামনাই যাহাদের আত্মীয় স্বজনের কর্ত্তব্য, সে-হেন 'মেয়েগুলা' যে দুনিয়ার বাজারে কোন্ স্পর্দ্ধায় বাঁচিয়া থাকে, ইহাই ত একটা ভয়ানক আশ্চর্য্য ব্যাপার!

শৈলবালা আক্রমণ করেছেন সমগ্র পিতৃতন্ত্রকে, পিতৃতন্ত্রের শাস্ত্রকে, যা নারীকে শুধু পীড়নের বিধান দিয়েই পরিতৃপ্ত নয়, পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকেও নিষিদ্ধ ক'রে দিয়েছে। বিধানে নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও অপেরার মনে জাগে প্রতিবাদ। তখন 'নির্দ্দয় শক্তিতে বজ্রনিষ্পেষণে অপেরার হাত টিপিয়া ধরিয়া কঠোর ভ্রূভঙ্গী করিয়া রূঢ় স্বরে তিনি (স্বামী) বলিলেন, "দেখ, মেয়েমানুষের অতটা তেজ ভাল নয়।" তখন :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপেরার গ্রহদেবতা বিরূপ!–কোথা হইতে দুষ্ট সরস্বতী আসিয়া তাহার স্কন্ধে চাপিয়া বসিলেন,–অপেরা ধৈর্য্য হারাইল!-চির-অনাদৃতা চির-অবজ্ঞাতা স্ত্রীলোকের কতটা তেজ যে ভাল, অপেরা সে হিসাবের অঙ্কটা জানিয়া বুঝিয়া, বিজ্ঞতা প্রকাশের অবসর লইল না,–এইবার অকুণ্ঠিত দৃষ্টি তুলিয়া বলিল–"তেজ! একেও তোমরা তেজ বলবে? বেশ, তোমাদের বিচারই ভাল! কিন্তু রক্তে মাংসে গড়া মানুষ আমি, আমার মন পাথর দিয়ে গড়া নয় সেটা মনে রেখো–"

অপেরা মুক্ত নারীর জীবন চায় নি, সে প্রথা মেনেই যাপন করতে চেয়েছে তার দণ্ডিত জীবন। সে বলেছে, 'স্বামী তুমি তোমার স্থান আমার মাথার উপর, সে একবার নয় একশো বার আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি।' তবে তারও যে সামান্য অধিকার আছে, তা সে জানাতে চেয়েছে; বলেছে 'স্ত্রী বলে আমারও কি–', কিন্তু বাক্য সে শেষ করতে পারে নি, জানাতে পারে নি তার কী আছে? এক সময় পীড়ন তার সহ্য হয়ে যায়, আর অসহ্য হয়ে ওঠে কৃত্রিম আদর : 'লাথির উপর লাথি, জুতোর উপর জুতো, ঝাঁটার উপর ঝাঁটা, যার জন্যে প্রেস্‌কৃপসন্ ঠিক হয়ে আছে, তাকে শান্ত সহিষ্ণুভাবে তার ন্যায্য প্রাপ্যটা গ্রহণ করিতে দাও– মাঝে মাঝে খেয়াল মত এমন যথেচ্ছ অনুগ্রহ দেখিয়ে কেন তার মাথা খারাপ করে স্পর্দ্ধা বাড়াও?–এতে তোমার কোন গ্লানি বোধ না হতে পারে, কিন্তু দোহাই ধর্ম্ম সত্যি বলছি, ঝাঁটা লাথি সহ্য করবার জন্যে যার মন কঠিন ভাবে প্রস্তুত হয়েছে, এ আদর অনুগ্রহ তার অসহ্য।' নারী যেমন পীড়নের শিকার হয় পুরুষের, তেমনি হয় পুরুষের সোহাগেরও শিকার; প্রেমহীন সোহাগ তার জন্যে শোচনীয়তম অপমান। পুরুষ সোহাগ করে নিজেকেই পরিতৃপ্ত করার জন্যে, নিজেরই প্রভুত্বকে ভিন্নভাবে নারীর ওপর চাপিয়ে দেয়ার জন্যে; তাতে নারীর কোনো সুখ নেই। নারী কি কোনো তেজ দেখাতে পারে, তার কি সে-অধিকার আছে? নেই। বুকে যখন একটু প্রতিবাদের অগ্নিকণা জন্ম নেয়, তখন 'অপেরার মনে হইল, সত্যই ত, মেয়েমানুষের এত তেজ, এ যে বাস্তবিকই একটা বিষম স্পর্দ্ধা!' মেয়েমানুষ কী করবে? তার জন্যে রয়েছে আত্মদমন : 'নিজের এই অস্বাভাবিক দুঃসাহসিকতার জন্য অপেরা মনে মনে ত্রাহি মধুসূদন জপিতে জপিতে আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিল,...তাহার মন উষ্ণ উত্তেজনায় বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে,–সামান্য সংঘর্ষে এখনই হয়ত সে বজ্রপাত ঘটাইয়া বসিবে। প্রাণপণে আত্মদমন করিবার জন্য অপেরা আড়ষ্ট নির্জ্জীবের মত পড়িয়া রহিল।' ক্রীতদাসী ক্ষুব্ধ হ'তে পারে, তবে ক্ষোভ বিপন্ন করে তার জীবন, তাই নিজের ক্ষোভকে দমন করাই তাঁর বেঁচে থাকার পদ্ধতি।

মেয়েমানুষের অবস্থান কোথায় শৈলবালা তা বারবার নির্দেশ করেছেন :

[ক] গোটা দুই ধমক ও একটা পদাঘাতে যাহাকে কাবু করিয়া ফেলিতে পারা যায়, সে কি আবার মানুষ। বিশেষতঃ মেয়ে মানুষ ত জন্তু জানোয়ারের সামিল নগণ্য জীব।–তবে সভ্য জগতে? ওঃ, সে আলাদা কথা।–আর আমাদের ঘরে এই সব "মাগী ছাগী"–উহাদের জীবন মূল্যহীন। উহাদের ধমনীতে যে তরল পদার্থটা প্রবাহিত হয়, সে ত রক্ত নয়,–অসার পদার্থ, লাল জল মাত্র।

[খ] স্ত্রীলোকের ভাগ্য নিশ্চল জড় পদার্থ!...পুরুষ মানুষের চরিত্র সহস্র অসৎ কাযে, সহস্র হীনতা, নীচতায়,–কখনও অপবিত্র হইবার নয়, সোণার মাকড়ী বুঝি বাঁকা হইলে ক্ষতি আছে? কি স্পর্দ্ধা রে আর স্ত্রী চরিত্র?–সত্যযুগ হইতে প্রমাণ চলিয়া আসিতেছে,–দ্বিতীয় বাক্য নিষ্প্রয়োজন! পৃথিবীর ইতিহাসে আজ পর্য্যন্ত চরিত্রহীনতার জন্য যত লক্ষ কোটি অপরাধ ঘটিয়াছে, সে শুধু স্ত্রীজাতির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একান্ত নিজস্ব কলঙ্ক! সে কলঙ্কের সহিত পুরুষ জাতির কোন পুরুষেও তিলার্দ্ধ সংস্রব নাই। বেশী কথা কি, ঐ কঠোর অপরাধী জাতিটার চরিত্র এমনই অবিশ্বাস্য ও মন এতই দুরভিসন্ধিপূর্ণ যে, মৃত্যুর পরও উহাদের বিশ্বাস করা নিষেধ! দেহটা চিতার আগুনে ভস্মসাৎ হইয়া বাতাসে যখন ছাই উড়িয়া যাইবে, তখন নির্ভয়!

[গ] যেহেতু বসুন্ধরার সর্ব্বোত্তম জীব পুরুষ-মানুষরা স্বতঃসিদ্ধ,–অথবা সোজা ভাষায় যাহাকে স্বেচ্ছাচারী বলা যায়, তাহাই। সুতরাং তাহারা ত কাহারও সুবিধা বা মঙ্গলের মুখ চাহিয়া নিজেদের উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি ও মন্দ অভ্যাস সংশোধন করিতে বাধ্য নন,–তা, তাহাতে সৃষ্টি রসাতলেই যাক, আর সৃষ্টিকর্ত্তা কারাগারে, দ্বীপান্তরে যেখানে খুশী শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া থাকুন, কোন ক্ষতি নাই।–কিন্তু বসুন্ধরার অধমাধম জীব মেয়ে-জাতটার প্রত্যেক জনকে যে এক একটি স্বেচ্ছাচারীর ছন্দ মাত্রা প্রকরণ অনুসারে, ঠিক মাপ মিলাইয়া নির্দ্দিষ্ট ছাঁচে স্বতন্ত্র ভাবে গড়িয়া উঠিতে হইবে, সে বিধান অবশ্য প্রতিপাল্য!...বেচারা অপেরা চুপ করিয়া যতই সহিতে লাগিল, তাহার অন্তঃকরণ ততই বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে লাগিল।

[ঘ] পুরুষ মানুষের চটি জুতার স্থানটা যেখানে, বিবাহিতা স্ত্রীর স্থান যে তাহার ঢের নীচে...

[ঙ] স্বামীর সহিত সদ্ভাব না থাকিলে, স্বামী অত্যাচার-পরায়ণ নিষ্ঠুর নির্দ্দয় হইলে, স্ত্রী পৃথক্ হইবে? ওমা, একি অসম্ভব কথা!...যে দেশে নারীর স্থান বুট, ঘোরতোলা, পাম্পসু, প্রভৃতি দামী জুতার নীচে নয়,–একেবারে সব চেয়ে অধম চটিজুতার নীচে বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, যে সমাজে নারীর জন্মগ্রহণ মহা অপরাধ–বাঁচিয়া থাকার ত কথাই নাই; সে দেশের সে সমাজের কোনও নারী যদি অত্যাচারী স্বামীর উৎপীড়নের হাত এড়াইয়া স্বচ্ছন্দ শান্তিতে সৎভাবে জীবনটা কাটাইবার জন্য, সাহস করিয়া পৃথক হইয়া যায়, তবে সে দুঃসাহসের দণ্ডের পরিমাণ কতখানি?

AMARBOI.COM

আক্রমণ, শ্লেষ, বিদ্রূপ, বর্ণনার মধ্য দিয়ে পুরুষের পাশবিকতা ও নারীর শোচনীয় অবস্থানটিকে শৈলবালা মর্মস্পর্শীভাবে নির্দেশ করেছেন; অপেরার জীবনের ভেতর দিয়ে শৈলবালা তুলে ধরেছেন সমগ্র পীড়িত নারীর যন্ত্রণার রূপ। পুরুষ তাঁর চোখে নৃশংস দানব। লৈঙ্গিক রাজনীতির চরম রূপটি চিত্রিত করেছেন শৈলবালা; দেখিয়েছেন পুরুষের স্বৈরাচারের ফলে নারীর অবস্থা শোচনীয় হ'তে পারে কতোখানি। তিনি দেখিয়েছেন নারী-পুরুষ, স্ত্রী-স্বামীর মধ্যে রয়েছে এক অনাদি বিরোধ, যার শিকার নারী। নারী এ-বিরোধ সৃষ্টি করে নি, পুরুষই নিজের স্বেচ্ছাচারিতায় নারীকে শত্রু ক'রে তুলেছে; পুরুষপ্রজাতির সাথে নারীর জীবনযাপন এক অসম্ভব পীড়াদায়ক ব্যাপার। স্বামী কি নারীর সুখ? শৈলবালা লিখেছেন, 'স্বামীর দিকে চাহিয়া হঠাৎ অপেরার মনে হইল, ইনিই যত অনিষ্টের মূল।' এক অপেরার অনুভবের মধ্য দিয়ে তিনি নির্দেশ করেছেন সমস্ত নারীর জীবনের অনিষ্টের মূলটি। অপেরা পীড়নের প্রতিবাদও করতে পারে না, পীড়নে পীড়নে সে শিশুর মতো অসহায় হয়ে ওঠে : 'অভিমানী শিশু যেমন তুচ্ছ ছুতা অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদাই কাঁদিবার জন্য ব্যাকুল হয়-অপেরার বুকের ভিতর তেমনই একটা অর্থহীন ব্যাকুলতার আবেগ ঠেলিয়া উঠিল।' পিতৃতন্ত্র নারীকে শিশুই মনে করে, যে-নারী শিশু হ'তে চায় না তাকে নির্যাতনের মধ্য দিয়ে পরিণত করে অবোধ অসহায় শিশুতে।

শৈলবালা শুধু অপেরার স্বামীকে নয়, প্রায় সব পুরুষই দেখেছেন অমানুষরূপে; এক চিকিৎসকের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে : 'তাহার উপর তিনি নিষ্ঠাবান জ্ঞানাভিমানী পুরুষ, পৃথিবীতে মেয়েমানুষদের বাঁচিয়া থাকাটা অত্যন্ত ঘৃণা ও লজ্জার বিষয় বলিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁহার জ্ঞানচক্ষুতে প্রতিভাত হইত।' পুরুষ এতো অমানুষ যে স্ত্রীকে খুন করার পর তার স্বামী বক্তৃতা দেয় : 'আজ কালকার মেয়েরা যে ধর্ম্ম কর্ম্ম ভুলিয়া, হিন্দু স্ত্রীর কর্ত্তব্য ভুলিয়া, ঘোরতর অহিন্দু আচার অবলম্বন করিয়া, অসদুপায়ে বিষ খাইয়া, গলায় দড়ি দিয়া, জলে ডুবিয়া ও কেরোসিন তৈলে পুড়িয়া মরিতেছে, তৎসম্বন্ধে উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষায় বিস্তর নিন্দাবাদ করিতেছেন!' নারী কী কী উপায়ে পুরুষের হাত থেকে নিজেকে উদ্ধার করছে, তার তালিকাটি তিনি উপস্থিত করেছেন এখানে। পুরুষের কবল থেকে নারীর নিজেকে উদ্ধারের উপায় আত্মহত্যা; অপেরা জানে, 'এই চির পরাধীন জীবনের অবস্থা!– এদের স্বচ্ছন্দভাবে নিঃশ্বাস ফেলবার অধিকার পর্য্যন্ত নেই...এরা জন্মেছে শুধু সংসারের সকলের অসন্তোষ বিরক্তির জ্বলায় উৎপীড়িত হয়ে,– আত্মগ্লানির ধিক্কারে আত্মহত্যা করতে!' অপেরা বলেছে, 'আমার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে যে আমায় যথার্থ ভালবাসে, সে যেন আমার মৃত্যুর প্রার্থনাই করে!' জন্ম-অপরাধী অপেরার এ-প্রার্থনা যে পূর্ণ হবে, তাতে সন্দেহের কারণ নেই; উপন্যাসের শেষে সে ঢ'লে পড়ে অপমৃত্যুর কোলে। মৃত্যুই তার মুক্তি, মৃত্যুই তার চরম বিদ্রোহ : 'অপেরা নিরুত্তর!– আজ সে তাঁহার (স্বামীর) শাসন বাধ্যতার আইনের কবল চিরদিনের মত এড়াইয়া নির্ভয়ে অবাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে! আজ সে আর উত্তর দিবে না!' জীবন অপেরাকে যে-অধিকার দেয় নি, মৃত্যু দিয়েছে তাকে সে-অধিকার : পুরুষের অবাধ্য হওয়ার স্বাধীনতা। শৈলবালা এঁকেছেন পুরুষের নারীপীড়নের রূপটি, অপেরাকে ক'রে তুলেছেন সমস্ত নিপীড়িত বাঙালি নারীর আদিরূপ। নারী কোনো অপরাধ না ক'রেও যে পুরুষতন্ত্রের কাছে অপরাধী, জন্মদণ্ডিত, এর বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলনের আয়োজন না ক'রেও শুধু একটি নারীর শোচনীয় জীবন চিত্রিত ক'রে শৈলবালা জানিয়েছেন প্রবল প্রতিবাদ; এবং রচিত হয়েছে একটি অসাধারণ নারীবাদী উপন্যাস।

অনুরূপা দেবী হিন্দু বিধানে দীক্ষিত প্রথাগত ঔপন্যাসিক; *মন্ত্রশক্তি* (১৯১৫) লিখেছেন তিনি বেদমন্ত্রের মহাশক্তি প্রমাণের জন্যে; কিন্তু তাঁর উপন্যাসেও নারীপুরুষের বিরোধ স্পষ্ট। তিনি তাঁর নায়িকা বাণীকে শেষে পুরুষের পায়েই সঁপে দিয়েছেন, তবে এঁকেছেন নারীপুরুষের দীর্ঘ লৈঙ্গিক রাজনীতি বা বিরোধের চিত্র। তাঁর *মন্ত্রশক্তি*ও নারীকেন্দ্রিক; তাঁর নায়িকা রাধারাণী বা বাণীর বিয়ে ও স্বামীর সাথে অপসম্পর্ক এর বিষয়। রাজনগরের জমিদার হরিবল্লভের বংশে এক বড়ো সমস্যা দেখা দেয় পুত্র রমাবল্লভের ঘরে কোনো সন্তান জন্ম না নেয়ায়। তবে 'হরিবল্লভ বাবু সুদীর্ঘ জীবনের মধ্যে পৌত্রমুখ সন্দর্শনের আশায় হতাশপ্রায় হইয়া তাঁহার বিপুল ধনৈশ্বর্য্য পরমার্থে উৎসর্গের কল্পনা করিয়া এই মন্দির নির্ম্মাণে মনোযোগী হইয়াছেন, এমন সময় পুত্রবধূ কৃষ্ণপ্রিয়া একটি পুষ্পকোরকতুল্য সন্তান প্রসব করিলেন। শিশুটি পুত্র সন্তান নহে, কন্যা সন্তান। তথাপি এই 'হাপুত্রে'র ঘরে তাহার আদরের সীমা রহিল না।' একটি পুত্র জন্ম নিলে যা হতো স্বর্গীয় আনন্দ, কন্যার জন্মের ফলে তা হয়ে ওঠে মহাসংকট। অনুরূপা জানিয়েছেন, এবং বিবরণও দিয়েছেন যে মেয়েটিকে হরিবল্লভ থেকে রমাবল্লভ অসীম আদর করে, কিন্তু মেয়েটির জীবনে ওই আদর নিরর্থক। হরিবল্লভ আদর ক'রেও বাণীর জীবনকে ধ্বংস ক'রে যেতে দ্বিধা করে নি। রমাবল্লভ সন্তানের-পুত্রের-আশায় আরেকটি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা অনেক বিয়ে করতে পারতো, তবে 'পিতার বিরাগভাজন হইয়াও কেবল এই হতভাগিনীর মুখ চাহিয়াই গৃহে পুনর্ব্বার সৌভাগ্যবতী নব বধূ আনয়ন করেন নাই।' এই শুধু কারণ নয়; অনুরূপা আরেকটি নব বধূ আনতে দেন নি, কেননা তিনি এ-'হতভাগিনী'র থেকে অনেক বেশি 'হতভাগিনী' আরেকজনের কাহিনী বলতে চেয়েছেন। অনুরূপা প্রথাগত বিধানের প্রতিপক্ষ নন; তিনি জানেন 'পতিব্রতা হিন্দুরমণী নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে বড় করিয়া দেখিতে জানেন না।' রমাবল্লভের স্ত্রী 'অনেক অনুনয় অনুরোধেও স্বামীকে পুনর্ব্বিবাহে সম্মত করাইতে পারেন নাই।' পুরুষকে একটু দেবতা ক'রেই এগিয়েছেন অনুরূপা।

বিয়ে মায়ের জীবনে সমস্যা সৃষ্টি না করলেও কন্যার জীবনকে নষ্ট ক'রে দেয়। সমস্যা যোগ্য পাত্রের অভাব; ন-বছর বয়স থেকেই বাণীকে বিয়ে দেয়ার চেষ্টা শুরু হয়, কিন্তু তেরো বছর বয়সেও তা সম্ভব হয় নি। পিতৃতন্ত্র নারীর বিয়ের আবশ্যিক বিধান দিয়েছে, এবং পিতৃতন্ত্রের এক বড়ো পুরোহিত হরিবল্লভ স্নেহ করা সত্ত্বেও পিতৃতন্ত্রের স্বার্থে পৌত্রীর জীবন নষ্ট ক'রে যেতে দ্বিধা করে নি। পিতৃতন্ত্র হরিবল্লভের হাতে লিখিয়ে নেয় নারীপীড়নের একটি উইল : 'যদি পঞ্চদশ বৎসর বয়সের মধ্যে তাহার পৌত্রী রাধারানী কোন সমশ্রেণীর সমান ঘরে কুলীনসন্তানের সহিত বিবাহিতা হয়, তবেই সে অথবা তাহার সন্তান সন্ততিগণ দেবসেবা ব্যতিরেকে আয়ের সমুদয় উপস্বত্ব পুরুষানুক্রমে ভোগদখল করিতে পারিবে। কিন্তু যদি তাহা না হয়–অর্থাৎ অসমান ঘরে বিবাহ হয় অথবা উক্ত সময়মধ্যে বিবাহ না হয়, তাহা হইলে রাধারানীর পঞ্চদশ বৎসব পূর্ণ হওয়ার পর দিবস প্রাতঃকালেই তাঁহার সুদূর কুটুম্বপুত্র মৃগাঙ্কমোহন সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইবেন। রমাবল্লভ যাবজ্জীবন সহস্র মুদ্রা মাসহারা পাইবেন মাত্র, এই পৈতৃক গৃহে সেইদিন হইতে তাঁহার কোনই অধিকার থাকিবে না।' এমন একটি নিষ্ঠুর উইল করতে তার হাত কাঁপে নি, অথচ সে খুব ভালোবাসতো তার নাতনীকে; বাণী যদি নাতী হতো, হতো পাষণ্ড, তাহলেও সে এমন উইল করতে পারতো না। বোঝা যাচ্ছে কোনো মেয়েকে স্নেহ করা আসলে তাকে উপহাস করা। নাতনীর কোনো মূল্য নেই, স্নেহেরও মূল্য নেই; মূল্যবান হচ্ছে পিতৃতন্ত্রের বিধান। জমিদার তার প্রিয় নাতনীকে বনবাসে পাঠিয়ে নির্দ্বিধায় সম্পত্তি উইল ক'রে গেছে এক কুটুম্বপুত্রের নামে, যাকে সে কখনো আদর করে নি, কাছেও পায় নি, এমনকি পছন্দও করে না। তাই দেখতে পাই পিতৃতন্ত্রের পুরোহিতদের কাছে স্নেহের পাত্রীর থেকে অনেক প্রিয় হচ্ছে পুত্র, তা তার নিজের হোক বা যারই হোক। বাণীর জীবনেকে পিতৃতন্ত্রের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে সে পরলোক চ'লে যায়। অল্প বয়সে বিয়ে না হওয়ায় বাণী অবশ্য এমন কিছু সুখ ভোগ করেছে, যার সুযোগ হিন্দু মেয়েরা পায় না : 'কুমারী জীবনের যে সুখাস্বাদে হিন্দু বালিকারা চিরবঞ্চিতা, সেই অনুপমেয় শান্তির আস্বাদ গ্রহণে সে নিজেকে চরিতার্থ মনে করিতেছিল।'

ধনী পরিবারে মেয়েদের স্বামীর বিকল্প হয়ে ওঠে কোনো দেবতা; রাধারাণীর বিকল্প স্বামী হয় কৃষ্ণ, যার পুজোয় সে নিজেকে সমর্পণ করে। অনেক উপাখ্যানে দেখা যায় যে অবিবাহিত বালিকারা মেতে উঠেছে পুজোয়, বিশেষ ক'রে কৃষ্ণের পুজোয়। অবিবাহিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বালিকাদের মন্দির নিয়ে মেতে ওঠার, বিশেষ ক'রে কৃষ্ণের পুজোয় নিজেদের বিলিয়ে দেয়ার ভেতরে লুকিয়ে আছে এক গোপন তাৎপর্য : কৃষ্ণ চরিতার্থ করে তাদের কাম; কৃষ্ণপ্রেমের ভেতর দিয়ে তারা জানায় তাদের পুরুষ ও স্বামীবিদ্বেষ। এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন রাধারাণী বলে, 'আমার কৃষ্ণ ত দিনরাত্তির আমার কাছেই রয়েছেন,...তোরা তোদের স্বামীকে কি এমন করে সাজাতে পারিস? না, এমন ভালই বাসতে পারিস? তারা পান থেকে চুণ খসলে ঝগড়া করে, দাসীর মত খাটিয়ে নিয়ে দুটো ভাল কথাও সকল সময় কয়ে উঠতে ফুরসৎ পায় না।...আমি তাই স্বয়ম্বরা হয়েছি।' যেনো সব নারীর মতোই তার জানা আছে পুরুষের পাশবিকতা, তাই পুরুষকে প্রত্যাখ্যান ক'রে গ্রহণ করে সে কৃষ্ণকে; বলে, 'আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি, এ জন্মে বিবাহ করিব না।' নারীর একমাত্র একান্ত সম্পদ তার দেহ, যার প্রতি পুরুষের একমাত্র মোহ। নারীর পুরুষবিরোধিতার একটি রূপ হচ্ছে সে তার দেহটিকে রক্ষা করতে চায় পুরুষের গ্রাস থেকে; সে বোধ করে তার দেহটি যদি পুরুষের কবলে পড়ে তখন তার আর নিজের ব'লে কিছু থাকে না। তার দেহ নষ্ট হয়, সেও নষ্ট হয়। নারী তখন হয়ে ওঠে কামবিরূপ, কামশীতল। এটাও নারীর এক বড়ো বিদ্রোহ। রাধারাণী জানে তার দেহটি তুলে দিতে হবে পুরুষের ক্ষুধার কাছে; তার পিতামহ যে-দলিল ক'রে যায়, তা হচ্ছে পুরুষকে দেহদানের অনিবার্য নির্দেশ। তার জীবনের করুণ পরিহাস : 'তাহার দেবোদ্দেশ্যে উৎসর্গিত মনঃপ্রাণ কোন এক ক্ষুদ্র মানব চরণে উৎসর্গ করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ সমর্পিত এ জীবন যৌবন নরভোগ্য করিয়া তবেই এ আশৈশবের আশ্রয় ক্রয় করা।' কিন্তু তা সে চায় না, তার সাধ হয় : 'এই ঐশ্বর্য্য সে জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মত পরিত্যাগ করিবে সেও ভাল, তবু এ দেহ কাহাকেও দান করিতে পারিবে না।... কোথাকার কে একটা মানুষ! সে তাহার মালিক মোক্তার হইয়া বসিবে?' অনুরূপা দেহের ওপর বেশ জোর দিয়েছেন, নারীদেহকে 'নরভোগ্য' হ'তে দেয়ার অর্থ ওই দেহকে দূষিত করা, এমন একটি মনোভাব তিনি জ্ঞাপন করেছেন।

বাণী বিয়ে করতে রাজি হয় এক শর্তে : যার সঙ্গে তার বিয়ে হবে, তার সঙ্গে সে একরাতও কাটাবে না। সে দেহ দিতে পারবে না পুরুষকে, দাসীত্ব করতে পারবে না পুরুষের; সে বলে, 'এই জন্যই বিবাহে বিতৃষ্ণা হয়। সাধ করে কি বলি, বিবাহের নামই দাসীত্ব।' তবে তার জীবনের ট্র্যাজেডি হচ্ছে নিজেকে সম্পদের মধ্যে রাখার জন্যে তাকে বিয়ে করতে হয় এমন একজনকে, যাকে সে একদিন বরখাস্ত করেছে মন্দিরের পুরোহিতের দায়িত্ব থেকে। তার নাম অম্বরনাথ। অম্বরনাথের অবশ্য নায়কোচিত সব গুণ রয়েছে, যদিও সে দরিদ্র। বাণীর সংকট দুটি, সে পুরুষবিরূপ, এবং অম্বরনাথের ওপর বিরূপ; তবু 'তাহারই মন্দিরের অযোগ্য পুরোহিত বলিয়া এই সে দিন মাত্র সে তাহাকে অক্ষমতার জন্য তিরস্কার করিয়া বিদায় দিয়াছে,– সেই ব্যক্তিরই পায়ে ধরিয়া তাহার পিতা তাহাকে দান করিবেন?– আর এই দেব-চরণে উৎসর্গিত শরীর,– তৎকর্ত্তৃক লাঞ্ছিত সেই ভিখারীকেই সমর্পণ করিতে হইবে? বাণী ভাবিল, এ কথা শুনিবার পূর্ব্বে সে মরিয়া গেল না কেন?' বাণী যে কামশীতল, এমন মনে করার কোনো কারণ নেই; বাণী যে পুরুষকে দেহদানের কথা বার বার ভেবেছে, ঘেন্না বোধ করেছে দেহ দিতে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটা তার পুরুষের বিরুদ্ধে চরম বিদ্রোহ। 'সে বড় নিশ্চিন্ত ছিল যে, মানুষকে কোনমতেই সে বিবাহ করিবে না', এবং সারা উপন্যাসে সে পুরুষকে তার দেহ দেয় নি। এক সময় ঔপন্যাসিক হস্তক্ষেপ করেন, তিনি যে-দিকে বাণীকে নিয়ে যেতে চান সে-দিকে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন; মানুষ তাকে যাতে রাজি করাতে পারে নি, সেখানে প্রকৃতি হস্তক্ষেপ করে : 'মহাপ্রকৃতি রাধা স্মিতমুখে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, 'পাপিষ্ঠা! প্রকৃতি স্বয়ং পুরুষের দাসী, তুই এমন কি যে, ঠাকুরালী হইয়া থাকিবি,-দাসী হইবি না?'' অতিপ্রাকৃতের সহায়তায় অনুরূপা পিতৃতন্ত্রে দীক্ষিত করতে থাকেন বাণীকে। কিন্তু বাণী তার দেহ রক্ষা করতে চায় পুরুষের কামকলুষ থেকে : 'তখন অশ্রুপরিপ্লুত নেত্রে যুক্তপাণি বাণী দেবতার উদ্দেশ্যে কহিল, তুমি কি শুনিতেছ, আমি অন্য কাহাকেও স্বামী বলিয়া স্বীকার করিতে পারিব না? তুমি যদি আমার পণ না রাখ, আমি নিজেই রাখিব। যদি বিবাহ করিতেই হয়, করিব। কিন্তু এ দেহ প্রাণ যখন তোমায় দিয়াছি, তখন এ কেবল তোমারি থাকিবে।' শরীরই তার অমূল্য সম্পদ : 'তাহার এ শরীরটাও সে অন্যের নিকট বেচিতে পারিবে না।' বাণী তার দেহশুচিতা রক্ষার যে-প্রয়াস চালিয়েছে, তা নারীর গভীর পুরুষবিরূপতার প্রকাশ।

কিন্তু পুরুষের সঙ্গে তাকে জড়িত হ'তে হয়, এবং বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সে দেখতে পায় নারীকে বন্দী করার কৌশল : 'অম্বর যখন প্রথম দাঁড়াইয়াছিল, তখন–অম্বরের উত্তরীয়ে গাটছড়া বাঁধা–কাজেই বাণীকেও সেই সঙ্গে বাধ্য হইয়াই দাঁড়াইতে হয়। সে অমনি ঘোর বিরক্ত হইয়া ভাবিল,– এই ত প্রভুত্ব আরম্ভ হইয়া গেল দেখিতেছি!– উনি দাঁড়াইলে দাঁড়াইতে হইবে, চলিলে চলিতে হইবে। আমায় যেন কিনিয়া ফেলিয়াছেন।' অম্বরনাথ তার অযোগ্য, তাকে সে বিয়ে করেছে সম্পত্তি রক্ষার জন্যে; মহৎ অম্বরনাথও স্বামীর অধিকার দাবি না ক'রে রাজি হয়েছে তাকে উদ্ধার করতে; তবু বাণীর 'মনে হইতে লাগিল, আজ এ গৃহের সম্রাজ্ঞী সে হইলেও এ ব্যক্তি তাহার প্রভু। তাহার উপর যেন ইহার একটা দখলী স্বত্ব জন্মিয়া গিয়াছে।' তার মনে জাগে হিন্দু নারীর মহাপ্রশ্ন : 'হিন্দুর সব ভাল, কেবল এইটিই বড় মন্দ। বিবাহ করিতে হইবে। কেন,– এমন কঠোর নিয়ম, কেন? মেয়ে হইয়া জন্মিয়াছি বলিয়া এতই কি মহাপাতক করিয়াছি...যিনি আমারই অন্নে প্রতিপালিত হইবেন, তিনিই হইবেন, আমার প্রভু?' যে-বিয়েকে এতো ঘেন্না করে নারী, তাতেই বসতে হয় তাকে। বিয়ের পর বাণী মিলিত হয় নি স্বামীর সাথে, তার স্বামী দেবতার অধিক মহত্ত্ব দেখিয়ে দূরে চ'লে গেছে। তবে অনুরূপা দেবী এর পর বাণী ও নিজের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে বাণীকে দীক্ষিত করতে থাকেন পিতৃতন্ত্রের বিধিবিধানে, স্বামীকে ক'রে তুলতে থাকেন দেবতা। তিনি ছক ভেঙেছেন শুধু ছকটিকে আরো শক্ত ক'রে নির্মাণ করার জন্যে। তিনি বাণীর মধ্যে ঢোকাতে থাকেন বেদমন্ত্র, তাকে ক'রে তুলতে থাকেন মহাসতী : 'বাণী গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল। হিন্দুর মেয়ে যে স্বামীর সহিত হাসিমুখে কেমন করিয়া জ্বলন্ত চিতায় পুড়িয়া বিচ্ছেদের শান্তি করিত আজ তাহা বুঝিলাম। এ যে কি অচ্ছেদ্য বন্ধন!...সেই যে কালমন্ত্র...সেই অনুজ্ঞার সম্মোহনবিদ্যা প্রভাবে লুপ্তচৈতন্যবৎ হইয়া পত্নী সেই দিনই পতির হৃদয়ে হৃদয়, চিন্তায় বাক্যে চিন্তা বাক্য সমস্তই সঁপিয়া দেয়; তাহার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর স্বাতন্ত্র্য কিছুই বাকি থাকে না।' অনুরূপা বাণীর কানে বাজাতে থাকেন পিতৃতন্ত্রের গীতিকা : 'তাহার কানের কাছে সেই মুহূর্ত্তে যেন বাজিয়া উঠিল, "স্ত্রীলোকের স্বামী ভিন্ন অন্য সুখ নাই, অন্য কামনা নাই, এমন কি, অন্য দেবতাও নাই।"-সে ঈষৎ শিহরিয়া উঠিল। এ কি মার কথা-না দেবতার আদেশ?' এটা আসলে পিতৃতন্ত্রে দীক্ষিত অনুরূপার চক্রান্ত।

অনুরূপা বেদমন্ত্র দিয়ে বাণীকে পুরুষপুজোয় আগ্রহী ক'রে তোলেন : 'যদি প্রতিমায় তাহার পূজা করি, তবে মানুষের মধ্যেই বা না করি কেন?' লেখিকা বাণীকে ক্রমশ দীক্ষিত করতে থাকেন পিতৃতান্ত্রিক বিধানে, আলোর নামে তাকে ঠেলে দিতে থাকেন অন্ধকারে : 'এইরূপে তাহার জীবনে একসঙ্গে দুইটী আলো জ্বলিয়া উঠিতেছিল,– নারীজীবনের সারধর্ম্ম পতিপ্রেম, অপরটী সকল প্রেমের সার ভগবৎপ্রেম।' বাণীর মধ্যে তিনি জাগিয়ে তোলেন ছকবাঁধা এক নারীকে : 'স্বামী স্ত্রীর গুরু কেন, আজ তাহা বুঝিতেছি। আর কে আমায় এমন করিয়া এ শিক্ষা দিতে পারিত?' অনুরূপা কাজ করেছেন পুরুষতন্ত্রের চর হিশেবে; তিনি নারীকে প্রথম নিজের অধিকার দেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে পরে বেঁধেছেন শেকলে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন নিজের লিঙ্গের সাথে। তাঁর চক্রান্তে বাণী হয়ে ওঠে পুরুষের প্রিয় ছকবাঁধা নারী : 'সেই ভস্মমুষ্টি পরে পতিপ্রেমের অমৃতাভিষেকে এবং নির্ব্বাসিত অম্বরের মন্ত্রশক্তি তেজে তপঃপূত-চরিত্রা, ব্রহ্মচারিণী, স্নেহ প্রেম করুণার জীবন্ত মূর্ত্তি এক সতী নারীর প্রতিষ্ঠা করিল।' বাণী সমগ্র নারীজাতিকে নিয়ে আত্মসমর্পণ করে স্বামী ও পিতৃতন্ত্রের পায়ে : '"হ্যাঁ, তোমার বাণী, তোমারই স্ত্রী, তোমারই দাসী, তোমারই সহধর্ম্মিনী।...আমি তোমায় অনেক কষ্ট দিয়েছি, তবু আমি তোমার স্ত্রী, তোমার শিষ্যা-তোমার দাসী। আমায় ক্ষমা করিবে না কি?"' যে-বাণী স্বামীর দেহও কখনো ছোঁয় নি, সে মৃত্যুর হাত থেকে স্বামীকে ফিরিয়ে আনার জন্যে অবতীর্ণ হয় সতীরূপে : 'এ নূতন জন্মে মৃত্যুর কাছে তোমায় ভিক্ষা করে ফিরিয়ে নিয়ে তোমায় আমি আমার করব। পার্‌ব না? কেন পার্‌ব না? সাবিত্রী তার মৃত স্বামীকে বাঁচিয়েছিলেন,–আর আমি পার্‌ব না?–কেন, আমি কি সতী স্ত্রী নই?' বেদমন্ত্রদীক্ষিত এ-আধুনিক সতী তার স্বামীকে মৃত্যুর কবল থেকে ফিরিয়ে আনার জন্যে প্রয়োগ করে এ-পদ্ধতি : 'তাহার মনের মধ্যে কোথা হইতে এ প্রতীতি সুদৃঢ় হইয়া উঠিল, যে তাহা হইলেই সে তাহার এই মৃত-কল্প স্বামীকে বাঁচাইয়া তুলিতে পারিবে। তাহার শোণিতোষ্ণতাহীন নীল শিরার উপর সে নিজের উষ্ণশোণিত প্রবাহিত ধমনী একাগ্রচিত্তে স্থাপন করিয়া রাখিয়াছিল, যেন সেই সঙ্গে কোন্ অদৃশ্য শক্তিবলে সে আপনার শরীর হইতে তপ্ত শোণিত ধারা তাঁহার অঙ্গে সঞ্চালিত করিয়া দিতেছে,...সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার এক সঙ্গে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। কেবল সেই সর্ব্বসমাহিত সতী চিত্তের সমুদয় শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া সে তাহার মৃতবৎ স্থির স্বামীর দেহে আপনার জীবন হইতে জীবনী-ধারা ঢালিয়া দিতে চাহিতেছিল।' বেদমন্ত্র চিকিৎসাপদ্ধতিতে সে সফল হয়েছে কিনা অনুরূপা দেবী তা বলেন নি, তবে তিনি সফলভাবে একটি নারীকে বিন্যস্ত করেছেন পিতৃতন্ত্রের ছকে। নারীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে অনুরূপা অর্জন করেছিলেন জনপ্রিয়তা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিরুপমা দেবীর *দিদি* (১৯১৫) চেতনায় ও কাঠামোয় অনুরূপার *মন্ত্রশক্তি*র সাথে অভিন্ন; এতেও প্রচার করা হয়েছে পিতৃতন্ত্রের বিধান। অনুরূপা ও নিরুপমা, দুজনেই, ব্যবহার করেছেন একই ছক : *মন্ত্রশক্তি*তে বাণী সারা উপন্যাস জুড়ে নিজের দেহ রক্ষা করেছে স্বামীর কবল থেকে, শেষে আত্মসমর্পণ করেছে মৃত স্বামীর পায়ে; *দিদি*র সুরমাও স্বামীকে দেহ দেয় নি, কিন্তু উপন্যাসের শেষ পাতায় আশ্রয় নিয়েছে স্বামীর পায়ে। তাঁদের উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়গুলো নারীর জন্যে প্রলোভন, মাঝের অধ্যায়গুলো নারীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত, আর শেষ পৃষ্ঠাগুলো বিশ্বাসঘাতকতা। কালিগঞ্জের জমিদারকন্যা সুরমা দাসীর বিয়ে হয় মাণিকগঞ্জের জমিদারপুত্র ডাক্তার অমরনাথের সাথে। তারা একটি বাসর রাত কাটিয়েছিলো পরস্পরকে না ছুঁয়ে– 'যথারীতি পাকস্পর্শ ফুলশয্যা সমস্ত হইয়া গেল। অমরনাথ ফুলশয্যার দিন জড়সড়ভাবে কোন রকমে খাটের এক পার্শ্বে শুইয়া রাত কাটাইয়া দিল। তাহার লজ্জা করিতেছিল। কন্যাটি নিতান্ত ছেলেমানুষ নয়; তের-চৌদ্দ বৎসর বয়স হইতে পারে।' পরে আকস্মিকভাবে অমরনাথ বিয়ে করে অনাথ চারুলতাকে। সুরমা এজন্যে স্বামীকে ক্ষমা করে নি; স্বামীকে ছেড়ে দেয়া সম্ভব হয় নি তার পক্ষে, তবে স্বামীকে সে গণ্য করেছে পরপুরুষ হিশেবেই। *বিষবৃক্ষ*-এ কুন্দকে আত্মহত্যা করতে হয়েছিলো, *দিদি* যেনো তার উত্তর; চারুলতাকে আত্মহত্যা করতে হয় নি, বরং সে-ই উপভোগ করে অমরনাথের স্ত্রীর ভূমিকা। সুরমা হয় তার দিদি। অমরনাথ ও সুরমা এক বাড়িতে থেকেও কখনো স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে আসে নি। নারীদের উপন্যাসে একটি লক্ষণীয় ব্যাপার স্বামী-স্ত্রীর দূরত্ব, এ-উপন্যাসে তা চরম রূপ নিয়েছে।

অমরনাথ চারুলতাকে বিয়ে করার পর তার পিতা তাকে ত্যাগ করতে চেয়েছে, কিন্তু সে পুত্র, তাকে ত্যাগ করা অসম্ভব; বরং তার পিতা মৃত্যুর আগে পুত্রবধু সুরমাকে দেবীর বেদিতে বসিয়ে উৎসর্গ ক'রে যায় সুরমার জীবনটি : 'মা, আমি একে তোমার হাতে দিয়া গেলাম। এ তোমার ছোট বোন। ছোট-বৌমা, তোমার দিদিকে প্রণাম কর। ইনি দেবী।' সুরমা চরম ঘৃণায় মেনে নেয় দেবীর ছক, সে হয় এমন দেবী যে ঘৃণা করে স্বামীকে : 'অমরকে যে তাচ্ছিল্য দেখাইয়া সে ফিরাইয়া দিতে পারিয়াছে, ইহা মনে করিয়া একটি বিজয়ানন্দে সুরমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল।' নিঃশব্দ বিরোধই হয়ে ওঠে তাদের জীবন। এতে অবশ্য অমরনাথের জীবনে কোনো শূন্যতা দেখা দেয় নি, সে চারুলতাকে নিয়মিতভাবে গর্ভবতী করেছে; চরম শূন্যতায় দিদির দেবী মহিমার জ্বালার মধ্যে বাস করেছে সুরমা। দেহ তাকেও পীড়িত করেছে; কিন্তু তার কাজ সহ্য করা : 'জীবনের প্রথম-যৌবনের আকুল বাসনার পুষ্পগুলি পরার্থপরতার দীপ্ত হোমানলে ভস্ম করিয়া ফেলিয়া তাহার হৃদয় কি একটুও বলিষ্ঠ হয় নাই? জীবনের স্নেহ, ভালবাসা, আশা, তৃষ্ণা এতগুলি জিনিস এক নিমেষে পান করিয়া তাহার মৃত্যুঞ্জয় কঠিন প্রাণ কি এখনও এত দুর্ব্বল? না, এ প্রাণকে সবল করিতেই হইবে।' সে জানে, 'তাহার জীবনের সমস্তটা একটা খরচেরই তালিকা– তাহার জমার ঘর একেবারে খালি।' তার স্বামীও তাকে মনে করে আত্মোৎসর্গিত দেবী : 'অমর ভাবিত, চারু–চারু–চারুই তাহার স্ত্রী,...সুরমার কাহারও সহিত বিবাহ হয় নাই, হইতে পারে না, কেন না পৃথিবীর কেহ কি সে? না। সে দেবী, শুধু স্নেহ দিবার জন্যই সে সংসারের সহিত আবদ্ধ।' কিন্তু তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোখে অমরনাথ 'সপত্নীপ্রণয়ে অবিচারক স্বামী'। অমরনাথ এক সময় প্রলুব্ধ বোধ করে সুরমার প্রতি, সুরমা তা প্রত্যাখ্যান করে; কেননা 'বলা কি যাইত না, "আজ তুমি আমায় যাহা দিতে আসিয়াছ, তাহা ইতিপূর্ব্বে কোথায় ছিল? আমার নবীন বাসনাময় তরুণ-যৌবনের প্রথম আগ্রহ যে অন্ধের মত চাহিয়া দেখে নাই বা দেখিতে ইচ্ছা করে নাই, সেই তুমি! সেই অবিচারক তুমি!...যাহা আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া অন্যের চরণতলে উপহার দিয়াছিলে, তাহাই আবার আজ আমায় দিতে চাও?' স্বামীর সাথে বাঙালি নারীর সম্পর্ক যে পারস্পরিক প্রতিপক্ষের, তা সুরমাও বোধ করে : 'তাহাকে সুরমার এখন তাহার জীবনের সুখস্বর্গ হইতে ভ্রষ্টকারী দুরদৃষ্ট বলিয়া জীবনের সর্ব্ব জ্বালাযন্ত্রণার মূলীভূত রুষ্ট কুগ্রহ বলিয়া, জন্মের সুখদুঃখের নিয়ন্তা, জন্মকেন্দ্রস্থিত দুষ্ট নক্ষত্র বলিয়া মনে করিত।' বাঙালি নারীর চোখে দেবতা হয়ে ওঠে দুষ্ট নক্ষত্র, একে যুগান্তর বলা যায়।

কিন্তু এ-সুরমাকে অবশেষে নিরুপমা বিন্যস্ত করেন পুরুষতন্ত্রের ছকে; চাপিয়ে দেয়া দেবীর ভূমিকা পালন ক'রে যে ক্লান্ত, যার জীবনে পুরুষের প্রয়োজন প্রায় কেটে গেছে, নিরুপমা বিশ্বাসঘাতকতা করেন তার সাথে, উদ্যোগ নেন তাকে অনিচ্ছায়-মেনে-নেয়া দেবীর আসন থেকে দাসীর আসনে বসানোর। তবে তিনি দাসীর গ্লানিকে অস্বীকার করেন নি : 'একদিন একস্থানে একজনকে সে 'না' বলিয়া গিয়াছিল, সেইস্থানে সেই ব্যক্তিকে আর একবার বলিতে হইবে 'হ্যাঁ'। বলিতে হইবে, নারী-জন্মের দোষ, ভাগ্যের দোষ, সর্ব্বোপরি বিধাতার দোষ। বলিতে হইবে, "হে দেব, তোমারই জয় হইয়াছে!— আর কেন— সর্ব্বস্ব আহুতি দিয়াছি, সব পুড়িয়া গিয়াছে, এখন এ হোমাগ্নি নিবাও।" প্রণাম করিয়া বলিতে হইবে, "ভস্ম তিলক ললাটে প্রসাদচিহ্ন-স্বরূপ নির্ম্মাল্য-স্বরূপ দাও। তুমি তৃপ্ত হইয়াছ, এখন আমায় মুক্তি দাও।' নারীজন্মের অপমান ও যন্ত্রণাকে নিরুপমা অস্বীকার করেন নি, তবে মেনে নিয়েছেন; তিনি যেনো জানেন জয় নারীর জন্যে নয় : 'তাহার পরাজয় যেন তাহারা দিব্যচক্ষে দেখিয়াই বসিয়া আছে। এমনি নারী-জন্ম লইয়া সে আসিয়াছে! ধিক!' সুরমা নিজের জীবন সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর উপন্যাসের শেষে বিসর্জন দেয় তার অস্তিত্বকেও; বলে, 'নারীর দর্প তেজ অভিমান কিছু নেই,...কেবল ভালবাসা, কেবল দাসীত্ব... ।' নিরুপমা সুরমাকে অবশেষে বসিয়েছেন পুরুষতন্ত্রের পদতলে : 'সুরমা সহসা নতজানু হইয়া স্বামীর পাদমূলে বসিয়া পড়িল। দুই হস্তে অমরের পদযুগল জড়াইয়া ধরিয়া অজস্রবাষ্পবারিসিক্ত মুখ উর্দ্ধে তুলিয়া বলিল, "কেবল— এইটুকু, আর কিছু নয়। আমায় কোথায় যেতে বল? আমার স্থান কোথায়? আমি যাব না।"' নিরুপমা তাঁর অপচয়িত দেবীকে পরিণত করেন অসহায় দাসীতে, জানিয়ে দেন যে নারীর মুক্তি নেই; নারীকে বন্দী থাকতেই হবে ছকে ও যন্ত্রণায়। নিজের লিঙ্গের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার এটা এক স্মরণীয় উদাহরণ।

নিরুপমা *শ্যামলী*তে (১৯১৮) নিয়েছেন শ্যামলী নামের এক 'কালা বোবা পাগলী'কে, কাব্যিক নামটি ছাড়া আর সবই যার শোচনীয়। তাঁর নায়িকা যে কালা বোবা পাগলী, এটা তাৎপর্যপূর্ণ। নিরুপমা হয়তো এমন একটি নায়িকা বেছে নিয়েছিলেন চরম ভাবাবেগ উৎপাদনের জন্যে, কিন্তু এটাকে আমার মনে হয় অত্যন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাৎপর্যপূর্ণ : নারীমাত্রই, পুরুষতন্ত্রের কাছে, কালা বোবা পাগলী; তারা যতোই শুনতে বলতে চিন্তা করতে পারুক। পুরুষতন্ত্র সব নারীকেই কালা বোবা পাগলী ক'রে রেখেছে। শ্যামলী কালা বোবা পাগলী, তবে তাকে কেন্দ্র ক'রেই আবর্তিত হয়েছে সব কিছু। শ্যামলী নারীর চরম দুর্দশার রূপ, তবে নিরুপমা তাকে দিয়েছেন এমন একটি স্বামী, যে তাকে মানুষের জীবন দিয়েছে। পুরুষের ওপর দিয়েছেন তিনি কালা বোবা পাগলীকে অর্থাৎ নারীকে মানুষ ক'রে তোলার ভার। এ-কাহিনী বাস্তবের নয়, ইচ্ছাপূরণের; সব নারীই যদি পেতো এমন পুরুষ, তাহলে তাদের জীবন মানুষের জীবন হয়ে উঠতো। শ্যামলী নারী, তার জীবন নিষ্ফল হওয়ার জন্যে এ-ই যথেষ্ট, তার ওপর সে কালা বোবা পাগলী; অন্যরা ও নিরুপমা তাকে বার বার 'জন্তু', 'জানোয়ার' ব'লেই নির্দেশ করেছেন। সমস্ত নারীর মতো বিয়েই তার প্রধান সংকট। তার বিয়ের কোনো সম্ভাবনা ছিলো না; কিন্তু তার পিতার এক উন্মত্ততায় তার বিয়ে হয়ে যায় তারই ছোটোবোনোর বর অনিলের সাথে। শ্যামলী নিজের জন্যে যতোটা সমস্যা, তার চেয়ে বড়ো সমস্যা পিতার জন্যে : 'কিন্তু কালা বোবা এবং পাগল এই ত্রিবিশেষণ-বিশিষ্টা কন্যাকে নামে মাত্র সম্প্রদানের জন্য ও স্বজাতি এবং সমকুলস্থ এমন কোন পাত্রই তিনি তখন খুঁজিয়া পাইলেন না যে তাঁহাকে জাতিচ্যুতি হইতে রক্ষা করে।' তাই পিতা এক অদ্ভুত উন্মাদের কাজ করে; তার ভাষায়, 'আমি সমাজের এই অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্যই এই অভাগা জীবটাকে একবার গোটাকতক মন্ত্র পড়িয়ে বিজলীর বিয়ের আগে সম্প্রদান করে নিলাম মাত্র।' শ্যামলী তার বাবার চোখেও 'একটি জানোয়ার মাত্র'। নিজেকে বাঁচানোর জন্যে সে মন্ত্র পড়িয়ে নেয়, তবে মেয়েকে বাঁচানোর কোনো আগ্রহ তার নেই; সে অনিলকে বলে, 'এখন এ ঘটনা তুমি মন থেকে শীগ্‌গিরই মুছে ফেলো, ভাল মেয়ে দেখে বিয়ে কোরো-সুখী হয়ো, এই আমার তোমায় আন্তরিক আশীর্ব্বাদ।' অনিল আদর্শবাদী পুরুষ; সে শ্যামলীর ছোটো বোন বিজলীকে আর বিয়ে করতে রাজি হয় নি, বরং তখনি বিজলীর বিয়ের ব্যবস্থা করেছে বন্ধু শিশিরের সাথে। এরপর নিরুপমা দীর্ঘ কাহিনী ব'লে একটি আদর্শবাদী স্বামীকে দিয়ে শ্যামলীকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন জীবনে। নিরুপমা নারীকে প্রথাগত ছক অনুসারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সাথে সাথে প্রকাশ করেছেন নারীর বেদনা। অনিল তাকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে আসার পর শ্যামলীর অব্যক্ত আর্তনাদে প্রকাশ পায় সব নারীর যন্ত্রণা : 'মাগো—কোথায় তুমি! এ আমি কোথায় আসিলাম মা?...এখানে যে আমি আর একদণ্ডও বাঁচিতে পারিতেছি না।' পৃথিবীতে পা দিয়ে প্রতিটি নারীই এমনভাবে চিৎকার ক'রে উঠতে পারে।

শ্যামলীর ভাগ্য ভালো সে অনিলের মতো দেবতার পায়ে পড়েছে। অনিল আর বিয়ে করতে রাজি হয় নি, এটা তার মহত্ত্ব; তবে শ্যামলীর কি রয়েছে আবার বিয়ের অধিকার? অনিলের মনে নিরুপমা যে-প্রশ্ন জাগিয়ে দিয়েছেন, সেটি আসলে নারীর প্রশ্ন : 'সমাজ পুরুষের দ্বিতীয়বার বিবাহ স্বচ্ছন্দে অনুমোদন করিবে আর স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহা খাটিবে না, সেই জন্যই কি এ ব্যবস্থা? এই অর্দ্ধমনুষ্য প্রাণীটির পক্ষেও কি এই নিয়ম! অনিলের যদি এ বিবাহ অসিদ্ধ হয়, তাহারই বা কেন না হইবে? তাহাকে আর কেহ বিবাহও করিবে না এবং যাহার সহিত বিবাহ হইল তাহারও গ্রহণযোগ্য সে হইবে না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবু অনিলকে মনে মনে স্বামী বলিয়া তাহাকে চিরদিন জানিতে হইবে। তাহার বিবাহের সম্ভাবনা না থাকিলেও অন্য ভয়ের সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে, সেইজন্যই তাহার জানিতে হইবে তাহার বিবাহ হইয়াছে, তাহার স্বামী আছে, অমুক তাহার স্বামী!' অনিলের বন্ধু ব্যক্ত করেছে পুরুষতন্ত্রের সিদ্ধান্ত : 'তুমিও জান এবং আমিও জানি যে স্ত্রীপুরুষের এ সাম্যবাদের নীতি বহু দেশে বহু তর্কের সঙ্গে চললেও সমত্ব কখনই মানুষে তাদের দিতে পারবে না। কিসে পারবে- প্রকৃতিই যে তাদের দুর্ব্বল করে রেখেছে।...হাজার শিক্ষা দাও, সুবিধা দাও, স্বাধীনতা দাও, ভগবান তাদের নীড় বাঁধবার জন্যেই তৈরী করেছেন; তর্ক মীমাংসা শ্রুতি স্মৃতি ঘাঁটবার জন্যে বা যুদ্ধ কর্‌বার জন্যে নয়।...সাধারণতঃ নারীদের ভগবান স্নেহদুর্ব্বল স্বভাবদুর্ব্বল করে যে সৃষ্টি করেছেন।...গৃহের মেরুদণ্ড স্বরূপেই ভগবান স্ত্রীজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা শিক্ষাদীক্ষা বা অন্যান্য সব অধিকারে পুরুষের তুল্য হোন ক্ষতি নেই, কিন্তু তাঁরা এই গৃহকে না অতিক্রম করেন, তাঁদের নারীত্ব না ভুলে যান! তা হলেই ধর্ম্মনাশ হবে!' নিরুপমা প্রথাগত, তবে তিনিও পুরুষতান্ত্রিক এ-বক্তৃতায় বিশ্বাস করেন না।

অনিল আদর্শবাদী হ'লেও নিরুপমা একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়েই শুধু অনিলকে দিয়ে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়েছেন শ্যামলীকে। অনিলকে তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত ক'রে কুৎসিত পুরুষে রূপান্তরিত করেন। যখন সে সুদর্শন ছিলো, যোগ্য ছিলো যে-কোনো রূপসী তরুণীর স্বামী হওয়ার, তখন সে তার আদর্শবাদ সত্ত্বেও নির্দ্বিধায় শ্যামলীকে স্ত্রী হিশেবে গ্রহণ করতে পারে নি, পেরেছে বসন্তে বিকৃত হয়ে যাওয়ার পর। একটি বিকৃত কুদর্শন পুরুষ একটি 'অর্দ্ধমনুষ্য', 'অসম্পূর্ণ জীব'কে স্ত্রী হিশেবে নিতে পারে, এটা সমাজের কাছে স্বস্তিকর; একটি যোগ্য পুরুষ গ্রহণ করবে একটি অযোগ্য নারীকে, এটা স্বস্তিকর নয়। সে জন্তুর সমতুল্য হ'লেও মাঝে মাঝে দেখা যায় তার 'কেমন এক রকম দৃষ্টি,–মুখের ও সারা অঙ্গের বিদ্রোহসূচক ভাব!' অনিল তাকে মূক-বধিরদের শেখানোর রীতিতে শিক্ষা দিতে থাকে, জাগিয়ে তুলতে থাকে তার 'প্রকৃত নারীত্ব'। তার নারীত্ব জেগে ওঠে ঈর্ষার মধ্য দিয়ে : 'এই অর্দ্ধমনুষ্য জীবটি, যাহাকে এতদিন উন্মাদ জড় বলিয়াই সকলে জানিত, অনিলও যাহাকে এতদিন পূর্ণ নারী বলিয়া অনুভব করিতে পারে নাই, যাহার বুদ্ধি স্নেহ ভালবাসা রাগ বা দুঃখ সমস্ত একেবারে এতদিন বালকের মতই ছিল, সেই শ্যামলীতে নারীত্বের এই নিকৃষ্ট অংশটি সহসা এমনই ভাবে কি ফুটিতে পারে? সে হিংসা করিতেছে?' নিরুপমা প্রশ্ন করেছেন : 'এই ঈর্ষা, নারীত্বের এই রহস্য, এ যে বিধাতারই নিজহস্তে দত্ত নারী-জীবনের অভিশাপ!– ইহা হইতে কোন্ নারী মুক্ত?' বিধাতা যে-শ্যামলীকে জন্তু হিশেবে সৃষ্টি করেছিলো, অনিল, এক পুরুষ, তাকে পুনরায় সৃষ্টি করে মানবী ও দেবীরূপে : 'সেই জড়বুদ্ধিসম্পন্না অর্দ্ধোন্মাদ শ্যামলীতে প্রথমে মানবীত্ব আনিয়া পরে ক্রমশঃ তাহতে আজিকার এই দেবীত্বের স্ফুরণ ইহাও অনিলের জীবন-ঢালা ব্রতেরই ফল বলিয়া রেবার মনে হইল।' *শ্যামলী*তে একটি জন্তুকে উন্নীত করা হয়েছে ছকবাঁধা নারীর স্তরে, এতে ভূমিকা পালন করেছে একটি পুরুষ; পুরুষই হয়ে উঠেছে নারীর স্রষ্টা।

শান্তা দেবীর *জীবনদোলা* (?১৯৩৮) সচেতনভাবে লেখা হয়েছে নারীমুক্তির বাণী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রচারের জন্যে, তবে তিনি বিধবার বিয়ের অধিকারকেই গণ্য করেছেন মুক্তি ব'লে। উপন্যাসটি আট বছর বয়সে বিবাহিত বালবিধবা গৌরীর উপাখ্যান। দু-খণ্ডে তিনি কাহিনী বলেছেন : প্রথম খণ্ডে দিয়েছেন বালিকা গৌরীর বিধবাজীবনের দুর্দশার বিবরণ, এবং দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণনা করেছেন ওই জীবন থেকে মুক্তির কাহিনী। প্রথম খণ্ডটির কোনো কোনো অংশ মর্মস্পর্শী, তবে দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি গৌরীকে মুক্ত করার জন্যে যে-কাহিনী তৈরি করেছেন, তা আবেদন জাগায় না। রচনা হিশেবে আলোচিত ছটি উপন্যাসের মধ্যে *জীবনদোলাই* সবচেয়ে দুর্বল। শান্তা দেবী জীবন উপস্থাপনের থেকে প্রচারে বেশি মন দিয়েছেন ব'লে লক্ষ্য অর্জনেও তিনি সফল হন নি; তবে তাঁর কৃতিত্ব হচ্ছে তিনি নারীকে মুক্ত ক'রে ছক থেকে বের ক'রে আনতে চেয়েছেন। শুরু থেকেই তিনি বিয়ে ও পুরুষবিরোধী মনোভাব প্রচার করেছেন; তাঁর অবোধ বালিকা গৌরী বলে, 'ছাই বর! আমাকে মার কাছ থেকে আবার নিয়ে যাবে!...আমি ধুতি পর্‌ব, চুল কেটে ফেল্‌ব; মেয়েমানুষ হব না। আমি ঘরে-ঘরে বিয়ে কর্‌ব।' গৌরী যেনো প্রতিশোধ নিতে চায় পুরুষের ওপর। বিয়ের পর গৌরী একবার শ্বশুর বাড়ি গিয়েছিলো : 'একরাত্রি নয় আট রাত্রি এই অজানা পুরীতে ভয়ে শোকে দুঃখে অনিদ্রায় অর্দ্ধনিদ্রায় মাতৃক্রোড়চ্যুতা গৌরীর প্রাণ কাঁদিয়াছিল', ফেরার পর দু-বছরেও তার 'মন হইতে শ্বশুরবাড়ীর সে বিভীষিকার ছবি' মোছে নি। গৌরীর ভাগ্য সে 'বাড়ীর বড় আদরের মেয়ে'। তার বাবা 'আট বছরের মেয়েটাকে দান করে পুণ্য সঞ্চয় করতে গিয়েছিলো; তার জন্যে যা পুণ্য গৌরীর জন্যে তা হয়ে ওঠে বিনাশ। তার শ্বশুরবাড়ি খবর যায় যে 'বিধবা মেয়েকে হরিকেশব সধবা বেশে ত রাখিয়াছেনই তাহার বৈধব্যের খবর পর্য্যন্ত তাহাকে জানিতে দেন নাই।' এটা গৌরীর শ্বশুরবাড়িতে উত্তেজনা সৃষ্টি করে; এক আশ্রিতা বিধবা ব'লেই বসে, 'তোমার বেয়াই মেয়েকে কল্‌মা পড়াবে, নিকে দেবে।' নারীর বিরুদ্ধে নারীও কাজ করতে পারে নিপুণ ও নিষ্ঠুরভাবে। গৌরীর বাবা পুরুষ, তবে মানুষ; তাই মেয়ের জীবনকে কিছুটা স্বস্তিকর ক'রে তোলার জন্যে তিনি মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন তীর্থভ্রমণে। তার বাবা জানে, 'তারা [পুত্ররা] যে পুরুষ। সংসারে তারা লড়্‌তে জন্মেছে, সংসার তাদের লড়্‌বার অধিকারও দিয়েছে। আর এ অসহায় শিশু বালিকা; মেয়ে হ'য়ে জন্মানোই এদেশে তার এক পরম দুর্ভাগ্য, তার উপর নূতন একটা দুর্ভাগ্যের বোঝা আজীবনের জন্য তার কচি মাথার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।' গৌরী অবশ্য জানে না সে বিধবা, সে বোঝে না বিধবা কাকে বলে; তবে পিতৃতন্ত্র তাকে এর মাঝেই বিধবার শাস্তি দেয়ার জন্যে ব্যগ্র হয়ে পড়েছে। শান্তা দেবী গৌরীর বাবামার মনে প্রশ্ন জাগিয়ে দিয়েছেন : 'সেই তরুণ শৈশবের দেখা অপরিচিতপ্রায় একটি বালকের তিরোধানে তাহার জীবনমুকুল সমাজের চক্ষে চির-অভিশপ্ত হইয়া গিয়াছে?...কিন্তু অচেনা মানুষের অজানা মৃত্যুতে শিশুকেও যে চির-সন্ন্যাসের বোঝা বহিয়া অপমান ও লাঞ্ছনায় আজীবন কৃত্রিম শোকের অভিনয় করিয়া যাইতে হয়, তাহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া মানিতে হয়, সে-কথা তাঁহার এই আদরিণী অভিমানিনী বালিকা কন্যাকে তিনি কি করিয়া বুঝাইবেন?' গৌরী যখন জানতে পায় যে সে বিধবা, তখন তার অবস্থা : 'বাঙ্গালীর মেয়ে সে আপনার বঞ্চিত জীবনের কথা যতটুকু বুঝিল তাহাতেই নিরানন্দের ম্লান ছায়ায় তাহার ফুলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মত মুখখানি অন্ধকার হইয়া গেল। অজানা সেই মানুষের মৃত্যু তাহার কাছে যতই অর্থহীন হোক পৃথিবীর কাছে তাহার বহু অধিকার যে সেই মানুষটিই হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে হিন্দুর মেয়ের মনে সেকথা ধরা পড়িলই।' শান্তা দেবী চিরস্বামীত্বের ধারণাটিকে স্পষ্টভাবেই বাদ দিয়েছেন। এমনকি গৌরীর প্রথাগত মায়ের মনেও হিন্দুবিবাহের বিধান সম্পর্কে সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছেন : 'তরঙ্গিনীর স্বামীর কথা মনে পড়িল, "আবার যদি ওর বিয়ে হয়।" এমন পাপ কথা মনে আনিতে তাঁহার যতখানি ঘৃণা যতখানি লজ্জা হওয়া উচিত ছিল, তিনি আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন কই সে লজ্জা, সে ঘৃণা ত তাঁহার মনে আসিল না।' শান্তা দেবী পুত্র ও কন্যার জীবনের দুই মেরুরূপের চিত্রও এঁকেছেন : 'এই ত্যাগ সমাজ তাহার নিকট জোর করিয়া আজীবন নিষ্ঠুর মহাজনের মত আদায় করিবে; তাহার পাঁচ ভাই যখন পিতার ঐশ্বর্য্যে ভোগ বিলাসে মাতিয়া থাকিবে তখন এই সকলের ছোট বোনটি বঞ্চিত জীবনের বোঝা বহিয়া বিস্মৃত স্বামীর প্রতি প্রেম ও ভক্তি নিবেদন করিবে।' গৌরী বোঝে না যে সে বিধবা, কিন্তু তার মুখে শান্তা এমন কথা দিয়েছেন, যেমন, 'আমার মেয়েকে আমি কখখনো বিয়ে দেব না। বাবা, শেষকালে যদি বিধবা হ'য়ে যায়' বা 'বিধবা হ'তে আমার ভাল লাগে না। কেন মা, আমি বাইরের লোকের জন্যে বিধবা হব?', যা তুলে ধরেছে পিতৃতান্ত্রিক বিধানের নিষ্ঠুরতা। শান্তা গৌরীকে আত্মোৎসর্গিত বিধবার ছকের বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তার মনে জাগিয়ে দিয়েছেন মুক্তির অভিলাষ : 'গৌরী ঠিক করিল এমন করিয়া পুতুলের মত দিন সে কাটিতে দিবে না। যেমন করিয়াই হউক একটা পথ তাহাকে করিতে হইবে।...তাহাকে মুক্ত হইতে হইবে।' দ্বিতীয় বা *মুক্তি*খণ্ডে শান্তা প্রচুর পরিশ্রম করেছেন গৌরীর মুক্তির গল্প বানাতে : তৈরি করেছেন তিনটি স্বদেশী যুবক, প্রতিষ্ঠা করেছেন হৈমবতীর কন্যাশ্রম, সেখানে বহু দুর্গত তরুণীর সাথে রেখেছেন গৌরীকে, এবং তরুণতরুণীদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন প্রেমাবেগ। নারীকে মুক্ত করার জন্যে পরিশেষে দিয়েছেন দুটি প্লটবাঁধা যুগ্ম বিয়ে : বিধবা গৌরীকে বিয়ে দিয়েছেন সঞ্জয়ের সাথে, আর সঞ্জয়ের পিতার অবৈধ কন্যা চঞ্চলাকে বিয়ে দিয়েছেন গৌরীর ভাই শঙ্করের সাথে। ভাইয়েরা উদ্ধার করেছে পরস্পরের বোনদের। তিনি ছক ভেঙেছেন, নতুন ভাবমূর্তি সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন; কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন উপন্যাস লিখতে এবং নারীর সপক্ষে গভীর আবেদন সৃষ্টি করতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙালি : একটি রুগ্ন জনগোষ্ঠি?

বাঙালি, পৃথিবীর সবচেয়ে অহমিকাপরায়ণ জাতিগুলোর একটি, বাস করে পৃথিবীর এককোণে; ছোটো, জুতোর গুহার মতো, ভূভাগে;– খুবই দরিদ্র, এখন পৃথিবীর দরিদ্রতম। তার দেশ ছোটো;– ছোটো ভূভাগে বাস করার একটি ফল মানসিকভাবে ছোটো, সংকীর্ণ হওয়া; কূপমণ্ডুকতায় ভোগা, যাতে ভুগছে বাঙালি অনেক শতাব্দী ধ'রে। বাঙালির এক অংশ প'ড়ে আছে এক বড়ো দেশের একপ্রান্তে, ভুগছে প্রান্তিক মানসিকতায়; এবং আরেক অংশ ঠাসাঠাসি ক'রে বেঁচে আছে আরেক ভূভাগে, যা এক টুকরো। বাঙালির দারিদ্র্য বিশশতকের বড়ো কিংবদন্তি ও সত্য। আর্থিক দারিদ্র্য মানুষকে মানসিকভাবে গরিব করে, বাঙালির মনের পরিচয় নিলে তা বোঝা যায়। প্রতিটি বাঙালি ভোগে অহমিকারোগে, নিজেকে বড়ো ভাবার অচিকিৎস্য ব্যাধিতে আক্রান্ত বাঙালি। ইতিহাসে বাঙালির যে-পরিচয় পাওয়া যায়, তা গৌরবজনক নয়; এবং এখন যে-পরিচয় পাই বাঙালির, তা আরো অগৌরবের। প্রতিটি জনগোষ্ঠির রয়েছে একটি বিশেষ চরিত্র, যা দিয়ে তাকে শনাক্ত করা যায়; কিন্তু বাঙালির পাওয়া যায় না এমন কোনো বৈশিষ্ট্য, যার দিকে নির্দেশ ক'রে বলা যায় এ হচ্ছে বাঙালিত্ব। প্রতিটি জনগোষ্ঠির স্বভাবের রয়েছে একটি-দুটি প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য;– কোনো জাতি সরল, কোনো জাতি পরোপকারী, কোনো জনগোষ্ঠি উদার, বা মহৎ, বা আন্তরিক; বা কোনো জাতি স্বল্পভাষী, বা বিনয়ী, বা পরিশ্রমী, বা উচ্চাভিলাষী; কিন্তু বাঙালির নেই এমন কোনো গুণ, যার সংস্পর্শে এসে মনুষ্যত্বের প্রসার ঘটতে পারে। বাঙালি জাতিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ ও বিচার করা হয়েছে কি না, তা জানি না আমি; কিন্তু বোধ করি যে তা এখন জরুরি। বাঙালিকে এখন বিচার করা দরকার শারীর দিক থেকে– তার অবয়বসংস্থান কেমন, ওই সংস্থান মানুষকে কতোটা সুন্দর বা অসুন্দর করে, তা দেখা দরকার। বিচার করা প্রয়োজন বাঙালিকে মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে;– কেমন তার মানসগঠন, ওই মনে নিয়ত চলছে কিসের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া; দিনভর কতোটা ঈর্ষায় ভুগছে, উত্তেজিত থাকছে কতোখানি, কতোটা গ্লানি বয়ে বেড়াচ্ছে দিনরাত, বা কতোটা গৌরবে তার সময় কাটে। মানসিক এলাকাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু বাঙালির মানস উদ্ঘাটনের কোনো চেষ্টা হয় নি আজো। বাঙালির আচরণও বিশেষ পর্যবেক্ষণ ও বিচারের বিষয়। বাঙালি সাধারণত কী আচরণ করে, তার সামাজিক আচরণ কেমন; বন্ধুকে কতোটা প্রীতির সাথে গ্রহণ করে, শত্রুকে দেখে কতোটা ঘৃণার চোখে; কতোটা কথা বলে বাঙালি, কথায় কতোটা বক্তব্য থাকে বা থাকে না, এবং আরো অনেক আচরণ সূক্ষ্মভাবে বিচার করা দরকার। তার আর্থ, সামাজিক, রাজনীতিক জীবন ও আচরণ তো গভীর পর্যবেক্ষণের বিষয়। অর্থাৎ আমি বলতে চাই খুব বিস্তৃতভাবে রচনা করা দরকার বর্তমান বাঙালিব জীবন ও স্বপ্নের ব্যাকরণ, যাতে আমরা বুঝতে পারি তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমস্ত সূত্র। ওই সব সূত্র যদি কখনো রচিত হয়, তবে কি ধরা পাড়বে যে বাঙালি একটি সুস্থ জনগোষ্ঠি, না কি ধরা পড়বে বাঙালি জাতি হিশেবে রুগ্ন; আর এ-রুগ্নতা শুধু সাম্প্রতিক নয়, ঐতিহাসিকও। বাঙালিক অহমিকা কি বাঙালিকে বাধা দেবে না নিজের নিরপেক্ষ, বস্তুনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণে ও বিচারে? তা দেবে; কেননা বাঙালি সত্যের থেকে শূন্য স্তাবকতা পছন্দ করে। আমি এখানে বাঙালির কিছু বৈশিষ্ট্য আলোচনা বা বর্ণনা করতে চাই, বস্তুনিষ্ঠভাবে, যাতে বাঙালির ব্যাকরণ রচনার সূচনা ঘটে।

বাঙালির ভাষিক আচরণ দিয়েই শুরু করি। জাতি হিশেবে বাঙালি বাচাল ও বাকসর্বস্ব; অপ্রয়োজনেও প্রচুর কথা বলে। বাঙালির স্বভাব উঁচু গলায় কথা বলা; সাধারণত শুরুই করে উচ্চকণ্ঠে, বা ক্রমশ তার গলার আওয়াজ চড়তে থাকে। যদি আলাপের বিষয়টি বিতর্কিত হয়, পক্ষবিপক্ষ থাকে, তাহলে অল্প সময়েই তারা প্রচণ্ড আওয়াজ সৃষ্টি করতে থাকে; এবং অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা যদি দুয়ের বেশি হয়, তিন-চার-পাঁচজন হয়, তাহলে আলোচনা পুরোপুরি পণ্ড হওয়ার সম্ভবনা থাকে। যে-কোনো আলাপে বাঙালি নিজেই নিজেকে প্রবেশ করিয়ে দেয়, অন্যদের অনুমতির প্রয়োজন বোধ করে না; এমনকি, অনেক সময়, আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে কিছু না জেনেই বাঙালি তীব্র আলোচনায় অংশ নেয়। বাঙালির যুক্তি কণ্ঠের উচ্চতা; যার কণ্ঠ যতো উঁচু, সে নিজেকে ততোটা যুক্তিপরায়ণ ব'লে গণ্য করে; এবং নিজের জয় অবধারিত ব'লে জানে। যুক্তিতে কোনো বাঙালি কখনো পরাজিত হয় নি, হয় না, ভবিষ্যতেও হবে না। বাঙালি কথায় সাধারণত ভুল শব্দ ব্যবহার করে, বাক্য সম্পূর্ণ করে না; এক কথা ব'লে অন্য কথা বুঝিয়ে থাকে। বাঙালি উচ্চকণ্ঠে আলাপ করে, অযুক্তি পেশ করে, এবং অনেকের মাঝখানে থেকেও ফিশফিশে স্বরে চমৎকার চক্রান্ত করতে পারে। বাঙালি কারো সাথেই দেখা হ'লেই কথা বলে, কথার কোনো প্রয়োজন না থাকলেও। বাঙালি প্রচুর মিথ্যে কথা ব'লে থাকে, অনেকে মিথ্যে বলাকে মনে করে চাতুর্য, একধরনের উৎকর্ষ। বাঙালির প্রতিটি এলাকায় অন্তত একজন পেশাদার মিথ্যেবাদী পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারতে একটি উপজাতি রয়েছে, যারা চল্লিশ বছর বয়স্ক হওয়ার পর কথা বলাই থামিয়ে দেয়; তাদের কথা বলার মতো আর কিছু থাকে না। বাঙালি এর বিপরীত– বয়স বাড়ার সাথে কথাও বাড়তে থাকে বাঙালির; বাঙালি বুড়োরা কথা বলার জন্যে প্রসিদ্ধ। বাঙালির কথার পরিমাণ ও বক্তব্য সমানুপাতিক নয়; প্রচুর কথায় বাঙালি সামান্য বক্তব্য প্রকাশ করে। বাঙালির কথার প্রাচুর্য হয়তো বোঝায় যে জীবন তাকে ক্লান্ত করে নি; এবং সাথে সাথে এও বোঝায় যে জীবনে তার অপ্রাপ্তি অশেষ। বাঙালির অধিকাংশ কথাই তার না পাওয়ার কথা, তার সমস্যার কথা, তার জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যর্থতার কথা। বাঙালি তার কথা দিয়ে জীবনের না-পাওয়ার শূন্যতাগুলো পূরণ করে। এ-দিক দিয়ে বেশ ট্র্যাজিক জাতি বাঙালি; কিন্তু সে তার ট্র্যাজেডিকে লুকিয়ে রাখতে চায় অন্যের কাছে। বাঙালির কথায় ধরা পড়ে তার অন্তঃসারশূন্যতাও।

বাঙালি গুছিয়ে কথা বলে না; এক কথা বার বার বলে; কথায় কথায় অতিশয়োক্তি প্রয়োগ করে। সাধারণ মানুষের বাক্যের ভাণ্ডার বেশ সীমাবদ্ধ; কিন্তু তারা ওই সীমাবদ্ধ ভাণ্ডারকে বারবার ব্যবহার ক'রে প্রায় অসীম ক'রে তোলে। বাঙালি মনে করে এক কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বারবার বললে তা গ্রহণযোগ্য হয়, তাতে ফল ফলে। এটা হয়তো মিথ্যে নয়, কিন্তু এতে কথার তাৎপর্য কমে, মূল্য বাড়ে পৌনপুনিকতার। সাধারণ মানুষকে যদি ছেড়ে দিই, ধরি যদি মঞ্চের মানুষদের, বিচিত্র কথা বলা যাদের পেশা, তারাও একই কথা বারবার বলে। বাঙালি নতুনত্ব চায় না, বিশ্বাস করে পুনরাবৃত্তিতে। পুনরাবৃত্তিতে বাঙালির প্রতিভা কি তুলনাহীন? বাঙালির স্বভাবে রয়েছে অতিশয়োক্তি, সে কোনো আবেগ ও সত্য প্রকাশ করতে পারে না অতিশয়োক্তি ছাড়া। অতিশয়োক্তি ভাষাকে জীর্ণ করে, নিরর্থক করে, যার পরিচয় পাওয়া যায় বাঙালির ভাষিক আচরণে ও লিপিবদ্ধ ভাষায়। 'দারুণ পছন্দ করি', 'ভীষণ ভালোবাসি', 'শ্রেষ্ঠতম কবির' মতো অতিশয়োক্তিতে বাঙালির ভাষা পূর্ণ। অতিশয়োক্তি লঘুতার লক্ষণ; এতে প্রকাশ পায় পরিমাপবোধের অভাব। বাঙালি লঘু, পরিমাপবোধহীন। বাঙালি সাধারণত কারো আন্তর গুরুত্ব নিজে উপলব্ধি করতে পারে না; অন্য কারো কাছ থেকে তার জানতে হয় এটা; এবং একবার অন্যের কাছে থেকে জেনে গেলে, বিচার না ক'রে, সে তাতে বিশ্বাস করে। বাঙালি ভাষাকে এক ধরনের অস্ত্ররূপেও ব্যবহার করে। কলহে বাঙালির প্রধান অস্ত্র ভাষা– আগ্নেয়াস্ত্রের মতো বাঙালি ভাষা প্রয়োগ ক'রে থাকে।

বাঙালি স্বভাবত ভদ্র নয়। সুবিধা আদায়ের সময় বাঙালি অনুনয় বিনয়ের শেষ সীমায় যেতে পারে, কিন্তু সাধারণত অন্যদের সাথে ভদ্র আচরণ করে না। বাঙালি প্রতিটি অচেনা মানুষকে মনে করে নিজের থেকে ছোটো, আগন্তুক মাত্রকেই মনে করে ভিখিরি। কেউ এলে বাঙালি প্রশ্ন করে, 'কী চাই?' অপেক্ষা করার জন্যে বলে, 'দাঁড়ান'। কোনো কর্মস্থলে গেলে বাঙালির অভদ্রতার পরিচয় চমৎকারভাবে পাওয়া যায়। যিনি কোনো আসনে ব'সে আছেন কোনো কর্মস্থলে, তাঁর কাছে কোনো অচেনা মানুষ গেলে তিনি সুব্যবহার পাবেন না, এটা বাঙালি সমাজে নিশ্চিত। আসীন কর্মকর্তা, তিনি যতো নিম্নস্তরেই থাকুন-না-কেনো, তিনি আগন্তুকের দিকে মুখ তুলেও তাকাবেন না; তাকালে মুখটি দেখে নিয়েই নানা অকাজে মন দেবেন। তিনি হয়তো পান খাবেন, অপ্রয়োজনে টেলিফোন করবেন, পাশের টেবিলে কাউকে ডেকে বাজে কথা বলবেন, আগন্তুকের দিকে মনোযোগ দেবেন না। সামনে কোনো আসন থাকলেও আগন্তুককে বসতে বলবেন না। বাঙালি অন্যকে অপমান ক'রে নিজেকে সম্মানিত করে। পশ্চিমে এটা কখনো হয় না। পশ্চিমে সাক্ষাৎপ্রার্থী সাদরে গৃহীত হয়, সম্মানিত হয়; কিন্তু বাঙলায় প্রতিটি সাক্ষাৎপ্রার্থী হয় অপমানিত। বাঙলায় সম্মানলাভের বড়ো উপায় হচ্ছে ক্ষমতা। কোথাও গিয়ে তাই প্রথমেই নিজের পদের পরিচয় দিতে হয়, ওই পদটি যদি আসীন ব্যক্তিকে সন্ত্রস্ত করে, তাহলে সাক্ষাৎপ্রার্থী যথেষ্ট সমাদর লাভ করেন। তাই বাঙালি সামাজিকভাবে ভদ্র বা সৌজন্যপরায়ণ নয়; তার সৌজন্য ভীতি বা স্বার্থচেতনাপ্রসূত। বাঙালি যখন পথেঘাটে পরস্পরের মুখোমুখি হয়, তখনও ঠিক সৌজন্যবিনিয়ম ঘটে না। ধর্মীয় সম্বোধন অনেকে পরস্পরের মধ্যে বিনিময় ক'রে থাকে, তবে তা যতোটা যান্ত্রিক, ততোটা সামাজিক বা সাংস্কৃতিক নয়। পশ্চিমে রাস্তায় বেরিয়েই পরিচিতজনের, সামান্য পরিচিতের, হাসিমুখ দেখা স্বাভাবিক ঘটনা; কিন্তু এখানে হাসিমুখ দুর্লভ; রেশারেশি বাঙলায় আলোবাতাসের মতো সত্য। প্রতিটি এলাকা পারস্পরিক রেশারেশিতে গোপন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুদ্ধক্ষেত্রের মতো ভয়ঙ্কর এখানে। তাই সামাজিক ভদ্রতা দুস্প্রাপ্য। বাঙালি সমাজ প্রতি মুহূর্তে ক্ষমতানিয়ন্ত্রিত; প্রতিটি ব্যক্তি একেকটি ক্ষমতারূপে বিরাজ করে, চলাফেরা করে। ক্ষমতা কোনো ভদ্রতা জানে না। ক্ষমতার দুটি দিক রয়েছে;– একটি দম্ভ, তা শক্তিমানকে দাম্ভিক করে; আরেকটি অসহায়ত্ব, তা অধীন ব্যক্তিকে স্তাবকে পরিণত করে। তাই বাঙালি দাম্ভিক বা স্তাবক, ভদ্র নয়।

বাঙালির চরিত্রের একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য ভণ্ডামো। বাঙালি প্রকাশ্যে একটি মুখোশ পরতে ভালোবাসে, মুখোশটি নানা রঙে রঙিন ক'রে রাখে; কিন্তু তার ভেতরের মুখটি কালো, কুৎসিত। বাইরে বাঙালি সব আদর্শের সমষ্টি, ভেতরে আদর্শহীন। বাঙালি সততার কথা নিরন্তর বলে, কিন্তু জীবনযাপন করে অসততায়। বাঙলায় এমন কোনো পিতা পাওয়া যাবে না, যিনি পুত্রকে সৎ হ'তে বলেন না; আর এমন পিতাও খুব কম পাওয়া যাবে, যিনি পুত্রের অসৎ উপার্জনে গৌরব বোধ করেন না। 'চরিত্র' সম্পর্কে বাঙালির ধারণাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। 'চরিত্রহীন' বলতে বাঙালি বোঝে পরনারীতে আসক্ত পুরুষ; তার চোখে আর কেউ চরিত্রহীন নয়, শুধু পরনারীআসক্তই চরিত্রহীন বা দুশ্চরিত্র। ঘুষ খাওয়া চরিত্রহীনতা নয়, গৌরব; কপটতা চরিত্রহীনতা নয়, মিথ্যাচার চরিত্রহীনতা নয়, এমনকি খুন করাও চরিত্রহীনের লক্ষণ নয়, শুধু নারীআসক্তিই চরিত্রহীনতা। তবে বাঙালিমাত্রই পরনারীআসক্ত; প্রকাশ্যে নয়, গোপনে। বাঙালি ধর্মের কথা সোরগোল ক'রে ব'লে ধর্মবিরোধী কাজ করে অবলীলায়, প্রগতির কথা ব'লে প্রগতিবিরোধী কাজ করে প্রতিদিন; বাঙালি প্রকাশ্যে মহত্ত্ব দেখিয়ে বাস্তব কাজের সময় পরিচয় দেয় ক্ষুদ্রতার। বাঙালি যা বিশ্বাস করে, মুখে তা প্রকাশ করে না; বাঙালি যা প্রকাশ করে, আচরণে তা পালন করে না; বাঙালি পেছনে যার নিন্দা করে, মুখোমুখি তার তোষামোদ করে– যদি সে শক্তিমান হয়। শক্তি বাঙালির জীবনের বড়ো নিয়ন্ত্রক;– বাঙালি শক্তিমানের পদানত হয় নির্দ্বিধায়, আর দুর্বলকে পীড়ন করে অবলীলায়। বাঙালি শক্তিমানের কোনো ত্রুটি দেখে না, শক্তিমানের সমস্ত অন্যায়কে মেনে নেয়, বাঙালির চোখে শক্তিমান কখনো চরিত্রহীন নয়, শক্তিমানের চরিত্র থাকার কোনো দরকার আছে ব'লেও মনে করে না বাঙালি; কিন্তু চরিত্রবান হওয়া দুর্বলের জন্যে বিধিবদ্ধ। বাঙালি খুবই পরনিন্দা করে, পিতার নিন্দা করতেও কুণ্ঠিত হয় না; তবে বাঙালির চোখে সামাজিকভাবে কেউ নিন্দিত নয়, যদি সে শক্তিমান হয়। নিন্দিত শক্তিমানের কণ্ঠে মালা পরাতে বাঙালি লজ্জিত হয় না, গর্ব বোধ করে; নিন্দিত শক্তিমানকে নিমন্ত্রণ ক'রে ধন্য বোধ করে বাঙালি। বাঙালি, অশেষ ভণ্ডামোর সমষ্টি, শক্তিকেই মনে করে বিধাতা।

বাঙালির শরীরটির দিকেই তাকানো যাক একবার। বাঙালি কি সুন্দর, বাঙালি কি নিজেকে মনে করে রূপমণ্ডিত? বাঙালির অহমিকা আছে, তাই নিজেকে রূপের আধার মনে করে নিশ্চয়ই; কিন্তু বাঙালির চোখে সৌন্দর্যের দেবতা অন্যরা। একটু ফরশা হ'লে বাঙালি তাকে বলে 'সাহেবের মতো সুন্দর'; একটু বড়োসড়ো হ'লে বাঙালি তার তুলনা করে, বা কিছুদিন আগেও তুলনা করতো, পাঠানের সাথে। বাঙালি সাধারণত খর্বকায়, তবে সবাই খর্ব নয়; বাঙালির রঙ ময়লা, তবে সবাই ময়লা নয়, কেউ কেউ ফরশা। শাদা রঙটিকে পূজো করে বাঙালি, সম্ভবত সমস্ত ভারতবর্ষীয়ই। এদিক থেকে বাঙালিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্ণান্ধ বা বর্ণবাদীও বলা যায়; রঙের জন্য এতো মোহ আর কোথাও দেখা যায় কিনা সন্দেহ। যে-মেয়ে শুধুই শাদা, আর কিছু নয়, যার মুখের দিকে তাকানো যায় না, যার শরীর বেঢপ, তাকেও বাঙালি সুন্দরী বলে, কারণ সে শাদা। বাঙালি কালো, কিন্তু তার সৌন্দর্যের দেবী শাদা। বাঙালির শরীর সুন্দর নয়। কেউ হয়তো খর্ব, মধ্যভাগে মাংস প্রচুর; নারীদের সৌন্দর্য কম, যদিও কেউ কেউ রূপসী। বাঙালি নারী বক্র হয়ে যায় পিঠ বাঁকিয়ে চলতে চলতে, আর ঠিক মতো সোজা হ'তে পারে না, সব সময় ঢাকা থাকে জড়তায়। বাঙালি পুরুষের কাঠামোতে পৌরুষের অভাব; নারীদের অভাব আবেদনের। বাঙালি অবশ্য নিজের সম্পর্কে সব কিছু বাড়িয়ে বলতে ভালোবাসে ব'লে সৌন্দর্যের কথাও বাড়িয়ে ব'লে থাকে; কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির সাথে তুলনা করলে তার সৌন্দর্য স্থান পাবে তালিকার নিচের দিকেই। তাই বাঙালি তাকেই সুন্দর বলে যে দেখতে বাঙালির মতো নয়। তাহলে কি বাঙালির সৌন্দর্যচেতনা চিরকালই থেকে যায় অপরিতৃপ্ত? বাঙালির জীবন ভ'রে অপরিতৃপ্তি ও অসন্তোষ; অর্থ তাকে সচ্ছলতা দেয় না, সমাজ তাকে শান্তি দেয় না, রাজনীতি তাকে মানুষ হিশেবে গণ্য করে না, আর তার সৌন্দর্যপিপাসাও তাকে করে রাখে অপরিতৃপ্ত?

বাঙালি দরিদ্র কিন্তু অপচয়প্রবণ; আর বাঙালি সময়ের মূল্যবোধহীন। দরিদ্রদের একটি বৈশিষ্ট্য সম্ভবত অপচয়, বা অপচয়ে তারা গৌরব বোধ করে। গরিব বাঙালির বাড়িতে গেলেও নানা অপচয় চোখে পড়ে। ভাতের অভাব বাঙালির জীবনে ঐতিহাসিক সত্য ও নিয়তি; কিন্তু প্রতি বাড়িতেই প্রতিদিন কিছু পরিমাণ হ'লেও ভাতের অপচয় ঘটে। কেউ হয়তো খাওয়ার সময় কিছু ভাত ফেলে দেয়, কেউ না-খেয়েই উঠে যায়; কিন্তু ধনী দেশগুলোতে এক টুকরো রুটিরও অপচয় হয় না। রাষ্ট্রীয়ভাবে বাঙালির অপচয়ের কোনো শেষ নেই, এটা ব্যক্তির অপচয়েরই রাষ্ট্রীয় পরিণতি। বাঙালির রাষ্ট্রযন্ত্র প্রতিদিন অপচয় ক'রে চলে, কিন্তু জাপানে একটি ইয়েনেরও অপচয় ঘটে না। অপব্যয় বাঙালির স্বভাব ও সামাজিক দাবি। বিলেতে কারো আয়ের একটি ছোটো মুদ্রাও অপব্যয়িত হয় না; তারা নিজেরা অপব্যয় করে না, রাষ্ট্র অপব্যয় করতে দেয় না, সমাজ অপব্যয় করতে দেয় না। সিগারেটকেই উদাহরণ হিশেবে নিই। আমি সিগারেট খাই, হিশেব মতো খেতে চাই, কিন্তু হয়ে ওঠে না। পাশের কাউকে-না-কাউকে প্রতিদিনই দু-চারটি দিতে হয়, যদিও তাঁদের অনেকে ধূমপায়ী নন, কিন্তু অন্যকে সিগারেট খেতে দেখলেই ধূমপানের শখ জেগে ওঠে তাঁদের। প্রতিদিনই কয়েকটি সিগারেট অপচয় হয় আমার, যেমন হয় অধিকাংশ বাঙালির। আয় খুব সামান্য, কিন্তু অপচয় অনেক;— কখনো স্বেচ্ছায়, কখনো বাধ্য হয়ে। দর্জির কাছে কখনো একবার গিয়ে জামা তৈরি পাওয়া যায় না, দু-তিনবার যেতে হয়, অপচয় ঘটে সময়ের ও অর্থের; যে-কাজে একবারের বেশি যাওয়ার কথা নয়, সেখানে যেতে হয় বারবার। এমন অপচয় পশ্চিমে ঘটে না। তারা অনেক আয় করে, কিন্তু তাদের একটি সিগারেটেরও অপচয় ঘটে না। বাঙালি আয় করে কম, কিন্তু তার একটা বড়ো অংশ অপচয় হয়ে যায়। অপচয় হয় বাঙালির জীবন। বাঙালির সময়বোধ নেই বললেই চলে; বাঙালি পাঁচটা বললে ছটা-সাতটাও বোঝাতে পারে। সময় মতো যে চলে বাঙালি সামাজে সে-বেমানান,

www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকে বার বার পড়তে হয় অসুবিধায়। বাঙালি সভা বা বৈঠক করতে খুবই উৎসাহী; প্রতিটি অফিস বৈঠকপরায়ণ, তারা প্রতিদিন নানা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে ব্যগ্র; কিন্তু ঠিক সময়ে কোনো সদস্য আসে না বৈঠকে। যারা আগে আসে তাদের মূল্য কম, বাঙালি মনে করে সময়বোধহীন বিলম্বীরাই মূল্যবান। যে-ঠিক সময়ে এসেছে বাঙালি তাকে খেয়াল করে না; কিন্তু যে আসে নি, আসবে কি না সন্দেহ, বাঙালি তার কথা বারবার বলে, তার জন্যে বড়ো আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে।

প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা বা কথা না-রাখায় বাঙালি প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। কারো সাথে আর্থিক সম্পর্কে জড়িত হ'লে প্রবঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে একশো ভাগ, না হ'লেই বিস্ময় জাগে। বাঙালি প্রচুর দলিলপত্র ক'রে ব্যবসায়ে নামে অন্যের সাথে, তারা সবাই সুযোগ খুঁজতে থাকে পরস্পরকে ঠকানোর, এবং ঠকাতে পারলে গৌরব বোধ করে, ও না ঠকলে অবাক হয়। ঋণ শোধ না করা বাঙালির স্বভাব। কেউ একবার ঋণ নিলে তা যে ফেরত পাওয়া যাবে, এমন আশা করা বাঙালিসমাজে অন্যায়; আর ফেরত পাওয়া গেলেও তা কখনো ঠিক সময়ে পাওয়া যায় না। বাঙালি কারো প্রাপ্য অর্থ শোধ করতেও কয়েকবার ঘোরায়। প্রথমে একটি তারিখ দেয়, প্রাপক গিয়ে দেখে অন্যজন অনুপস্থিত। তখন তার খোঁজ করতে হয়, পাওয়া গেলে প্রাপ্য টাকা পাওয়া যায় না, টাকা শোধের আরেকটি তারিখ পাওয়া যায়। অনেকবার ঘোরানোর পর বাঙালি টাকার কিছুটা শোধ করে, বাকিটার জন্যে আরেকটি তারিখ দেয়। এটাই হচ্ছে বাঙালির ঋণনীতি। ব্যবসাবাণিজ্যে যারা জড়িত, তারা প্রত্যেকেই প্রতারক; কাউকে-না-কাউকে প্রতারণা ক'রে তারা টাকা করে। এখন অবশ্য রাষ্ট্রকে প্রতারণা করার পথই তারা আবিষ্কার করেছে। বাঙালি বন্ধুকে, পরিচিতজনকে, এমনকি অপরিচিতকেও নানা রকম কথা দেয়; কিন্তু কথা রাখে না। কথা না-রাখার নানা অজুহাত বের করতে দক্ষ বাঙালি; এতো দক্ষ যে বাঙালির কথা শুনে যে বিশ্বাস করবে না তাকে চরম অবিশ্বাসী ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

বাঙালি খুবই স্বৈরাচারী; দেখতে এতোটুকু, কিন্তু সবাই ছোটোখাটো চেঙ্গিশ খাঁ। প্রতিটি পরিবারকে যদি একটি ছোটো রাষ্ট্র হিশেবে দেখি, তাহলে ওই রাষ্ট্রের একনায়ক পিতাটি। পল্লীসমাজে পিতার একনায়কত্ব খুবই প্রবল ও প্রচণ্ড; শহুরে মধ্যবিত্ত সমাজে কিছুটা কম। পিতার শাসনে স্বৈরাচারে পরিবারটি সন্ত্রস্ত থাকে সারাক্ষণ; মা-টি হয় সবচেয়ে পীড়িত ও পর্যুদস্ত, সন্তানেরাও তাই। পিতার স্বৈরাচারের পরিচয় পরিবারের সদস্যদের সম্বোধনরীতিতে ধরা পড়ে। আগে, সম্ভবত এখনো, সন্তানেরা পিতাকে সম্বোধন করতো 'আপনি' ব'লে, কিন্তু মাকে সম্বোধন করতো বা করে 'তুমি' বলে। পিতা যে প্রতাপশালী বা অপ্রতিহত, এটা বোঝে ছোটো শিশুটিও; মা যে শক্তিহীন তাও বোঝে। মা তাদের মতোই পীড়িত। বাঙালির পারিবারিক একনায়কত্বই বিস্তৃত হয় সমাজে, রাষ্ট্রে। বাঙালি সমাজে প্রধানেরা একনায়ক, তারা অন্যের মত গ্রাহ্য করে না, নিজের মত চাপিয়ে দেয় সকলের ওপর। রাষ্ট্রনায়কেরা তো প্রসিদ্ধ একনায়ক, যদিও বিশ্বের প্রধান একনায়কদের কাছে তারা ইঁদুরছানার মতো। বাঙালি একনায়কত্ব করে, ও ওপরের একনায়কের বশ্যতা মেনে নেয়। নিচের সবাই তাদের কাছে 'ভৃত্য', ওপরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবাই 'প্রভু'। একনায়কত্ব বাঙালিসমাজে বিকাশ ঘটিয়েছে স্তাবকতার। স্তাবকতায় বাঙালি কি অদ্বিতীয়? প্রভুকে তারা হাজার বিশেষণে শোভিত করে, এতো বিশেষণ তাকে উপহার দেয় যে বিধাতাকেও অতো বিশেষণে সাজানো হয় না। স্তাবকতায় যে-কোনো অতিশয়োক্তি প্রয়োগ করতে পারে বাঙালি, এবং মুহূর্তে মুহূর্তে নতুন অতিশয়োক্তি খুঁজে ফেরে। তবে বাঙালি কখনো প্রভুভক্ত নয়। বাঙালি জানে প্রভু শাশ্বত, কিন্তু কোনো বিশেষ প্রভু নশ্বর। এক প্রভু নিঃশেষ হয়ে গেলে বাঙালি আরেক প্রভু ধরে, আগের প্রভুর নিন্দায় মুখর হয়, জয়গানে মুখর হয় নতুন প্রভুর।

অন্যদের সমস্ত কিছুতে নাক গলাতে বাঙালি শুধু পছন্দই করে না, এটাকে কর্তব্য ব'লে গণ্য করে। বাঙালি তার এলাকার সকলের সমস্ত খবর রাখে, খারাপ খবরগুলো মুখস্থ রাখে; এবং যদি কারো কোনো খারাপ খবর না থাকে, তবে বাঙালি তার একটা খারাপ খবর তৈরি করে। বাঙালি অন্যের ব্যক্তিগত জীবনে বিশ্বাস করে না। বাঙালি অন্যের একান্ত বা ব্যক্তিগত কিছু সহ্য করে না। তাই বাঙালির কোনো ব্যক্তিগত জীবন নেই। বাঙালি প্রতিবেশীর ঘরবাড়ির ওপর বিনিদ্র চোখ রাখে, ওই বাড়িতে কে বা কারা আসে, কখন আসে ও যায়, সব সংবাদ রাখে, এবং সংবাদ বানায়। বাঙালির ঘরবাড়িতে যে দরোজাজানালা লাগানোর ব্যবস্থা আছে, এটা আপত্তিকর ব্যাপার প্রতিবেশীর চোখে। বাঙালি কারো সাথে দেখা করতে এলে দরোজায় কড়া নাড়ে, ডাকে; সাড়া না পেলে পাড়া মাতিয়ে তোলে, এমনকি দরোজা ভেঙে ঘরে ঢোকার উপক্রম করে। বাঙালির চোখে ব্যক্তিগত জীবন পাপ; বাঙালি মনে করে দরোজা লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে মানুষ পাপকর্মে লিপ্ত হয়; তাই তার দায়িত্ব অন্যের দরোজা ভেঙে ঢুকে তাকে পাপ থেকে উদ্ধার করা। তবে বাঙালি উদ্ধার করে না, অন্যকে বিপদে ফেলাই তার সমস্ত উদ্বেগের উদ্দেশ্য। বাঙালি অন্যের ব্যক্তিগত জীবনে নাক গলানোর আরেকটি দিক হচ্ছে কুৎসা রটনা। বাঙালি কুৎসা রটিয়ে সুখ পায়; আর এ-কুৎসা যদি যৌন হয়, তাহলে তা সর্বশ্রেষ্ঠ। বাঙালি একটি নিন্দাকেই বড়ো নিন্দা মনে করে, তা হচ্ছে লাম্পট্য নিন্দা। কোনো পুরুষকে লম্পট আর নারীকে ভ্রষ্টা হিশেবে চিহ্নিত ক'রে দিতে পারলে বাঙালি জীবন সার্থক হয়েছে ব'লে মনে করে।

বাঙালির যৌনজীবন ও আচরণ একটি ভয়ঙ্কর ট্যাবো। ওই জীবন সম্পর্কে কিছু জানা যায় না; কিছু লেখা হয় না। ওটাকে নিষিদ্ধ জীবনও বলা যায়। এক আশ্চর্য সন্দেহজনক গোপনীয়তায় ঢাকা ওই জীবন, যেনো তার আলোচনা পাপ। এ থেকেই বোঝা যায় তার ওই জীবনটি পঙ্কিল, দূষিত, অপরাধপূর্ণ, অস্বাভাবিক ও সুখশূন্য। বাঙালি যৌন ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী; প্রতিটি পুরুষ একেকটি ক্যাসানোভা, কিন্তু তাদের কামনা সাধারণত অচরিতার্থ থাকে, তাই ভরা থাকে নানা বিকৃতিতে। কিশোরেরা বাঙলায় জড়িত যৌনবিকৃতিতে, যুবকেরা সময় কাটায় যৌনক্ষুধায়, বয়স্ক ও বৃদ্ধরাও তাই। অধিকাংশ বাঙালিই যৌনআলোচনায় সুখ পায়, অন্যের যৌনজীবন নিয়ে কুৎসা রটায়; বড়োদের আলোচনার বড়ো অংশ যৌনতাবিষয়ক। কিন্তু পরিচ্ছন্ন ভণ্ড তারা; তাদের কাছে এ-সম্পর্কিত কিছু জানতে গেলে তারা এমন ভাব করে যে যেনো তারা যৌনতার কথা কখনো শোনে নি; কাম কী তারা জানে না। বাঙালির জীবনের এ-অংশটি বিকৃত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙালিসন্তান এ-বিষয়ে কোনো শিক্ষা পায় না; নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে জানে না; তাদের আচরণ ও ব্যবহার জানে না। পরোক্ষভাবে তারা কতোগুলো সামাজিক ও ধর্মীয় নিষেধের মুখোমুখি হয়। ওই নিষেধগুলো পুরোপুলি অবৈজ্ঞানিক। বাঙালির যৌনজীবনে বিজ্ঞান নেই, কলাও নেই; রয়েছে পাশবিকতা। বাঙালির যৌবন অতিবাহিত হয় অবদমিত যৌন কামনাবাসনায়, যার ফল বিকৃতি। ধর্ষণ বাঙলায় প্রত্যহিক ঘটনা, বাঙালিকে ধর্ষণকারী জাতিও বলা যায়। এর মূলে রয়েছে সুস্থ যৌনজীবনের অভাব। পশ্চিমে যে-বয়সে তরুণতরুণীরা ঘনিষ্ঠ হয়, সুখ আহরণ করে, সে-বয়সটা বাঙালির কাটে প্রচণ্ড যন্ত্রণায়। বাঙালির যৌবনমাত্রই ব্যর্থ, ও যন্ত্রণাপীড়িত। সুস্থ মানুষ ধর্ষণ করে না; অসুস্থরা ধর্ষণ না ক'রে পারে না। বাঙালির বিবাহবহির্ভূত যৌনজীবন ছোটো নয়, তারা খোঁজে থাকে এ-সুযোগের; কিন্তু বিবাহিত যৌনজীবনই তার শারীর কামনা পরিতৃপ্তির প্রধান স্থল। এ-ক্ষেত্রে বাঙালি কি তৃপ্ত? এ-সম্পর্কে কোনো সমীক্ষা পাওয়া যায় না; আলোচনা পাওয়া যায় না কোনো। বাঙালি এ-ক্ষেত্রে পরিতৃপ্ত নয়; শুধু অপরিতৃপ্তই নয়, প্রচণ্ড অসুখী। বাঙালির যৌনক্ষেত্রে পুরুষ সক্রিয় কর্মী; নারী নিষ্ক্রিয় শয্যামাত্র। পুরুষ নিজের সাময়িক সুখ ছাড়া আর কিছু ভাবে না, সঙ্গিনীও যে সুখী হ'তে চায়, তা জানে না; কখনো জানার কথা ভাবে না। বাঙালি নারীপুরুষ পরিতৃপ্তির সাথে পরস্পরকে উপভোগ করে না। উপভোগের ধারণাও তাদের নেই। যে-প্রশান্তি, স্বাস্থ্য ও নিরুদ্বেগ পরিবেশ প্রয়োজন পরিতৃপ্তির জন্যে, তা নেই অধিকাংশ বাঙালির। তাই বাঙালি অনুপ্রাণিত হওয়ার সাথে সাথেই উপসংহারে পৌঁছে; এটা তার জীবনের সংক্ষিপ্ততম কাজ; যদিও এটাই বৃহত্তম কাজ জীবনে। এখানে যে-অপরিতৃপ্তি, তা ঘিরে থাকে বাঙালির সমগ্র জীবন; তাকে রুগ্ন ক'রে রাখে। এ-রুগ্নতার ফল বাঙালির হঠাৎ-জাগা কামনা। বাঙালি নারী দেখলেই তাকে কাম্য বস্তু মনে করে, মনে মনে রমণ করে। এমন যৌনঅসুস্থ জাতি জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে সুস্থ হ'তে পারে না।

একটা রোগ বাঙালির আগে ছিলো না; কিন্তু গত দু-দশকে উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে ওই রোগটির, যার নাম 'স্থানচ্যুতির অস্থিরতা বা বৈকল্য'। ব্রিটিশ পর্বে বাঙালি জানতো সমাজে তার স্থান কোথায়, সে চাষী হবে, না হবে দারোগা, না কেরানি, না মেজিস্ট্রেট? পাকিস্তানপর্বেও জানতো কী হ'তে পারে সে; তার স্বপ্নের একটি নিশ্চিত সীমা ছিলো। দু-দশকে ওই সীমাটি ভেঙে গেছে; বাঙালি এখন যা কিছু হ'তে পারে। যার স্বপ্ন সে দেখে নি, তা সে পেতে পারে; যার যোগ্যতা সে অর্জন করে নি, সে তার প্রভু হ'তে পারে। যার হওয়ার কথা ছিলো, বা যে সুখী বোধ করতো নিম্নপদস্থ হয়ে, সে হঠাৎ একদিন নিজেকে দেখতে পাচ্ছে উচ্চপদে; যে-কেরানিও হ'তে পারতো না, সে মন্ত্রণালয়ের প্রভু হচ্ছে; যার কথা ছিলো অসরকারি মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার, সে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরো অধ্যাপক হচ্ছে। যার বাসে ঝোলার কথা ছিলো, সে হঠাৎ হয়ে উঠছে শীততাপনিয়ন্ত্রিত। ফলে চারদিকে অস্থিরতা দেখা দিচ্ছে। পদ আর ব্যক্তিটির মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি হচ্ছে না, পদটিকে মনে হচ্ছে ব্যক্তিটির ওপরে, বা ব্যক্তিটির মাথার ওপর চেপে আছে পদটি। চারপাশে এখন দেখা যাচ্ছে স্থানচ্যুতি রোগটি। তাই কোথাও কিছু চলছে না ঠিক মতো। চারদিকে বিকলন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরশ্রীকাতরতা, বলা যাক পরোন্নতিকাতরতা– কারণ কারোই শ্রী নেই এখন, বাঙালির একটি স্থায়ী রোগ। পিতামাতার জিনক্রোমোসোমের সাথে, ছেচল্লিশের দ্বিগুণ হয়ে, এটি সংক্রমিত হয় বাঙালির সত্তায়। কারো ভালো দেখতে নেই, এমন একটি জন্মলব্ধ জ্ঞান নিয়ে আসে বাঙালি; আর চারপাশে যা দেখে, তাতে উত্তেজিত থাকে সব সময়। তবে বাঙালি শত্রুর উন্নতিতে যতোটা কাতর হয়, তারচেয়ে বেশি কাতর হয় বন্ধুর উন্নতিতে। উন্নতির ক্ষেত্রে বন্ধুই বাঙালির শত্রু। শত্রুর উন্নতি ঘটলে যে-বিষ ঢোকে বাঙালির শরীরে, তা মধুর করা যায় নিন্দা ক'রে; কিন্তু বন্ধুর উন্নতিতে রক্তনালি দিয়ে ছড়িয়ে পড়া বিষকে কিছুতেই মধুর করা যায় না। একটিই উপায় আছে, সেটি বন্ধুবিচ্ছেদ। উন্নতিকাতরতা রোগটি হয়তো জন্মসূত্রে পাওয়া নয় বাঙালির, পাওয়া আর্থনীতিক ও সামাজিক সূত্রে, যে-সূত্র কোনো নিয়ম মানে না। যোগ্যের উন্নতি হয় না বাঙালি সমাজে, উন্নতি ঘটে অযোগ্যের; অযোগ্যরাই তাদের অসাধারণ যোগ্যতা দিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে যায়, যোগ্যরা নিচে প'ড়ে থাকে। উন্নতির সুযোগ এতো সীমিত যে তাকে ভাগ্য না ব'লে উপায় নেই, কে যে ভাগ্যবান হবে তা আগে থেকে বলা যায় না। কিছুই সুনিশ্চিত নয় বাঙালিসমাজে, সুনিশ্চিত শুধু অসংখ্য বাঙালির উন্নতিকাতরতা রোগে আক্রান্ত হওয়া। উন্নতির একটি উপায় এখানে দাসত্ব বা দালালি। বাঙালিসমাজ প্রধানত দালালসমাজ। পরোন্নতিকাতরতা থেকে মুক্তির একটি উপায়ও বের করেছে বাঙালি, চমৎকার উপায় সেটি; তা হচ্ছে পরনিন্দা। বাঙালি পরনিন্দায় সুস্থবোধ করে। পরনিন্দা শুধু ছিদ্রান্বেষণ নয়, যার যে-ছিদ্র নেই তার সে-ছিদ্র আবিষ্কারই পরনিন্দা। বাঙালি উপকারীর নিন্দার জন্যে খ্যাত। নিন্দিতরাও এর চমৎকার উত্তর বের করেছে, তারা যে-কোনো সমালোচনাকেই নিন্দা ব'লে গণ্য করে। বাঙালির দোষের শেষ নেই; তাই তার আচরণের বস্তুনিষ্ঠ নিরপেক্ষ বর্ণনাকেও নিন্দা ব'লে মনে হয়। বাঙালি সমালোচনা সহ্য করে না, নিজেকে কখনো সংশোধন করে না; নিজের দোষত্রুটি সংশোধন না ক'রে সেগুলোকে বাড়ানোকেই বাঙালি মনে করে সমালোচনার যথাযথ উত্তর। বাঙালি যখন নিজের সম্পর্কে অন্য কারো মত চায়, তখন সে প্রশংসাই আশা করে; আর প্রশংসা না পেলে ক্ষুব্ধ হয়। বাঙালি নিজের সব কিছুকেই মনে করে প্রশংসনীয়; কিন্তু বাঙালি কখনো অন্যের প্রশংসা করে না। বাঙালি শক্তিমানের মিথ্যা প্রশংসা করে, যা স্তাবকমাত্র; কিন্তু প্রকৃতই প্রশংসা যার প্রাপ্য, তার কখনো প্রশংসা করে না। যার প্রশংসা প্রাপ্য, তার প্রশংসা করাকে বাঙালি গণ্য করে নিজের অপূরণীয় ক্ষতি ব'লে।

বাঙালি দায়িত্বহীন, কোনো দায়িত্বই বাঙালি ঠিক মতো পালন করে না। তবে বাঙালি দায়িত্ব পালন সম্পর্কে অন্যকে হিতোপদেশ দিতে ব্যগ্র থাকে। কোনো কাজের সাথে যদি নিজের স্বার্থ জড়িত না থাকে, তাহলে বাঙালি সেটি দিনের পর দিন ফেলে রাখে, এবং চাপ ছাড়া কোনো কাজ করে না। বাঙালির প্রতিটি কর্মস্থল অকর্মস্থল, দায়িত্ব-পালন-না করার কেন্দ্র। বাঙালি কর্মস্থলে ঠিক সময়ে যায় না, গেলেও কোনো কর্ম করে না; যা করে, তার অধিকাংশই অকর্ম। বাঙালির জীবনের অর্ধেকের বেশিই ব্যয় হয় অকর্মে। বাঙালি সততার ভান করে, কিন্তু খুবই অসৎ। প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে অসৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের লীলাভূমি। ঘুষ খাওয় বাঙালির প্রিয়। বাঙালি সব সময়ই সুযোগে থাকে কীভাবে অন্যকে ফেলা যাবে অসুবিধায়, এবং ঘুষ খাওয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে। বাঙালির রাষ্ট্রব্যবস্থাই ঘুষ খাওয়ার যন্ত্র। ঘুষ খাওয়াকে বাঙালি গৌরব মনে করে। বাঙালি নীতির কথা বলে সব সময়, কিন্তু নীতি রক্ষা করে না। বাঙালি মনে করে নীতি রক্ষা করবে অন্যে, তার নিজের কাজ হচ্ছে নীতির কথা বলা। সামান্য অসুবিধার জন্যে বাঙালি প্রতিমার মতো নীতি বিসর্জন দেয়; কোনো অনুতাপ বোধ করে না।

বাঙালি ইন্দ্রিয়পরায়ণ, সব ধরনের নেশার প্রতি আসক্ত; কিন্তু প্রকাশ্যে তা স্বীকার করে না। সুযোগে সব বাঙালিই মদ্যপান করে, কিন্তু স্বীকার করে না। ধুমপান বাঙালির প্রিয় নেশা। অন্যান্য নেশা যেহেতু নিষিদ্ধ বাঙালি সমাজে, তাই ধুমপানকেই তারা নিজেদের সমস্ত উদ্বেগ থেকে মুক্তির উপায়রূপে গণ্য করে। বাঙালির ধারণা মদ্যপান করলেই মাতাল হ'তে হয়, বা মাতাল হয়; তাই বাঙালি সামান্য পানের পরেই মাতলামো করে। বাঙালির জীবনে আনন্দ নেই, আনন্দ পাওয়াকে বাঙালি গর্হিত ব্যাপার মনে করে। আনন্দ পাওয়ার জন্যে দরকার উৎসব; কিন্তু বাঙালির উৎসবগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বাঙালি সেগুলোতে অংশ নেয় না, থাকে দর্শকরূপে। আনন্দ পাওয়ার জন্যে নিজেকে ভুলে যাওয়াও দরকার, কিন্তু বাঙালি ভোলে না সে কে। বড়োই আত্মসচেতন বাঙালি। বাঙালি আত্মসচেতন, অর্থাৎ শ্রেণীসচেতন, পদসচেতন, অর্থসচেতন। বাঙালি সব সময় নিজের সঙ্গে অপরের তুলনামূলক মূল্যায়নে ব্যস্ত থাকে, নিজেকে ওপরে দেখে, এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। বিচ্ছিন্নতা আনন্দ বা সুখের বিরোধী। প্রতিটি বাঙালি কোনো ব্যক্তি নয়, সে একটি শ্রেণী, বা পদ বা টাকার বাক্স। বাঙালি বাহ্যিকভাবে চালাকচতুর, অনেক কিছু বোঝেও তাড়াতাড়ি, কিন্তু বেশি কিছু বোঝে না। একজন জাপানি বা চীনার পাশে বাঙালিকে মনে হবে অনেক বেশি চৌকশ, চীনা-জাপানিকে মনে হবে বোকা; তবে ঈশপের খরগোশের মতো বাঙালি মাঝপথে ঘুমিয়ে পড়বে; অন্যরা এগিয়ে যাবে কিংবদন্তির কাছিমের মতো। বাঙালি 'মোটামুটি'তেই সন্তুষ্ট, তারা কখনো চরম উৎকর্ষের অভিলাষী নয়।

বাঙালি না ভেবে লাফ দেয়, এবং লাফ দেয়ার পর বার বার ভাবে, অর্থাৎ অনুশোচনা করে। প্রতিটি বাঙালির জীবন অসংখ্য অনুশোচনার ভাণ্ডার। বাঙালি যা হ'তে চায়, সাধারণত তা হয় না; এবং যা হয়, তা সাধারণত হ'তে চায় নি। তাই জীবন কাটে অনুশোচনায় : ধারাবাহিক অনুশোচনার শ্লথ স্রোত বাঙালির জীবন। বাঙালি নিজেদের মনে করে অন্য জাতিদের থেকে উৎকৃষ্ট;— অন্য সমস্ত জাতিকেই দেখে পরিহাসের চোখে, এবং নিজেদের সব কিছুকে মনে করে অন্যদের সব কিছুর চেয়ে ভালো। তাই বাঙালি জাতিগর্বী। তার চোখে চীনাজাপানি হাস্যকর, পাঠানপাঞ্জাবি উপহাস্যকর; পশ্চিমের মানুষেরা প্রায় অমানুষ। তবে এদের মুখোমুখি বাঙালি অসহায় বোধ করে, ভোগে হীনমন্যতায়। বাঙালি ভিক্ষা করতে লজ্জা বোধ করে না। দরিদ্রদেরই শুধু নয়, বাঙালি ধনীদের স্বভাবের মধ্যেও রয়েছে ভিখিরির স্বাভাব। বাঙালির স্বভাবের কোনো দৃঢ়তা নেই; তাই বাঙালির পতনও ট্র্যাজিক মহিমামণ্ডিত হয় না, পরিণত হয় প্রহসনে। বাঙালি ভাঙে না, লতিয়ে পড়ে। বাঙালির প্রিয় দর্শন হচ্ছে বেশি বড়ো হোয়ো না ঝড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেঙে পড়বে, বেশি ছোটো হোয়ো না ছাগলে খেয়ে ফেলবে;– তাই বাঙালি হ'তে চায় ছাগলের সীমার থেকে একটু উচ্চ,– নিম্নমাঝারি। বাঙালির এ-প্রবচনটিতে তার জীবনদর্শন বিশুদ্ধরূপে ধরে পড়ে। এতে নিষেধ করা হয়েছে অতি-বড়ো হওয়াকে, কেননা তাতে ঝড়ে ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা; আর নিষেধ করা হয়েছে খুব ছোটো হওয়াকে, কেননা তাহলে সহজেই বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা। তাই মাঝারি হ'তে চায় বাঙালি; বাঙালি মাঝারি হওয়ার সাধক। মাঝারি হ'তে চাইলে হওয়া সম্ভব নিম্নমাঝারি; এবং বাঙালির সব কিছুতেই পরিচয় পাওয়া যায় নিম্নমাঝারিত্বের।

বাঙালি উদ্ভাবক নয়, তাত্ত্বিকও নয়। সম্ভবত কোনো কিছুই উদভাবন করে নি বাঙালি, এবং বিশ্বের আধুনিক উদ্ভাবনগুলোতে বাঙালির কোনো ভূমিকা নেই। কোনো তত্ত্ব ও চিন্তার জনক নয় বাঙালি; বাঙালির সমস্ত তত্ত্বই ঋণ করা। আধুনিক বাঙালির জীবনে যে-সমস্ত তত্ত্ব কাজ করে, তার একশোভাগই ঋণ করা। বাঙালি সাধারণ সূত্র রচনা করতে পারে না, আন্তর শৃঙ্খলা উদঘাটন করতে পারে না; পারে শুধু বর্ণনা করতে। বাঙালি সংঘ গ'ড়ে তুলতে পারে না, তবে ভাঙতে পারে; এক সংঘকে অল্প সময়ের মধ্যে বহু সংঘে বিশ্লিষ্ট করার প্রতিভা রয়েছে বাঙালির। বাঙালি একদিন যা গ'ড়ে তোলে কিছু দিন পর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে তাতেই। বাঙালি যে-সংঘের প্রধান হ'তে পারে না, সে-সংঘ তার নিজের গড়া হ'লেও তাকে সে আর প্রয়োজনীয় মনে করে না। বাঙালি আমরণপ্রাধান্যে বিশ্বাস করে। তাই বাঙালি গণতান্ত্রিক নয়, যদিও গণতন্ত্রের জন্যে প্রাণ দেয়। বাঙালি সুবিধাবাদী; সুবিধার জন্যে সব করতে পারে। বাঙালি পুজো করতে পছন্দ করে; প্রতিমা বা লাশ পুজোতেই বাঙালির সুখ। বাঙালি লাশের গলায় মালা দেয়, তবে জীবিতকে লাশে পরিণত করে। বাঙালি মূল্যায়ন করতে পারে না; কারো বা কোন বস্তুর আন্তর মূল্য কতোটা, তা স্থির করতে পারে না বাঙালি; একবার কারো বা কিছুর ভুল মূল্য স্থির হয়ে গেলে, তার পুনর্মূল্যায়নে বাঙালি রাজি হয় না।

এমন একটি জনগোষ্ঠিকে কি রুগ্ন ব'লে শনাক্ত করা ছাড়া আর কোনো পথ আছে? এ-রুগ্নতা সাময়িক নয়, কয়েক দশকের নয়, বহু শতকের; সম্ভবত শুরু থেকেই বাঙালি ভুগছে এ-সমস্ত রোগে; এবং দশকে দশকে দেখা দিচ্ছে নানা অভিনব ব্যাধি। তার শরীর রুগ্ন, রুগ্ন তার মন; তার আচরণ রুগ্ন, রুগ্ন তার স্বপ্ন। তার সমাজ রুগ্ন, সামাজিক রীতি রুগ্ন; তার রাজনীতি রুগ্ন, রুগ্ন তার রাষ্ট্র। কোথাও তার স্বাস্থ্য নেই, সুস্থতা নেই। এতো রোগের সমষ্টি যে-জনগোষ্ঠি, তার বর্তমান অবশ্যই শুয়ে আছে রোগশয্যায়; তার ভবিষ্যত শুধু শ্মশান বা কবরস্থান। বাঙালি ভবিষ্যতে টিকে থাকবে কিনা, সন্দেহ করা চলে। মালার্মে অনেক আগেই মুমূর্ষু বা অবলুপ্তির কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া একটি পাখির সাথে তুলনা করেছিলেন বাঙালিকে; ফরাশি প্রতীকী কবির ওই তুলনাটি যদি সত্যে পরিণত হয়, তাহলেও বিস্ময়ের কিছু থাকবে না। বাঙালি চিকিৎসায় বিশ্বাসী নয়। কোনো দিকেই বাঙালির রোগের চিকিৎসা চলছে না। জাতির চিকিৎসার দায়িত্ব রাষ্ট্রের, কিন্তু রাষ্ট্র চিকিৎসার বদলে রোগ বাড়াতেই বেশি আগ্রহী। রাষ্ট্র এখন রুগ্ন ক'রে চলছে বাঙালির শরীর ও মন, তার কাঠামো ও মনোজগত; রুগ্ন ক'রে চলছে তার সমাজ, রাজনীতি, রাষ্ট্র। রুগ্ন রাজনীতি বিনাশ ঘটায় সব কিছুর; এখন বিনাশ ঘটছে বাঙালির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব কিছু। বাঙালি হয়ে উঠেছে আরো প্রতারক, ভণ্ড; হয়ে উঠেছে আরো অসৎ, নীতিশূন্য, আদর্শহীন; বাঙালি হয়ে উঠেছে আরো খল, সুবিধাবাদী, সুযোগসন্ধানী। নিয়ন্ত্রণের ফলে বিকৃত হচ্ছে বাঙালির শরীর, ও কামনাবাসনা। যতোই ধর্মের কথা বলা হচ্ছে অজস্র মাইক্রোফোনে, ততোই বাড়ছে অনৈতিকতা; যতোই শোনানো হচ্ছে সংযমের কথা, ততোই বাড়ছে অসংযম ও বিকৃত কাম; পান যতোই নিষিদ্ধ করা হচ্ছে, শক্তিমান মাতালের সংখ্যা ততোই বাড়ছে। বাঙালি হয়ে উঠছে একটি বিকৃত জনগোষ্ঠি। মনোবিজ্ঞানীর চোখ দেয়া দরকার এদিকে, যেমন চোখ দেয়া দরকার সমাজবিজ্ঞানীর। বাঙালির রুগ্নতা আর লুকিয়ে রাখা চলে না, ক্ষতস্থলকে ময়লা কাপড়ে মুড়ে রাখলে ক্ষত শুকোয় না, তাতে পচন ধরে। পচন ধরেছে এর মাঝেই। বাঙালির চিকিৎসার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না;– একটি জনগোষ্ঠি কি রুগ্ন থেকে রুগ্নতর হ'তে হ'তে লুপ্ত হয়ে যাবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাইকেল মধুসূদন : প্রথম বিশ্বভিখারি ও ত্রাতা

বিশ্বের সেই আদিম উর্বরতা আজ আর নেই। এখন সারা ব্রহ্মাণ্ড খুঁজে বীজ সংগ্রহ না করলে, কাব্যের কল্পতরু জন্মায় না। : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

তিনজন কবির মহিমা পরিণত হয়েছে বাঙলা সাহিত্যের প্রিয় কিংবদন্তি ও সংস্কারে;– তাঁদের প্রথমজন মাইকেল মধুসূদন। জনশ্রুতি, অনেক সময়, নিজের চেয়ে বড়ো ক'রে তোলে কবিদের, যাচাই করতে গিয়ে দেখি সত্যের মাত্রা কম, অনেক বেশি লোকবিশ্বাস ও দশকপরম্পরার রটনা। ভারতীয় অঞ্চলে সংস্কার ও কিংবদন্তি পরিগ্রহ করতে পারে সাংঘাতিক রূপ; বিচারবিবেচনা বাদ দিয়ে একই শ্লোক পুনরাবৃত্তি ক'রে যেতে পারি আমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী, এবং হয়ে উঠতে পারি অন্ধ পৌত্তলিক। তবে মধুসূদনের মহিমা শুধু জনশ্রুতিনির্ভর নয়, তা দাঁড়িয়ে আছে অটল ভিত্তির ওপর। ঠাণ্ডা, ঢেউশূন্য, অন্ধকার, ও আঞ্চলিক বাঙলা ভাষায় তিনি সঞ্চার ক'রে দিয়েছিলেন অভাবিত তাপ, তরঙ্গ, আলো ও আন্তর্জাতিকতা, যা প্রায় তুলনাহীন। বাঙলা ভাষার প্রথাগতভাবে বিনয়ী ভক্ত কবিদের মধ্যে প্রথম অবিনয়ী, দ্রোহী ও সংস্কারহীন তিনি; এবং একই সঙ্গে তিনি এক দুঃখী বিশ্বভিখারি, যিনি আপন ভাণ্ডার ভরার জন্যে ভিক্ষা ক'রে ফিরেছেন দেশে দেশে, ও রত্নে ভরেছেন বাঙলা ভাষার শূন্য ভাঁড়ার। মধুসূদন আমাদের প্রথম আধুনিক, যেহেতু তিনি বাঙলা ভাষার প্রথম বিশ্বভিখারি কবি। তিনি বুঝেছিলেন, বিশশতকি আধুনিকতা উন্মেষের অনেক আগেই, যে মরুভূমির মতো আধুনিক কালে দেশদেশান্তর থেকে কবিতার বীজ সংগ্রহ না করলে কবিতার কল্পতরু জন্মানো অসম্ভব।

এক বিস্ময়কর শতাব্দী উনিশশতক; তা বিস্ময়কর একটি সাহিত্যিক কারণেও। বাঙলা সাহিত্যের আত্মা-অস্থি-মজ্জা কবিতায় গঠিত; কবিতাই বাঙলা সাহিত্যের মাতৃভাষা। হাজার বছর আগে যখন উন্মেষ ঘটেছিলো বাঙলা সাহিত্যের, তখন তা প্রথম কথা ব'লে উঠেছিল কবিতায়– পদ্যে। সে-ভাষা সে ভোলে নি কয়েক শো বছর; যখনি কথা বলতে চেয়েছে, তখনি তার কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয়েছে নানা সুরস্বরের ছন্দমিলবিন্যস্ত স্তবক। পদ্য ছাড়া আর কোন ভাষা সে শেখে নি অনেক শতাব্দী। উনিশশতকে বাঙলা সাহিত্য আয়ত্ত করে এক নতুন ভাষা, যার নাম গদ্য। গদ্য নতুন, তা বিস্ময় ছড়িয়ে দেয় দিকে দিকে; আর এ-বিস্ময় টিকে রয় আধশতাব্দী ভ'রে। তাই উনিশশতকের প্রথমার্ধ ভ'রে বাঙলা সাহিত্যের কণ্ঠ থেকে গদ্য ছাড়া উচ্চারিত হয় নি আর কোন ভাষা। গদ্য– গদ্য– গদ্য : এই হচ্ছে উনিশশতকের প্রথমার্ধ। যে-দিকে তাকাই দেখি দশদিগন্ত ছেয়ে লাফিয়ে উঠেছে গদ্যের ঢেউ, যে-দিকে কান পাতি শোনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায় কলহ, বিতর্ক, বিচার, অর্থাৎ গদ্যস্বর। দারুণ কর্মময় ও কর্মী এ-সময়টি; বাঙলা তার সারা ইতিহাসে এতো কাজে আগে আর হাত দেয় নি। কাজের জন্যে দরকার গদ্য, স্বপ্নের জন্যে কবিতা। উনিশশতকের প্রথম পাঁচ দশকের দু-হাত ভ'রে ছিলো কাজ, তাই তার দরকার পড়েছিলো গদ্যের, তা যতোই খিন্ন-কৃশ-রুগ্ন হোক-না-কেনো। বাঙলার স্বাপ্নিকেরা তখন ম'রে গেছে, বা প্রতীক্ষা করছে জন্মের, বা প্রস্তুতি নিচ্ছে আত্মপ্রকাশের, ওই বাস্তব সময়ে চারদিক কলরোলিত ক'রে রেখেছিলেন কর্মীপুরুষেরা। প্রচণ্ড কর্ম ও ভয়াবহ স্বপ্নহীনতার সময় উনিশশতকের প্রথম ভাগ; তাই এ-সময় কোনো কবি নেই বাঙলা ভাষায়। এমনি অন্ধকারাচ্ছন্ন অসময় তখন বাঙলার। সব বাঙালি লিপ্ত তখন গদ্যে ও কর্মে।

এ-সময়ে ছিলেন একজন পদ্যরচয়িতা, যাঁর কোনো পংক্তিই কবিতা হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখে নি। কোনো স্বপ্নই ছিলো না ঈশ্বর গুপ্তের, তাঁর পেশাও ছিলো স্বপ্নহীনতার সাথে খাপ-খাওয়া সাংবাদিকতা। তাঁর সমস্ত পদ্য হয়ে ওঠে পদ্যসাংবাদিকতা, আর তিনি হয়ে ওঠেন ওই কর্মী সময়ের পদ্যসাংবাদিক। প্রতি যুগের কমপক্ষে একজন সভাকবি চাই, সভাকবি দরকার ছিলো ওই গদ্য-সময়েরও। উনিশশতকের কর্মময় স্বপ্নহীন প্রথমাংশ একজন সভাকবি জন্ম দিতে গিয়ে জন্ম দিয়েছিলো একজন পদ্যসাংবাদিক, যাঁর নাম ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। চারপাশের ব্যাপক কবিতাহীনতার মধ্যে কবিতা সৃষ্টির শক্তি ছিলো না তাঁর। কথাটি অন্যভাবে, ও সরলরূপে, বলতে হয় যে সৃষ্টিশীলতাহীন উনিশশতকের প্রথম ভাগকে সৃষ্টিশীল করার শক্তি ছিলো না ঈশ্বর গুপ্তের। সাহিত্যের বন্ধ্যাত্ব মোচনের জন্যে দরকার হয় কোনো কবি বা কবিগোত্রের, একমাত্র কবিরাই এগিয়ে থাকেন তাঁদের সময়ের থেকে। উনিশশতকে মধুসূদন দেখা দিয়েছিলেন সে-কবিরূপে, যিনি বাঙালির সৃষ্টিশীলতার রুদ্ধ ধারাটি মুক্ত করার প্রতিভা বহন করতেন রক্তমাংসস্বপ্নে। মধুসূদন আধুনিক বাঙলা কবিতা বা সাহিত্যের প্রথম মুক্তিদাতা, ও প্রথম দ্রোহী। তাঁর দ্রোহ ছাড়া উনিশশতকের প্রথম ভাগের আটকেপড়া কবিতাকে বিশাল ব্যাপক তীব্র স্রোতে বইয়ে দেয়া ছিলো অসম্ভব।

উনিশশতকে একটি আধুনিক সংকট দেখা দেয়া বাঙলা সাহিত্যে। মধুসূদনপূর্ব বাঙলা কবিতা ছিলো কবির বুক থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে উৎসারিত স্তবকগুচ্ছ। স্বভাবকবিদের এক বড়ো লীলাক্ষেত্রের নাম বাঙলা সাহিত্য। শুরু থেকে উনিশশতক পর্যন্ত স্বতস্ফূর্ততা ও স্বভাবকবিত্বের নানা বাঁকে ঘুরে ঘুরে বাঙলা কবিতার ধারাটি শুকিয়ে পড়ে, তাকে স্রোতগ করার জন্যে স্বভাবকবিত্ব, স্বতস্ফূর্তি, স্বদেশনিষ্ঠা, বা শেকড়সন্ধান যথেষ্ট ছিলো না। দরকার ছিলো এমন কিছু, যা আগে বাঙলা কবিতায় দেখা যায় নি। কেবল স্বদেশী সম্পদে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার দিন কেটে গেছে তখন, সময় এসে গেছে বিদেশি ঋণের। তখন তাঁর পক্ষেই কবিতাকে মুক্তি দেয়া, নতুন খাতে বইয়ে দেয়া, সম্ভব ছিলো, যাঁর শক্তি ও প্রতিভা ছিলো বিদেশি ঋণের। এ-প্রতিভা ঈশ্বর গুপ্ত বা রঙ্গলাল বা ওই সময়ের আর কারো ছিলো না, ছিলো শুধু মধুসূদনের। মধুসূদন আমাদের প্রথম মহান অধমর্ণ, যিনি নির্বিচারে বা বিশেষভাবে বিচার ক'রে ঋণ করেছেন পশ্চিমের কাছে : কখনো ছুটে গেছেন গ্রিক কবির মন্দিরে, কখনো হাত পেতেছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাতিন কবির দরোজায়, কখনো উপস্থিত হয়েছেন ইংরেজ কবির আঙিনায়। পশ্চিমের কবিতালোকের দরোজায় দরোজায় ফিরেছেন এ-মহাভিখারি– মহাঋণী– আর সে-ঋণে গ'ড়ে তুলেছেন নিজের পুঁজি। পুঁজির অপব্যবহার হয় অনেকের হাতে, কিন্তু সৌভাগ্য আমাদের ঋণের অপব্যবহার করেন নি মধুসূদন, বরং গ'ড়ে তুলেছেন নতুন কালের নতুন সাহিত্য, যার দিকে তাকিয়ে বিস্ময়বোধ না করলে বুঝতে হবে যে অন্তরের কোথাও পঙ্গু হয়ে পড়েছি।

কোনো স্বাদেশিক, বাঙলার কাদামাটির গন্ধমাখা, কবির পক্ষে রচনা করা সম্ভব ছিলো না *মেঘনাদবধকাব্য;* পশ্চিমের সাথে যাঁর আন্তর ঘনিষ্ঠতা গ'ড়ে ওঠে নি, তাঁর পক্ষে *কৃষ্ণকুমারীনাটক* বা চতুর্দশপদী কবিতাগুচ্ছ রচনা চরম দুঃস্বপ্ন। ঋণ ক'রে মধুসূদন নিত্য অভিনব সামগ্রী সৃষ্টি করেন। বাঙলা ভাষার আকাশেবাতাসে যা কোনোদিন কল্পিত হয় নি, তা একদিন বাস্তব রূপ নেয় বাঙলা ভাষায়, মধুসূদনের আঙুলে। বিরামহীন অভিনবত্বের নামই মাইকেল মধুসূদন। যা ছিলো না, তিনি স্রষ্টা তার; শুধু স্রষ্টা নন, তিনিই শ্রেষ্ঠ অনেক ক্ষেত্রে। বাঙলা ভাষায় তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, যদিও অনুকারী রয়েছেন অনেক। এমনকি বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের চেয়েও তিনি বলিষ্ঠ প্রতিভা। তিনি পশ্চিম থেকে ঋণের যে-রাস্তা খুলে দেন, সে-পথেই চলেছেন বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু তাঁরা কেউ মধুসূদনের মতো তীব্র বিশালত্বমুখি ছিলেন না। বাঙলা ভাষার শ্রেষ্ঠ ও মহত্তম কল্পনা ও পরিকল্পনা *মেঘনাদবধকাব্য;* একশতাব্দী পরেও বিস্ময়বোধ করতে হয় একথা ভেবে যে মধুসূদন ওই মহৎ কল্পনাকে কাব্যবাস্তবে পরিণত করার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন এমন এক সময়ে যখন বাঙলা ভাষা ছিলো একটি আঞ্চলিক, ক্ষুদ্র, গোত্রের, অনেকটা কবিসম্প্রদায়ের ভাষা, যার মানরূপ তখনো অনির্ধারিত। আমাদের সাহিত্যদ্রোহীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তিনি; মধ্যযুগ থেকে তিনি কয়েক বছরে বাঙলা সাহিত্যকে নিয়ে আসেন আধুনিক কালে। এমন এক সময়ে তিনি জন্ম নিয়েছিলেন, এবং জন্ম দিচ্ছিলেন তাঁর স্পর্ধিত রচনাবলি, যখন বিনয়-বিকাশ-ক্রমমুক্তি কাজে আসতো না কোনো। তাঁর পক্ষে রবীন্দ্রনাথের মতো ক্রমবিকশিত হওয়ার সাধনার অর্থ ছিলো ব্যর্থতা। তাঁর সার্থকতা আকস্মিক বিস্ফোরণে, চারপাশ হঠাৎ তীব্র আলোকে ভ'রে দেয়ায়। তাঁর সংস্কারমুক্তি, বিশ্বপরিব্রাজকতা, অতৃপ্তি তাঁকে ঠেলে দিয়েছিলো হঠাৎ সফল হয়ে বিনাশের অভিমুখে ধাবিত হওয়ার দিকে। এদিকে তিনি আমাদের অতি কাছাকাছি, রবীন্দ্রনাথের চেয়েও; মধুসূদনের মধ্যে যে-বিক্ষোভ, বিনাশ ও মহান অশুভকে পাই, তা বর্তমান সময়ের বান্ধব। তাঁর সংস্কারমুক্তি ঈর্ষা জাগায় আমাদের; এখন আমরা প্রতিদিন বাঁধা পড়ছি এক একটি সংস্কারের শেকলে, খুলে বেরোতে-না-বেরোতেই নতুন কোনো শেকলে জড়িয়ে পড়ে আমাদের শিল্প ও জীবনভাবনা। কিন্তু মধুসূদন সমস্ত সংস্কার পরিহার করতে পেরেছিলেন ব'লে তিনি যেমন প্রথাগত বিশ্বাসের বিরোধী কল্পনাকে মূল্যবান ক'রে তুলতে পেরেছিলেন, তেমনি পেরেছিলেন একের পর এক নতুন সাহিত্য-আঙ্গিক সৃষ্টি করতে। তাঁর রাম-রাবণ পরিকল্পনা মহত্তম দুঃসাহসের উদাহরণ, এমন সংস্কারমুক্তির পরিচয় বাঙলা ভাষায় আর পাওয়া যায় না। মধুসূদন এমন কাজ ক'রে গেছেন *মেঘনাদবধকাব্য*-এ, যা সাম্প্রতিক হিন্দু মৌলবাদীদের আক্রমণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হ'তে পারে। তিনি যখন একের পর এক নতুন সাহিত্য-আঙ্গিক সৃষ্টি করছিলেন, পয়ার ভেঙে ফেলে বইয়ে দিচ্ছিলেন প্রবহমাণ অক্ষরবৃত্ত, রচনা করছিলেন নিষিদ্ধ ট্র্যাজেডি, বা সৃষ্টি করছিলেন অভিনব চতুর্দশপদী, তখন সংস্কারমুক্তির কাজ করেছে প্রধান প্রেরণারূপে।

আধুনিক চৈতন্যের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যই বিশ্বজনীন, দেশ ও ভাষা নিরপেক্ষ; কিন্তু ওই চৈতন্যের কিছু অংশ অবশ্যই বিশেষ দেশ ও ভাষা-অপেক্ষী। মধুসূদনের মধ্যে এমন অনেক বৈশিষ্ট্য খচিত হয়ে আছে, যা হয়তো আধুনিক ব'লে গৃহীত হবে না ইংরেজি, ফরাশি, বা জর্মন সাহিত্যে, কিন্তু বাঙলাদেশ ও ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে ওই বৈশিষ্ট্যরাশি অবশ্যই আধুনিক। মধুসূদনের ধ্রুপদী কাব্য, বহির্জীবনের প্রাধান্য, সংস্কারমুক্তি প্রভৃতি আধুনিক মানদণ্ডে সর্বাংশে আধুনিক নয়, কিন্তু বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের যে-অবস্থায় তিনি ওই প্রবণতাসমূহের বিকাশ ঘটিয়েছেন, তাতে তাঁকে আধুনিক ব'লে অস্বীকারের উপায় নেই। যে-আধুনিক চৈতন্যের উন্মেষবিকাশ লক্ষ্য করি রোম্যান্টিসিজমের মধ্যে, যা ইউরোপের প্রথাগত চিন্তাভাবনার মেরুদণ্ডে ফাটল ধরিয়ে দেয় চিরকালের জন্যে, এবং যা বিলম্বে হ'লেও সংক্রামিত হয় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে, যা ব্যক্তিকেই ক'রে তোলে সব কিছুর মানদণ্ড, তা পাই না মধুসূদনে। তাঁর মধ্যে যা পাই, তাকে বলতে পারি ধ্রুপদী আধুনিকত্ব। ধ্রুপদী আধুনিকত্বের প্রথম ও শেষ পুরুষ তিনি বাঙলা ভাষায়। তিনি বাঙলা সাহিত্যকে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে নিয়ে আসেন, দেন তাকে সুস্বাস্থ্য, শুধু আধুনিক চৈতন্যের বিস্ময়কর ব্যাধিটুকু সংক্রামিত করার দায়িত্ব রেখে যান অন্যের জন্যে, যা চমৎকারভাবেই পালন করেন বিহারীলাল চক্রবর্তী। মধুসূদন পরিহার করেছিলেন তথাকথিত 'খাঁটি বাঙালীত্ব', যা আদিমতা, অমার্জিত রুচি, ও আঞ্চলিকতার মিশ্রণ। তার বিকল্পে তিনি বরণ করেছিলেন আন্তর্জাতিকতা। তাই বঙ্কিম, উনিশশতকের নবম দশকে, সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পেরেছিলেন যে 'এখন আর খাঁটি বাঙ্গালী কবি জন্মে না– জন্মিবার যো নাই– জন্মিয়া কাজ নাই। বাঙ্গলার অবস্থা আবার ফিরিয়া অবনতির পথে না গেলে খাঁটি বাঙালী কবি আর জন্মিতে পারে না।' মধুসূদন বাঙলা কাব্যে নিয়ে এসেছিলেন আরো একটি আধুনিক প্রবণতা : কবিতার জন্য কবিতা বা শিল্পের জন্যে শিল্প চর্চার সূত্রপাত, বাঙলা ভাষায়, করেছিলেন মধুসূদন। তাঁর আগের ও সমকালের, এমনকি অব্যবহিত পরের পদ্য, ও গদ্য, লেখকেরা পংক্তি বিন্যস্ত করতেন কোনো-না-কোনো অশৈল্পিক উদ্দেশ্যে, শিল্প পেতো গৌণ মূল্য তাঁদের কাছে। কিন্তু মধুসূদনই প্রথম সহিত্যের জন্যে সাহিত্য সৃষ্টির বীজ বুনে যান বাঙলা ভাষায়, যা বিশশতকি আধুনিক কবিতায় ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়।

প্রত্যেক ভাষার প্রধান কবিরা তাঁদের গোত্রের ভাষাকে পরিস্রুত করেন, এবং বিশেষ বিশেষ সন্ধিক্ষণের কবিরা এ-পরিস্রুতির কাজটি করেন দক্ষভাবে। মধুসূদন যখন কবিতা লিখছিলেন, তখন বাঙলা নামক ভাষাটির নামই স্থির হয় নি ভালোভাবে– সে-ভাষা ছিলো অপরিস্রুত আঞ্চলিক, যাতে *মেঘনাদবধ*-এর মতো মহাকল্পনাকে বাস্তবায়িত করা ছিলো অসম্ভব। তাই মধুসূদনকে রচনা বা সৃষ্টি করতে হয়েছিলো নিজস্ব ভাষা ও ছন্দ; আধার-আধেয়ের পরম মিলনের এক অনন্য নিদর্শন *মেঘনাদবধকাব্য*। *মেঘনাদবধ*-এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্পর্ধিত কল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে হ'লে দরকার যে-ভাষা, তাই চারদিকের প্রাকৃত কোলাহলের ভেতর থেকে ছেঁকে তুলেছিলেন মধুসূদন। *মেঘনাদবধ*-এর দুরূহ শব্দাবলি, গ্রিকধরনে রচিত অভিধা, প্রয়োজনীয় শব্দ তৈরির জন্যে নবশব্দরূপতত্ত্ব, উক্তির ধ্রুপদী ঢং, উপমাউৎপ্রেক্ষার অভিনবত্ব, চলতি ও সংস্কৃতের মিশেল, নানা রকম ক্রিয়ারূপ বাঙলা ভাষার মান স্থিররূপ নির্দেশে সাহায্য করেছে অনেকখানি। মধুসূদনের দুরূহ শব্দের বিরুদ্ধে ক্ষোভ আছে বহুর; অনেকের কাছে তিনি মৃত শব্দের অধীশ্বর। কিন্তু এটা প্রশংসার বিষয় এ-জন্যে যে মধুসূদন দেখিয়ে গেছেন শব্দ কখনো সম্পূর্ণরূপে লোকান্তরিত হয় না, যদিও তা শতাব্দীর পর শতাব্দী নিঃশব্দে থাকতে পারে অভিধানের গহ্বরে। দীর্ঘ অব্যবহারে তার গায়ে জড়ো হয় উজ্জ্বলতা, এবং একদিন কোনো প্রতিভা এসে ওই শব্দরাশিতে সংক্রামিত ক'রে দেন জীবনস্পর্শ। মধুসূদন করেছেন, না করলে চলতো না তাঁর। উনিশশতকের বাঙালির মুখে যে-বাঙলা প্রত্যহ ব্যবহৃত হতো, তাতে *মেঘনাদবধ* সম্ভব ছিলো না। মধুসূদনের বাঙলা পরিস্রুত বাঙলা। এ-ভাষা শুধু তাঁর কবিতাকে মহত্ত্ব দেয় নি, আধুনিক মান বাঙলা ভাষা সৃষ্টিতেও সাহায্য করেছে প্রভূত।

আধুনিক কালের সাথে মধুসূদনের ঘনিষ্ঠতার অনেকগুলো গ্রন্থি রয়েছে : তাঁর মতো আমরাও পশ্চিমমুখি, কোনো পরম শুভ নেই আমাদের সামনে, বিনাশ আমাদের ঘিরে থাকতে চায় সারাক্ষণ। ধ্রুপদী ও রোম্যান্টিকের মিশ্রণ এখন স্বাভাবিক ঘটনা, দুরূহ শব্দকে এখন আর আমরা তিরস্কার ক'রে হটাতে রাজি নই; এবং এসে গেছি মধুসূদনের অব্যবহিতপূর্ব সময়ের মতো অন্ধকারে : চার দিকে অভাব সৃষ্টিশীলতার, কবিতা আটকে গেছে শুকনো চরায়, কিন্তু মুক্তি নেই আমাদের। উনিশশতকের মধ্যভাগে তিনি বেরিয়ে পড়েছিলেন বিশ্বভিক্ষায়, তাঁর পর আরো একজন বেরিয়েছিলেন, এবং বিশশতকের তৃতীয় দশকে গোত্রবদ্ধ আধুনিকেরা বেরিয়েছিলেন একই উদ্দেশ্যে। সুফল ফলেছিলো তিনবারই। এখন কি এসে গেছে চতুর্থ বিশ্বভিক্ষায় বেরোনোর সময়? আমরা কি ধরবো মধুসূদনের আধুনিক পথ, দূরযাত্রী হবো, নাকি 'খাঁটি বাঙলা' কবিতায়, স্বভাবকবিত্বে, অশিল্পে, অমার্জিত রুচিতে, ও সংখ্যাহীন শহুরে পল্লীকবিতে ভ'রে তুলবো অবনতির পথে দ্রুত ধাবিত দরিদ্র বাঙলার পথঘাট?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একুশের চেতনা, ও তিন দশকের উপন্যাস

মধ্যবিত্ত বাঙালির রাজনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্মৃতি স্বপ্ন বাস্তব, তিনটি উথালপাথাল দশক ধ'রে, জড়ো হচ্ছে একটি দিনকে ঘিরে; এবং রচিত হয়েছে বাঙালির জীবনের মহত্তম কিংবদন্তি : একুশে ফেব্রুয়ারি। যে-চেতনারাশির নাম একুশ, তা বহু রঙে রাঙা আর বহুমুখি; শুধু একটি ও একরঙা চেতনা দিয়ে বায়ান্নোর ফাল্গুন–ফেব্রুয়ারিকে নির্দেশ করা অসম্ভব। একুশে, কারো কাছে, বাঙলা ভাষার উত্থানদিবস; কারো কাছে আধুনিক বাঙালি জাতির উদ্ভবের দিন; কারো কাছে অঘোষিত অস্বীকৃত স্বাধীনতা দিবস। একুশের অর্থ তারুণ্য, প্রতিরোধ বিদ্রোহ প্রগতিশীলতা, সামাজিক ন্যায়বিচার, অধিকারহীন মানুষের মনে বিদ্রোহের আগুন জ্বেলে রাখা। বায়ান্নোর ফাল্গুনে পাখিডাকা ছায়াঢাকা গ্রামেরই সহোদর ঢাকা শহর রূপান্তরিত হয়েছিলো অগ্নিগিরিতে, যার বিচ্ছুরিত শিখা ছড়িয়ে পড়েছিলো বাঙলার শহরে গ্রামে। তার পরের প্রতিটি বছর আগুন সংগ্রহ করেছে বায়ান্নোর অগ্নি থেকে। এমন নয় যে বায়ান্নোর বিদ্রোহীরা বিপ্লবের ছক তৈরি ক'রে নিয়েছিলেন নিপুণভাবে, সুচারুরূপে স্থির ক'রে নিয়েছিলেন ভবিষ্যৎ বছরগুলোর লক্ষ্য ও বিদ্রোহকৌশল। তাঁদের লক্ষ্য ছিলো পাকিস্তানি ঘাতকদের দ্বারা আক্রান্ত বাঙলা ভাষাকে রক্ষা করা। তাঁদের কাছে বাঙলা ভাষা শুধু ব্যাকরণিক অর্থে ভাষা ছিলো না; বাঙলা ভাষা ছিলো বাঙালির অস্তিত্ব অধিকার স্বাধীনতার অন্য নাম। তাই বাঙালিবিরোধী পাকিস্তানে বিপ্লবের প্রথম রক্ত বেরিয়েছিলো বাঙলা ভাষার শরীর থেকে।

যে-চেতনা বায়ান্নোর বিদ্রোহীদের ঠেলে দিয়েছিলো ঘাতকের অস্ত্রের মুখোমুখি, তার প্রত্যক্ষ লক্ষ্য ছিলো বাঙলা ভাষার প্রতিষ্ঠা; কিন্তু পরোক্ষ লক্ষ্য ছিলো অনেক। তাঁরা চেয়েছিলেন স্বাধীনতার স্বাদ আর শস্য ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে, ব্যাপক শোষণ থেকে মুক্তি চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন পাকিস্তান নামক একটি মধ্যযুগীয় সামন্ত রাষ্ট্রকে আধুনিক যুগে নিয়ে আসতে; চেয়েছিলেন পাকিস্তান যদি আধুনিক যুগে আসতে রাজি না হয়, তবে তাকে ধ্বংস ক'রে নতুন আধুনিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে। এ-সমস্ত চেতনার স্ফুলিঙ্গই বায়ান্নোর একুশের ভেতরে ছিলো; এবং তার পরের বছরগুলোতে ওই স্ফুলিঙ্গরাই দাউদাউ আগুন হয়ে পাকিস্তানকে জতুগৃহে পরিণত করে। বায়ান্নোর বিশ আর একুশে ফেব্রুয়ারির মধ্যে শতাব্দীর ব্যবধান : একুশের রক্তাঞ্জলির পর আর কোনো কিছুই আগের মতো থাকে নি পাকিস্তানের পূর্বখণ্ডে। তরুণমাত্রই হয়ে ওঠে বিদ্রোহী, নতুন আলো ঢোকে বুড়োদের ছানিপড়া চোখে, শ্রমিকচাষীর পর্যুদস্ত পেশিতে শিহরণ জাগে, বাঙালি মুসলমান বাঙালি হয়ে ওঠে, এবং আধুনিকতার উন্মেষ ঘটে জীবনে শিল্পে সাহিত্যে। আর পাকিস্তানের সামন্ত রাষ্ট্রপতিদের চোখে ঢোকে একটি চব্বিশ ঘন্টার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুঃস্বপ্ন : পাকিস্তান নামক অপরাষ্ট্রটি অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে।

বায়ান্নোর বিদ্রোহ বিশশতকের বাঙালিজীবনের প্রথম বড়ো ঘটনা। ওই ঘটনার স্রষ্টা ও লালনপালনকারীরা প্রধানত মধ্যবিত্তশ্রেণীর; তাই একুশের চেতনারাশির বড়ো অংশ গ'ড়ে উঠেছে মধ্যবিত্তের কামনা বাসনা স্বপ্নে। একুশের, ও তার পরের সমস্ত, আন্দোলনে তারাও যোগ দিয়েছে, যাদের বলা হয় 'সাধারণ মানুষ'। কিন্তু ওই সাধারণ মানুষের স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা, স্বার্থ কখনোই বড়ো হয়ে ওঠে নি। তাই একুশ আমাদের দিয়েছে একগুচ্ছ মধ্যবিত্ত চেতনা। ওই চেতনারাশির অনেক চেতনাই গত তিন দশকে ধার আর তীব্রতা হারিয়ে ফেলেছে, তার অনেক চেতনাই এখন আর প্রশংসনীয় নয়; কিন্তু বায়ান্নোর পাকিস্তানের মধ্যযুগীয় পটভূমিতে বিচার করলে ওগুলোকে অত্যন্ত উজ্জ্বল ব'লে মানতেই হয়। আমাদের সমাজ-রাষ্ট্র তিন দশক ধ'রে যে শুধু সামনের দিকেই এগিয়েছে, তাও নয়। বায়ান্নোর পরবর্তী দু-দশক ধ'রে সামনের দিকে এগোতে এগোতে সত্তরের দ্বিতীয়াংশে আমাদের সমাজ-রাষ্ট্র ফিরে যায় বায়ান্নোরও আগের কালে; এবং এখন তো চারদিকে মধ্যযুগীয় প্রতিক্রিয়াশীলতার জিন্দাবাদ ধ্বনিই শোনা যায় প্রহরে প্রহরে। তাই বর্তমানের পটভূমিতেও বায়ান্নোর চেতনাসমূহ অত্যন্ত উজ্জ্বল। একুশের অজস্র চেতনা থেকে আমি বেছে নিতে চাই যে-চেতনাগুলো, তা হচ্ছে : আধুনিকতা, বিদ্রোহ, পাকিস্তানে অনাস্থা ও স্বাধীনতার স্বপ্ন, বাঙলা ভাষার প্রতিষ্ঠাকামনা, অসাম্প্রদায়িকতা, সমাজতন্ত্রস্পৃহা, গণতন্ত্রের জন্যে আকুলতা ইত্যাদি; এবং দেখতে চাই এ-চেতনাগুলোর কেমন বিকাশ ঘটেছে বায়ান্নোর পরের তিন দশকের উপন্যাসে।

এ-তিন দশকের কবিতা, প্রবন্ধ ও উপন্যাসের ওপর একটু চোখ দিলেই একটি কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বাঙলাদেশের কবি ও প্রাবন্ধিকেরা একুশের চেতনার সাথে যতোটা একাত্ম হয়েছেন, ঔপন্যাসিকেরা ততোটা হন নি। প্রতিটি একুশ উপলক্ষে কবিরা পালন করেছেন বিদ্রোহীর ভূমিকা, প্রতিটি আন্দোলনের সময় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে তাঁদের রক্ত; এবং বাঙলা ভাষায় রচিত হয়েছে একরাশ ক্ষুব্ধ শাণিত সমাজকাঁপানো কবিতা। প্রাবন্ধিকেরা একুশে থেকে সংগ্রহ করেছেন তীব্র অনুপ্রেরণা, রচনা করেছেন সমাজ পাল্টানোর বিপুল পরিমাণ ইশতেহার। যে-দ্রোহ আর ভবিষ্যৎমুখিতা দেখা যায় কবিতা আর প্রবন্ধে, উপন্যাসে তা দুর্লভ। এদিক দিয়ে ঔপন্যাসিকেরা অনেক পিছিয়ে আছেন কবি ও প্রাবন্ধিকদের থেকে, যেমন তাঁরা অনেক পেছনে প'ড়ে আছেন শিল্পসৃষ্টির সাফল্যে। কবিতা ও প্রবন্ধ যতোটা আকর্ষণ করে, উপন্যাস তার সিকি ভাগও করে না। কবিতা তো এগিয়ে গেছে অনেক দূর, তা সমাজ ও আধুনিকতাকে আত্মস্থ ক'রে নিয়েছে চমৎকারভাবে; কিন্তু আমাদের উপন্যাস সমাজ ও সময়কে ধরতে গিয়ে বারবার পদস্খলিত হয়ে পড়ে; আধুনিকতা এখনো তার আয়ত্তে আসে নি, শিল্পসৃষ্টি এখনো তার বাসনামাত্র। গত তিন দশক ধ'রে পশ্চিমে উপন্যাস বাঁকের পর বাঁক নিচ্ছে, কিন্তু আমাদের উপন্যাস এগোচ্ছে প্রথাসম্মত পথ ধ'রে। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে গত তিন দশকে উপন্যাসে প্রধান হয়ে উঠেছে তিনটি প্রবণতা : একশ্রেণীর ঔপন্যাসিক তথাকথিত কল্পনাকে পরিহার ক'রে উপন্যাসের বিষয় হিশেবে গ্রহণ করছেন বাস্তব ঘটনা ও তথ্য, রচনা করছেন গবেষণাগ্রন্থের প্রতিদ্বন্দ্বী উপন্যাস;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরেক শ্রেণীর ঔপন্যাসিক লিখছেন বৈজ্ঞানিক কল্পনাপ্রসূত উপন্যাস; এবং তথ্য ও বৈজ্ঞানিক রূপকথাবিরক্ত একশ্রেণীর ঔপন্যাসিক দার্শনিকতাকে পরিণত করেছেন উপন্যাসের বিষয়ে। আমাদের ঔপন্যাসিকেরা প্রথাসম্মতভাবে কল্পনানির্ভর, বানানো গল্পে বিশ্বাসী। বাস্তব ঘটনা যখন তাঁদের কাহিনীতে ঢুকে পড়ে, তখন তাঁরা ভীত হয়ে ওঠেন; ভূমিকায় জানিয়ে দেন যে 'উপন্যাস উপন্যাসই, ইতিহাস নয়।' তাই আমাদের অধিকাংশ উপন্যাস রূপকথাধর্মী, বাস্তব থেকে যতো দূর যেতে পারে ততোটুকুই যেনো এগুলোর সাফল্য। অনেক উপন্যাসেই ঐতিহাসিক ঘটনা– দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, পাকিস্তান-আন্দোলন, ভাষা-আন্দোলন ইত্যাদি– স্থান পেয়েছে; কিন্তু ওই ঘটনাগুলো উপন্যাসে বিন্যস্ত হয়েছে এমনভাবে, যাতে ওগুলোকে বানানো গল্প ব'লে মনে হয়। ওসব ঘটনা-আন্দোলন সম্পর্কে এর মধ্যেই লেখা হয়েছে বেশ কিছু তথ্যপূর্ণ গবেষণাগ্রন্থ। ওই সমস্ত ঘটনাখচিত উপন্যাস ও গবেষণাগ্রন্থগুলোর মধ্যে গবেষণা গ্রন্থগুলো অনেক বেশি আকর্ষণীয়; উপন্যাসের চেয়েও শিহরণ জাগানো।

পঞ্চাশের শুরুর পাকিস্তান ও বাঙালি মুসলমান ছিলো অনাধুনিক, অসংস্কৃত, শিল্পহীন। পৃথিবীর চারদিকে, জীবনে ও শিল্পে, ছড়িয়ে পড়ছিলো তখন আধুনিক চেতনা; – আধুনিক বাঙলা সাহিত্য তখন অন্তত পঁচিশ বছর বয়স্ক, কিন্তু পাকিস্তানি সাহিত্য ব্যস্ত ছিলো মধ্যযুগপরিক্রমায়। আবু রুশদের *নোঙর*-এর নায়ক পবিত্র পাকিস্তানে নোঙর ফেলতে এসে দেখেছিলো, 'সাহিত্য ঝাঁঝরা হয়ে গেছে; সঙ্গীত স্তব্ধ; চিত্রকলা ক্লান্ত।' বায়ান্নোর আগে, দু-একটি ক্ষীণ ব্যতিক্রম বাদে, মধ্যযুগীয় পাকিস্তানে আধুনিক চেতনার কোনো বিকাশ ঘটে নি; আর শিল্প সাহিত্য চিত্রকলা সঙ্গীত ওই রাষ্ট্রের চিত্তে ঢোকে নি। 'কায়দে আজম' নিয়ে পদ্য লেখাই ছিলো তখন চূড়ান্ত কাব্যসৃষ্টি। 'আর্ট' সম্পর্কে পাকিস্তানি ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় আলাউদ্দিন আল আজাদের 'জবানবন্দী' গল্পের জেবুন্নিসার উক্তিতে : 'একটা গোলাপ আরেকটি বুলবুলি, পাপড়ি আর পাথর, কয়েক লাইন আরবী হরফ চালিয়ে দিলেই আর্ট হয়ে গেলো' ব'লে মনে করতো পাকিস্তানের পিতারা। ওই আর্টকে 'আছাড় মেরে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলা'র চেতনা যুগিয়েছিলো একুশের আন্দোলন। আমাদের উপন্যাসে আধুনিক চেতনা, নতুন শিল্পসৃষ্টির চেতনা কতোটা সংক্রামিত হয়েছিলো? বায়ান্নোর পরের ঔপন্যাসিকেরা বিষয় ভাষা আঙ্গিকে আধুনিক হয়ে ওঠার চেষ্টা করেন; কিন্তু বাঙলাদেশের উপন্যাস, কবিতার তুলনায়, অনাধুনিক। বারবার মনে হয় বায়ান্নোর পরিস্রুতি অভিযান আমাদের উপন্যাসকে পরিচ্ছন্ন করতে পারে নি; এখনো তার শরীর-মনে জড়িয়ে আছে অনেক অতীত অপরিচ্ছন্নতা। একটি বিষয় চোখে পড়ার মতো : পাকিস্তান-আন্দোলনের সময় যে-ঔপন্যাসিকেরা তরুণ ছিলেন, তাঁরাই বিশেষভাবে অপরিস্রুত; আর বায়ান্নোর চেতনা বুকে জ্বালিয়ে ঔপন্যাসিকরূপে আবির্ভূত হন যে-তরুণেরা, তাঁরা অনেক বেশি আধুনিক। আবুল ফজল, আবু জাফর শামসুদ্দীন বা সরদার জয়েনউদ্দীনের সাথে জহির রায়হান, আলাউদ্দিন আল আজাদ বা সৈয়দ শামসুল হককে তুলনা করলে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবশ্য বয়স্কদের মধ্যে ব্যতিক্রমী যে কেউ নেই, তা নয় : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, শওকত ওসমানকে বয়স্ক আধুনিকরূপে গ্রহণ করতে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঞ্চাশের দশকের আগেই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস রচিত হয়েছিলো : শওকত ওসমানের *জননী*, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর *লালসালু*, এবং আবু ইসহাকের *সূর্যদীঘল বাড়ি*। কিন্তু পঞ্চাশের দশকে এ-মানের উপন্যাস লিখতে সক্ষম হন নি কেউ। বায়ান্নোর পরের যে-কটি উপন্যাসের নাম, উৎকৃষ্ট কোনো উপন্যাসের অভাবে, উল্লেখ করতে হয়, সে-ক'টি হচ্ছে আবুল মনসুর আহমদের *জীবনক্ষুধা* (১৯৫৫), সরদার জয়েনউদ্দীনের *আদিগন্ত* (১৯৫৬), আবু রুশদের *সামনে নতুন দিন* (১৯৫৬), ও আবুল ফজলের *রাঙ্গাপ্রভাত* (১৯৫৬)। এর কোনোটিই সার্থক শিল্পসৃষ্টি নয়; তবে *জীবনক্ষুধা* ও *রাঙ্গাপ্রভাত* কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এ-উপন্যাস দুটিতে একুশের চেতনার দুই বিপরীত দিকের পরিচয় আছে। আবুল মনসুর আহমদ সামন্তবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল, আধুনিক চেতনা তাঁর মধ্যে কখনোই প্রবেশ করে নি; এবং তাঁর উপন্যাস *জীবনক্ষুধা* সম্পূর্ণরূপেই একুশের চেতনাবিরোধী। যে-জীবন ও সাহিত্যাদর্শ *জীবনক্ষুধার* পাতায় পাতায় ছড়িয়ে দিয়েছেন আবুল মনসুর আহমদ, বায়ান্নোর পরে তা কাম্য হ'তে পারে না কোনো আধুনিক শিল্পীর ও মানুষের। *জীবনক্ষুধার* নায়ক হালিম ও লেখক আবুল মনসুর আহমদ অভিন্ন ব্যক্তি : ওই উপন্যাসের নায়ক সাম্প্রদায়িক ও সামন্ত মানসিকতায় আবদ্ধ, ঠিক যেমনভাবে সাম্প্রদায়িকতায় ও সামন্ত ভাবনায় আচ্ছন্ন আবুল মনসুর আহমদ। বায়ান্নোর কয়েক বছর পরে পাকিস্তান সম্পর্কে যখন অবিশ্বাস জন্মে গেছে সাধারণ মানুষেরও মনে, তখনও *জীবনক্ষুধার* লেখক পাকিস্তানপন্থী। আবুল ফজল বিপরীত দিকে অবস্থান করেন আবুল মনসুর আহমদের; এবং তাঁর উপন্যাস *রাঙ্গাপ্রভাত* মর্মমূলে না হ'লেও আপাতদৃষ্টিতে বায়ান্নোর চেতনা অর্জন করেছে অনেকখানি। এ-উপন্যাসের দুটি চেতনাকে– সমাজতন্ত্রস্পৃহা ও অসাম্প্রদায়িকতাকে– অনেকটা একুশের দান ব'লে গ্রহণ করতে পারি। যে-মানসিকতা কাউকে দৃঢ় সমাজতন্ত্রীতে পরিণত করে, তা লেখকের ও তাঁর নায়ক কামালের নেই; কিন্তু সমাজতন্ত্র যেহেতু হাওয়ায় উড়ছিলো তখন, তাই লেখক ও নায়কের মনে একরকম রোম্যান্টিক সমাজতন্ত্র দোলা দিয়ে গেছে। উপন্যাসটির অসাম্প্রদায়িক বাণীও লক্ষ্য করার মতো : হিন্দুমুসলমানকে মেলানোর জন্যে আবুল ফজল নায়ক সংগ্রহ করেছেন মুসলমান ও নায়িকা সংগ্রহ করেছেন হিন্দু সমাজ থেকে। আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটি বেশ অসাম্প্রদায়িক; কিন্তু আমি বোধ করি এর অত্যন্ত অভ্যন্তরে রয়েছে একরকম সাম্প্রদায়িকতা। মুসলমান লেখক যখন মুসলমান নায়ক ও হিন্দু নায়িকার প্রেমবিবাহ আঁকেন, তা যতোটা উদার অসাম্প্রদায়িকভাবেই আঁকুন না কেনো, তখন তাকে চারপাশের ইসলামি সাম্প্রদায়িকতারই বহিঃপ্রকাশ ব'লে মনে হয়। মুসলমান হিন্দু বা অন্য কোনো ধর্মের রমণীতেই বীতস্পৃহ নয়, সুযোগ পেলে তারা হিন্দু-খ্রিস্টান-বৌদ্ধ-ইহুদি নায়িকার সঙ্গে প্রেমে ও বিবাহে প্রস্তুত; কিন্তু যাতে তারা প্রস্তুত নয়, তা হচ্ছে নিজের বোন, মেয়ে, বা সমাজের কোনো মেয়েকে অন্য ধর্মের কারো সাথে প্রেমে লিপ্ত হ'তে, বা বিয়ে দিতে। নায়ক যখন অন্য ধর্ম ও সমাজের কাউকে বিয়ে করে, তখন সে তার স্ত্রীর ধর্ম ও সমাজটাকেও নিজের শয্যায় ও অধীনে নিয়ে আসে; অর্থাৎ প্রচণ্ডভাবে জয়ী হয়। নায়িকা হয় পরাজিত, সে তার ধর্ম ও সমাজকে নতজানু ক'রে দেয় অন্যের কাছে। আবুল ফজল যদি পাকিস্তানে হিন্দু নায়ক আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলমান নায়িকার প্রেমবিবাহ আঁকতে পারতেন, তাহলেই তাঁকে ভাবা যেতো একুশের অসাম্প্রদায়িক চেতনার সন্তান। তা পারেন নি ব'লে তাঁকে ইসমাইল হোসেন সিরাজিরই উত্তরাধিকারী ব'লে মনে হয়।

ষাটের দশকে উপন্যাস কিছুটা গভীর ও অনেকটা ব্যাপক হয়ে ওঠে। ভাষা-আন্দোলনের তরুণেরা এর মাঝে বয়স্ক হয়েছেন, আর পাকিস্তান-আন্দোলনের তরুণেরা হয়েছেন প্রৌঢ়। প্রৌঢ়রা এ-সময়ে পেশ করতে থাকেন তাঁদের যুবককালের অভিজ্ঞতা, আর বায়ান্নোতে যাঁরা তরুণ ছিলেন, তাঁরা জীবন ও আধুনিক চেতনার নানা বিকাশ ধরার চেষ্টা করেন উপন্যাসে। পঞ্চাশের দশকে উপন্যাসের এলাকায় যে-দুর্দশা বিরাজ করছিলো, তার অনেকটা কেটে যায় ষাটের দশকে, গুণগত দিকে না হ'লেও পরিমাণগত দিকে। আনোয়ার পাশা, আবদুল রাজ্জাক, আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী, আবু জাফর শামসুদ্দীন, আবু রুশদ, আলাউদ্দিন আল আজাদ, খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, জহির রায়হান, মেসবাহুল হক, রশীদ করিম, শওকত আলী, শওকত ওসমান, শহীদ আখন্দ, শহীদুল্লা কায়সার, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, সত্যেন সেন, সরদার জয়েনউদ্দীন, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, সৈয়দ শামসুল হক, ও আরো কারো কারো উপন্যাস বছরে বছরে প্রকাশ পেয়ে ষাটের দশককে উপন্যাসের সোনালি দশকে পরিণত করে। যাঁদের নাম উল্লেখ করেছি, একা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বাদে, তাঁরা কেউ অসামান্য ঔপন্যাসিক নন। বাঙলা ভাষায় প্রধান উপন্যাসগুলোর সাথে তুলনা করলে তাঁদের রচনাকে বেশ সামান্য মনে হয়; এবং এমনও মনে হয় যে আমাদের ঔপন্যাসিকদের অনেকের খ্যাতি সত্যিকার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ষাটের দশকের উপন্যাস আলোচনা, একটি কারণে, আমি শুরু করতে চাই জহির রায়হানকে দিয়ে। জহির রায়হান সম্ভবত বাঙলাদেশের একমাত্র কথাসাহিত্যিক, যাঁর উদ্ভবের পেছনে আছে বায়ান্নোর ভাষা-আন্দোলন, যাঁর স্বপ্ন কল্পনা জীবন ভ'রে আছে ভাষা-আন্দোলনের স্মৃতি ও দ্রোহে। যদি বায়ান্নোর একুশ না ঘটতো, তবে জহির রায়হান হয়তো কথাসাহিত্যিক হতেন না। তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিলো ভাষা-আন্দোলনের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য অর্থাৎ বাঙলা ভাষার প্রতিষ্ঠা; এবং একুশের অন্যান্য চেতনাও তাঁর মধ্যে বিদ্যুৎ-ঢেউ জাগিয়েছিলো। তাঁর অনেকগুলো গল্প; যেমন : 'অতি পরিচিত', 'কয়েকটি সংলাপ', 'একুশে ফেব্রুয়ারী', 'একুশের গল্প', এবং একটি উপন্যাস– *আরেক ফাল্গুন*– একুশের প্রত্যক্ষ চেতনা থেকে জন্মেছে। তবে জহির রায়হানের মন ঢাকা ছিলো এক তরল ভাবালুতাগ্রস্ত রোম্যান্টিক কুয়াশার আস্তরণে; এবং তিনি সব কিছুকেই রূপকথায় পরিণত করেছেন। তাঁর *আরেক ফাল্গুন* বা *হাজার বছর ধ'রে* একধরনের রূপকথা, যাতে বস্তুসত্যের চেয়ে ভাবালুতা অনেক বেশি। *আরেক ফাল্গুন* উপন্যাসটি বারবার প'ড়েও বোঝা যায় না এটা কোন ফাল্গুনের গল্প; এবং সারাক্ষণই মনে হয় বিদ্রোহবিপ্লব একরকম ভাবালু হৃদয়বৃত্তিমাত্র। কিন্তু বিদ্রোহের চেতনা যতোটুকু আছে *আরেক ফাল্গুন*-এ, তার সামান্যও নেই *হাজার বছর ধরে*তে।

ষাটের দশকের কয়েকটি উপন্যাসের পটভূমি বেশ বিস্তৃত : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, পাকিস্তান-আন্দোলন, পাকিস্তানের উদ্ভবের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থান পেয়েছে উপন্যাসগুলোতে। এগুলোর মধ্যে আছে আলাউদ্দীন আল আজাদের *ক্ষুধা ও আশা*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(১৯৬৪), শহীদুল্লা কায়সারের *সংশপ্তক* (১৯৬৫), সরদার জয়েনউদ্দীনের *অনেক সূর্যের আশা* (১৯৬৬), ও আবু রুশদের *নোঙর* (১৯৬৭)। আবু জাফর শামসুদ্দীনের *পদ্মা মেঘনা যমুনা* (১৯৭৪) ও সরদার জয়েনউদ্দীনের *বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ* (১৯৭৫) সত্তরের দশকে বেরোলেও পটভূমিগত কারণে ওপরের চারটি উপন্যাসের সাথেই বিন্যস্ত করতে চাই এ-উপন্যাস দুটিকে। এ-উপন্যাসগুলো যখন রচিত হয়, সে-ষাটের দশকে পাকিস্তানে অনাস্থাই ছিলো স্বাভাবিক। সামান্য অন্তর্দৃষ্টিও যাঁদের ছিলো, তাঁরা বুঝেছিলেন পাকিস্তানের কাছে আশা করার মতো কিছু নেই; কিন্তু পঞ্চাশের *রাঙ্গাপ্রভাত* আর ষাটের *অনেক সূর্যের আশা, নোঙর* ইত্যাদি আশায় উজ্জ্বল নাম ইঙ্গিত করে যে ওই উপন্যাসগুলোর লেখকদের মনে একুশের চেতনা বিশেষ ঢোকে নি; বরং জমাট হয়ে আছে পাকিস্তান-আন্দোলনের চেতনা। সরদার জয়েনউদ্দীনের ষাটের দশকের মাঝামাঝি প্রকাশিত *অনেক সূর্যের আশা* পাকিস্তানি মানসিকতার ফসল; এতে পাকিস্তান ও তার পিতার প্রশংসা ছড়ানো এখানে সেখানে, কিন্তু সত্তরের দশকে প্রকাশিত *বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ*-এ দেখা দেয় পাকিস্তানের সমালোচনা। সরদার জয়েনউদ্দীন যদি *বিধ্বস্ত রোদের ঢেউ* ষাটের দশকে, আদমজি পুরস্কারকে মনে রেখে, লিখতেন, এবং *অনেক সূর্যের আশা* লিখতেন সত্তরের দশকে, তাহলে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি উল্টে যেতো। এ-উপন্যাসগুলোর কোনোটিই মহৎ রচনা নয়; তবে একুশের চেতনা এগুলোতে নানাভাবে, অনেক সময় এলোমেলোভাবে, ঢুকে গেছে। শহীদুল্লা কায়সার, আলাউদ্দীন আল আজাদ, আবু জাফর শামসুদ্দীন, সরদার জয়েনউদ্দীন দুর্ভিক্ষ দেখে ক্ষিপ্ত হয়েছেন, মহাযুদ্ধকে তিরস্কার করেছেন, সমাজতন্ত্র আর স্বাধীনতার জন্যে প্রকাশ করেছেন আকুলতা। এঁদের মধ্যে সব মিলিয়ে কিছুটা সফলতা অর্জন করতে পেরেছেন শহীদুল্লা কায়সার। শহীদুল্লা কায়সার বেশ বড়ো কাহিনী বর্ণনা করেছেন, শোষকশোষিতের দ্বন্দ্ব মাঝেমাঝে তীব্রভাবে আঁকতে পেরেছেন; কিন্তু আলাউদ্দীন আল আজাদ দুর্ভিক্ষ-দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-স্বাধীনতার মতো কড়া বিষয় নিয়েও রোম্যান্টিক-সাংকেতিক আশাবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। সরদার জয়েনউদ্দীনের ব্যর্থতা আরো বড়ো ও মর্মান্তিক : দুটি উপন্যাসে তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেকে একুশের আন্দোলন পর্যন্ত সময়ের উপাখ্যানকে পরিণত করেছেন ক্লান্তিকর, দ্যুতিহীন গল্পে। তাঁর তুলনায় অনেক সফল আবু জাফর শামসুদ্দীন, যাঁর মধ্যে শিল্পিতার অভাব থাকলেও সময়কে নিরাবেগ দৃষ্টিতে দেখার গুণ বিদ্যমান। তাঁর এ-বৈশিষ্ট্য যেমন দেখা যায় সাড়ে এগারো শো পৃষ্ঠার *পদ্মা মেঘনা যমুনায়* তেমনি দেখা যায় সম্ভবত সত্তর পৃষ্ঠার *দেয়াল*-এ [গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত]। আবু জাফর শামসুদ্দীনের আছে তথ্যনিষ্ঠ দলিলধর্মী উপন্যাস রচনার শক্তি। পাকিস্তান-বিষয়ক উপন্যাসে একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো : প্রায় প্রতিটি উপন্যাসেই দেখা যায় যে পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি ঘটেছিলো বদমাশশ্রেণীর। *সংশপ্তক*-এ দেখি গুণ্ডা রমজান পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে হয়ে উঠেছে সম্ভ্রান্ত কাজি মোহাম্মদ রমজান; *অনেক সূর্যের আশার* দুশ্চরিত্র ছমির মিয়া পাকিস্তান-আন্দোলনের সময় হয়ে ওঠে মুসলিম লিগের 'সালার', *ক্ষুধা ও আশায়* দেখা যায় বাদশা গুণ্ডার উন্নতি; *পদ্মা মেঘনা যমুনায়* অসৎ আকবর খাঁকে দেখি মুসলমানের নেতারূপে, আর *নোঙর*-এর নায়কের মনে হয়েছে পাকিস্তানি 'সমাজের পরিবেশে কোনো স্নিগ্ধতা বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহত্ত্বের সম্ভাবনা একেবারে বিলুপ্ত।'

আর দুজন ঔপন্যাসিক শওকত ওসমান ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ নানা কারণে উল্লেখযোগ্য; এবং সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ একটু অতিপ্রশংসিত, দেশে থাকলে এতোটা প্রশংসা তিনি পেতেন না। শওকত ওসমানের মধ্যে একরকম দ্রোহ সবসময়ই সক্রিয়; আর সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সমস্ত দ্রোহবিদ্রোহের পরপারে বাস করেন। তবে শওকত ওসমান কোনো কিছুকেই যেনো গুরুত্ব, ধ্যান ও চৈতন্যের সাহায্যে গ্রহণ করেন নি;– যদি তিনি আঙ্গিক ও চাতুর্যের ওপর বেশি জোর দিয়ে চমকপ্রদ হ'তে চেষ্টা না করতেন, গভীরভাবে পাঠ করতেন তাঁর সময় ও সমাজকে, তবে তিনি হয়তো একজন প্রধান ঔপন্যাসিক হ'তে পারতেন বাঙলা ভাষায়। চল্লিশ-দশকের প্রথাগত *জননী*র মধ্যে যে-সম্ভাবনা ছিলো, ষাটের দশকের ঝিলিক দেয়া *ক্রীতদাসের হাসিতে* তা পরিণতি না পেলেও *ক্রীতদাসের হাসি*, এবং *চৌরসন্ধি, রাজা উপাখ্যান* একুশের বিদ্রোহী উদ্ধত চেতনাকে ধরেছে অনেকখানি। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ একুশের চেতনার বাইরে থেকেছেন। তাঁর পরিণত জীবনের সবটাই কেটেছে এমন এক দেশে ও সময়ে, যখন যেখানে অস্তিত্ববাদই ছিলো উপন্যাসের বড়ো বিষয়। ওই বিপন্ন অস্তিত্বের দর্শন তিনি পেশ করেন বাঙলা ভাষায়– জীবনকে সম্পূর্ণরূপে নির্বাক ও নিঃশব্দ ক'রে দিয়ে। *কাঁদো নদী কাঁদোতে* জীবন এক অতীত ব্যাপার, সেখানে বিনাশ আর আত্মহননই জীবনের নিয়তি: কিন্তু তিনি আধুনিক, যে-গুণটি আমাদের অনেক ঔপন্যাসিকেরই আয়ত্তের অতীত। তাঁর একুশের চেতনার প্রকাশ ঘটেছে সংকটচেতনার মধ্য দিয়ে। একজন সত্যেন সেন অনেকগুলো 'প্রগতিশীল' উপন্যাস লিখেও ভাষা ও সাহিত্যকে যা দিতে পারেন না একজন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ একটিমাত্র উপন্যাস লিখেও তা দিতে পারেন।

একুশ প্রধানত একগুচ্ছ চেতনার সমষ্টি; একুশের আন্দোলন ঘটনার ঘনঘটাপূর্ণ নয়। বিভিন্ন চেতনা প্রকাশের জন্যে ঔপন্যাসিকের দরকার হয় নানা ঘটনায় আন্দোলিত জীবন। ঔপন্যাসিকেরা একুশের আন্দোলনে ঘটনার প্রাচুর্য পান নি ব'লে দু-একজন ছাড়া সবাই একুশের দিনকে এড়িয়ে চলেছেন, এবং দুর্ভিক্ষ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পাকিস্তান আন্দোলনের ঔপন্যাসিকেরা তাঁদের উপাখ্যান শেষ করেছেন একুশের অব্যবহিত আগে। একুশ যেনো তা বুঝতে পেরেছিলো, তাই একুশ ঔপন্যাসিকদের দু-দশক পরে উপহার দেয় একাত্তর : যুদ্ধ ধ্বংস সৃষ্টি হিংস্রতা মহত্ত্ব বিদ্রোহে পরিপূর্ণ ঘটনাপূর্ণ জীবন। একাত্তর একুশেরই দু-দশক পরবর্তী মহাঢেউ। একাত্তর সৃষ্টি করে বাঙালি জীবনের মহত্তম ইতিহাস। আমাদের সত্তর দশকের ঔপন্যাসিকেরা কি একাত্তরের মহাজীবন ও ইতিহাসকে ধরতে পেরেছেন? এর উত্তর : না। একাত্তর যে কোনো মহৎ উপন্যাসের প্রেরণা হ'তে পারে নি, এতে মনে হয় ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারে যে-কোনো নির্বোধ, কিন্তু তাকে শিল্পে রূপায়িত করার জন্যে দরকার প্রতিভা। প্রতিভার অভাবেই একাত্তরের জীবন ও চেতনা এখনো উপন্যাসরূপ লাভ করে নি। ষাটের তুলনায় সত্তরদশকের উপন্যাস অনেক পাংশু, দরিদ্র। ঔপন্যাসিকেরা একাত্তরে দেখেছেন পলায়ন, নিপীড়ন, হিংস্রতা, কিছু খণ্ড আক্রমণ, এবং ঘনঘন ধর্ষণ। ধর্ষণের ব্যাপারটিই বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিলো ঔপন্যাসিকদের কাছে। এ-ব্যাপারটি বিভীষিকাময় সন্দেহ নেই, এর প্রতীকী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাৎপর্যও অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু অনেক গল্পউপন্যাসে এর যে-ছবি পাই, তাতে মনে হয় পাকিস্তানি তাতারদের সাথে লেখকেরাও উপভোগ করেছেন হিংস্র সুখ।

সত্তর দশকের উপন্যাসগুলোকে দু-ভাগে ভাগ করতে পারি : বড়ো ভাগটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক, অন্যটি বিবিধ বিষয়ক। প্রথম ভাগে পড়ে সৈয়দ শামসুল হকের *নীলদংশন, নিষিদ্ধ লোবান*, শওকত আলীর *যাত্রা*, মাহমুদুল হকের *জীবন আমার বোন*, মির্জা আবদুল হাইয়ের *ফিরে চলো* ইত্যাদি, দ্বিতীয় ভাগে পড়ে রশীদ করিমের *আমার যতো গ্লানি, প্রেম একটি লাল গোলাপ*, সৈয়দ শামসুল হকের *দূরত্ব, কালধর্ম*, শওকত আলীর *প্রদোষে প্রাকৃতজন*, রাহাত খানের *কোলাহল* প্রভৃতি। সব ঔপন্যাসিক ও উপন্যাসের তালিকা দেয়া লক্ষ্য আমার নয়, শুধু প্রবণতা বোঝানোর জন্যে ওপরের নামগুলো উল্লেখ করলাম। সত্তর দশকের অনেক উপন্যাসই 'ঈদসংখ্যার উপন্যাস'; এগুলোর অধিকাংশই উপন্যাসনামী বড়োগল্প। সত্তরদশকে একজন ঔপন্যাসিকেরই মূল্যবান বিকাশ ঘটেছে, তিনি সৈয়দ শামসুল হক। এ-দশকে প্রচুর লিখেছেন তিনি এবং প্রচুর ভালো রচনা লিখেছেন। *নীলদংশন* সম্ভবত তাঁর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উৎকৃষ্টতম উপন্যাস বা বড়োগল্প। বন্দী হয়ে একজন সাধারণ কাজি নজরুল ইসলাম কীভাবে বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলামে পরিণত হলো, পীড়িত হয়ে হয়ে ঢুকলো মৃত্যুর গর্তে : সে-কাহিনী স্নায়ুছেঁড়া তীব্রতার সাথে পেশ করেছেন সৈয়দ শামসুল হক। তিনি ব্যাপক বিস্তৃত জীবন ও সমাজের ঔপন্যাসিক নন, ব্যক্তিই তাঁর বিষয়; আধুনিক ঔপন্যাসিকদের বিষয় ব্যক্তিই। এ-জন্যেই তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বহুমাত্রিক জীবন বা যুদ্ধ আশ্রয় ক'রে লেখা হয় নি, হয়েছে ব্যক্তিকে অবলম্বন ক'রে। তাঁর শক্তি চরমভাবে বিকাশ পেয়েছে *দূরত্ব* (১৯৮১) উপন্যাসে, যা চেতনা ও উৎকর্ষে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর *চাঁদের অমাবস্যা* ও *কাঁদো নদী কাঁদো*র কাছাকাছি। শওকত আলীর *যাত্রা* মুক্তিযুদ্ধের পলায়নপর পর্যায়ের খণ্ডচিত্র, মাহমুদুল হকের *জীবন আমার বোন* চমৎকার, কিন্তু অনেকাংশে গ্লানিকর। অন্য শ্রেণীর উপন্যাসে ব্যক্তিক ও সামাজিক গ্লানিই বড়ো হয়ে উঠেছে; যেমন হয়েছে রশীদ করিমের *আমার যত গ্লানি*, ও রাহাত খানের *কোলাহল*-এ। রশীদ করিম শরৎচন্দ্রেরই স্মার্ট, ও নিম্নমানের, ষাট-সত্তর দশকীরূপ; তাঁর পাত্রপাত্রীরা সমাজের নষ্ট উচ্চবিত্তশ্রেণীর, লেখকের ভাষায় 'খচ্চর'শ্রেণীর। ওই শ্রেণীর চেতনার সাথে লেখকের চেতনাও অভিন্ন : হুইস্কি, পরস্ত্রী, রাতের ক্লাবচর্চার মানসিকতা রশীদ করীমের, এতে নতুনত্ব আছে। রাহাত খানও মোটামুটিভাবে ওই শ্রেণীকেই নিয়েছেন *কোলাহল*-এ, তবে দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। পঙ্ক উদঘাটনে উৎসাহী ও আকৃষ্ট হ'লেও ওই সামাজিক পঙ্ককে রূপান্তরিত করার মধ্যবিত্তসুলভ বিলাসী চেতনা তাঁর মাঝে দেখা যায়।

একুশের চেতনা তিন দশকের উপন্যাসে আধেয়ে প্রকাশ পেয়েছে যতোটুকু, তারচেয়ে বেশি সম্ভবত প্রকাশ পেয়েছে উপন্যাসের ভাষায়। একুশের আগে বাঙালি মুসলমানের ভাষা ছিলো অপরিস্রুত, অনেকটা পুথিসাহিত্যের ভাষা; ওই ভাষার অবিরল আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দ জানিয়ে দিতো যে রচয়িতা মুসলমান, পাকিস্তানি। বায়ান্নোর পরে পরিস্রুত হয়ে উঠতে থাকে বাঙলা ভাষা, বিদায় নিতে থাকে আরবি-ফারসি-উর্দু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শব্দ, এবং ষাটের দশকে বাঙলা ভাষা প্রায় বিশুদ্ধ বাঙলায় পরিণত হয়। এখন পশ্চিম বঙ্গের লেখকেরাও যে-পরিমাণ ইসলামি শব্দ ব্যবহার করেন, বাঙলাদেশের আধুনিকেরা সে-পরিমাণ ব্যবহার করেন না। ভাষা-আন্দোলন ভাষাকেই স্বাধীন স্বায়ত্তশাসিত করেছে বেশি। এ-রচনা লেখার সময় একটি বইয়ের কথা আমার বারবার মনে পড়েছে, কিন্তু সেটি কোনো প্রথাসম্মত উপন্যাস নয়; তবু কেনো যেনো আমার ওটিকেই মনে হয় একুশের চেতনার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, যদিও এটি গবেষণাগ্রন্থ এবং একপেশে; বইটি বদরুদ্দীন উমরের *পূর্ব বাঙলার ভাষা-আন্দোলন* ও *তৎকালীন রাজনীতি*। বাঙলাদেশে তিন দশকে এ-একটি বই-ই লেখা হয়েছে, যার নায়ক কোনো বিশেষ ব্যক্তি নয়, যার 'নায়ক পূর্ব বাঙলার সংগ্রামী জনগণ'। তবে উপন্যাসের, আধুনিক উপন্যাসের, নায়ক যে সংগ্রামী জনগণই হ'তে হবে, তা নয়; ভীরুতম ব্যক্তিও নায়ক হ'তে পারে আধুনিক উপন্যাসের, এবং সাধারণতই হচ্ছে তাই। উপন্যাস থেকে বিদায় নিয়েছে বীরেরা, যারা কখনো ছিলো না; অন্তত আধুনিক সময়ে নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাধীনতা ও বিশ্ববিদ্যালয়

শৃঙ্খলিত সিংহের চেয়ে স্বাধীন গাধা উত্তম। শৃঙ্খল মানুষকে, যে-কোনো প্রাণীকে, রোধ ও বিনাশ করে; স্বাধীনতা বিকশিত করে। মানুষের মুখ্য লক্ষণ সৃষ্টিশীলতা, যার অন্য নাম প্রতিভা; ওই সৃষ্টিশীলতার, প্রতিভার, বিকাশের প্রথম শর্ত স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন। স্বাধীনতা শুধু রাজনীতিক হ'লে চলে না; তথাকথিত স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিবাসীমাত্রই যে স্বাধীন এমন নয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালে এ-গ্রহের মাঠেঘাটে জন্ম নিতে থাকে নতুন পতাকাখচিত রাষ্ট্র, এবং তাদের অধিবাসীরা অধীন হয়ে পড়ে দেশি ঔপনিবেশিকদের। তাই এমন ব্যাপার বেশ সুলভ হয়ে উঠেছে এখন যে রাষ্ট্রটি স্বাধীন, কিন্তু তার অধিবাসীরা স্বাধীনতাহীন। এমন অবস্থা ক্ষতিকর পরাধীনতার চেয়েও, কেননা রাজনীতিক পরাধীনতার মধ্যে যে-দ্রোহ ও স্বাধীনতাস্পৃহা থাকে জাতির চেতনাস্রোতে, ছদ্মস্বাধীনতায় তাও থাকে না। ছদ্মস্বাধীনতা নষ্ট করে সব কিছু;– দ্রোহ, স্বাধীনতাস্পৃহা, মেধা ও প্রতিভা। স্বাধীন দেশে স্বাধিকারহীনতা এক ভয়াবহ ব্যাপার, তাতে সমগ্র জাতি পরিণত হয় দাসে বা জন্তুতে, এবং এক সময় তা বিলুপ্ত হ'য়ে যেতে বাধ্য। এমন দেশে স্বাধীনতা পায় একমুঠো মানুষ, যারা শক্তিমান কিন্তু প্রতিভাবান নয়; সারা দেশে হয়ে ওঠে তাদের স্বেচ্ছাচারের লীলাভূমি। কিন্তু যে-কোনো জাতির বিকাশের জন্যে অপরিহার্য স্বাধীনতা আর স্বায়ত্তশাসন। কোনো রাষ্ট্রে কেউ হবে অবাধ স্বাধীন, আর বিপুল জনমণ্ডলি হবে পরিমিতভাবে স্বাধীন, এমন অবস্থা জাতির দুরারোগ্য ব্যাধির লক্ষণ। রেশন করা স্বাধীনতা পরাধীনতার চেয়েও অনিষ্টকর।

একটি জাতি কতোটা উন্নত ও সৃষ্টিশীল, তার মাপকাঠিরূপে ব্যবহার করা যায় স্বাধীনতাকে;– ওই জাতি কতোটা ভোগ করে স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন, তার পরিমাণ জানলে পরিমাপ করা সম্ভব তার উন্নতি ও সৃষ্টিশীলতার মাত্রা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতির দিকে তাকালে স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে উন্নত জাতিমাত্রই বিপুল স্বাধীনতাভোগী; আর অনুন্নতরা বেঁচে আছে রেশন করা স্বাধীনতা-স্বায়ত্তশাসনে। একটি জাতি ও রাষ্ট্র অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি;– মানুষ জীবনের প্রয়োজনে গ'ড়ে তোলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, মুদির দোকান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভবপ্রতিষ্ঠার মূলে আছে জীবনের চাহিদা। প্রতিষ্ঠানের জন্যে জীবন নয়, জীবনের জন্যে প্রতিষ্ঠান। বিশ্ববিদ্যালয় ওই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অনন্য : বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাংক নয়, জীবনবীমা সংস্থা নয়, আমদানিরপ্তানির প্রতিষ্ঠান নয়, নয় এমনকি মন্দির-মশজিদ-গির্জা। সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় পবিত্রতম ও সর্বজনীনতম। ব্যাংক, বীমাসংস্থা, আমদানিরপ্তানি কেন্দ্র, ও অজস্র পার্থিবতামুখি প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কিন্তু তার সাথে মহত্ত্বের, পবিত্রতার সম্পর্ক কেউ খোঁজে না। উপাসনালয়ের সঙ্গে পবিত্রতার ভাবনা জড়িত হয়ে আছে প্রথাগতভাবে, কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্ববিদ্যালয় তারও উর্ধ্বে, কেননা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বমানবের; মুসলমান-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ও অজস্র ধর্মাবলম্বীর; বর্ণের, গোত্রের ও শ্রেণীর। বিশ্ববিদ্যালয় এমন আরাধনাস্থল যেখানে মিলিত সবাই, আর ওই আরাধনাভবনে যার আরাধনা করা হয়, তার নাম জ্ঞান। আমি ব্যক্তিগতভাবে মহৎ ও পবিত্র শব্দগুচ্ছের মহিমা সাধারণত স্বীকার করি না, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের মহৎ ও পবিত্রতা বোঝানোর জন্যে এদের চেয়ে অর্থময় শব্দ আমার জানা নেই।

তাই স্বীকার ক'রে নিতে হয় যে জাতির প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় অনন্য, তা পৃথক অন্যান্য পার্থিব প্রতিষ্ঠান থেকে। যারা এ-সত্য স্বীকার করে না, বিশ্ববিদ্যালয় ও বীমাসংস্থাকে চালাতে চায় একই বিধিতে, তারা ভ্রান্ত, জাতির জন্যে ক্ষতিকর। আপাতদৃষ্টিতে বীমাসংস্থা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে, কেননা প্রথম প্রতিষ্ঠানটি অর্থকরী, আর দ্বিতীয়টি শুধুই অর্থ ব্যয় করে। দ্বিতীয়টি সৃষ্টি করে জ্ঞান, যা সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ মানুষের। জ্ঞান সৃষ্টি, সম্প্রচার, বিভিন্ন প্রতিযোগী জ্ঞানের মধ্যে বির্তক, বিচার ও পরিশেষে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া লক্ষ্য ও দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের। বিশ্ববিদ্যালয় বলতে দালানকোঠা, কলা বা বিজ্ঞানভবন, গ্রন্থাগার, গবেষণাগার ও অন্যান্য সহায়ক উপকরণ বোঝায় না, এগুলো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত সম্পদ নয়; বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত সম্পদ জ্ঞান, যার চর্চা হয় কিছু দালান- ভবন-গবেষণাগারে। জ্ঞানচর্চার জন্যে স্বাধীনতা অপরিহার্য; কেননা সত্য কোনো রাষ্ট্রিক বিধি, সামাজিক নিষেধ, ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে না। জ্ঞান ও তার সত্যের সাথে মিল নাও হ'তে পারে প্রথাগত সামাজিক, রাষ্ট্রিক, ধর্মীয় বিশ্বাসের; এবং না হওয়াই স্বাভাবিক, কেননা প্রথা এড়াতে না পারলে জ্ঞানের অগ্রগতি অসম্ভব। যে-জ্ঞান প্রথাপরিক্রমায় ব্যস্ত, তা কোনো জ্ঞান নয়। সভ্যতার ইতিহাস প্রথা ও মুক্তজ্ঞানের সংঘর্ষের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। যুগে যুগে দেখা গেছে প্রথা ও প্রথাবাদীরা নতুন জ্ঞানান্বেষীদের পীড়ন করেছে হিংস্রভাবে, কিন্তু তাতে ভবিষ্যৎমুখি জ্ঞান আর সত্য পরাস্ত হয় নি। এককালের জ্ঞান পরবর্তীকালে প্রথা, সংস্কার, ও অন্ধবিশ্বাসে পরিণত হ'তে পারে; বাধা দিতে পারে জ্ঞানচর্চায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব হচ্ছে স্বাধীনভাবে জ্ঞানচর্চার জলবায়ু তৈরি ক'রে রাখা, যাতে কোনো বিশ্বাস, স্বার্থ, সংস্কার কারাগারে তুলতে না পারে। এ-স্বাধীন জ্ঞানচর্চার জন্যে স্বাধীনতা-স্বয়ত্তশাসন প্রথম শর্ত; রাষ্ট্র ও সমাজকে মেনে নিতেই হবে যে তার বিশ্ববিদ্যালয় নামক যে-অনন্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে, তাকে দিতে হবে অপার স্বাধীনতা। এ-জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় মাত্রই রাষ্ট্রের ভেতরে রাষ্ট্র; দেশের ভেতরে সবচেয়ে মুক্ত, স্বাধীন, স্বায়ত্তশাসিত পরিমণ্ডলের নাম বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয় যে রাষ্ট্রের ভেতরে রাষ্ট্র, তা দেশ ও সমাজের স্বার্থেই।

কেনো বিশ্ববিদ্যালয়ের দরকার এতো স্বায়ত্তশাসন, প্রয়োজন রাষ্ট্রের ভেতরে রাষ্ট্র হওয়া? এমন বৈশিষ্ট্য অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন নয়, কিন্তু কেনো প্রয়োজন বিশ্ববিদ্যালয়ের? উন্নত দেশগুলো, যাদের কয়েক শতাব্দী ধ'রে ধারাবাহিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার অভিজ্ঞতা রয়েছে, স্বীকার ক'রে নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন। কী পড়ানো হবে, কে পড়াবেন, কাদের পড়াবেন, ও কীভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়াবেন ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার ওই সমস্ত দেশে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের, তাতে রাষ্ট্র বা সমগ্র সমাজ প্রভাব বিস্তার করতে উদ্যত হয় না। ওই সব রাষ্ট্র জ্ঞানীদের ওপর আস্থা পোষণ করে, এবং তাঁদের সিদ্ধান্তকেই শিরোধার্য ক'রে নেয়। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের একরকম ঐতিহাসিক অধিকার। কিন্তু কোনো অধিকার একবার পাওয়া গিয়েছিলো ব'লেই যে তা চিরকাল পাওয়া যাবে, এমন নয়; বরং এখন দেখা যায় ঐতিহাসিক অধিকারই বর্তমান অধিকারের বিরুদ্ধে যায়। এখন কোনো চুক্তি বা সংবিধানের ওপর বেশি ভরশা করা যায় না, যে-কোনো সময় তা বাতিল হয়ে যেতে পারে; তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শতাব্দীপরম্পরার অধিকারের দাবি বেশি শক্তিশালী নয়।

এবার অন্যভাবে বিচার করা যেতে পারে প্রসঙ্গটি;– বাস্তব মানদণ্ড প্রয়োগ ক'রে দেখা যেতে পারে স্বাধীনতা-স্বয়ত্তশাসন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাপ্য কি না? বিচার ক'রে দেখতে পারি স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানচর্চা ও সমাজরাষ্ট্রের জন্যে বেশ উপকারী, না কি পর্যুদস্ত, শৃঙ্খলিত, অবরুদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় বেশি উপকারী? কালপরম্পরায় দেখা গেছে স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রের ও সমাজের যতো উপকারে এসেছে, নিত্য নতুন জ্ঞানসৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে, পর্যুদস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে তা হয় নি। এজন্যে দেখা যাবে পর্যুদস্ত রাষ্ট্রের পর্যুদস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শুধু সাক্ষরশ্রেণী সৃষ্টি করেছে, বিভিন্ন উপাধি বিতরণ করেছে নানা বিমর্ষ পরীক্ষা ভিত্তি ক'রে, এর বেশি পারে নি; আর স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যাগুলো সমৃদ্ধ করেছে বিশ্বকে ও নিজের সমাজকে নতুন জ্ঞানসম্পদে। পর্যুদস্ত বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ওঠে সরকারি প্রতিষ্ঠান, আর স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয় সমগ্র জাতিকে সঞ্জীবিত ক'রে রাখে। তাই রাষ্ট্র ও জাতির অস্তিত্বের প্রয়োজনেই স্বীকার ক'রে নিতে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন। যে-জাতি ও রাষ্ট্র তা করে না, তা আত্মহত্যাকেই শ্রেয় ব'লে গণ্য করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের কোনো শক্তি নেই স্বাধীন স্বায়ত্তশাসিত থাকার; বিশ্ববিদ্যালয় এমন কোনো প্রতিষ্ঠান নয় যে তার নিজস্ব অর্থকোষ আছে, নিজের প্রয়োজন নিজেই মেটাতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় এমন কোনো প্রতিষ্ঠান নয় যে তার নিজস্ব রক্ষীবাহিনী আছে, আছে বিমান-নৌ-পদাতিক বাহিনী, এবং প্রতিহত করতে পারে যে-কোনো আক্রমণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব কিছুই নেই; তাকে, বিশ্বের অধিকাংশ দেশে, সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল থাকতে হয় রাষ্ট্র ও সমাজের ওপর। এখন খুব কম বিশ্ববিদ্যালয়ই আছে, যা আপন ব্যয় নির্বাহ করতে সক্ষম। রাষ্ট্র অর্থ না যোগালে পৃথিবীর অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় একমাসের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু সারা রাষ্ট্রে একটিও বিশ্ববিদ্যালয় নেই, এমন রাষ্ট্র অকল্পনীয়। সমাজ ও রাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয় দরকার আপন প্রয়োজনে, এবং সমাজ-রাষ্ট্র-সভ্যতাকে অধিক মাত্রায় সেবা করার সুযোগ দেয়ার জন্যেই সমাজ-রাষ্ট্র মেনে নেয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন। তাই স্বায়ত্তশাসন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকার নয়, তা সমাজ-রাষ্ট্র কর্তৃক স্বেচ্ছায় অর্পিত অধিকার। কিন্তু কোনো সমাজ-রাষ্ট্র যদি বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বাধীনতা স্বায়ত্তশাসন দিতে প্রস্তুত না থাকে, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানান্বেষীদের সামনে খোলা থাকে দুটি পথ। প্রথমত, তাঁরা বেছে নিতে পারেন আত্মবিনাশ, অথবা প্রতিরোধ করতে পারেন সমাজ-রাষ্ট্রের অপসিদ্ধান্ত। বিশ্ববিদ্যালয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে উঠতে পারে অবরুদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়, যাকে ঘিরে থাকতে পারে শক্তিমান জ্ঞান ও সমাজ বিরোধীরা। সমাজ-রাষ্ট্র-সভ্যতার ভবিষ্যৎ স্মরণে রেখে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য হয়ে ওঠে স্বায়ত্তশাসনবিরোধীদের প্রতিহত করা। অবরুদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় অবরুদ্ধ নগরের মতোই শ্রদ্ধেয়। যে-বিশ্ববিদ্যালয় নিজের স্বাধীনতা স্বায়ত্তশাসন রক্ষার পুণ্য সমরে না নেমে নিজের স্বাধীনতা অর্পণ করে অন্ধকারের পশুদের পদতলে, তার ওপর সভ্যতার ও মানুষের সমস্ত অভিশাপ বর্ষিত হওয়া উচিত। অমন বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানচর্চায় নয় নিয়োজিত পতিতাবৃত্তিতে, যেমন নিয়োজিত হয়েছিলো বন বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৭-এ হিটলারের আদেশে টমাস মানের ডিগ্রি কেড়ে নিয়ে। জর্মন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তখন ছিলো হিটলারের রক্ষিতা, নাটশিদের তুষ্টিবিধান ছিলো তাদের লক্ষ্য; এবং এর ফলে পতনই হয়ে ওঠে জর্মন জাতির নিয়তি।

প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় লালন করে দ্বৈত আনুগত্য; তার আনুগত্য নিজের সমাজের প্রতি, ও বিশ্বমানবের প্রতি। যে-সমাজ পালন করছে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে, তার প্রতি যে বিশেষ কর্তব্য আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের, তা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। আপন সমাজের প্রতি দায়িত্বপালনের সুবিধার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে দিতে হয় এমন কিছু বিশেষ সুযোগসুবিধা ও অধিকার, যা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে দায়িত্বপালন অসম্ভব। এমন বিশেষ অধিকার অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় নয়, কিন্তু একান্ত প্রয়োজন বিশ্ববিদ্যালয়ের। তাই বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েও এক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। স্বতন্ত্র রাষ্ট্রত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের দোষ নয়, গুণ। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব রয়েছে সমগ্র সভ্যতা ও মানবমণ্ডলির প্রতিও। বাঙলা 'বিশ্ববিদ্যালয়' শব্দটির আক্ষরিক তাৎপর্য অনুধাবনযোগ্য; এটি বিশ্বের বিদ্যালয়, এখানে চর্চা হয় বিশ্বজ্ঞান। জ্ঞানের বিচিত্র রূপ ও বহুমুখি বিকাশের এলাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বিশুদ্ধরূপে জ্ঞান দেশ-সমাজ এমনকি মানব-নিরপেক্ষ। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের চর্চা করা যায় কোনো দেশ-সমাজ- ও মানুষকে স্মরণে না রেখে; এবং এর যা ফল, তা বিশ্বমানবেরই কল্যাণে আসে। বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান নয়, এমনকি পেশাদার বিদ্যার বিদ্যালয়ও নয়। শুধু জীবিকা উপার্জনের শিক্ষা দেয়াই লক্ষ্য নয় বিশ্ববিদ্যালয়ের। সংস্কারহীন জ্ঞানচর্চা, তার সম্প্রচার ও বিচারবিবেচনার স্থান বিশ্ববিদ্যালয়। সমাজ-রাষ্ট্রের বহু এলাকা আছে, যেখানে মুক্ত চিন্তা গ্রহণযোগ্য নয়। উপসনালয় তার ধর্মবিরোধী চিন্তা সহ্য করে না, সচিবালয়ে সহ্য করা হয় না ক্ষমতাসীন দলের গৃহীত মতের বিরোধী চিন্তা; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরোধী, প্রথাবিরোধী চিন্তাভাবনারই বিকাশ ঘটে বহুমুখে। এর জন্যে দরকার স্বাধীনতা স্বায়ত্তশাসন, যাকে বিবেচনা করতে পারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শেকড়ের জল ব'লে, যার অভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিণত হয় শুষ্ক বৃক্ষে, আর সচ্ছলতায় শত ভাবনার ফুলফল ধরে শাখায় শাখায়। আমরা কি মৃত গাছ চাই, না কি চাই ফলফুলভারাবনত সবুজ সমৃদ্ধ বৃক্ষ?

প্রশ্ন উঠতে পারে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কতোটা সাফল্য অর্জন করেছে জ্ঞান চর্চায়, কোন অসাধারণ জ্ঞান প্রথম বিকশিত হয়েছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে? আমাদের অধ্যাপকেরা জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণা করতে সমর্থ হয়েছেন কতোখানি? এমন সব প্রশ্নের উত্তর বেশ বুক ফুলিয়ে দেয়া সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের অধ্যাপকেরা দাবি করতে পারবেন না যে পদার্থবিজ্ঞানের একটি বিশেষ মৌলিক তত্ত্ব তাঁরাই উদ্ভাবন করেছেন, বা আবিষ্কার করেছেন সমাজবিজ্ঞানের কোনো মূলসূত্র, বা মানববিদ্যায় তাঁরা নতুন পথনির্দেশ করেছেন। এমন দাবি তাঁদের পক্ষে করা অসম্ভব। তাঁরা যে তাঁদের মেধা দিয়ে সভ্যতাকে আরো উজ্জ্বল করতে পারেন নি, তার বহু কারণের দুটি হচ্ছে স্বাধীনতা স্বায়ত্তশাসনের অভাব, ও মৌলিক মহৎ গুরুত্বপূর্ণ কিছু করার সুযোগের অভাব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার বিধিসমূহ, ১৯২১ থেকে ১৯৮৩ পর্যন্ত, লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে বিধিপ্রণেতারা বিশ্ববিদ্যালয়কে এক রকম প্রাথমিক বিদ্যালয় ব'লেই ভেবেছেন। সমাজের সমস্ত শ্রেণীর লোক কর্তৃত্ব করার জন্যে ছুটে এসেছে, খ্যাতি পেতে চেয়েছে সমাজসেবক ও শিক্ষাবিদের, এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে পরিণত করেছে তাদের দর্প দেখানোর আরো একটি ক্ষেত্রে। গৌণ থেকে গেছেন শিক্ষক ও ছাত্ররা। ব্রিটিশ যুগে তবুও কিছুটা স্বায়ত্তশাসন ছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের, কিন্তু পাকিস্তানকালে তা পরাধীন হয়ে ওঠে; এবং ষাটের দশকে প্রণীত বিধিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা হয়ে ওঠেন রাষ্ট্রপরিচালকদের দাস। এমন দাসত্ব মৌলিক জ্ঞানচর্চার পরিপন্থী। তবু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা অব্যাহত রেখেছেন জ্ঞানচর্চার ধারা।

'শিক্ষক' সম্পর্কে আমাদের সমাজ বেশ ভণ্ড, হাস্যজনক, ও পীড়নকারী মনোভাব পোষণ করে। একটি বুলি, 'শিক্ষকেরা শ্রদ্ধেয়', খুবই শোনা যায় আমাদের সমাজের চারদিকে; কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় বিপরীত আচরণ। কেউ কারো চেয়ে সহজাতভাবে বা পেশাগতভাব বেশি শ্রদ্ধেয় হ'তে পারে না, তবু শিক্ষক জ্ঞান দিয়ে থাকেন ব'লে বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠতে পারেন জ্ঞানার্থীর কাছে। কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্র শিক্ষকদের সাথে যে-আচরণ করে, তাতে শ্রদ্ধার মাত্রাধিক্য ঘটে না, বরং পীড়নকারী মনোভাবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমাদের সমাজ শিক্ষকদের অসহায় ও দরিদ্র দেখতে পছন্দ করে, যেনো শিক্ষকের দারিদ্র্যই তার শ্রদ্ধেয় হওয়ার চাবিকাঠি। কিন্তু দরিদ্রকে কেউ সম্মান করে না, তাই দরিদ্র শিক্ষককেও করে না। প্রাথমিক-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কথা ছেড়েই দেয়া যায়, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটা বড়ো অংশ বাধ্য হন যে-জীবনযাপনে, তা জ্ঞানসাধনার সহায়ক নয়। যাঁর জীবনের প্রাথমিক চাহিদাগুলো অপূর্ণ, তাঁর থেকে অসামান্য কিছু প্রত্যাশা করা যায় না। তারপর বিশ্ববিদ্যালয় এমন কোনো সহায়তা দেয় না, যা শিক্ষকদের জ্ঞানচর্চায় উৎসাহিত করতে পারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উঁচু পর্যায়ের শিক্ষকের অবস্থা বিচার করা যাক। তিনি যে-বেতন ও বাড়িভাড়া পান, তাতে তাঁর বিশ দিন চলে, ও বাড়িভাড়ার শতকরা ষাটভাগ শোধ করা যায়। তাঁর জীবনের মূল এলাকাতেই সংকট বিরাজমান। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে একটি ছোটো কক্ষে তিনি ও তাঁর এক সহকর্মী বসেন; মোটামুটি বারো বর্গফুট এলাকায় তাঁরা দুজন জ্ঞানঅর্জন ও বিতরণ করেন। তাঁর ঘরের পর্দাটি তিনি নিজেই কিনেছেন, কেননা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর জন্যে একটি পর্দারও ব্যবস্থা করতে পারে নি। কাগজপত্র, পেন্সিল, কলম, টুকিটাকি প্রয়োজনীয় জিনিশ তিনি নিজেই কেনেন, কেননা বিভাগ ওগুলো সরবরাহ করতে পারে না। বিভাগ তাঁকে একটা গ্লাশ ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টাওয়েল দেয়, কেনো দেয় তিনি বুঝতে পারেন না। তাঁর টেবিলটি উচ্চমান করণিকের, তাঁর চেয়ারটি জীর্ণ, ছাত্ররা যেগুলোতে বসে সেগুলো জীর্ণতর। বিভাগে দুজন পিয়ন আছে, তারা চেয়ারম্যানকে নিয়েই ব্যস্ত। তাঁর ডাকে কোনো পিয়ন সাড়া দেয় না, তাঁর কিছু টাইপ করাতে হ'লে ছুটে যেতে হয় বাইরে, বা বিভাগীয় টাইপিস্টকে বারবার অনুরোধ ক'রে এক সপ্তাহে দু-পাতা টাইপ করাতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে জিরোক্স করার সুবিধা আছে, কিন্তু তিনি সরাসরি জিরোক্স করাতে পারেন না নিজের পয়সায়ও, সভাপতির সম্মতি লাগে। এ হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উচ্চপদস্থ শিক্ষকের সুযোগসুবিধা; এতে তো ফাইলও লেখা যায় না, মহাগ্রন্থ লেখা দূরের কথা। আধুনিক কালের মহাগ্রন্থ কীভাবে লেখা হয় তা আমরা জানি : প্রধান লেখকের সহায়করূপে থাকেন কয়েকজন সহকারী, যাঁরা তাঁকে বাঁচিয়ে দেয় অনেক শারীরিক শ্রম থেকে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা যাঁরা গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁরা মানস প্রেরণাতেই রচনা করেন; বিশ্ববিদ্যালয় তাতে কোনো উৎসাহ দেয় না। আরো একটি প্রসঙ্গ তোলা দরকার; এককালে শিক্ষকদের গুরু জ্ঞান করা হতো, আর এখন বিবেচনা করা হয় প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরূপে; বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তো অনেকটা মূল্যায়নই করা হয় উপসচিব, যুগ্মসচিব প্রভৃতির সাথে তুলনা ক'রে। কিন্তু শিক্ষকেরা কর্মচারী নয়, যে-অর্থে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা কর্মচারী।

ঐতিহাসিকভাবে ক্ষমতাবঞ্চিত আমাদের সমাজের মানুষেরা ক্ষমতা খুব ভালোবাসে; স্বেচ্ছাচার তাদের খুবই পছন্দ। আমরা জাতিগতভাবে এমন ধারণা পুষি যে যদি স্বেচ্ছাচার করতে না পারি, যাকে তাকে মারতে কাটতে পদচ্যুত করতে না পারি, তাহলে ক্ষমতা কিসের? তাই সারা সমাজ ক্ষমতালোভী, ও স্বেচ্ছাচারী। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গৌণ এলাকা হচ্ছে প্রশাসন, কিন্তু ওই এলাকাতেই ক্ষমতা বিরাজ ক'রে ব'লে ওটাই হয়ে উঠেছে মুখ্য এলাকা। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের প্রধান উপাচার্য; ক্ষমতামোহ এ-পদটিকে অন্যায়ভাবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ক'রে তুলেছে। এ-পদটিকে ঘিরেই জড়ো হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত সম্পদ ও ক্ষমতা। প্রত্যাশা করতে পারি উপাচার্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ব্যক্তি, হবেন বিশিষ্ট পণ্ডিত;– তাঁর রচনাবলি সমৃদ্ধ করবে আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার। কিন্তু বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যতালিকা আমাদের সীমাহীনভাবে হতাশ করে : দেখতে পাই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্যরা সাধারণত পণ্ডিত ব্যক্তি নন, তাঁরা আমলামাত্র। এমন অবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে ক্ষতিকর। বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রকৃত জ্ঞানকেন্দ্রে পরিণত করতে হ'লে উপাচার্যপদটি বিশিষ্ট পণ্ডিতদের জন্যেই নির্ধারিত রাখতে হবে। এমন একটি বিধি আরোপ করা যেতে পারে যে যিনি অন্তত দশটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন নি, তিনি উপাচার্যপদের জন্যে উপযুক্ত নন। এমন বিধি ক্ষমতালোভীদের উৎসাহী ক'রে তুলবে জ্ঞানচর্চায়, এবং বিশ্ববিদ্যালয় তথাকথিত রাজনীতি ও আমলাবৃত্তির মুঠো থেকে মুক্তি পাবে। প্রশাসনের অন্যান্য এলাকায়ও প্রাধান্য দিতে হবে পণ্ডিতদের, যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু পাণ্ডিত্যের মহিমাই স্বীকৃত হয়, অন্য কোনো মহিমা নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটা এক আন্তর্জাতিক ও সর্বকালিক ব্যাপার যে বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজনীতি বেশ ঘনিষ্ঠজড়িত;– ছাত্রসমাজ বিশেষভাবে রাজনীতিকাতর, আর শিক্ষকেরাও একরকম রাজনীতিক ভূমিকা পালন ক'রে থাকেন। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে, যেখানে দারিদ্র্য ও সংকট জীবনের নিত্যসঙ্গী, শোষণ যেখানে অবাধ, ব্যক্তিস্বাধীনতা যেখানে অস্বীকৃত, সেখানে ছাত্ররাজনীতি চরমভাবেই দেখা যায়। ছাত্ররা এসব দেশে রাজনীতি করে, মিছিলসহ রাস্তায় নামে, কখনো দালানে যানবাহনে আগুন ধরায়, এগুলো বড় ঘটনা, তবে এর চেয়েও বড়ো ঘটনা হচ্ছে এরা প্রতিমুহূর্তে এমন করে না, যদিও এসব দেশের অবস্থা প্রাত্যহিক মিছিল শ্লোগান ধ্বংসাত্মক কাজের জন্যে খুবই চমৎকার। ছাত্ররাজনীতি যারা বন্ধ করতে চায়, তারা খুবই মহৎ মানুষ, বা দেবতা, বা নির্বোধ। যদি শাসকেরা মনে করে যে ছাত্ররা কেনো রাজনীতি করে, তারা খুঁজে বের করবে সে-সমস্ত কারণ, এবং রাষ্ট্রিক ইন্দ্রজালে সমাধান ক'রে দেবে সমস্ত সমস্যা, তাহলে তাদের মহৎ মানুষ, এমনকি দেবতা, ব'লে মানতেই হয়। কিন্তু যদি তারা মনে করে যে জারি করবে তারা বিধিবিধান অনুশাসন, তথাকথিত শৃঙ্খলারক্ষাকারীদের জড়ো করবে মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চার ধারে, এবং পরিচ্ছন্নভাবে বন্ধ হয়ে যাবে ছাত্ররাজনীতি, তাহলে তাদের নির্বোধ গণ্য করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। আমাদের দেশে ছাত্ররাজনীতি ও আন্দোলনের প্রধান প্রেরণা আসে সরকারের কাছ থেকে; সরকার এমন কিছু উদ্যম দেখায় যা আন্দোলনে উৎসাহ দেয়। কয়েক দশক ধ'রেই দেখা যাচ্ছে সরকার শিক্ষা-জ্ঞান ও তার মানে উৎসাহী নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের বিশেষ কোনো আগ্রহ নেই, কিন্তু বিশেষ আগ্রহ আছে তাদের ছাত্ররাজনীতিতে অংশ নেয়ার। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে আমাদের সরকারমাত্রই অতিশাসনে আগ্রহী; তাদের মনোভাব অনেকটা এমন যে যেহেতু তারা শাসক, তাই তারা নিয়ন্ত্রণ করবে সব কিছু;– রাষ্ট্রনীতি থেকে শুরু ক'রে বনের পাখির উড়ালের নিয়মকানুনও। অতি নিয়ন্ত্রণ ও শাসনপ্রবণতা দেশে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সংকট সৃষ্টি করে। তৃতীয় বিশ্বের ছাত্রসমাজের বড়ো অংশ প্রগতিশীল ও বিদ্রোহী; তারা বয়স্কদের শোষণ, সুবিধাবাদ, অন্যায়ের যেমন সংশোধন চায়, তেমনি চায় দেশের সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা। তাই ছাত্ররা অনেকটা বিবেকের ভূমিকাই পালন ক'রে থাকে। তারা আত্মদানেও সমর্থ। দেশবিদেশের উদাহরণ না এনে বাঙলাদেশের দুটি উদাহরণই এখানে উল্লেখ করতে পারি। বায়ান্নোর আন্দোলনের মতো অসাধারণ ঘটনা ছাত্রদেরই সৃষ্টি, তারাই সেদিন বপন করেছিলো বাঙলাদেশের বীজ। সত্তর-একাত্তরে দেশকে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে দিয়েছে ছাত্ররাই; বিবেচক রাজনীতিকদের সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'লে বাঙলাদেশ আজো থাকতো পাকিস্তানের উপনিবেশ। বাঙলাদেশে ছাত্ররা বিদ্রোহী ও ত্রাতার ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু এটা এক ঐতিহাসিক পরিহাস যে প্রাক্তন বিদ্রোহীরা সর্বদা প্রশংসিত, আর সমকালীন বিদ্রোহীদের প্রাপ্য মৃত্যু বা কারাদণ্ড। প্রাক্তন বিদ্রোহীদের নির্দ্বিধায় প্রশংসা করা যায়, প্রগতিশীল থেকে প্রতিক্রিয়াশীল থেকে পতিতা সবাই তাঁদের স্তব করে, তাঁদের লাশের ওপর স্তম্ভ ওঠে; কিন্তু বিপদ শুধু সমকালীনদের নিয়ে– তিরস্কার ও দণ্ডই তাঁদের নিয়তি। কিন্তু যতো দিন নারকী সমাজব্যবস্থা ও ছাত্র থাকবে, ততো দিন থাকবে ছাত্ররাজনীতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিক্ষকদের রাজনীতি নিয়েও কথা ওঠে, ও অভিযোগ তোলা হয় যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা রাজনীতিপরায়ণ। এটাও ভুল ব্যাখ্যার ফল। রাজনীতি এখন সবাই করে; আর শিক্ষকেরা সাধারণত যে-রাজনীতি করেন, তাকে বিবেকের প্রকাশ ব'লে গণ্য করতে পারি; কেননা আমাদের দেশে এমন পরিস্থিতি, দুর্ভাগ্যক্রমে, আসে মাঝেমাঝেই যখন মৌনতা হচ্ছে অসততা ও বিবেকশূন্যতা। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকার বিশেষ বিশেষ শিক্ষককে বিশেষভাবেই রাজনীতিপ্রবণ ব'লে শনাক্ত ক'রে থাকে। এটাও হয় ভুলশনাক্তি। কয়েক দশকে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-শিক্ষকেরা শাসকসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, তাঁদের কিন্তু কোনো সরকারই রাজনীতিদোষদুষ্ট মনে করে না, কেননা ওই ব্যক্তিরা নিজেদের স্বার্থ ছাড়া আর কোনো বিবেকী ভূমিকা কখনোই পালন করে নি। যাঁরাই বিবেকবান তাঁরাই রাজনীতিপ্রবণ এমন ভাবা ভুল। শিক্ষকেরা, বা তাঁদের একটি খণ্ডাংশ, যা করেন, তা হচ্ছে স্বাধীনতা-স্বায়ত্তশাসনের চর্চা; দেশকে শোষণমুক্ত করার চেতনার চর্চা। এটুকু চর্চার অধিকার ও দায়িত্ব যদি তাঁদের না থাকে, তাহলে তাঁদের শিক্ষকত্ব শূন্য বুলি মাত্র।

জ্ঞানের অবাধ, দেশিক ও বিশ্বজনীন চর্চার কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, এবং জ্ঞানচর্চার প্রাথমিক শর্ত স্বাধীনতা স্বায়ত্তশাসন। স্বাধীনতা স্বায়ত্তশাসন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ অধিকার, সমাজ-রাষ্ট্র এ-অধিকার স্বেচ্ছায় অর্পণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর, যাতে বিশ্ববিদ্যালয় চূড়ান্তভাবে সেবা করতে পারে দেশ-জাতি ও সভ্যতাকে। যারা এ-অধিকার হরণ করতে চায়, দেশ-জাতি-সভ্যতার নামে তাদের প্রতিরোধ করা দরকার, নইলে ভবিষ্যৎ জাতি-সমাজ-সভ্যতা অভিযোগ তুলবে যে তাঁদের পূর্বপুরুষেরা জ্ঞানচর্চার পবিত্র অধিকার রক্ষার সমরে না নেমে পরিণত হয়েছিলো অন্ধশক্তিমানদের রক্ষিতায়। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তোরণে বড়ো বড়ো অক্ষরে খচিত থাকা উচিত দক্ষিণ আফ্রিকার উইটওয়াটারসর‍্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাবাণীটি : 'আমরা যারা জ্ঞানচর্চা ও অন্বেষণে এখানে সমবেত তাদের পবিত্র দায়িত্ব এ-মৌলনীতি চিরভাস্বর রাখা যে বিশ্ববিদ্যালয় এমন স্থান, যেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে নরনারীরা মিলিত হয় জ্ঞানান্বেষণ ও জ্ঞানাগ্রসরণের জন্যে। জ্ঞানচর্চায় আমরা স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন যারা বিধিবিধান, অনুশাসন ও অন্যান্য প্রক্রিয়ায় খর্ব করতে উদ্যত হবে, তাদের আমরা প্রতিহত ক'রে জ্ঞানচর্চার স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন যে-কোনো পরিস্থিতিতে রক্ষা করবো। আমরা যার নামে আত্মোৎসর্গিত, তার নাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বইয়ের বিরুদ্ধে

যদি এমন হয় যে মানুষ ও মানুষের সভ্যতা মুখোমুখি হয়েছে বিনাশের, কিন্তু অনুমতি পেয়েছে মাত্র একটি স্মারক রেখে যাওয়ার, তখন কী রেখে যাবে মানুষ? কী রেখে গেলে প্রলয়ের ভেতর থেকে কোটি বছর পর জেগে ওঠা অভিনব মানুষ বা অন্য কোনো গ্রহের আকস্মিক আগন্তুক পাবে মানুষ ও তার সভ্যতার প্রকৃত পরিচয়? মানুষ কি স্মারক হিশেবে রেখে যাবে মোটরগাড়ি, দূরদর্শনযন্ত্র, নভোযান, বা আর কোনো আবিষ্কার, যা নির্ভুল পরিচয় দেবে মানুষের? এসবের কিছুই প্রকৃত পরিচয় দেবে না মানুষের। অমন অভাবিত মুহূর্তে নিজের স্মারকরূপে মানুষকে রেখে যেতে হবে একটি বই। বহুপরিচয়ের ফলে বই আজ বিস্ময় সৃষ্টি করে না, বইকে বেশ সাধারণ বস্তু ব'লে মনে হয়। কিন্তু বইয়ের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানুষের প্রকৃত পরিচয়; তাই বই মানুষের শ্রেষ্ঠ স্মারক। মানুষ বই সৃষ্টি করেছে, আর বই সৃষ্টি করছে মানুষকে; মানুষের সভ্যতা সৃষ্টি করেছে বই, এবং বই সৃষ্টি করেছে মানুষের সভ্যতা। মানুষসত্তার পরম উৎসারণ বই, বা মানুষ ও বই একই সত্তার দুই রূপ। মানুষ এক আশ্চর্য স্রষ্টা, বই তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। বর্ণমালা উদ্ভাবন ক'রে মানুষ পৃথিবী জুড়ে পাতায়, বাকলে, চামড়ায়, মাটিতে ধাতুতে, কাগজে লিপিবদ্ধ করেছে মহাজগতের থেকেও ব্যাপ্ত নিজেকে, আপন সত্তাকে। বই মানুষসত্তার লিপিবদ্ধ রূপ। বইয়ে মানুষ লিপিবদ্ধ করেছে তার আবেগ ও আবিষ্কার, ইন্দ্রিয়ের আলোড়ন, প্রাকৃতিক সত্য, তার বাস্তব, স্বপ্ন ও বিশ্বাস, অর্থাৎ বইয়ে মানুষ ধ'রে রেখেছে নিজেকে। তাই মনে হয় মানুষই বই, আর বইই মানুষ। বইকে কখনো কখনো আয়নার সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে। এটি ভুল উপমা। বই শুধু প্রতিবিম্বিত করে না, প্রকাশ ও ধারণ করে; বই প্রকাশ ও ধারণ করে মূর্ত-অমূর্ত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-ইন্দ্রিয়াতীত সব কিছু। বইয়ের পাশে আয়না জড় বস্তুমাত্র। বই শুধু অবয়বকে নয়, অন্তর্লোককেও প্রকাশ করে, ধারণ করে; এবং অন্তর্লোককে প্রকাশ কর ব'লেই বইয়ের মূল্য। বইকে বস্তু মনে হ'লেও বই বস্তু নয়; বই এক অনন্য সজীব সত্তা। তার প্রাণ আছে, কিন্তু মৃত্যু নেই।

বই মানুষ ও তার বিশ্বলোকের মতোই বিচিত্র। বইয়ের শরীরটি বই নয়, প্রচ্ছদ ও পাতাগুলো বই নয়; পাতাগুলোতে মুদ্রিত বাণীই বই। ওই বাণী অশেষ। বই অসলে অমূর্ত বস্তু। বই মানুষের পরাক্রান্ত আবেগের প্রকাশ, তার অনুভূতিমালার সংকলন; বই মানুষের স্থিরচিত্র, বই মানুষের চারদিকে ছড়ানো রহস্যময় বাস্তব ও ঐন্দ্রজালিক অবাস্তবের ভাষ্য। কোনো বই মানুষের বিশ্বাসের সার, কোনো বই মানুষের অপবিশ্বাসের অসারতা; কোনো বই সত্যের মতো অকরুণ, কোনো বই অভিচারিতা। বই মানুষের বিকাশের ইতিহাস, তার চারপাশের মুখোশপরা প্রাকৃতিক সত্যের মুখোশ-উন্মোচন। কোনো বই বন্দী করে মানুষকে, কোনো বই মানুষকে দেয় মুক্তির মন্ত্র। কোনো বই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদ্যা, কোনো বই অবিদ্যা; কোনো বই জ্ঞান, কোনো বই নির্জ্ঞান। সাহিত্যে ঘটে মানুষের বস্তু ও স্বপ্নলোকের রূপময় উপস্থাপন; সেখানে পাওয়া যায় মানবপ্রজাতিটির অশেষ বৈচিত্র্য ও সৃষ্টিশীলতার পরিচয়। কবিতা, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধে মানুষ বিকাশ ঘটিয়ে চলছে তার অনন্ততার। মহাধ্বংসের মুহূর্ত পর্যন্ত মানুষ নিজেকে পরিবেশন ক'রে যাবে সাহিত্যের বিভিন্ন পাত্রে, তবুও তার আন্তর নির্ঝরধারা নিঃশেষ হবে না। দর্শন বইয়ে পাওয়া যায় সত্য উদঘাটন ও সৃষ্টির সাধনা; বিজ্ঞান বইয়ে উদঘাটিত দেখি বিচিত্র অদৃশ্য সূত্র। বিচিত্র বই বিচিত্রভাবে ধ'রে আছে মানুষকে। বইয়ের বাঙলা শব্দটি, গ্রন্থ শব্দটি, আক্ষরিকার্থে গ্রন্থিত পৃষ্ঠার ভাব জ্ঞাপন করে; কিন্তু এটি ব্যঞ্জনা করে যে বইয়ে মানুষ গেঁথে চলেছে মানুষের বিচিত্র সত্তাকে।

বই অরণ্যে ফোটা ফুল নয়; সকলের অগোচরে আরণ্য নির্জনতায় পরিমল বিলোনোর জন্যে বই লেখা হয় না। বই লেখা হয় অনেকের অন্তরে নিজেকে সংক্রামিত করার উদ্দেশ্যে। বই পড়ার জন্যে। মানুষ বই লেখে, আর মানুষ বই পড়ে। লেখকের কিছু বক্তব্য রয়েছে ব'লে তিনি বই লেখেন; তাঁর শিল্পসৃষ্টির প্রতিভা রয়েছে, তাই তিনি লেখেন বই। তিনি কিছু সত্য বের করেছেন, তা তিনি লিপিবদ্ধ করেন বইয়ে, লেখক কিছু বিশ্বাস ও অবিশ্বাস পোষণ ও প্রচার করতে চান, তাই তিনি লেখেন বই। বই বিচিত্র, তাই বই লেখার পেছনের প্রেরণাও বিচিত্র। কেউ আত্মপ্রকাশের জন্যে, কেউ সত্য প্রকাশের জন্যে বই লেখেন; কেউ খ্যাতিলাভের জন্যে, কেউ পুঁজি আয়ের জন্যে বই লেখেন; কেউ জ্ঞান দেয়ার উদ্দেশ্যে বই লেখেন, কেউ জ্ঞানহরণের জন্যে বই লেখেন। মানুষ বই পড়ে কেনো? বেকন নির্দেশ করেছেন বই পড়ার তিনটি কারণ। তাঁর মতে বই পড়া উচিত আনন্দ, অলঙ্কার, ও সামার্থ্য বা শক্তিলাভের জন্যে। আনন্দ ব্যক্তিগত ব্যাপার, তাই বেকন আনন্দের জন্যে বইপড়াকে গণ্য করেছেন কুঁড়েমি ব'লে। অলঙ্কার বা ভূষণ হিশেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বইপড়াকেও তিনি বিশেষ মূল্য দেন নি। বই পড়লে অনেক চৎমকার কথা জানা যায়, ঠিক সময়ে উদ্ধৃত করা যায় ভালো ভালো কথা, অর্থাৎ অলঙ্কৃত করা যায় নিজের বক্তব্যকে। এটা বেকন ও আমাদের কাছে সমান মূল্যহীন। তিনি সামর্থ্য বা শক্তিলাভের ব্যাপারটিকেই বইপড়ার প্রধান লক্ষ্য ব'লে গ্রহণ করেছেন। বই পড়লে জ্ঞান জন্মে; ওই জ্ঞান প্রয়োগ করা যায় নানা কাজে। বইপড়ার ফলিত দিকটাকেই সর্বোচ্চ মূল্য দিয়েছেন তিনি। বেকন ও তার মানুষ শক্তিপুজোরী। তাই শক্তিসামর্থ্যকেই তিনি আরাধ্য গণ্য করেছেন। বই তাঁর কাছে শক্তিদেবতার মন্দির। বই জ্ঞান দেয়, এবং জ্ঞান শক্তি, এটা সত্য; কিন্তু তা আন্তর শক্তি, বাহ্যশক্তি নয়। পৃথিবীর বাহ্যশক্তিমানেরা বইকে বিশেষ পছন্দ করে না, বরং সন্দেহের চোখে দেখে; কারণ বই থেকে স্থূল পার্থিব শক্তি বেশি অর্জন করা যায় না, বরং পার্থিব দুর্বলতাই বেশি অর্জিত হয়। বইকে যারা ছুঁড়ে ফেলে, তারাই শক্তিমান হয়ে ওঠে। অলঙ্কার হিশেবে বই পড়া সত্যিই কাজের কথা নয়। আনন্দ, যদি গ্রহণ করি শব্দটির গভীর অর্থকে, তাহলে প্রধানত আনন্দের জন্যেই বই পড়া উচিত। এ-আনন্দ ইন্দ্রিয়বিলাস বা ইন্দ্রিয়মন্থন নয়; এ-আনন্দ উপলব্ধি, বোধি ও প্রাজ্ঞতার আনন্দ। আনন্দ শব্দটির শরীরে কিছুটা কালিমা লেগেছে, ওই কালিমাটুকু বাদ দিলে এর যা তাৎপর্য, তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হচ্ছে বই পড়া সুখ দেয়।

বই থেকে মানুষ আনন্দ আহরণ করে বললে মনে হ'তে পারে যে বই বলতে শুধু সাহিত্য বইকেই বোঝাচ্ছি। শুধু সাহিত্য নয়, বই বলতে সব ধরণের বইকেই আমি বোঝাতে চাই। এটা সত্য যে সাহিত্য আনন্দ দেয়। এ-আনন্দ মোটা সুখ নয়; সাহিত্য বিশেষ কোনো ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধাতৃষ্ণা মেটায় না। সাহিত্য জটিল বহুস্তরিক আনন্দ দেয় মানুষকে। মনে করা যাক একটি কবিতা পড়ছি। কবিতাটি আমার চেতনাকে ঋদ্ধ করলো এমনভাবে, যা আমি কোনো দিন পুরোপুরি বুঝে উঠবো না; আমাকে পৌঁছে দিলো এমন উপলব্ধিলোকে, যেখানে এর আগে কখনো উপনীত হওয়ার অভিজ্ঞতা হয় নি; কবিতাটির ভাষায়, ছন্দে, মিলে ও অমিলে এমন কিছু রয়েছে, যা আমার ভেতরে একটি নতুন ভূখণ্ড সৃষ্টি করলো; কবিতাটির কিছু উপমা ও চিত্রকল্প আমার ইন্দ্রিয়কে নতুন সৌন্দর্যে আলোড়িত করলো। কবিতাটি আমার মনুষ্যত্বকে বিকশিত করলো। উৎকৃষ্ট সাহিত্য পড়ার আনন্দ হচ্ছে নিজের বিকাশ-সুখ উপলব্ধির আনন্দ। তবে পৃথিবীর অধিকাংশ বইই সাহিত্য নয়; এবং সেগুলো কোনোরকম আনন্দ দেয়ার উদ্দেশ্যে রচিত হয় না। দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সমাজ, অর্থনীতি ও আরো হাজারো বিষয়ে লেখা হয় বই; এবং এসব বিষয়েই বই লেখা হয় বেশি। এগুলো জ্ঞান দেয়, পাঠককে ক'রে তোলে জ্ঞানী। এসব বিষয়ে শুধু বই যে বেশি লেখা হয়, তাই নয়, সম্ভবত এসব বইই বেশি পড়া হয়। একটি বিশেষ বয়স পেরিয়ে যাওয়ার পর অধিকাংশ পাঠক আর সাহিত্যে আকর্ষণ বোধ করে না, এসব বইয়ের দিকেই আকর্ষণ বোধ করে বেশি। এসব বই যে-জ্ঞান দেয়, তাও একধরনের গভীর আনন্দ। যে-দর্শনগ্রন্থটি পড়ছি, সেটি আমাকে নানা বিষয়ে জ্ঞানী ক'রে তুলছে, ওসব আমার কিছুই জানা ছিলো না। ওই বই থেকে পাওয়া জ্ঞান যে আমি বাস্তব শক্তি হিশেবে ব্যবহার করবো, তা নায়। বইটি থেকে যা পাচ্ছি, তা আমার সত্তাকে পূর্ণতর ক'রে তুলছে। বইপড়ার উদ্দেশ্য প্রাজ্ঞ আনন্দ পাওয়া; ওই আনন্দ মানুষকে পরিণত করে পূর্ণতর মানুষে। অলঙ্কাররূপে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে যে বই পড়ে, সে হাস্যকর মানুষ; শক্তির জন্যে যে বই পড়ে, সে অমানুষ; আর প্রাজ্ঞ আনন্দের জন্যে যে বই পড়ে, সে সম্পূর্ণ মানুষ।

বাই মানুষকে মুক্তি দেয় ও তার বিকাশ ঘটায়; আবার বই মানুষকে বন্দী করে ও তার বিকাশ রোধ করে। যে-বই এক সময় মুক্তি দিয়েছিলো মানুষকে, কিছুকাল পর দেখা যায় সে-বইই বন্দী ক'রে ফেলেছে মানুষকে। অধিকাংশ মানুষ ওই বইয়ের শেকলে আটকে থেকেই ধন্য বোধ করে, এবং অন্যদের আটকানোর জন্যে উদগ্রীব থাকে। যুগে যুগে বইয়ের থাবায় ধরা পড়েছে সমাজ, রাষ্ট্র, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও মানুষ। আরিস্ততল ব'লে গেছেন নাটক এ-রকম, তাই অন্যরকম আর কিছুই নাটক নয়; কেউ ব'লে গেছেন রাষ্ট্র চলবে এভাবে, তাই আর কোনোভাবেই চলতে পারবে না রাষ্ট্র। বই বলেছে পৃথিবী স্থির, তাই অস্থির পৃথিবীকেও স্থির ব'লে মানতে হবে; বই বলেছে সমাজ চারবর্ণে বিভক্ত, তাই মেনে নিতে হবে ওই অমানবিক বিভাজন। বই প্রথা সৃষ্টি করে, আবার প্রথা ভাঙে। প্রথা সৃষ্টি করার সময় বই মানুষের রক্তে মাটি রাঙায়, আবার প্রথা ভাঙার সময়ও মাটি রাঙায়। তাই বইকে বিশ্বাস করতে হবে, আবার অবিশ্বাস করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবে। পড়তে হবে বহু বই; এবং এক-বইয়ের পাঠক সম্পর্কে সাবধান থাকতে হবে সব সময়। বই পুজোর জন্যে নয়, শিরোধার্য করার জন্যে নয়। নিজস্ব চিন্তা ছাড়া বই পড়া বই না-পড়ার চেয়ে খারাপ।

বই মানুষেরই সৃষ্টি; কিন্তু মানুষ বইকে দেখে থাকে রহস্যরূপে। বর্ণমালাই তাদের কাছে রহস্য, তাই ওই রহস্যে খচিত বই তাদের কাছে প্রতিভাত হয় মহারহস্যরূপে। সব সমাজেই লেখাকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়। লেখা কোনো কিছু ভুল হ'তে পারে না, মিথ্যে হ'তে পারে না, খারাপ হ'তে পারে না ব'লে নিরক্ষরেরা বিশ্বাস ক'রে থাকে; মুদ্রিত বস্তু সম্পর্কে অমন ধারণা পোষে সাক্ষরদেরও অনেকে। বিশেষ ধরনের লিপির প্রতিও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বিভিন্ন আবেগে ভোগে। তাই বই সম্পর্কে সবাই ভোগে অতিবাস্তব আতঙ্কে ও মোহে। কিন্তু বই মানবিক অন্যান্য ক্রিয়াকর্ম থেকে অধিক পবিত্র নয়। পৃথিবীর অধিকাংশ পাপ জড়ো হয়ে আছে বইয়ে, তাই বইয়ের প্রতি অতিবাস্তব ভীতি বা মোহ থাকা অসমীচীন। তবু মানুষ এ-ভীতি ও মোহ কাটিয়ে উঠতে হয়তো পারবে না কখনো। একগুচ্ছ কাগজকে নষ্ট করতে অনেকেই দ্বিধা করবে না, কিন্তু ওই কাগজগুচ্ছ যখন বই হয়ে বেরিয়ে আসে, তখন বিশেষ মহিমা তাকে ঘিরে ধরে। মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ে তার প্রতি। প্রতি মাসে আমি সংবাদপত্রগুলোকে ঘর থেকে বের ক'রে দিই, গৃহপরিচারিকা দ্বিধাহীনভাবে সংবাদপত্র দিয়ে আগুন জ্বালায়; কিন্তু ওই সংবাদপত্রের থেকে অনেক তুচ্ছ জিনিশ মলাটে বাঁধাই হয়ে সজ্জিত হয়ে আছে বইয়ের আলমারিতে, কেনো যেনো ওগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারছি না।

বইকে যেমন মানুষ পুজো করে, তেমনি তাকে ভয়ও করে। যে-বই প্রথা সৃষ্টি করেছে, বিশেষ দেয়ালের ভেতর আটকে ফেলেছে মানুষকে, তার বিকাশ থামিয়ে দিয়েছে, মানুষ সে-বইকে পুজো করে; আর যে-বই প্রথা ভেঙে ফেলতে চায়, মানুষকে নিয়ে যেতে চায় দেয়ালের বাইরে, বিকাশ ঘটাতে চায় তার, সে-বইকে মানুষ ভয় করে। পুজো ও ভয় দুটোই শ্রেণীস্বার্থে। শ্রেণীস্বার্থে কতো বই খড়ের মতো জ্বলেছে, পাড়ার পেশল যুবকেরা বহু বই টেনে ফেলেছে পাঠাগারের আলমারি থেকে। কিন্তু প্রতিটি দগ্ধ বই সভ্যতাকে নতুন আলো দিয়েছে। সামন্ত সমাজ সহ্য করে নি বুর্জোয়াভাবের বইকে, বুর্জোয়াসমাজ সহ্য করে না সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার বই; এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সহ্য করে না বিরোধী ভাবধারার বই। প্রতিটি মৌলিক বই দগ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নিয়েই রচিত হয়। বই যেমন বিশেষ সমাজ গ'ড়ে তোলে, তেমনই ধ্বংসও করে, এবং স্থাপন করে নতুন সমাজের ভিত্তি। পৃথিবীতে বহু বই দগ্ধ হয়েছে, কিন্তু পরে আলোকশিখা ব'লে গণ্য হয়েছে; ভবিষ্যতেও বহু বই আগুনের থেকেও লেলিহান মানুষের ক্রোধে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, কিন্তু তার মধ্যে যদি কোনো সত্য থাকে, তবে তা ফিনিক্সের মতো ছাইয়ের ভেতর থেকে নতুন সত্তা নিয়ে জেগে উঠবে। তার ভেতর সত্য না থাকলে উপেক্ষায়ই সেটি আগুনের থেকেও বেশি ভস্মীভূত হবে।

সব বইই কি বই? ধূসর অতীত থেকে আজকের মুখর মুদ্রাযন্ত্রের পর্ব পর্যন্ত রচিত, মুদ্রিত, প্রকাশিত হয়েছে অসংখ্য বই; কিন্তু তার প্রতিটিই বই নয়। অধিকাংশ বইয়ের মলাটই উৎকৃষ্ট অংশ, অনেক বই পড়ার চেয়ে না পড়া বেশি উপকারী। মানুষের সভ্যতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎপাদন ক'রে চলছে অমিত আবর্জনা, বইয়ের আবর্জনায়ও অত্যন্ত দূষিত মানুষের সভ্যতা। অস্কার ওয়াইল্ড বলেছেন, আগে জ্ঞানীরা বই লিখতেন, পড়তো সাধারণেরা; এখন বই লেখে সাধারণেরা, এবং কেউ পড়ে না। কেউ পড়ে না, একথাটি ঠিক নয়; বরং এখন সাধারণের লেখা বইই সম্ভবত পড়া হয় বেশি। বইয়ের প্রাচুর্য, ভলতেয়ারের কথানুযায়ী, মানুষকে মূর্খ ক'রে তুলছে। পৃথিবীতে বইয়ের মতো দেখতে যতো বস্তু রয়েছে, তার নব্বই অংশই লিপিবদ্ধ নির্বুদ্ধিতা। মূর্খ মুদ্রাযন্ত্র পাগলের মতো উৎপাদন ক'রে চলছে বই; পৃথিবী ভ'রে ছাপাখানার গর্ভ থেকে নিষ্ক্রান্ত হচ্ছে চোখঝলসানো আবর্জনা। পুঁজিবাদের পণ্যরাশির মধ্যে বইয়ের স্থান প্রথম দিকেই। বইপণ্য এখন যেতোটা আবেদন সৃষ্টি করে, তার চেয়ে প্রলুব্ধ করে বেশি। পশ্চিমে এখন দেখা দিচ্ছে বইপড়া অশিক্ষিতরা। যে-সব বইয়ের প্রলোভনে প'ড়ে তারা বই কিনছে, পড়ছে, ছুঁড়ে ফেলছে ময়লাফেলার পাত্রে, সে-সব বই মানুষকে শিক্ষিত নিরক্ষরে পরিণত করে। তাই বইমাত্রই পড়ার উপযুক্ত নয়, তবে এখন পড়ার অযোগ্য বইয়ের পাঠকই বেশি। এমন বই প্রতিদিন একটি ক'রে পড়লেও কোনো উপকার হয় না, তবে অপকার হ'তে পারে; আর সারা জীবনে একটিও না পড়লে কোনো ক্ষতি হয় না, তবে উপকার হ'তে পারে।

বই সজীব বীজ;– বই সৃষ্টি করে বই, বই থেকে জন্ম নেয় বই। যে-পৃথিবী মানুষের চারদিকে বইয়ের মতো খোলা, তাকে মানুষ প্রতিমুহূর্তেই পড়ছে, ঋদ্ধ হচ্ছে অভিজ্ঞতায়; তার সংস্পর্শে এসে গ'ড়ে তুলছে নিজের অনুভূতি, আবেগ, উপলব্ধি। কিন্তু তাতে মানুষ পূর্ণ হয়ে ওঠে না। বইও আরেক পৃথিবী, যা বাস্তব পৃথিবীর চেয়েও বড়ো, ও প্রেরণা-দায়ক। বইয়ে সরাসরি সম্পর্ক পাতানো যায় মানুষের শ্রেষ্ঠ ও প্রধান প্রতিনিধিদের সাথে। আমরা অধিকাংশই সামান্য মানুষ, এবং যাদের সহবাসী ও প্রতিবেশী হিশেবে পাই, যাদের প্রীতি ও বৈরিতা আমাদের দ্বিতীয় রক্ত হিশেবে কাজ করে, তারাও সামান্য মানুষ। ঘর থেকে বেরিয়েই আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ ক'রে আসতে পারি না; উদ্যানে পাশাপাশি হাঁটতে পারি না শেক্সপিয়রের সাথে, প্লাতোর সাথে আলাপ ক'রে কয়েকটি দীর্ঘজীবী বিতর্কের নিরসন ঘটাতে পারি না; বা মধুসূদনের সাথে ভাববিনিময় করতে পারি না মদ্য ও মেঘনাদবধ ও মানুষ বিষয়ে। কিন্তু বই খুলে ধরলে তাঁদের সাথে ভাববিনিময় সহজ হয়ে ওঠে। বই কালের প্রবাহকে প্রতিরোধ ক'রে বিভিন্ন কালের মানুষকে মুখোমুখি বসিয়ে দেয়। নিজের নিকৃষ্ট কালে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সঙ্গ পাওয়ার জন্যে রয়েছে বই; আর সমকালের নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গ পাওয়ার জন্যে রয়েছে সংবাদপত্র। তবে ভাববিনিময় বড়ো কথা নয়; বড়ো কথা হচ্ছে বই বীজ হিশেবে কাজ করে আরেক ও অনেক বইয়ের। বাস্তব বিশ্ব যতো বইয়ের প্রেরণারূপে কাজ করেছে, তার চেয়ে বই অনেক বেশি কাজ করছে অন্য বইয়ের অনুপ্রেরণারূপে। কোনো বইতে হয়তো উন্মেষ ঘটছে একটি ভাবনা, ধারণা বা বক্তব্যের, আর অজস্র বই বিকাশ ঘটিয়েছে সে-ভাবনা, ধারণা বক্তব্যের। বইয়ের সাথে মতৈক্য ও মতানৈক্যের ফলে জন্মেছে অজস্র বই। কারো একটি পংক্তিতে পেতে পারি একটি মহৎ ভাবনার বীজ, কারো একটি পাদটীকায় লুকিয়ে থাকতে পারে কোনো সত্যের সূত্র। সুদূরে প্রকাশিত কারো আবেগ আমার ভেতরে জাগিয়ে তুলতে পারে নতুন আবেগ। আধুনিক বাঙলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহিত্যের কথা ধরা যাক। এর প্রতিটি শাখার ভালো বইগুলোর প্রেরণা হিশেবে কাজ করেছে পশ্চিমের কোনো-না-কোনো বই। হোমার-মিল্টনের বই ছাড়া বাঙলায় জন্ম নিতো না মধুসূদনের বই, স্কটের বই ছাড়া উদ্ভব ঘটতো না বঙ্কিমের, শেলি-টেনিসন ছাড়া রচিত হতো না রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা; এবং পশ্চিমে কিছু কবিতা রচিত না হ'লে এ-শতকের আধুনিক বাঙলা কবিতার রূপ এমন হতো না। তাই বই অন্য বইয়ের জননী; বাস্তব পৃথিবীর থেকে অধিক প্রেরণাদায়ক।

বাঙলা বই মানুষের অন্তর ও বাহ্যিক বৈচিত্র্যের প্রকাশ হিশেবে খুবই গরিব। পশ্চিমের বিভিন্ন ভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে লেখা হয়েছে ও হচ্ছে অসংখ্য বই, বাঙলা ভাষায় অমন বই খুবই কম। অনেক বিষয়ে কোনো বইই লেখা হয় নি বাঙলায়। জ্ঞান বা প্রাজ্ঞতায় বাঙালি দরিদ্র; বিশ্বজ্ঞানের কোনো শাখায়ই বাঙালির কোনো মৌলিক দান নেই। বাঙালি কোনো মৌল সূত্র উদঘাটন করে নি; কোনো নতুন তত্ত্ব সৃষ্টি করে নি, সূত্রপাত করে নি শিল্পকলার কোনো নতুন ধারার। কোনো এলাকায়ই বাঙালি মৌলিক স্রষ্টা বা আবিষ্কারক নয়, উদভাবক নয়। বাঙলা জ্ঞানমনস্ক বইগুলো অন্যের সৃষ্টি জ্ঞানের মলিন বিবৃতিমাত্র; এবং অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। পশ্চিমের একজন সাধারণ মননশীল লেখকও মননশীলতার যে-পরিচয় দেন, সাধনা করেন যে-মৌলিকতার, বাঙলার প্রধান মননশীল লেখকদের লেখায়ও তার পরিচয় দুর্লভ। বাঙলার প্রধান ও গৌণ মননশীল লেখকদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে প্রধান মননশীল লেখকেরা পশ্চিমের লেখা থেকে প্রচুর ঋণ নেন, আর গৌণ মননশীল লেখকেরা বিচরণ করেন নিজেদের মৌলিক মূর্খতার মধ্যে। বাঙলার অধিকাংশ মননশীল বই তথ্যের জন্যে উল্লেখযোগ্য, তত্ত্ব বা বিশ্লেষণের জন্য নয়। বাঙলায় লেখা ভালো বই মাত্রই সাহিত্য-বই। আমাদের জীবন, আবেগ, স্বপ্নের প্রকাশরূপে এর কোনো কোনোটি অসামান্য হয়ে উঠেছে, তবে বাঙলা সাহিত্যও বিশ্বের প্রধান সাহিত্যগুলোর তুলনায় সীমাবদ্ধ ও দরিদ্র। পশ্চিমের কবিতা, উপন্যাস, নাটকে যে-বৈচিত্র্য, ব্যাপকতা, পরীক্ষানিরীক্ষা ও অসম্ভবের সাধনা দেখা যায়, বাঙলা সাহিত্যের তা দুর্লভ। যদি শুধু বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বইগুলোর সাথে কেউ পরিচিত থাকে, তাহলে বলা যায় সে পৃথিবীর দ্বিতীয়-তৃতীয় মানের কিছু বইয়ের সাথে পরিচিত।

সমগ্র বাঙলা সাহিত্যের যেখানে এমন অবস্থা, সেখানে বাঙলাদেশের সাহিত্যের শোচনীয়তা ব্যাখ্যা ক'রে বোঝানোর প্রয়োজন পড়ে না। শুধু সাহিত্য নয়, বইয়ের পুরো এলাকাটিই বিবেচিত হ'তে পারে; এবং দেখতে পারি কী শোকাবহ তার অবস্থা। এখানে বেরোয় কিছু সাহিত্য-বই, কিছু পাঠ্যবই। যাকে বলা যেতে পারে জ্ঞানবিজ্ঞানের বই, তেমন কিছু এখানে প্রকাশিত হ'তে দেখি না। বিজ্ঞানের কোনো এলাকাতেই কোনো গুরুত্বপূর্ণ বই লেখা হয় নি বাঙলাদেশে; এবং জ্ঞানের কোনো শাখায়ই বেরোয় নি কোনো গুরুত্বপূর্ণ বই। পৃথিবীর প্রধান ভাষাগুলোতে মৌলিক জ্ঞানের বই, এবং সেগুলোর জনপ্রিয় ভাষ্যই বেরিয়ে থাকে বেশি। দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সাহিত্যতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, জীববিজ্ঞান, বা অন্য যে-কোনো শাখারই নাম করি না কেনো, বাঙলাদেশে এমন কোনো বই বেরোয় নি, যা পশ্চিমের প্রধান বইয়ের কাছাকাছি আসতে পেরেছে। বাঙালির অনেক মাথা, কিন্তু মস্তিষ্কলোক বেশ শূন্য। কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বই লেখা হয়েছে, এবং প্রতি বছরই লেখা হয়, সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে। এ-বইগুলোতে যতোটা আবেগ রয়েছে, ততোটা তথ্য নেই; যতোটা তথ্য রয়েছে, ততোটা প্রাজ্ঞতা নেই। 'আইডিয়া' বা বিমূর্ত চিন্তাভাবনায় কোনো উৎসাহ নেই আমাদের; তাই এখানকার কোনো বই চিন্তাভাবনাজাত নয়, এবং চিন্তাভাবনার উদ্রেক করে না। যেটুকু মগজ রয়েছে আমাদের, তা শ্রান্ত হয়ে পড়ছে দুস্থ পরাক্রান্তঅশীল সমাজ ও রাজনীতি চর্চায়। আমাদের বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে; রয়েছে ছাত্ররা, তাদের জন্যে প্রকাশিত হয় পাঠ্যবই। বাঙলায় লেখা অধিকাংশ পাঠ্যবইই বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্যে। এ-পাঠ্যবইগুলো সাধারণত অপাঠ্য; এগুলো প'ড়ে ছাত্ররা যে কিছু শেখে তাই বড়ো বিস্ময়। রয়েছে আমাদের সংকীর্ণ সাহিত্য। যে-সাহিত্য রচনা করছি আমরা, তা নিয়ে যে আমরা তৃপ্ত ও গৌরবান্বিত, এতেই বোঝা যায় আমাদের দারিদ্র্য শুধু পার্থিব সম্পদের নয়, মনোসম্পদেরও।

পাঠ্যবইয়ের বিষয়টিই প্রথমে বিবেচনা করতে চাই, কারণ পাঠ্যবইই শিক্ষিত মানুষের ভিত্তি। পাঠ্যবইকে সাধারণত উপেক্ষা করা হয়, মর্যাদা দেয়া হয় না; কিন্তু পাঠ্যবই উপেক্ষার জিনিশ নয়, বিশেষ মর্যাদা তার প্রাপ্য। অধিকাংশ মানুষ সারাজীবনে অভিনিবেশের সাথে পড়ে শুধু পাঠ্যবই, বাল্যকাল থেকে তার পাঠজীবনের সমাপ্তি পর্যন্ত পাঠ্যবই ছাড়া আর কিছু পড়ে না। পাঠ্যবই ভিত্তির কাজ করে : পাঠ্যবই তার জ্ঞান, বিশ্বাস, অপবিশ্বাস, শিল্পবোধ, রুচি, প্রবণতা অর্থাৎ সারাজীবনের ভিত্তি। তাই তা দৃঢ় হওয়া দরকার, বিস্তৃত ও গভীর হওয়া প্রয়োজন, যাতে সে শেকড় চালিয়ে সংগ্রহ করতে পারে পর্যাপ্ত জীবনরস। পাঠ্যবই সুলিখিত হওয়া দরকার; তার পেছনে থাকা উচিত মহৎ আদর্শ, সত্যনিষ্ঠা, প্রজ্ঞা। কোনো মিথ্যার স্থান থাকা উচিত নয় পাঠ্যপুস্তকে, থাকা উচিত নয় কোনো ভ্রান্তি, থাকা উচিত নয় কোনো অপবিশ্বাস, কুসংস্কার। তার অবয়বটিও হওয়া উচিত সুন্দর সুখকর। কয়েক দশক আগেও উন্নত ছিলো বিদ্যালয়পাঠ্য বইগুলোর মান, ছিলো সুরুচি ও সৌন্দর্যের সযত্ন ছোঁয়া; কিন্তু এখন ওগুলো পরিণত হয়েছে মুদ্রিত বিভীষিকায়। এগুলোর পেছনে কোনো আদর্শ, প্রজ্ঞা তো নেইই; এমনকি ন্যূনতম শিক্ষার স্পর্শও নেই। এগুলো এখন ভুল ভাষায় ভুল বিষয়ের সমষ্টি। এগুলো প'ড়ে জ্ঞান লাভ অসম্ভব; মোটামুটি শিক্ষা লাভই কঠিন। এগুলো একরাশ মুদ্রিত আবর্জনা। এগুলোকে সম্পূর্ণ নষ্ট ক'রে ফেললে কোনো ক্ষতি হয় না; বরং তাতেই উপকারের সম্ভাবনা বেশি। অন্যান্য বইয়ের কথা ছেড়ে দিচ্ছি; বাঙলা পাঠ্যবইয়ের কথাই ধরি। শ্রেণীতে শ্রেণীতে গদ্য ও পদ্য নামে পাঠ্য হচ্ছে এমন সব রচনা, যেগুলোর অধিকাংশই শোচনীয় নিম্নমানের। শিশুরা, কিশোররা কেনো এগুলো প'ড়ে জীবনের ভিত্তিটাকেই নষ্ট করবে? যে-বয়সে দেয়া দরকার শ্রেষ্ঠ খাদ্য, বিকাশের সুন্দর সে-বয়সে তাদের সামনে নোংরা কাগজে তুলে দেয়া হচ্ছে বিষাক্ত খাদ্য। আমাদের অনেকেরই সাহিত্যপাঠের অভিজ্ঞতা বাঙলা পাঠ্যপুস্তকেই সীমাবদ্ধ। বিখ্যাত অনেককেই একটি কবিতার পংক্তি বলতে বললে তিনি ফিরে যান বাল্যকালে, এবং বাল্যের অখ্যাত বালকটি সাহায্য করে বুড়ো বয়সের বিখ্যাত ব্যক্তিটিকে। তাই পাঠ্যবইতে থাকা উচিত বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলো, যা ওই বয়সের পুষ্টি যোগাবে উদারভাবে। তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বদলে নিকৃষ্ট লেখক ও সম্পাদকেরা নিকৃষ্ট রচনা সাজিয়ে প্রস্তুত করছেন পাঠ্যবই। এগুলো অন্য কোনো পণ্য হ'লে অবিক্রিত থেকে যেতো, কিন্তু পাঠ্যবই ব'লে সাদরে গৃহীত হয়। এগুলোকে পোড়ালে কিছুটা আলো পাওয়া যায়, কিন্তু এগুলো পড়লে এগুলোর ভেতর থেকে শিশুকিশোরের মনে কোনো আলো প্রবেশ করে না। আমাদের সমগ্র পাঠ্যপুস্তকের এলাকাটিই এমন; এটি অরুচি, অশিক্ষা ও আদর্শহীনতার এক অন্ধকার এলাকা।

বাঙলা মননশীলতার এলাকাটি কেমন? স্বাধীনতা একটি জাতির জীবনে নিয়ে আসে সৃষ্টিশীলতা ও মননশীলতা; কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা যেনো নিয়ে এসেছে বন্ধ্যাত্ব। মেধা এখানে খুবই দুর্লভ। আমাদের মননশীলেরা কোনো তত্ত্বে উৎসাহী নন, কোনো বিমূর্ত ভাবনা তাঁদের তাড়িত করে না; কোনো বিমূর্ত প্রশ্ন তাঁদের মনে উত্তর খোঁজে না। মননের সব এলাকায়ই বড়ো বড়ো প্রশ্ন পশ্চিমের মস্তিষ্ককে আলোড়িত ক'রে চলছে; এবং তাঁরা তার উত্তর খুঁজছেন। কোনো এলাকায়ই শেষ কথা বলা হয় নি, প্রতিটি এলাকায়ই আরো অভিনব কথা বলার সুযোগ রয়েছে; কিন্তু সে-সবে আমাদের উৎসাহ নেই। এখানে আমরা যেগুলোকে মননশীল রচনা বা বই বলি, সেগুলো সাধারণত সমাজ, রাষ্ট্র, জীবন সম্পর্কে কিছু তথ্য ও মতের সমষ্টি। মহৎ ঘটনাকে কতোটা সামান্য ক'রে তোলা সম্ভব, তা দেখাতে আমরাই সমর্থ হয়েছি। রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সৃষ্টিশীল ও মননশীল প্রচুর রচনা লিখেছি আমরা, কিন্তু ওই লেখা মহৎ বই হয়ে ওঠে নি। ঘটনা দুটিকে দেখেছি আমরা ব্যক্তিগত আবেগের আয়নায়, অপব্যবহার করেছি ঘটনা দুটির, এবং নানা নিম্নমানের বই লিখেছি। জাতির আবেগের সাথে জড়িত ব'লে ওই সমস্ত বই আদৃত হয়, কিন্তু মননশীলতার মানদণ্ডে বিচার করলে বুঝি অধিকাংশ বইই তুচ্ছ। এমনকি বহুখণ্ডে মুক্তিযুদ্ধের যে-ইতিহাস বেরিয়েছে, যার মহিমা আবেগগত কারণে রটিত হয়েছে ব্যাপকভাবে, যে-গ্রন্থসমষ্টিকে আমরা প্রায় পবিত্র ব'লে গণ্য করতে যাচ্ছি, সেগুলোও মননের দিক থেকে সামান্য বই। জাতি মননশীল হয়ে ওঠে ভাবনাচর্চায়, তথ্যবর্ণনা জাতিকে মননশীল করে না। আমরা জীবন নিয়ে এতো পর্যুদস্ত, জীবনের রুজ্জুতে এতো বাঁধা যে মননের বিমূর্তলোকে ওঠা অসম্ভব আমাদের পক্ষে। এসব বই প'ড়ে কিছু তথ্য পাই, কিছু ব্যক্তিগত বা দলীয় প্রবণতা পাই, কিছু বিশ্বাস ও অপবিশ্বাস পাই, কিছু আবেগ ও ভাবাবেগ পাই, পাই না মননের জ্যোতি।

এজন ভালো পাঠক, যিনি ছাত্রজীবন থেকেই বিভিন্ন ধরনের বই পড়ছেন, এবং পশ্চিমের গুরুত্বপূর্ণ বইগুলো পড়েছেন, তিনি চল্লিশ বছর বয়স্ক হওয়ার আগেই বোধ করবেন যে বাঙলায় লেখা মননশীল লেখাগুলো/বইগুলো তাঁর কাছে আর পড়ার যোগ্য মনে হচ্ছে না। কারণ তিনি যতোটা পড়েছেন, মননশীল লেখকেরাও ততোটা পড়েন নি। তিনি বিভিন্ন বইয়ে ফিরে ফিরে পাবেন পুনরাবৃত্তি, পশ্চিমের কোনো-না-কোনো লেখা থেকে সরাসরি গ্রহণ, একই তথ্যের বারবার পরিবেশন, একই উদ্ধৃতি একই ভাষ্য; যে-লেখকের পড়াশুনোর পরিমাণ তাঁর নিজের লেখার পরিমাণের থেকে কম, তাঁর সাথে কথা বলতে রাজি হন নি স্যামুয়েল জনসন। এখন এখানে থাকলে জনসন কথা বলার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো কাউকে পেতেন না; মননশীলদের লেখা প'ড়ে তিনি সহজেই বুঝতেন তাঁদের লেখার পরিমাণ পড়ার পরিমাণের থেকে অনেক বেশি। আমাদের মননমূলক বইগুলো ছাত্রপাঠ্য বইগুলোর মতোই নিস্প্রভ, তা চেতনাকে নাড়া দেয় না; নতুন জিজ্ঞাসা জাগায় না। সংকীর্ণ দেশের সংকীর্ণ সাংস্কৃতিক অবস্থা বোধ হয় এর চেয়ে উৎকৃষ্ট কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। জীবন ও সমাজ নিয়ে বড়ো বেশি জড়িয়ে পড়া এর কারণ। জীবন এতো বেশি খোঁচা দেয় যে বিশুদ্ধ ভাবনাচিন্তার অবকাশ পাওয়া যায় না। তবে এসব বই সম্বন্ধে নির্মোহ ধারণা থাকা দরকার। বই হিশেবে এগুলোর অধিকাংশই সামান্য।

বাঙলা সাহিত্যের মতো বাঙলাদেশের ভালো বইগুলোও সাহিত্য-বই। কিন্তু মোহহীনভাবে বিচার করা দরকার আমরা যে-সাহিত্য, পাকিস্তান ও বাঙলাদেশপর্বে, সৃষ্টি করেছি, তা কতোটা মূল্যবান? আমরা কি এমন বই লিখতে পেরেছি, যা সমগ্র বাঙলা সাহিত্যের পটভূমিতে বড়ো সৃষ্টি ব'লে গণ্য হ'তে পারে; বা লিখতে পেরেছি এমন বই, যা বিশশতকের বিশ্বসাহিত্যের একটি প্রধান সৃষ্টি? আমরা কি সাহিত্যকে, সাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিককে, বইয়ে দিতে পেরেছি নতুন ধারায়; সৃষ্টি করতে পেরেছি ভাষার নতুন সৌন্দর্য, বা এমন কোনো নিরীক্ষা করেছি, যা উপহার দিতে পারি পৃথিবীকে? এমন কিছুই করি নি; বরং যা করার প্রতিভা থাকার কথা, তাও করি নি। পাকিস্তানি স্বাধীনতা নিস্ফলা ছিলো; এবং মর্মাহত হয়ে বোধ করতে হয় যে বাঙলাদেশি স্বাধীনতা তার চেয়েও নিস্ফলা। পাকিস্তানি স্বাধীনতা কয়েক বছরের মধ্যেই একটি মহান আন্দোলন সৃষ্টি ক'রে খুলে দিয়েছিলো বাঙালি মুসলমানের মনের বন্ধ দরোজাটি; এক যুগের মধ্যে, নিরালোক সামরিক শাসনের মধ্যে, সূচনা করেছিলো এক উজ্জ্বল সাহিত্যস্রোতের। ষাটের দশকে কবিতা ও উপন্যাসের যে-বিকাশ ঘটে, যে-শীর্ষ ছোঁয়ার অভিলাষ দেখি, একাত্তরের পর তা আর দেখি না। কবিতায় ষাটের দশকে তিরিশের কবিতাস্রোতের সাথে সংযোগ গ'ড়ে ওঠে; কবিতা হয়ে ওঠে আধুনিক। বাঙালি মুসলমানের বুক থেকে এই প্রথম আধুনিক চেতনা উৎসারিত হয়। উপন্যাসে লক্ষ্য করি ব্যাপক জটিলতা ধারণের প্রয়াস। স্বাধীনতার পর দেখি সৃষ্টিশীলতার শোচনীয় পরিণতি।

স্মৃতিচারণ ব্যাধিটি এখন খুব ব্যাপক হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। বাঙালি জাতি হিশেবে বেশ স্মৃতিহীন, তার স্মৃতি বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য নয়; কিন্তু স্মৃতিচারণায় আমাদের মননশীলগণ সম্প্রতি ক্লান্তিহীনতার পরিচয় দিচ্ছেন। এটা স্মরণশক্তির প্রখরতার বদলে মগজের পচনশীলতার পরিচয় বেশি দেয়। স্মৃতিচারণ বিকলমস্তিষ্ক বৃদ্ধের লক্ষণ। মস্তিষ্ক কাজ করছে না, কোনো ব্যাখ্যা বা ভাষ্য দেয়া সম্ভব হচ্ছে না তার পক্ষে, তাই তার আশ্রয় স্মৃতি। রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনবিষয়ক বই এখন হয়ে উঠেছে পীড়াদায়ক; বিভিন্ন বিরক্তিকর 'ভাষা-সৈনিক' বিষয়টিকে নষ্ট ক'রে ফেলেছেন। মুক্তিযুদ্ধও এখন স্মৃতির বিষয়। এ-দুটি মহান ঘটনা আমাদের মেধা ও সৃষ্টিশীলতাকে বিকশিত না ক'রে বন্ধ্যা ক'রে তুলেছে। এসব বিষয়ে লেখা হচ্ছে যে-সব বই, তার বড়ো অংশই অপাঠ্য। কিছু প্রবন্ধের বই বেরোয় এখানে; সেগুলোতেও দেখা যায় মননের বদলে আবেগের ও বিনোদনপ্রবণতার পরিচয়। এসব বই প'ড়ে প্রাজ্ঞতার সামান্য ছোঁয়াও বোধ করি না। কেনো পড়বো এসব বই? এসব বইয়ে ফিরে ফিরে পাই স্থূল যাপিত জীবনেরই বিভিন্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবেগ; কিন্তু পাই না বিশুদ্ধ জ্ঞান বা মনন। কোনো দার্শনিক প্রশ্ন নিয়ে কোনো ভাবনার পরিচয় পাই না, নান্দনিক সমস্যাও কারো বিচারের বিষয় নয়, বৈজ্ঞানিক চিন্তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তাই আমাদের মেধার সৃষ্টি যে-সব বই, সেগুলো আমাদের মননদারিদ্র্যেরই প্রকাশ। এসব বই পুরোপুরি বর্জন করলে কোনো ক্ষতি হয় না। মননের এলাকায় আমরা ব্যর্থ।

সৃষ্টিশীলতার এলাকায়ও গৌরব করার মতো বই লিখে উঠতে আমরা পারি নি। উপন্যাস আঙ্গিকটি থেকে গেছে আমাদের আয়ত্তের বাইরেই; জীবনের যে-ব্যাপ্তি ধরা পড়ার কথা উপন্যাসে, তা ধরা পড়ে নি; নতুন নতুন তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেও জীবনকে উপস্থাপিত করার উদ্যোগ নেয়া হয় নি। ফলে আমাদের উপন্যাস সাধারণত বিভিন্ন তুচ্ছ ঘটনার সংকলন। গত চল্লিশ বছরে যতো উপন্যাসরূপী বই বেরিয়েছে, তার মধ্যে চার পাঁচটির বেশি বই উল্লেখযোগ্যতা দাবি করতে পারে না। তাও বাঙলা সাহিত্যেরই পটভূমিতে, সমগ্র বিশশতকের বিশ্বউপন্যাসের প্রেক্ষিতে সেগুলোর মূল্য আরো কম। এখন তো উপন্যাসের স্থান দখল করেছে উপসংস্কৃতি ও বিনোদনব্যবসার অর্ন্তভুক্ত 'অপন্যাস', যেগুলোর কোনো সাহিত্য মূল্য নেই। এসব বই যেমন পরিচয় দেয় না লেখকের সৃষ্টিশীলতার, তেমনি পাঠকের সৃষ্টিশীলতাকেও আলোড়িত করে না; বরং নষ্ট করে পাঠককে। সাহিত্যে জনপ্রিয়তা খুবই সন্দেহজনক ব্যাপার। জনপ্রিয় সাহিত্যমাত্রই নিম্নমানের সাহিত্য, এটা প্রথমেই ধ'রে নেয়া যায়। অধিকাংশ, প্রায় সমস্ত, জনপ্রিয় সাহিত্যের সাফল্য নির্ভর করে লেখক ও পাঠকের বোধ, ভাবনা, আবেগের নিম্নতার ঐক্যবশত। লেখকের কোনো প্রগাঢ় উপলব্ধি নেই, পাঠকেরও নেই; লেখক পরিবেশন করেন অপবোধ, ভাবনা, আবেগ আর পাঠকও তাতেই পরিতৃপ্তি বোধ করেন; এমন অবস্থায়ই রচিত হয় জনপ্রিয় বই। জনপ্রিয় সাহিত্য অসাহিত্য; জনপ্রিয় উপন্যাস শস্তা গল্প– অপন্যাস। টেলিভিশন যেমন নষ্ট করে মানুষের সময় ও সৃষ্টিশীলতা, অপন্যাসও তাই করে। প্রতি বছর যদি শতো শতো অপন্যাস বেরোয় এবং সেগুলোর অজস্র সংস্করণ হয়, তাহলেও সাহিত্য বিন্দুমাত্র উন্নত হয় না; আর একটিও প্রকাশিত না হ'লে কোনো ক্ষতি হয় না সাহিত্যের।

কবিতা আমাদের সাহিত্যের উজ্জ্বলতম এলাকা। বাঙলাদেশের কবিতার যেটুকু মূল্যবান, তার সবটাই পঞ্চাশ ও ষাটের কবিদের প্রতিভাজাত। অর্থাৎ স্বাধীনতা কোনো উল্লেখ্য কবি বা কবিগোত্রের জন্ম দেয় নি। এটা শোচনীয় ঘটনা। আমাদের কবিতা প্রধানত বাহ্যজীবনের কবিতা; জীবনের আঘাতই নানা ঢেউরূপে বিন্যস্ত হয় বাঙলাদেশের কবিতায়। তাই এ-কবিতায় দার্শনিক উপলব্ধি, বৃক্তিগত কোনো আশ্চর্য জগত, অনাবিষ্কৃত কোনো স্বপ্ন ও সৌন্দর্য উদঘাটিত হয় না; জীবনই বিভিন্ন চিৎকার হয়ে ধরা দেয় কবিতায়। কবিতায় জীবন অবশ্যই উপস্থাপিত হবে, কিন্তু যদি শুধু জীবনকে, পরিপার্শ্বকেই পাই কবিতায়, তবে সে-কবিতার দুর্বলতা গোপন থাকে না। কবিতায় জীবনের পরিমিত উপস্থাপন সুখকর শিল্প, অপরিমিত উপস্থাপন ক্লান্তিকর অশিল্প। আমাদের অপরাজনীতিও কবিতাকে অপকবিতা ক'রে তুলছে। এখন বাঙলাদেশে বঙ্কিমচন্দ্র কথিত 'খাঁটি' কবিরা আবার জন্ম নিচ্ছেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিলেন বাঙলা যদি আবার পতনের দিকে না যায় তাহলে আর 'খাঁটি বাঙালি' কবি জন্মাবে না, জন্মে কাজ নেই। এ-কবিরা বাঙালি জাতি ও বাঙলা কবিতা উভয়েরই পতনের সংকেতচিহ্ন। জনপ্রিয় মেলা ও মঞ্চের কবিতা থেকে উদ্ধার করতে হবে কবিতাকে। অকবিদের আক্রমণে কবিতা এখন বিপন্ন।

পাঠককে সচেতন থাকতে হবে বইরূপী সে-সব বই সম্পর্কে, যেগুলো বই নয়। ওই বই উপস্থিত হ'তে পারে মননমনস্ক বইয়ের মুখোশ প'রে, দেখা দিতে পারে সৃষ্টিশীল সাহিত্যরূপে। চিন্তা ছাড়া বইপড়া বইপড়া নয়; তা বই না-পড়ার থেকেও ক্ষতিকর। এখনকার মূর্খ মুদ্রাযন্ত্র ও বিজ্ঞাপনের যুগে প্রতিমুহূর্তে সাবধান থাকা দরকার প্রতিটি ব্যক্তিকে, কারণ চারপাশ তাকে আক্রমণ করার জন্যে খুবই ব্যগ্র। ওই আক্রমণ রাজনীতিরূপে আসে, টেলিভিশনরূপে আসে, সংবাদপত্ররূপে আসে, বইরূপে আসে। আসে জ্ঞানের ছদ্মবেশে, আসে সাহিত্যের পোশাক প'রে। সচেতন পাঠক মুখোশ খুলে চিনতে পারে আসল চেহারাটি; কিন্তু অসচেতনেরা মুখোশের শোভার কাছেই আত্মসমর্পণ ক'রে তার খাদ্যে পরিণত হয়। আমাদের দেশে প্রধান সংস্কৃতির ধারাটি শক্তিশালী নয়; উপসংস্কৃতির ধারাটিই প্রবল। যাঁরা প্রধান সংস্কৃতির ধারাটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, তাঁরাও উপসংস্কৃতিরই অংশ; তাই তাঁরাও বইরূপী অবই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম, বা বিশেষ স্বার্থে নিশ্চুপ থাকতে পছন্দ করেন। মূল্যায়নের অভাবে এখানে তুচ্ছ বই মূল্য পায়, ভালো বই পায় না প্রাপ্যমূল্য। যাঁরা মৌখিকভাবে, বিভিন্ন মঞ্চে, মূল্যায়ন করেন বিভিন্ন ধরনের বই, তাঁদের অসততা সর্ববিদিত; এবং তাঁরা নিম্নরুচিরই প্রচার দিয়ে থাকেন। মূল্যায়ন এখানে নিম্নমুখি নয়; উর্ধ্বমুখি; অর্থাৎ একজন বা কতিপয় রুচিশীল সমালোচকের মূল্যায়ন অন্যরা, সাধারণেরা, গ্রহণ করে না; বরং সাধারণের মূল্যায়নকেই মেনে নিতে হয় সমালোচককে। এমন অবস্থায় অপবই বা অবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে, এটাই স্বাভাবিক; এবং ভালো বই পাবে না গুরুত্ব। অপলেখক বা অলেখক মর্যাদা পাবেন নন্দিত লেখকের, গুরুত্বপূর্ণ লেখক অবহেলিত থাকবেন। অবই, বা অপবই প্রতিটি সামাজে থাকবে, কিন্তু তা হবে উপসংস্কৃতির অংশ, প্রধান সংস্কৃতির নয়। এ-সম্পর্কে সচেতন হ'তে হবে পাঠককে, সমালোচককে, সমাজকে; এবং অপবইয়ের বিরুদ্ধে থাকতে হবে সাংস্কৃতিকভাবে সক্রিয়। বই মানুষ, সমাজ, সভ্যতাকে সৃষ্টি করে; আর অপবই বা অবই নষ্ট করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারী, তার বিয়ে ও সংসার

পিতৃতন্ত্র নারীর জন্যে রেখেছে যে-পেশাটি, তা বিয়ে ও সংসার; এ-ই পিতৃতন্ত্রের নির্ধারিত নারীর নিয়তি। এরই মাধ্যমে নারীকে বিস্তৃত জীবন থেকে সংকুচিত ক'রে, তার মনুষ্যত্ব ছেঁটে ফেলে, তাকে পরিণত করা হয় সম্ভাবনাশূন্য অবিকশিত প্রাণীতে। নারীকে দেয়া হয়েছে বিয়ে নামের অনিবার্য স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন, যার মধ্য দিয়ে সে ঢোকে একটি পুরুষের সংসার বা পরিবারে; পালন করে পুরুষটির গৃহিণীর ভূমিকা, কিন্তু বন্দী থাকে দাসীত্বে। প্রথাগত স্ত্রীর ভূমিকা একটি প্রশংসিত পরিচারিকার ভূমিকা, যে তার প্রভুর সংসার দেখাশোনার সাথে কাম ও উত্তরাধিকার দিয়ে চরিতার্থ করে প্রভুর জীবন। বিয়ে ও সংসার নারীর সম্ভাবনার সমাপ্তি; অবশ্য পুরুষতন্ত্র বিশ্বাস করে না নারীর কোনো সম্ভাবনায়ই, মনে করে দাসীত্বেই নারী লাভ করে পরিপূর্ণতা। এঙ্গেলস (১৮৮৪) পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের প্রতিষ্ঠাকে বলেছেন 'স্ত্রীজাতির এক বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয়'; এর ফলে 'পুরুষ গৃহস্থালির কর্তৃত্বও দখল করল, স্ত্রীলোক হল পদানত, শৃংখলিত, পুরুষের লালসার দাসী, সন্তানসৃষ্টির যন্ত্র মাত্র।' বিয়ে, তাঁর মতে, 'মোটেই স্ত্রী ও পুরুষের সদ্ভাব সূত্রে' দেখা দেয় নি, দেখা দেয় 'নারী পুরুষের একজন কর্তৃক অপরের উপর আধিপত্য হিসাবে'। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের 'স্ত্রী-ই হল প্রথম ঘরোয়া ঝি'। এঙ্গেলস (১৮৮৪) দেখিয়েছেন 'আধুনিক ব্যক্তিগত পরিবার স্ত্রীলোকের প্রকাশ্য অথবা গোপন গার্হস্থ্য দাসত্বের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে... বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্ততপক্ষে বিত্তবান শ্রেণীগুলির মধ্যে পুরুষই হচ্ছে উপার্জনকারী, পরিবারের ভরণপোষণের কর্তা এবং এইজন্যই তার আধিপত্য দেখা দেয়, যার জন্য কোন বিশেষ আইনগত সুবিধা দরকার পড়ে না। পরিবারের মধ্যে সে হচ্ছে বুর্জোয়া; স্ত্রী হচ্ছে প্রলেতারিয়েত।' প্রতিটি পরিবার গ'ড়ে ওঠে একজন ব্রাহ্মণ ও একটি শূদ্রীর সমবায়ে, যাতে পুরুষটি ব্রাহ্মণ নারীটি শূদ্রী। পুরুষই বিয়ে ও সংসারের কর্তা, সে-ই সংসারে সার্বভৌম, তার বিধানই সংসারে ধ্রুব ধর্মগ্রন্থ; নারীটি ওই সংসারের পরিচারিকা। বাড়ির দাসীর সাথে বুর্জোয়া স্ত্রীটির পার্থক্য হচ্ছে দাসীটিকে (যৎসামান্য) বেতন দেয়া হয়, আর নারীটি (কখনো কখনো মর্যাদা ও বিলাসে) রক্ষিত হয়। রোজা লুক্সেমবার্গ তাঁর সময়ের বুর্জোয়া নারীদের বলেছিলেন 'পরগাছার পরগাছা', ম্যাককিনন (১৯৮২) প্রলেতারিয়েত নারীদের বলেছেন 'ক্রীতদাসের ক্রীতদাসী'; এবং মিল রয়েছে দু-শ্রেণীর নারীর মধ্যেই যে তারা একই রকমে শোষিত। রক্ষণশীল বঙ্কিমও 'প্রাচীনা ও নবীনা'য় (১৮৮৭) বলেছেন, 'পুরুষ প্রভু, স্ত্রী দাসী; স্ত্রী জল তুলে, রন্ধন করে, বাটনা বাটে, কুটনা কোটে। বরং বেতনভাগিনী দাসীর কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা আছে, কিন্তু বনিতা দুহিতা স্বসার তাহাও ছিল না।' তবে তারা শুধু শোষক ও শোষিতই নয়, তাদের ভিন্নতা আরো বেশি; শোষকশোষিতরা হয় একই প্রজাতির, কিন্তু স্বামীস্ত্রী ভাবগতভাবে বিধাতা ও ভক্তের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর্যায়ের : হিন্দুমতে পতি পরম গুরু; সে 'স্বামী', 'পতি', বা 'ঈশ্বর'; মুসলমান মতে স্বামীর পায়ের নিচে বেহেস্ত, স্বামী প্রায় সেজদার উপযুক্ত; খ্রিস্টান মতে স্বামীই নারীর ঈশ্বর। মিল্টনের ইভ আদমের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে বলে :

> আমার প্রণেতা ও ব্যবস্থাপক, তুমি যা আদেশ করো
> প্রশ্নহীন আমি মান্য করি; এ-ই বিধাতার বিধি;
> বিধাতা তোমার *বিধি, তুমিই আমার* : এর বেশি কিছু
> না জানাই নারীর সবচেয়ে সুখকর জ্ঞান ও গুণ।

নারী আজো রয়ে গেছে হাওয়ার পর্যায়েই।

সমাজ বিয়ে ও সংসারের নামে নারীর জন্যে বিধিবদ্ধ করেছে এ-ভবিতব্যই। বিয়ের জন্যে দরকার পুরুষ ও নারী দুজনকে; তবে বিয়েতে তাদের ভূমিকা সমান নয়; পুরুষ বিয়ে করে, নারী বিয়ে বসে, নারীকে বিয়ে দেয়া হয়, নারীর বিয়ে হয়। পুরুষ সক্রিয়, নারী অক্রিয়; তার বিয়ে হয় অন্যদের দৌত্যে, বা প্রাকৃতিক ক্রিয়াকলাপের মতো। প্রতিটি পিতৃতন্ত্র বিয়ের যে-বিধান তৈরি করেছে, তা সম্পূর্ণ পুরুষের স্বার্থে প্রস্তুত, নারীর স্বার্থ তাতে দেখা হয় নি; নারীকে ব্যক্তি হিশেবেই গণ্য করা হয় নি। হিন্দু বিধানে বিয়ে নারীবলি, মুসলমান বিধানে বিয়ে চুক্তিবদ্ধ দেহদান, খ্রিস্টান বিধানে বিয়ে নারীর অস্তিত্ব বাতিল। বিয়ে পুরুষ ও নারীর কাছে ভিন্ন ব্যাপার; বিয়ে দুটি অসম মানুষের স্থায়ী বা অস্থায়ী সম্পর্ক, ও চুক্তি, যাতে বাতিল হয়ে যায় নারীটির স্বায়ত্তশাসন। তবে বিধানের থেকে অনেক মানুষ উৎকৃষ্ট ব'লে সব সময় বিধানের পীড়ন সহ্য করতে হয় না নারীকে, কিন্তু গোপনে সে মেনে নেয় নিজের ভাগ্য। পুরুষ স্বাধীন সম্পূর্ণ ব্যক্তি, সে উপার্জন করে, উপার্জনই তাকে প্রতিষ্ঠা করে ব্যক্তি হিশেবে; নারী করে গৃহস্থালি ও গর্ভধারণের কাজ, যা কখনো তাকে পুরুষের সমকক্ষ ক'রে তোলে না। মনু [৯:৩] যে বলেছেন, 'নারীকে কুমারীকালে পিতা, যৌবনে স্বামী ও বার্ধক্যে পুত্ররা রক্ষা করবে, নারী কখনোই স্বাধীন থাকার যোগ্য নয়', এটা সব পিতৃতন্ত্রেরই বিশ্বাস; নারীকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিলে বিপন্ন হয়ে পড়ে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারসংস্থা। নারী কখনোই স্বায়ত্তশাসিত নয়; সে বিয়ের আগে বাপের বাড়িতে আশ্রিত থাকে, বিয়ের ফলে ঘটে তার প্রভুবদল; পিতার বদলে স্বামীটি হয় তার নতুন প্রভু। এক প্রভু ধর্মীয় বা সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে তাকে হস্তান্তরিত করে আরেক প্রভুর কাছে; এ-হস্তান্তরণ চুক্তি সাধারণত সম্পন্ন হয় দু-প্রভু, শ্বশুর ও জামাতার, মধ্যে। বিয়েতে নারী পাত্র নির্বাচন করে না, কিন্তু বিধান ও সামাজিক পরিস্থিতি অনুসারে তার পক্ষে অবিবাহিত থাকাও অসম্ভব; তাই বিয়ে তার জন্যে জীবিকার একমাত্র উপায়। বিয়ের মধ্য দিয়েই নারীর ব্যবস্থা হয় জীবনধারণের; তার অস্তিত্বের যে কিছুটা মূল্য আছে নারী তা প্রমাণ করে বিয়ের মধ্য দিয়েই; বিয়ে ছাড়া তার অস্তিত্বের কোনো মূল্য নেই, বিয়ে ছাড়া তার অস্তিত্ব পিতৃতন্ত্রের কাছে আপত্তিকর। তবে সমাজ যে চায় অবশ্যই বিবাহিত হ'তে হবে নারীকে, তা নারীর জন্যে নয়; তা সমাজ ও পুরুষের জন্যে।

সমাজ দু-কারণে চায় নারী বিয়ে বসবে, না ব'সে থাকতে পারবে না; হিন্দু পিতৃতন্ত্র এমন ব্যবস্থা করেছে যে নারীকে শেষ নিশ্বাসের পূর্ব মুহূর্তে বা কোনো বস্তুর সাথে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ'লেও অবশ্যই বিয়ে বসতে হবে। নারীর বিয়ে না করা সমাজের সাথে বেয়াদবি, মারাত্মক সমাজদ্রোহিতা। বিয়ে নারীর জন্যে অবধারিত, এর প্রথম কারণ সমাজের জন্যে তাকে সন্তান, সম্ভব হ'লে পুরুষ, উৎপাদন করতে হবে, তাকে মা হ'তে হবে; মানুষ প্রজাতিকে টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব পালন করতে হবে তাকে। তবে পুরুষতন্ত্র মনে করে মানবপ্রজাতিকে টিকিয়ে রাখার ভার পুরুষকেই দিয়েছে প্রকৃতি, নারীর কাজ শুধু অক্রিয় আধারের ভূমিকা পালন করা; নারী যদি আধারের ভূমিকা পালনে সম্মত না হয়, তাহলে পুরুষ, যেমন ফ্রয়েড বলেছেন, নারীর সম্মতির অপেক্ষা না ক'রেই তার জরায়ুতে উৎপাদন করবে মানুষ। দ্বিতীয় কারণ তাকে পরিতৃপ্ত করতে হবে পুরুষের কাম, পরিচর্যা করতে হবে পুরুষের সংসার। নারীর জন্যে বিয়ে পুরুষসেবা, যার বিনিময়ে পুরুষ তার ভরণপোষণ করে। যে-দুটি কারণে নারীকে বাধ্য করা হয় বিয়েতে, তাতে নারীকে মানবিক সমস্ত এলাকা থেকে তাড়িয়ে ঢোকানো হয় জৈবিক এলাকায়, সেখানে তার একমাত্র কাজ প্রাণপোষণ ও লালন। নারী উৎপাদন করে পুরুষের উত্তরাধিকারী; তার ভূমিকাই যদিও প্রধান এতে, কিন্তু তা মুছে দেয়া হয়, সন্তান পরিচয় ধারণ করে শুধু পুরুষের। কামের পরিতৃপ্তি বিয়ের আশুউদ্দেশ্য; বিয়ের দিন কেউ মানবজাতির ভবিষ্যতের কথা ভাবে না, ভাবে যৌনসংসর্গের কথা; এবং ভাবে পুরুষটির দিক থেকে। নারীটি অনাঘ্রাত কিনা, পুরুষটি কীভাবে নারীটিকে ভোগ করবে, ক'রে তৃপ্তি পাবে কিনা, নারীটি কতোখানি উপযুক্ত সম্ভোগের, এসবই সংগোপন বিবেচনার বিষয় হয় সবার। এজন্যেই বিয়ের আগে মেয়ের দেহটিকে নানাভাবে আকর্ষণীয় ক'রে তোলা হয়; আর পুরুষটিকে সুখাদ্য খাইয়ে ক'রে তোলা হয় কামশক্তিমান। বিয়েতে পুরুষের কামই প্রধান, নারীর কামের পরিতৃপ্তি বিয়ের উদ্দেশ্য নয়; পুরুষের কাম মেটাতে গিয়ে যদি নারীর কামও মেটে, তাহলে আপত্তি নেই, যদি না মেটে তাহলে তা আপত্তিকর। বিয়ের বাইরে নারীর কামের পরিতৃপ্তি নিষিদ্ধ। বহুবিবাহের সুবিধা ভোগ করে পুরুষ চিরকালই; হিন্দুধর্ম ও ইসলামে তা স্বীকৃতও; তাছাড়াও পুরুষ মিলিত হয় দাসীর সাথে, পুরুষ উপপত্নী রাখে, বেশ্যাসম্ভোগ করে; কিন্তু নারী একটি পুরুষ ছাড়া আর কোথাও কাম পরিতৃপ্ত করতে পারে না। কামনিষ্ঠতা পুরুষের কাছে প্রত্যাশা করা হয় না, কিন্তু নারীর জন্যে তা বিধিবদ্ধ; নারী ওই বিধান থেকে বিচ্যুত হ'লে পায় চরম শাস্তি।

বিয়ে স্বামীস্ত্রী উভয়েরই জন্যে একই সাথে ভার ও উপকারী, তবে দুজনের পরিস্থিতি ভিন্ন। পুরুষ বিয়ে না করলেও সমাজে গৃহীত হয়, সমাজে গৃহীত হওয়ার একমাত্র শর্তই পুরুষ হওয়া; কিন্তু নারী শুধু বিয়ের মধ্য দিয়েই গৃহীত হ'তে পারে সমাজে। বিয়ে তাকে একটি সংসার দেয়, যদিও সংসারটি তার নয়; সে পরিচিত হয় পুরুষটির পরিচয়ে, অর্থাৎ পুরুষের সংস্পর্শে সে স্থান পায় সমাজে। বিয়ে না হ'লে তার জীবনই নষ্ট। তাই তাকে বিয়ে দেয়ার জন্যে ব্যগ্র থাকে পিতামাতা, তাতে তার মত আছে কিনা তাতে কেউ আগ্রহ বোধ করে না; সমাজ ধ'রেই নেয় বিয়ের জন্যে প্রস্তুত থাকাই নারীত্ব। প্রথাগত সমাজে তার জন্যে ঠিক করা হয় একটি স্বামী; অপ্রথাগত সমাজে তাকে সাধনা করতে হয় স্বামী ধরার। প্রথা-অপ্রথার মিশ্র সমাজে তার অবস্থা হয়ে ওঠে আরো জটিল, তাকে প্রস্তুত থাকতে হয় যে-কোনো পুরুষের জন্যে, আবার তাকে ফাঁদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাততে হয় বিশেষ পুরুষের জন্যে, যেমন বাঙলাদেশে। তবে বিয়েতে সে অক্রিয়; সে বিয়ে করে না, বিয়ে বসে বা তাকে বিয়ে দেয়া হয়। পুরুষ বিয়ে করে অস্তিত্বসম্প্রসারণের জন্যে; বাল্যকাল থেকেই সে তার অস্তিত্বকে সম্প্রসারিত করতে থাকে, বিয়ে তার অস্তিত্বসম্প্রসারণ প্রক্রিয়ার একটি অংশ, তার অস্তিত্বের চূড়ান্ত সার্থকতা নয়। তার জীবন যেমন সক্রিয়তার, বিয়েতেও সে তেমনই সক্রিয়; বিয়ে তার প্রতিষ্ঠার ভিত্তিকে দৃঢ়তা দেয়। বিয়ে নারীকে কিছু অধিকার দেয়; বিয়ের মাধ্যমে সে পায় নিরাপত্তা, তবে সব নারী নিরাপত্তা পায় না, কিন্তু সে পরিণত হয় একটি পুরুষের অস্থাবর সম্পত্তিতে।

বিয়ের ফলে উদ্ভূত সংসার সংস্থাটির প্রধান হয় পুরুষটি; সে-ই হয় সমাজে পরিবার বা সংসারের প্রতিনিধি। একটি পরিবার সৃষ্টি একটি নতুন সামন্ত রাজ্য সৃষ্টির মতো; সেখানে অধিরাজ পুরুষটি, আর নারীটি ওই রাজ্যে লুপ্ত ক'রে দেয় নিজের সত্তা। পশ্চিমে নারীটিকে গ্রহণ করতে হয় পুরুষটির নাম, সে অন্তর্ভুক্ত হয় পুরুষটির ধর্মে ও শ্রেণীতে; তার সমস্ত জীবন বদল করতে হয় একটি নতুন জীবনের সাথে। মূলত নারীর কোনো ধর্ম ও শ্রেণী নেই, সে যে-প্রভুর অধীনে যায় অন্তর্ভুক্ত হয় সে-প্রভুরই ধর্ম ও শ্রেণীতে। নাম বদল নারীকে নতুন শূদ্রে পরিণত করে; হিন্দুধর্ম অনুসারে ব্রাহ্মণ দুবার জন্ম নেয়, কিন্তু নারীও জন্ম নেয় দুবার, দ্বিতীয় জন্ম ঘটে তার বিয়েতে;-শূদ্ররূপে। আমাদের দেশে নারীর নামই ছিলো এক সময় বাহুল্য, তাই স্বামীর নাম গ্রহণ করতে হতো না তাকে; তবে পশ্চিমের প্রভাবে এ-দেশেও বিত্তশালীদের মধ্যে প্রচলিত হয় পুরুষাধিপত্যের এ-রীতিটি। পুরুষতন্ত্র নারীকে কিছুতেই স্বাধীন, নিজের নামেও স্বাধীন থাকতে দেয় না; এর করুণ রূপ দেখা যায় বেগম রোকেয়ার নামে। বাঙলায় পুরুষতন্ত্রের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিলেন যিনি, তাঁর নামের সাথেও পুরুষতন্ত্র স্বামীর নামটি যোগ ক'রে তাঁকে ক'রে তুলেছে রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন। নারীর পক্ষে পুরুষাধিপত্য থেকে মুক্তি পাওয়া এতোই কঠিন। বিয়ের ফলে নারীটি যোগ দেয় পুরুষটির সংসারে, হয় পুরুষটির অর্ধাঙ্গিনী; সৃষ্টি হয় একটি পরিবার। এক সময় পুরুষটি স্ত্রীটিকেই বলতো নিজের 'পরিবার', তবে সে-ই পরিবারে সর্বময়। পুরুষটি যেখানে থাকে বা থাকতে বলে, সেখানে থাকে এবং যেভাবে চলতে বলে, সেভাবে চলে নারীটি। নারীটি ছিঁড়ে ফেলে তার প্রাক্তন জীবনের সাথে সম্পর্ক। নারীটি পুরুষটিকে দেয় দেহ, তার কুমারীত্ব, তাকে থাকতে হয় পুরুষটির একান্ত অনুগত। পুরুষটির কাছে সে হয়ে ওঠে বিকশিত দেহের এক অবিকশিত বালিকা।

পুরুষটির রয়েছে আর্থনীতিক ভিত্তি, নারীটির নেই; পিতৃতন্ত্র সূচনার কালেই নারীকে আর্থ ভিত্তি থেকে উৎখাত ক'রে পুরুষনির্ভরতাকে ক'রে তুলেছে তার ভবিতব্য। আর্থনীতিক ভিত্তি যার নেই, সে পৃথিবীতে দাঁড়াতে পারে না, তার কোনো মেরুদণ্ড নেই। নারী আর্থ মেরুদণ্ডহীন; তার এখনো দরকার 'ভাতার'। স্বামীটি উপার্জন করে, সে গৃহে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে না; সে অংশ গ্রহণ করে সভ্যতায়। নারীটি দণ্ডিত হয় সন্তানপ্রসবের জৈবিক ও সংসারের ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্ত কাজে। নারী শুধু দেহ সৃষ্টি ও দেহ লালনের কাজে নিযুক্ত থাকে ব'লে দেহোত্তীর্ণ হ'তে পারে না; কিন্তু পুরুষটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেহোত্তীর্ণ, সে শুধু সম্ভোগের সময়ই জড়িত হয় দেহের সাথে। পুরুষের জন্যে রয়েছে দু-ই : প্রকৃতি ও সংস্কৃতি; পুরুষ বিয়ের মধ্য দিয়ে তার দেহকে যেমন পরিতৃপ্ত করে, তেমনই গৃহের বাইরে গিয়ে অংশ নেয় দেহোত্তীর্ণ সভ্যতায়। সঙ্গম ও সন্তান সৃষ্টি কোনো মহৎ মানবিক কাজ কিনা, এ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে; তবে পিতৃতন্ত্র একে জরুরি মনে করলেও মহৎ মনে করে না। তাই নারীর কাজে কোনো মহত্ত্ব নেই, সে সভ্যতায় অংশ গ্রহণ করে না। যে-নারীরা সভ্যতায় অংশ নিয়েছে ও নেয়, পুরুষতন্ত্র তাদের মনে করে বিকৃত। অনেকেই মনে করেন জৈবিকতাই যেহেতু নারীকে বন্দী ক'রে রেখেছে আদিম স্তরে, সন্তান ধারণই যেহেতু তার প্রধান সীমাবদ্ধতা, তাই নারীকে মুক্তির জন্যে সন্তান ধারণই অস্বীকার করতে হবে। পুরুষ তার পেশা ও সামাজিক কাজের মধ্য দিয়ে বিকশিত সম্প্রসারিত করে নিজেকে; যখন সে এসবে ক্লান্তি বোধ করে, তখন বিশ্রাম নেয় গৃহের মনোরমতায়। গৃহ পুরুষের জন্যে বিশ্রামকক্ষ, সে গৃহের নয়। বাঙালি কবি, কালিদাস রায়, বলেছেন, 'গৃহই মোদের সব, প্রাণপণে করি তার আঁধার হরণ,/নিভে যদি কার ক্ষতি? গৃহের ক্ষতির আর হয় কি পূরণ।' কিন্তু পুরুষ গৃহের অন্ধকার দূর করার চেষ্টা করে গৃহের বাইরে থেকে, গৃহের ওই অন্ধকারে যে থাকে সে নারী। সে গৃহিণী, কুলবতী, কুলবালা, কুলস্ত্রী, কুলনারী, পুরনারী, পুরস্ত্রী; সে সভ্যতার কেউ নয়, সে গৃহের অন্ধকারের।

প্রসব, পালন ও সংসারের কাজে নিয়োজিত থেকে নারী প্রজাতির সংরক্ষণ করে, এবং নিজে থেকে যায় অপরিবর্তিত। এ-জন্যেই পুরুষতন্ত্র তৈরি করেছে চিরন্তন নারীপ্রকৃতি, চিরন্তনী, শাশ্বতী প্রভৃতি ছক। সে কোনো কিছুর ওপর প্রভাব বিস্তার করে না, সে ঘরের সীমার বাইরে গেলেও ঘর ও বাইরের মধ্যে তার সেতু হয়ে থাকে স্বামীটি। দেশের বিখ্যাত নারীটিরও পরিচয় স্বামীর স্ত্রী হিশেবে; পিতৃতন্ত্র যে-সব নারীকে স্বীকৃতি দেয়, তারাও স্বামীর পরিচয় দিয়েই বোধ করে গৌরব। বিয়ে আজো পৃথিবীর সবচেয়ে প্রথাগত ব্যাপারগুলোর একটি, চলছে প্রথাগত রীতিতেই। বিয়ে চাপিয়ে দেয়া হয় নারীর ওপর, পুরুষের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয় না; কেননা নারীর সামনে আর কোনো পথ খোলা নেই। বিয়ে না হ'লে সে হয় পিতা, ভাই বা অন্য কারো গলগ্রহ দাসী; তার জীবনের একটি নির্দিষ্ট সময় কেটে যাওয়ার পর পিতার বাড়িই তার জন্যে সবচেয়ে অসুখকর, অবিবাহিত অবস্থায় পিতার বাড়িতে থাকা কলঙ্ক। সে অরক্ষণীয়া। বিয়ে তাকে একটি সংসার দেয়। তাই সে একটি স্বামী চায়, এমন একটি স্বামী খোঁজে যার অবস্থান তার অনেক ওপরে। নারী যেহেতু যে-শ্রেণীতে থাকে অর্ন্তভুক্ত হয় সে-শ্রেণীরই, তাই নিজের শ্রেণীউন্নতির জন্যে চায় তার চেয়ে ওপরের শ্রেণীর স্বামী, সমাজও তাই চায়। পেশাজীবী নারীরাও বিয়ে বসে তাদের থেকে অনেক উঁচুপেশার পুরুষের সাথে; দরিদ্র পরিবারে স্বামীস্ত্রীটির মধ্যে আর্থভিত্তির যে-পার্থক্য থাকে, তার চেয়ে বেশি পার্থক্য থাকে সাধারণত পেশাজীবী স্বামীস্ত্রীর মধ্যে; তাই স্বামী থাকে প্রথাগত স্বামী, স্ত্রী প্রথাগত স্ত্রী।

বিয়েতে নারীর কাম কিছুটা মেটে, তবে তার কাম নিজের জন্যে নয়; সে নিজের কাম দিয়ে সেবা করে পুরুষটির। সে দেহদান করে, পুরুষটি তাকে সম্ভোগ করে, বিনিময়ে তার ভরণপোষণ করে। নারীর দেহ সে একটি পণ্যরূপে কিনে নেয়, পণ্যটিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের সুবিধা মতো ব্যবহার করে; কিন্তু এটি পণ্য হিশেবে উৎকৃষ্ট। এটি যেমন অক্রিয়ভাবে ব্যবহৃত হ'তে পারে, তেমনই সক্রিয় হ'তে পারে গৃহস্থালির কাজে : তার কাজ দেহদান, ধারণ-প্রসব ও পালন, ঘরকন্না। এর জন্যে তাকে কোনো বিশেষ যোগ্যতা অর্জন করতে হয় না, কোনো বিশেষ ঝুঁকিও নিতে হয় না। তাই পেশা হিশেবে নারীর কাছে একে মনে হয় চমৎকার। তার সামনে অন্য কোনো পেশার দরোজা খোলা নেই, কোনো পেশাই তার জন্যে এতো সহজ সুবিধাজনক নয়। তাই পেশা হিশেবে নারীর জন্যে আজো বিয়েই শ্রেষ্ঠ পেশা। অপদার্থ উচ্চ ও মধ্যবিত্ত নারীরা এর সুবিধা ভোগ করে চরমভাবে; তারা দেহদান ও প্রসবের জৈবিক ভূমিকা পালন ছাড়া আর কোনো ভূমিকাই পালন করে না। উচ্চ ও মধ্যবিত্ত নারীদের জন্যে বিয়ে আকর্ষণীয় পতিতাবৃত্তি; তাই তাদের নিজেদের বা অভিভাবকদের প্রধান উদ্বেগ একটি উৎকৃষ্ট খদ্দের বা স্বামী সংগ্রহ করা। তারা দরকার হ'লে স্বামী কিনে নেয়। এরা সুবিধাজনক পেশার আলস্যে অপদার্থ হয়ে উঠে এক সময় দেহদানের যোগ্যতাও হারিয়ে ফেলে; তখন তাদের আমলা, লুণ্ঠতরাজদক্ষ পতিরা খোঁজে নতুন নারী। এরা বাস করে কারুকার্যখচিত আরামদায়ক কারাগারে, এবং কাজ করে নারীমুক্তির প্রতিপক্ষরূপে।

অবিবাহিত নারীর কামপরিতৃপ্তি পৃথিবীর অধিকাংশ জুড়ে নিষিদ্ধ; পশ্চিমের মুক্ত সমাজে তার পক্ষে কাম পরিতৃপ্ত করা আর অসম্ভব নয়, কিন্তু অত্যন্ত নিষিদ্ধ পূর্বাঞ্চলে। বিবাহিত নারীর বিবাহবহির্ভূত কামসম্পর্ক আইনগত অপরাধ, কিন্তু অবিবাহিত নারীর কামসম্পর্ক আরো মারাত্মক অপরাধ। কাম চাইলে নারীকে বিয়ে করতেই হবে। মাতৃত্বের জয়গান গাওয়া প্রতিটি পিতৃতন্ত্রের অভ্যাস, কিন্তু পিতৃতন্ত্র বিশুদ্ধ মাতৃত্বে বিশ্বাস করে না; বিশ্বাস করে বিবাহিত মাতৃত্বে। মাতৃত্ব বিবাহিত নারীর গৌরব, অবিবাহিত নারীর কলঙ্ক। তাই তরুণীর জীবনের লক্ষ্যই বিয়ে, কিন্তু বিয়ে কোনো তরুণের জীবনের লক্ষ্য নয়। তার লক্ষ্য আর্থনীতিক সাফল্য, বিয়ে তার জীবনের একটি কাজ। আজকের তরুণের চোখে বিয়ে আগের মতো মোহ সৃষ্টি করে না, এটা তার কাছে বোঝাই মনে হয়, কেননা বিয়ের উপকারিতা আগের থেকে অনেক ক'মে গেছে। পশ্চিমে থাকা, খাওয়া, কামযাপন করা সম্ভব সংসার পাতার থেকে অনেক সহজে; পুবে বিয়ের বাইরে কামযাপন প্রায় অসম্ভব ব'লে আজো বিয়ের প্রতি তরুণদের আগ্রহ রয়েছে। বদ্ধ সমাজ বিয়েতে প্ররোচিত করে, মুক্ত সমাজ বিয়েতে অনীহ করে; বিয়ে মুক্তির নয়, বন্ধনের ব্যাপার। বাঙলায় একে 'বিবাহবন্ধন'ই বলা হয়ে থাকে। বিয়ে জীবনকে কিছুটা চরিতার্থ করে; বিয়ে নরনারীকে নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি দেয়, কামের পরিতৃপ্তি ঘটায়, সন্তান ও সংসার দেয়; নিরর্থক জীবনকে প্রথাগতভাবে অর্থপূর্ণ ক'রে তোলে। তবে পুরুষ যে বিয়ে খুব চায়, তা নয়; নারীই পুরুষের মধ্যে এ-চাওয়া সৃষ্টি করে। অধিকাংশ সমাজেই এখনো বিয়ে ঠিক করা হয়, তাতে উদ্যোগ নেয় পাত্রীপক্ষই বেশি, কেননা বিয়ে ছাড়া নারীর জীবনে কোনো সাফল্য নেই, কোনো ভবিষ্যৎ নেই। সব দেশেই কনে দেখার রীতি প্রচলিত ছিলো; বাঙলাদেশে আজো আছে। গ্রামে মেয়েরা চরম লাঞ্ছনার মধ্যে আজো নিজেদের দেখায়, রূপ ও বিদ্যার পরীক্ষা দেয়; শহরেও কোনো নিউ মার্কেট, বিপনিবিতানে পিতামাতারা প্রদর্শন করে কন্যাদের। তাদের মাংস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পছন্দ হ'লেই পুরুষেরা এগিয়ে আসে।

তরুণীরা বিয়ের প্রতীক্ষা করে, তবে ভয়ও পায়; কেননা বিয়েতে তাদের ঠেলে ফেলা হয় জীবনের পরিণতিতে, যার ওপর তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। বিয়ে নারীটির জন্যে বেশি উপকারী পুরুষটির থেকে, বিয়ে ছাড়া তার আর কোনো পরিণতি নেই; তবে বিয়েতে ত্যাগ স্বীকার করতে হয় নারীকেই, পুরুষকে কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে হয় না। নারীটিকে ছিঁড়ে ফেলতে হয় তার অতীতের সাথে সম্পর্ক, যে-জীবনের মধ্যে সে বেড়ে উঠেছে সেখান থেকে বিয়ে তাকে উপড়ে নিয়ে স্থাপন করে অন্য জীবনে, দিন দিন অচেনা হয়ে যায় তার পরিচিত মুখ আর দৃশ্যগুলো। তাই বিয়ে যতোই ঘনিয়ে আসে ততোই উদ্বিগ্ন বোধ করে তরুণীরা, ভবিষ্যৎ জীবনের চিন্তা যেমন তাদের বিপন্ন করে তেমনই দুর্বহ হয়ে ওঠে একটি পুরুষের কাছে আত্মদানের ভাবনা। তারা বোঝে এ-ই তাদের জন্যে ভালো, এ-ই তাদের জীবনের লক্ষ্য, এ-ই তাদের জীবনসমস্যার শ্রেষ্ঠ সমাধান, তবু মনের তলে থাকে ভয়। বিয়ে তাদের জন্যে নিরুদ্দেশ যাত্রা; যদি ওই যাত্রার শেষে থাকে কোনো সব পেয়েছির দেশ, তাহলে চমৎকার, নইলে তা বিভীষিকা। পৃথিবীর অধিকাংশ মেয়ের জন্যে বিয়ে আনন্দ নয়, পরিত্রাণ; কিন্তু বিপর্যয়ের সম্ভাবনার কথাও তাদের বুকে জেগে থাকে। মুসলমান সমাজে বিয়ের কথা মনে এলেই তালাকের কথাও মনে আসে; এ-তালাক পশ্চিমের বিবাহবিচ্ছেদ নয়। পশ্চিমের নারী আজ অসহায় নয়, বিবাহবিচ্ছেদ তার জন্যে বিপর্যয় নয়, কিন্তু দরিদ্র সমাজে তা খড়গের মতো নারীটির মাথার ওপর ঝুলতে থাকে।

প্রেম এখন কিংবদন্তির মতো চারপাশে ছড়ানো, এটা এক আধুনিক পুরাণ; তবে প্রেম বিয়ের ভিত্তি নয়, এমনকি বিয়ের সিমেন্টও নয়। বিয়েতে চাওয়া হয় না যে নারীপুরুষ পরস্পরকে ভালোবাসবে প্রেমিকপ্রেমিকার মতো, এমনকি নারীটিকেও প্রেমের দায়িত্ব দেয়া হয় না; তার কাছে চাওয়া হয় সে পালন করবে স্ত্রীর দায়িত্ব। প্রেম নয়, তার কাছে কাম চাওয়া হয়; স্ত্রী হ'তে হ'লে তাকে এ-শর্তটি অবশ্যই পূরণ করতে হবে। তবে তাকে মানতে হবে যে বিয়ের বাইরে সে কোনো কামসম্পর্ক পাতবে না; পুরুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এটি, তবে তা মানা হয় না, কঠোরভাবে মানতে হয় শুধু নারীকেই। পুরুষ আজো একপতিপত্নী বিয়ে মেনে নেয় নি, বিয়ের বাইরে পুরুষের কামপরিতৃপ্তির অজস্র রাস্তা খোলা রয়েছে। বিয়ে নারীর কামতৃপ্তির জন্যে নয়, তার কামদমনের জন্যে। নারীর কামতৃপ্তি বিবেচনার বিষয় ব'লে মনে করে না সংসারসংস্থাটি, মনে করে নারী ক্ষণিক সুখের বদলে বহন করবে দীর্ঘ গর্ভ ও প্রসবের বেদনা। বাইবেলে স্পষ্টভাবেই উচ্চারণ করা হয়েছে অভিশাপটি : 'আমি তোমার গর্ভবেদনা অতিশয় বৃদ্ধি করিব, তুমি বেদনাতে সন্তান প্রসব করিবে' [*আদিপুস্তক*, ৩:১৬]। পিতৃতান্ত্রিকেরা বিশ্বাস করে যে নারী মর্ষকামী, তার পীড়ন দরকার; পীড়নের মধ্য দিয়েই তার ভেতর জেগে ওঠে মাতৃত্ব। প্রসব নারীর কাছে সুখকর নয়, প্রসবে কোনো অসামান্য অনুভূতি নেই; বিকল্প থাকলে নারী প্রসবের দায়িত্ব থেকে মুক্ত ক'রে নিতো নিজেকে। নারী শুধু মাতৃত্বের যন্ত্রণা ভোগ করবে, তবে পুরুষ চায় শয্যায় তার স্ত্রীটি হবে সমস্ত যৌনাবেদনময়ী অভিনেত্রীর সমষ্টি; তারা নারীকে চায় সব সময় সতী, কিন্তু শয্যায় বারাঙ্গনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ-বিরোধ কী ক'রে সে মেটাবে? যাকে বাল্যকাল থেকে শেখানো হয়েছে কাম খারাপ, সে কী ক'রে মেতে উঠবে শারীরিক প্রমোদে? মঁতেন বলেছেন, 'আমরা একাধারে চাই স্বাস্থ্যবতী, তীব্র, গোলগাল, এবং সতী-অর্থাৎ গরম ও ঠাণ্ডা দু-ই'। এখন এ-অপ-প্রত্যাশার শিকার পূর্বাঞ্চলের নারীরা, যেখানে পুরুষ পাশবিক।

মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিয়ের সময় কনেটিকে কুমারী থাকতো হতো না, বরং বিয়ের আগেই তার সতীত্বমোচন করতে হতো, না হ'লেই তা গণ্য হতো ত্রুটি ব'লে; কিন্তু পিতৃতন্ত্র তার রন্ধ্রে আবিষ্কার করে একটি দামি ছদ। বিয়েতে নারীটির দায়িত্ব চম ৎকারভাবে প্যাককরা অটুট ছদসমৃদ্ধ একটি যোনি স্বামীটিকে উপহার দেয়া [দ্র 'নারী, তার লিঙ্গ ও শরীর']। এটা যে-কোনো তরুণীর মনে জাগায় ভয়, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার মুসলমান দেশগুলোতে আজো তা নববিবাহিত নারীর বিভীষিকা। পৃথিবীর নানা দেশে আজো বাসর রাতের ভোরে শয্যায় খোঁজা হয় রক্ত। বাঙলাদেশে রক্তখোঁজা বিভীষিকা হয়ে ওঠে নি কখনো, তবে আজো তা খোঁজা হয়, পুরুষটি ও তার আত্মীয়রা বিছানায় রক্ত পেলে সুখ বোধ করে। নারীর জন্যে বাসর রাত বলাৎকারের রাত; বাঙলাদেশ ধর্ষণের দেশ, তবু বিয়েতে যতো বলাৎকার সম্পন্ন হয় এখানে তার একাংশও সড়কে বা খেতের আলে হয় না। অধিকাংশ নারী পুলক বোধ না ক'রেই মা, দাদীনানী হয়; অনেকে কামবোধ না ক'রেই মেটায় স্বামীর কাম। যদিও নারীদের কাম অশেষ কিন্তু বিয়ের ফলে অনেকেই কামবোধ হারিয়ে ফেলে, কাম হয়ে ওঠে তাদের জন্যে পীড়ন।

বিয়ে ও সংসার নারীকে দেয় দুটি ভূমিকা : গৃহিণী ও জননীর; প্রথাগতভাবে নারী এ-দুটি ভূমিকা সম্পন্ন করতে পারলেই নারীর জীবন সার্থক ব'লে গণ্য করা হয়। নারীর এ-দুটি ভূমিকাকে খুবই আদর্শায়িত করেছে পিতৃতন্ত্র; সমস্ত ধর্ম সমাজ সংস্কৃতি নারীর এ-দুটি ভূমিকার স্তবগানে মুখর। তবে নারীর এ-ভূমিকা দুটিই নারীর মুক্তির প্রতিবন্ধক, সাম্যের বিরোধী। এ-ভূমিকা দুটিকে পেরিয়ে যেতে না পারলে নারী বন্দী হয়ে থাকবেই, তাকে থাকতেই হবে ঘরে ও আঁতুড় ঘরে। দুটি ভূমিকাই নারীকে পালন করতে হয় গৃহবন্দীত্বের মধ্যে মানবিক সমস্ত ক্রিয়াকলাপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে; এ-ভূমিকা দুটিই নারীকে বহিষ্কৃত করে সভ্যতা থেকে। প্রথাগতভাবে মনে করা হয় নারী বিয়ের পর স্ত্রী, ও মায়ের দায়িত্ব হাসিমুখে চমৎকারভাবে পালন করবে, কেননা এগুলোই তার জন্যে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক, যেনো নারীর জৈবনির্দেশের মধ্যে খচিত হয়ে আছে কীভাবে সন্তানকে দুধ খাওয়াতে হবে, কীভাবে ঢালতে হবে স্বামীর পা ধোয়ার পানি, কীভাবে ইস্ত্রি করতে হবে স্বামীর শার্ট, কীভাবে ব'সে থাকতে হবে শিশুবিদ্যালয়ের পাশের রাস্তায়! প্রথাগতদের ঋষি বঙ্কিম (১৮৮৭) 'নবীনা'র কয়েকটি ত্রুটি ধরেছিলেন :

> তাঁহাদের প্রথম দোষ আলস্য। প্রাচীনা অত্যন্ত শ্রমশালিনী এবং গৃহকর্মে সুপটু ছিলেন; নবীনা ঘোরতর বাবু;...গৃহকর্ম্মের ভার, প্রায় পরিচারিকার প্রতি সমর্পিত। ইহাতে অনেক অনিষ্ট জন্মিতেছে;-প্রথম শারীরিক পরিশ্রমের অল্পতায় যুবতীগণের শরীর বলশূন্য এবং রোগের আগার হইয়া উঠিতেছে।...স্ত্রীগণের আলস্যের আর একটি গুরুতর কুফল এই যে, সন্তান দুর্ব্বল এবং ক্ষীণজীবী হয়। শিশুদিগের নিত্য রোগ এবং অকালমৃত্যু অনেক সময়েই জননীর শ্রমে অনুরাগশূন্যতার ফল।...নবীনাগণ গৃহকর্ম্মে নিতান্ত অশিক্ষিতা এবং অপটু।...তিনি পশুজাতির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভাল হইলে হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীজন্ম নিরর্থক।...গৃহিণী গৃহকর্ম্ম না জানিলে রুগ্নগৃহিণীর গৃহের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ন্যায় সকলই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে; অর্থে উপকার হয় না;...

স্ত্রীলোকের প্রথম ধর্ম্ম পাতিব্রত্য।...নবীনাগণ পতিব্রতা বটে, কিন্তু যত লোকনিন্দাভয়ে, তত ধর্ম্মভয়ে নহে।...ধর্ম্মে যে নবীনাগণ প্রাচীনাদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট, তাহার একটি বিশেষ কারণ অসম্পূর্ণ শিক্ষা। লেখাপড়া বা অন্য প্রকারের শিক্ষা তাহারা যাহা কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হয়েন, তাহাতেই বুঝিতে পারেন যে, প্রাচীন ধর্ম্মের শাসন অমূলক।

এ হচ্ছে প্রথাগতদের বিশ্বাস; এর সবই সহজে বাতিল ক'রে দেয়া সম্ভব, কিন্তু আজো বাতিল হয় নি। নবীনাদের মূল দোষ শিক্ষা; অসম্পূর্ণ শিক্ষা; আর অল্পবিদ্যা সত্যই ভয়ঙ্করী, কেননা তা আরো শেখার আগ্রহ সৃষ্টি করে, এবং প্রথার অন্তঃসারশূন্যতা বুঝতে শেখায়। নারীর স্থান গৃহ, সে গৃহ সাজিয়েগুছিয়ে রাখবে, সংসার ঠিক মতো চলার জন্যে সব কিছু করবে, এ হচ্ছে প্রথাগত বিধান। যে-নারী এটা করে না সে অস্বাভাবিক, অনৈতিক, নারী নামের অযোগ্য। কিন্তু গৃহস্থালির কাজ শুধু নারীকেই কেনো করতে হবে, পুরুষও তা করতে পারে। পুরুষকে রেহাই দেয়া হয় এ-ক্লান্তিকর কাজ থেকে, যাতে পুরুষ অংশ নিতে পারে সভ্যতার কাজে;–রাজনীতি, বিজ্ঞান, ব্যবসা, সাহিত্যে, এমনকি প্রমোদে। বঙ্কিমের যে-প্রবীণারা জল তুলতো, বাটনা বাটতো, তাদের স্বাস্থ্যের যে এতে উন্নতি ঘটতো এমন নয়; পুরুষও তাহলে নিতো স্বাস্থ্যোন্নতির ওই এ-পদ্ধতি। এটা নারীপীড়ন, এবং পীড়ন আদর্শায়িতকরণ। বাইবেলের হিতোপদেশ 'গুণবতী ভার্য্যার বর্ণনা'য় বলেছে যে 'তিনি রাত্রি থাকিতে উঠেন, আর নিজ পরিজনদিগকে খাদ্য দেন', 'তিনি বলে কটি বন্ধন করেন, আপন বাহুযুগল বলশালী করেন', 'রাত্রিতে তাঁহার দীপ নির্ব্বাণ হয় না' এবং 'তিনি আলস্যের খাদ্য খান না': অর্থাৎ গুণবতী গৃহিণী এক সার্বক্ষণিক দাসী। সবাই বাইবেলে বিশ্বাস করে না, কিন্তু বিশ্বাস করে এ-বাণীতে। সংসারের কাজগুলো চাপিয়ে দেয়া হয় নারীর ওপর, ক্লান্তিকর বিরক্তিকর কাজগুলো সম্পন্ন করাই তার জন্যে ধর্ম; এসব কাজ যার জীবনে পুনরাবৃত্ত হয়, তার কোনো সম্ভাবনার বিকাশ ঘটতে পারে না।

সামন্ত ও বুর্জোয়া দু-সমাজই গৃহিণীপনাকে এক মহৎ ভাবাদর্শে পরিণত করেছে, গৃহ ও গৃহিণীর স্তুতি করেছে ও করছে, যদিও উত্তম গৃহিণী উত্তম পরিচারিকা মাত্র। অম্বুজাসুন্দরী নামের এক নারী কবি লিখেছিলেন:

বড় ভালবাসি আমি বঙ্গ-কুল-নারী,
ধীরতা নম্রতা মাখা, ঘোমটায় মুখ ঢাকা
রয়েছে উনন-ধারে চিরকাল ধরি,
বড় ভালবাসি আমি বঙ্গ-কুল-নারী।
নয়নে কজ্জল-দাগ, অধরে তাম্বুল-রাগ
ললাটে সিন্দুর-বিন্দু লক্ষ্মীর আসন,...
বুক-ভরা স্নেহ-ধারা, পতি-প্রেমে মাতোয়ারা
স্থির সরসীর ন্যায় গম্ভীর সুস্থির।

এর কাব্যটুকুর মূল্য নেই; সেটুকু বাদ দিলে সত্য যা থাকে, তা হচ্ছে 'রয়েছে উনন-ধারে চিরকাল ধরি।' গৃহ তার স্থান, তবে গৃহসুখ তার জন্যে নয়; তার কাজ গৃহকে পুরুষদের জন্যে সুখকর ক'রে তোলা। গৃহে তার সমস্ত কাজ পুরুষদের লক্ষ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক'রে, গৃহ তার দ্বিতীয় দেহ; পুরুষের জন্যে যেমন তাকে আকর্ষণীয় করতে হয় দেহখানি তেমনই আকর্ষণীয় করতে হয় গৃহখানিকে। সামন্ত সমাজে নারীর স্থানই গৃহ, তাই নারীকে দেয়া হয়েছে গৃহের সমস্ত ক্লান্তিকর কাজ। ওই কাজগুলো সে যেখানে করতো সে-এলাকাটি হতো গৃহের নিকৃষ্টতম অংশ; গৃহের নিকৃষ্ট অংশে জীবনের নিকৃষ্ট কাজগুলো গৃহিণীকে সম্পন্ন করতে হতো পুরুষের সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি ঘটিয়ে। দরিদ্র নারীদের গৃহ নেই, তবে কাজের অভাব নেই। আধুনিক বুর্জোয়ারা ব্যবসার স্বার্থে সৃষ্টি করেছে পালে পালে গৃহিণী, গৃহিণী সৃষ্টিতে তাদের গবেষণা ও প্রচারের শেষ নেই; তারা আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে চলছে পুরোনো গৃহিণীকে আধুনিক সময়ে প্রতিষ্ঠিত করতে। একটি আদর্শ গৃহিণী সৃষ্টির অর্থ হচ্ছে একরাশ পণ্য বিক্রয়ের নিশ্চিত সম্ভাবনা সৃষ্টি; এবং প্রগতিশীলতা প্রতিরোধ।

গৃহিণী এমন নারী, যে নিজের সমস্ত সম্ভাবনা প্রত্যাখ্যান ক'রে ঢোকে আরামদায়ক বন্দীশিবিরে; সে পণ্য উৎপাদনকারীদের মানসসুন্দরী, যাকে লক্ষ্য ক'রে পৃথিবীর দিকে দিকে ঘুরছে পুঁজিবাদী কারখানাগুলোর চাকা। আদর্শ গৃহিণীর কাজ হচ্ছে পুঁজিবাদী পণ্যে নিজের গৃহ ভ'রে তোলা। ধনী বিশ্বে আদর্শ গৃহিণীদের গন্তব্য বিপনিকেন্দ্র; গরিব বিশ্বে ধনী গৃহিণীদের গন্তব্য বিপনিকেন্দ্র। তাদের স্বামীদের পবিত্র গৃহ ব্যাংক, আর স্থূল মস্তিষ্কহীন আদর্শ গৃহিণীদের পবিত্র এলাকা বিপনিকেন্দ্র। ধনী বিশ্বে গৃহিণীদের গৃহের কাজ করতে হয়; কিন্তু গরিব বিশ্বে দাসদাসী এতোই সুলভ যে ধনী গৃহিণীদের সাংসারিক কাজও করতে হয় না, তবে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র নারীরা ব্যগ্র থাকে নিপুণভাবে গৃহিণীর দায়িত্ব পালন করতে। গরিব বিশ্বে শোষণ সহজ, তাই ধনী গৃহগুলোতে উৎপন্ন হয় একপাল অপদার্থ নারী, যারা দেহসম্ভোগ ছাড়া আর কোনো স্বপ্ন দেখে না। তারা জীবনকে বাতিল ক'রে দিয়ে মনে করে জীবন উপভোগ করছে। গৃহিণীর কাজ এমন কাজ, যা পেশা, আবার পেশা নয়। গৃহিণী হওয়ার জন্যে প্রশিক্ষণ নিতে হয় না, মনে করা হয় যে প্রতিটি নারীর মধ্যেই রয়েছে একেকটি অনন্যসাধারণ গৃহিণী, যে জেগে ওঠে সংসারে ঢুকেই। গৃহিণীর কাজ হচ্ছে পুনরাবৃত্তির পর পুনরাবৃত্তি; আদর্শ গৃহিণী একই কাজ ফিরে ফিরে করে, প্রতিদিন করে, কাজ করতে করতেও তার কাজের শেষ হয় না, তার কোনো অবসর নেই। তার জীবন হচ্ছে রান্না, ধোয়ামোছা, কাপড় ধোয়া, ইস্ত্রি করা, রান্না, ধোয়ামোছা, কাপড় ধোয়া, ইস্ত্রি করা, রান্না। গৃহিণীর কাজকে 'পেশা' বলা পশ্চিমি সুভাষণ; এটি তৈরি করা হয়েছে গৃহিণীর নিরর্থক কাজকে অর্থপূর্ণ ক'রে তোলার জন্যে। যে-কোনো পেশায় রয়েছে বিশেষ অধিকার ও দায়িত্ব, গৃহিণীর কাজে তা নেই; তার বেতন নেই, কাজের নির্দিষ্ট সময় নেই, অনেককে ব্যস্ত থাকতে হয় সারাক্ষণ অনেককে করতে হয় না কিছুই। কোনো পেশায় না থাকাই হচ্ছে গৃহিণীর পেশায় থাকা; বিবাহিত যে-নারী আর কিছু নয়, যে কোনো আর্থযোগ্যতা অর্জন করে নি, সে-ই গৃহিণী। তার কাজকে মর্যাদা দিলে আছে, না দিলে নেই; এমন মহৎ কাজে জড়িত গৃহিণী।

চল্লিশের দশক থেকে পশ্চিমে পুঁজিবাদ আবার বিয়ে, সংসার, গৃহিণীকে গৌরবান্বিত কর ~ সর্বগ্রাসী অভিযানে নামে; তার লক্ষ্য পণ্য বিক্রয়, সে জানে গৃহিণী হচ্ছে আদর্শ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রেতা; তাই নারীকে আবার আদর্শ নারী, খাঁটি গৃহিণী, বিশুদ্ধ মাতা ক'রে তোলার ধর্মযুদ্ধ শুরু করে পুঁজিবাদ। যে-নারী কোনো পেশায় জড়িত, যে নিজে চিন্তা করে, যে ব্যক্তিগত সাফল্যের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত, বিয়ে সংসার পণ্য তার কাছে গৌণ; কিন্তু যে-নারী কোনো বাইরের জগত নেই, তার থাকে বিয়ে, গৃহ, পণ্য, কাম। পুঁজিবাদী মাধ্যমগুলো নিরন্তর প্রচার চালাতে থাকে যে পেশা নারীকে অসুখী করে, পেশা নারীর নারীত্ব নষ্ট করে; নারীর জীবন চরিতার্থ হয় বিয়ে, সংসার, কাম, আর পণ্যে। তারা তরুণীদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দেয় জ্ঞান আর বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে, তাদের মনে এমন ধারণা সৃষ্টি করে যে বিশ্বে কী হচ্ছে তা নিয়ে ঘর্মাক্ত থাকা পুরুষের কাজ; নারীদের কাজ পড়াশুনো চুকিয়ে দিয়ে সতেরোআঠারো বছর বয়সে বিয়ে ও ঘরসংসার এবং মাতৃত্ব ও পণ্যস্তূপে জীবন চরিতার্থ করা। পুঁজিবাদী কারখানাগুলো উৎপাদন করতে থাকে পণ্য, আর প্রচার মাধ্যমগুলো উৎপাদন করতে থাকে খাঁটি গৃহিণী, যারা তরুণী, অগভীর, রূপসী, অক্রিয়; শয্যাকক্ষ, রান্নাঘর, কাম, শিশু, গৃহ যাদের জগত। এদের বার বার শোনানো হয় খাদ্য, পোশাক, রূপচর্চা, আসবাবপত্র ও কামের কথা; তাদের জীবনে নিষিদ্ধ হয়ে যায় জ্ঞান, রাজনীতি, চেতনা, যা কিছু মানবিক। তাদের দীক্ষিত করা হয় এ-ধর্মে যে নারীর বাইরে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভের বাসনা বিকৃতি, তাদের জন্যে পুণ্য হচ্ছে অক্রিয় কাম, পুরুষাধিপত্য ও বিয়োনোর মধ্যে জীবনকে পূর্ণ করা। তাদের শেখানো হয় যে নারীকে হ'তে হবে 'গৃহিণী'; এবং তাদের অহমিকাকে তৃপ্ত করার জন্যে বলা হয় তাদের 'পেশা : গৃহিণী'। তাদের কাজ রান্না, ঘর ঝাঁটা, রান্না, কাপড় ধোয়া, ইস্ত্রি করা, রান্না। চিন্তাজগতের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই তাদের; তারা বই পড়ে না, পড়ে বিনোদনমূলক পত্রিকা, যেগুলোতে থাকে রান্না, রূপচর্চা, গৃহসজ্জার কথা; যেগুলোতে থাকে না কোনো পেশাজীবী নারীর কথা, একমাত্র 'পেশাজীবী' যে-নারী এগুলোতে ফিরে ফিরে স্থান পায়, সে অভিনেত্রী;– পুরুষের প্রধান সম্ভোগপণ্য ও নারীমুক্তির এক বড়ো প্রতিপক্ষ। গৃহিণীর কাজ পশ্চিমে খুব ক'মে গেছে, গৃহে এতো কাজ নেই যে সে কাজে ব্যস্ত রাখবে নিজেকে। হাতে কাজ নেই, অথচ সময়ের অভাব নেই, এমন গৃহিণী কী করতে পারে? সে পারে নিরর্থক কাজকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে। পার্কিন্সনের একটি সূত্র বদলে ফ্রাইডান (১৯৬৩,) নতুন সূত্র তৈরি করেছেন যে 'গিন্নিপনা ফেঁপে সবটুকু সময়কে ভ'রে রাখে'; অর্থাৎ খাঁটি গৃহিণীর হাতে কাজ না থাকলে সে চালডাল মিশিয়ে বাছতে বসে! পেশাজীবী নারী যে-কাজ করবে আধ ঘন্টায়, আদর্শ গৃহিণী করবে চার ঘন্টায়, তার কাজ নেই কিন্তু সময় অনেক। আদর্শ গৃহিণী এক শোচনীয় অপচয়।

গৃহিণীর মহত্তম কাজ প্রসব করা, মা হওয়া। পুরোনো কাল থেকেই সবচেয়ে আদর্শায়িত ভূমিকাগুলোর একটি মা; পিতৃতন্ত্র মায়ের জয়গানে অনেক শ্লোক রচনা করেছে। এর মূল কারণ নারীর মর্ষকামিতার চূড়ান্ত রূপ মা : মা এমন নারী, যার জীবন অপার দুঃখের। মা ভাবমূর্তির মধ্যে গৌরবায়িত করা হয়েছে অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করার শক্তিকে, মা দুঃখের নারীমূর্তি। মা সভ্যতার শ্রেষ্ঠ শহীদ। কিন্তু নারীকে কি চিরকাল বেছে নিতে হবে অপার দুঃখকেই, নারী কি যন্ত্রণা ভোগ ক'রেই পাবে মহিমা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহীদ হওয়াই হবে নারীর নিয়তি? আদি নারীবাদীরা নারীর মা ভূমিকাটিকে প্রত্যাখ্যান করেন নি, তবে আক্রমণ করেছিলেন; শার্লোট পার্কিন্স গিলম্যান (১৮৯৮) পরিহাস ক'রে বলেছিলেন যে অন্য কোনো গ্রহের কোনো সমাজবিজ্ঞানী এসে যদি শোনেন মানবপ্রজাতির কল্যাণের জন্যে 'মায়ের ত্যাগস্বীকারের' কথা, তবে তিনি অত্যন্ত অভিভূত ও মুগ্ধ হবেন। 'কী চমৎকার' বলবেন তিনি। 'কী পরম করুণ ও কোমল! মানবজাতির অর্ধেক সমস্ত মানবিক উৎসাহ ও কাজ ফেলে তাদের সমস্ত সময়, শক্তি ও নিষ্ঠা নিয়োগ করছে মাতৃত্বে! সে-মহান জাতিকে লালন ও পালন করার জন্যে যাতে সে ভালোভাবে অন্তর্ভুক্তও নয়! কী মহান অসামান্য শহীদত্ববরণ! প্রথাগতভাবে নারীদের সারা বছর ধ'রে গর্ভবতী ক'রে রাখাই ছিলো পুরুষের কৃতিত্ব, আর নারীদের গৌরব ছিলো জরায়ুর উর্বরতায়; কিন্তু আধুনিক কালেও যখন পরিবার পরিকল্পনা হয়ে উঠেছে মহাজাগতিক শ্লোগান, তখনও পুঁজিবাদ নারীদের শেখাচ্ছে মাতৃত্বেই নারীর পূর্ণতা; কেননা তা প্রকাশ করে নারীদের মৌল আদিমতা। ফ্রাইডান (১৯৬৩) পেশ করেছেন এক গৃহিণী মায়ের স্বপ্নভঙ্গের তাৎপর্যপূর্ণ স্বীকারোক্তি :

> আমি স্ত্রী ও মায়ের সুন্দর ভাবমূর্তিটি রক্ষা করার জন্যে খুব পরিশ্রম করতাম। আমি আমার সব সন্তান প্রসব করেছি স্বাভাবিকভাবে। আমি তাদের বুকের দুধ দিয়েছি। একবার এক পার্টিতে এক বৃদ্ধার কথায় আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম, যখন আমি তাঁকে বলি যে সন্তান প্রসবই জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, আদিম পাশবিক কাজ, এবং তিনি আমাকে বলেন, 'তুমি কি পশুর চেয়ে বেশি কিছু হ'তে চাও না?'

স্বাভাবিকভাবে সন্তান প্রসব, তাকে বুকের দুধ খাওয়ানো, ঘন ঘন তার কাঁথা বদলানো, তার বিদ্যালয়ের পাশের রাস্তায় ব'সে থাকাতে নারীর মুক্তি নেই। মার্কিন গৃহিণীরা এক দিন দেখতে পায় গৃহ, কাম, সন্তান, স্বামী, আসবাবপত্র তাদের আটকে ফেলেছে; বাতিল হয়ে গেছে তাদের সত্তা। তাকে ধরেছে এক নতুন রোগে, যার নাম 'গৃহিণীর ক্লান্তি', যে-ধারাবাহিক পুলকের জন্যে সে পাগল ছিলো, সে পুলকও দুর্লভ হয়ে উঠেছে, স্বামীও চ'লে গেছে অন্য তরুণীর শয্যায়; তাকে গ্রাস করেছে এমন এক সমস্যা যার কোনো নাম নেই। বিয়ে, কাম, সংসার, মাতৃত্বে মুক্তি নেই নারীর। মানুষ মুক্তি পেতে পারে শুধু মানুষ হয়ে।

বাঙলাদেশে বিয়ে ও সংসার নারীর অনিবার্য তীর্থ; গরিব নারীদের জন্যে তা অবধারিত উৎপীড়নের লীলাক্ষেত্র, মধ্য ও উচ্চবিত্ত নারীদের জন্যে সুখকর বন্দীশিবির। বিয়ে ও সংসার এখন বিশেষ পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে শিক্ষিত তরুণীদের জন্যে; তাদের শিক্ষা সমস্ত লক্ষ্য ও তাৎপর্য হারিয়ে নিরর্থক হয়ে উঠছে। বিয়ে ও সংসার তাদেরও জীবনের প্রধান, একমাত্র, লক্ষ্য; বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া নিরর্থক অপব্যয়। বিয়ে এখানে তরুণীদের অত্যন্ত দরকার, সমাজ তাদের দেয় না অবিবাহিত কামের অধিকার, এবং জীবিকার কোনো নিশ্চয়তা। কিন্তু বিয়ে ও সংসারই জীবনের লক্ষ্য হয়ে বাতিল ক'রে দিচ্ছে জীবনকে। প্রথম উচ্চশিক্ষিত বাঙালি তরুণীদের অনেকেই বিয়ে করেন নি; চিকিৎসক বিধুমুখী, যামিনী, আর রাধারানী, সুরবালা, হেমপ্রভা, লজ্জাবতী বিয়ে করেন নি; বা অনেকে বিয়ে করেছিলেন বেশি বয়সে—চন্দ্রমুখী বসু, ভার্জিনিয়া মেরি মিত্র, কামিনী রায়, সরলা, কুমুদিনী বিয়ে করেন তিরিশ পেরোনোর পর; এবং যাঁরা বিয়ে করেছিলেন, তাঁদের কারো কারো জীবনে শিক্ষা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিলো। প্রথম দিকের স্নাতক কামিনী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রায় বিয়ের আগে কবিতা লিখেছিলেন, বিয়ের পর বিয়ের সুখে এতো পাগল হয়ে যান যে আর কবিতা লেখেন নি; আবার লেখেন যখন স্বামীর মৃত্যুতে মুক্তি পান সংসারের সুখ থেকে। আজো যে তাঁকে স্মরণ করি, তা ওই সুখের বিয়ের জন্যে নয়; কয়েকটি পদ্যের জন্যে। ষাটের দশকেও বাঙলাদেশের শিক্ষিত তরুণীরা বিয়ে ও সংসারের বাইরের স্বপ্ন দেখার চেষ্টা করতো, কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীলতা এখন এতো প্রবল যে তরুণীদের অন্যান্য স্বপ্ন সম্পূর্ণ নষ্ট ক'রে বিয়েকেই ক'রে তোলা হয়েছে একমাত্র দুঃস্বপ্ন। প্রগতিশীলেরাও আজ কন্যাদের সতেরো বছর বয়সে স্বামীর সংসারে পাঠিয়ে জীবন সার্থক করেন। দুর্বার পশ্চাৎমুখিতার ফলে তরুণীদের জন্যে উচ্চশিক্ষা তাদের সমস্যার সমাধান না হয়ে রূপ নিচ্ছে সংকটের; যদি তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে না ঢুকতো, তাহলে ষোলোসতেরো বছর বয়সে কারো সংসারে ঢুকে জরায়ুর সাফল্য অর্জন করতে পারতো, কিন্তু এখন উচ্চশিক্ষা তাদের জন্যে কোনো পেশার ব্যবস্থাও করে না, এবং বিয়ের সম্ভাবনাও নষ্ট করে। আজকের প্রতিক্রিয়াশীল তরুণেরা তাদের পিতামহদের মতো আবার উন্মাদ হয়ে উঠেছে কিশোরীসম্ভোগের জন্যে; তারা চিকিৎসক প্রকৌশলী আমলা হয়ে ব্যগ্রতা বোধ করছে দশম শ্রেণীর বালিকার দেহ ভোগের জন্যে। তারা শিক্ষাকে ভয় পায়, শিক্ষিত নারীকে ভয় পায়, তারা তৃপ্তি বোধ করে নির্বোধ বালিকায়।

বিয়ে, একপতিপত্নী বিয়ে, সংসার ও মাতৃত্ব সম্প্রতি নারীবাদীদের তীব্র আক্রমণের বিষয় হয়েছে; কারণ প্রধানত এরই মাধ্যমে পীড়ন করা হয় নারীদের, বাতিল ক'রে দেয়া হয় তাদের সত্তা। নষ্ট ক'রে দেয়া হয় তাদের সম্ভাবনা, তাদের মেধা ও প্রতিভা। আমি কতিপয় নারীকে জানি, যাঁরা ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী, কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় ও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় থেকে, কিন্তু এখন তাঁদের কোনো পার্থক্য নেই মাধ্যমিক পাশ গৃহিণীর সাথে; সংসার তাঁদের মেধা গ্রাস করেছে। একজন জানিয়েছেন তাঁর অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে উঠেছে যে তিনি বই প'ড়ে বুঝতে পারেন না, ভালো সাময়িকীও পড়তে পারেন না, পড়তে পারেন শুধু রম্যপত্রিকার কেলেঙ্কারি, যদিও ছাত্রজীবনে তিনি লিখতেন চমৎকার প্রবন্ধ। বিয়েসংসার নারীদের কী ক'রে তোলে বোঝা যায় তাঁদের দিকে তাকালে। বিয়েসংসার কি আজো জীবনের প্রার্থিত লক্ষ্য হওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ? পশ্চিমে বিয়েসংসার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে, বাঙলাদেশেও আর বিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব'লে বিবেচিত হওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিয়ে কি সামঞ্জস্যপূর্ণ স্বাধীনতা ও সাম্যের সাথে? বিয়ে এখনো নারীটিকে অধীন ক'রে তোলে পুরুষটির, পুরুষটি নারীটির থেকে কম যোগ্যতাসম্পন্ন হ'লেও। বিয়েতে স্বামীস্ত্রীর যে-প্রথাগত ভূমিকা রয়েছে, তারও বদল ঘটা দরকার; স্ত্রীকেই যে দেখতে হবে সংসার, একে আর অবধারিত মনে করার কারণ নেই। দরিদ্র দেশগুলোতে নারীদের অবস্থা শোচনীয়, শুধু প্রগতিশীলতা তাদের উদ্ধার করতে পারে ওই শোচনীয়তা থেকে। নারীর জন্যে প্রগতিশীলতা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই, প্রতিক্রিয়াশীলতা নারীর চিরশত্রু। পশ্চিমে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের, যাতে স্বামী কুলপতি স্ত্রী দাসী ও আর্থনীতিকভাবে নির্ভরশীল, তার মৃত্যুর সম্ভাবনা। নারীর শিক্ষা, কাম, ও আর্থনীতিক স্বাধীনতা, যাকে বলা হয় 'ইএসই ফ্যাক্টর', বদলে দিচ্ছে বিয়ে ও সংসারের চরিত্র। প্রথাগত বদ্ধ বিয়ের বদলে দেখা দিচ্ছে উন্মুক্ত বিয়ে, বহুজনীয় বিয়ে, একত্রবাস; এবং বদলে যাচ্ছে পরিবারসংস্থা। প্রথাগত বিয়ে একদিন এখানেও হয়ে উঠবে অতীতের ব্যাপার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার ইন্দ্রিয়গুলো

মানুষ হয়ে জন্ম নিয়ে আমি সুখী;– বেশ লাগে আমার; অন্য কোনো প্রাণী, এমন কি বস্তু, রঙিন প্রজাপতি বা সুন্দরবনের বাঘ বা শান্ত গরু বা নির্বিকার মোষ বা মাছ বা সাপ বা ছোট্ট পিঁপড়ে বা আমগাছ বা শিমুল বা ঘাস বা পাথরও যদি হতাম, তাহলেও খারাপ লাগতো না, বেশ লাগতো। আর যদি কখনোই জন্ম না নিতাম, কিছুই না হতাম, তাহলেও খারাপ লাগতো না। তখন আমি জানতামই না জন্ম আর পৃথিবী কাকে বলে, যেমন এসব আমি জানবো না যখন ম'রে যাবো। ম'রে যাওয়ার পর কখনোই জানবো না যে আমি জন্ম নিয়েছিলাম, পৃথিবীতে ছিলাম, আমার ভালো লাগতো ভোরের আকাশ, শ্রাবণের মেঘ, হেমন্ত, নদী বা নারী; কখনোই জানবো না আমি কবিতা পড়েছিলাম, এমনকি লিখেছিলামও, কেঁপে উঠেছিলাম কামনায়, অজস্র বার তৃপ্ত করেছিলাম আমার কামনা, এবং বহুবার পরিতৃপ্ত করতে পারি নি। জন্মের আগে যেমন শূন্য ছিলাম, ম'রে যাওয়ার পর আমার কাছে আমি সম্পূর্ণ শূন্য হয়ে যাবো। আমার সূচনার আগের অধ্যায় অন্ধকার, সমাপ্তির পরের পরিচ্ছেদও অন্ধকার। দুই অন্ধকারের মধ্যে ক্ষণিক আলোর ঝিলিক আমি, এই ঝিলিকটুকু আমার ভালো লাগে। আমার আগের ও পরের অন্ধকার সম্পর্কে যে আমি জানি না, তা নয়; ওই অন্ধকারকে রহস্যময় ব'লে ভেবে আমি বিভোর নই, আমি জানি আমার আগে কী ছিলো, আমার পরে কী হবে। আমি জানি আমি কোনো মহাপরিকল্পনা নই, কোনো মহাপরিকল্পনার অংশ নই, আমাকে কেউ তার মহাপরিকল্পনা অনুসারে সৃষ্টি করে নি; একরাশ প্রাকৃতিক ক্রিয়ার ফলে আমি জন্মেছি, অন্য একরাশ প্রাকৃতিক ক্রিয়াকলাপের ফলে আমি ম'রে যাবো, থাকবো না; যেমন কেউ থাকবে না, কিছু থাকবে না। এ-সম্পর্কে সন্দেহ পোষণের কোনো কারণ আমি দেখি না।

বেঁচে আমি সুখ পাই; আমার ইন্দ্রিয়গুলো দিয়ে সুখ ঢোকে, আমাকে ভ'রে তোলে। সুখ আমার কাছে সামাজিক নয়, যদিও আমার সামাজিক অবস্থান আমাকে সহযোগিতা করে সুখী হ'তে, তবু সুখ আমার কাছে একান্তই ব্যক্তিগত; তার সাথে সমাজরাষ্ট্রসভ্যতার সম্পর্ক নেই; আমি আমার সুখগুলো প্রকৃতি ও প্রতিবেশ থেকে পুরোপুরি ইন্দ্রিয় দিয়ে উপভোগ করি। আমার মাত্র পাঁচটি ইন্দ্রিয়, আমার মনে হয় আরো অনেকগুলো ইন্দ্রিয় থাকা উচিত ছিলো আমার; আমার ইন্দ্রিয়গুলোর থাকা উচিত ছিলো আরো শক্তি, আরো নিপুণতা; তাহলে আমি আরো নানা ধরনের সুখ আরো প্রবলভাবে পেতে পারতাম। আমি দেখতে পাই, যদিও দিন দিন আমার দেখার শক্তি কমছে; দেখতে পাওয়া আমার জন্যে একটি বড়ো সুখ। এক ভোরবেলা চারদিকে এমন ঘন কুয়াশা ছড়ানো দেখলাম, কুয়াশা এমনভাবে ঢেকে ফেললো আমাকে, আরেক ভোরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন অমল আলো দেখলাম, রোদ এমনভাবে রঞ্জিত করলো আমাকে যে সুখে শরীর ভ'রে গেলো; মনে হলো মাংসে কুয়াশা ঢুকছে, রক্তে রোদ ঢুকছে, আমি সুখী হচ্ছি। যা কিছু দেখি আমি, তাই আমার জন্যে সুখ। ছেলেবেলায় পুকুরে ঢেউ উঠতে দেখে, স্থির জলে কচুরি ফুল দেখে সুখ পেতাম, আজো পাই; আজ পৌষের শিশির দেখে সুখ পেলাম, শিশিরভেজা ঘাসের সবুজ দেখে সুখ পেলাম, কোমল রোদ দেখে সুখ পেলাম; আজ এতোগুলো বিস্ময়কে দেখলাম যে সুখে দেহ ভ'রে উঠলো। বলবো কি যে মন সুখে ভ'রে উঠলো? সামাজিক অনেক কিছুর দিকেই আমি চোখ দিই না, ওসব দেখে সুখ পাই না, নোংরা লাগে, চোখ অসুস্থ বোধ করে। আমার মগজ সামাজিক অধিকাংশ ব্যাপার দেখতে ঘেন্না বোধ করে, তাই ওগুলো পীড়া দেয় আমাকে; যেমন মন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি দেখে আমি সুখ পাই না, সাধারণত ওসব দেখতে চাই না, ওঁরা যেখানে থাকেন আমি সাধারণত সেখানে যাই না, ক্ষমতা আমার কাছে অসুন্দর, এমনকি অশ্লীল; দোয়েলচড়ুই দেখে সুখ পাই, রাষ্ট্রপতির মুখের থেকে চড়ুইর মুখ অনেক সুন্দর; উলঙ্গ শিশুরা, ওদের পরার কিছু নেই, মাঘের শীতে পাতার আগুনের উম নিচ্ছে দেখে সুখ পাই; সুখ পেয়ে নিজেকে অপরাধী বোধ করি। আমার ইন্দ্রিয়গুলোর মধ্যে চোখ দুটিই শ্রেষ্ঠ; এ-দুটি দিয়ে আমি দূর থেকে ভেতরে টেনে আনি দৃশ্যের পর দৃশ্য, সৌন্দর্যের পর সৌন্দর্য। অন্য কোনো ইন্দ্রিয় দিয়ে এভাবে টানতে পারি না বাইরকে। ছেলেবেলায় পদ্মার পারে, সূর্যাস্তের আগে, দাঁড়িয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। পদ্মার পশ্চিম প্রান্তে যে-লাল গলতে দেখেছিলাম, তার ছেঁট আজো দেখতে পাই; ওই লাল আমার চোখে লেগে আছে, যে-লাল আমি পরে মুহূর্তের জন্যে দেখেছিলাম মেরেলিন মনরোর ঠোঁটে, ওই ঠোঁটও আমি দেখতে পাই।

AMARBOI.COM

গন্ধ আমাকে সুখী করে, এলোমেলো করে, কখনো ভারী, কখনো হাল্কা করে; দৃশ্যের থেকেও, অনেক সময়, গন্ধ আমাকে বেশি আলোড়িত করে। গন্ধ অনেক বেশি গভীরে ঢোকে দৃশ্যের থেকে, এবং দেয় সংস্পর্শের বোধ। চোখ দূরকে ভেতরে টেনে আনলেও দূরত্ব ঘোচাতে পারে না; নাক দূরকে টেনে আনতে পারে না ভেতরে, টেনে আনে যা কিছু আমাদের সংলগ্ন; তাই নাক দিয়ে নিই সংলগ্নতার স্বাদ। শুধু সুগন্ধ নয়, যেসব গন্ধ খুব ভদ্র নয়, সাধারণত আমরা পেতে চাই না, সেগুলোতেও আমি সুখ পাই। অজানা ফুলের গন্ধে, সাথে কেউ না থাকলে, যেমন হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ি, তাকাই, তেমনি দাঁড়িয়ে পড়ি, তাকাই, পচানো পাটের অবর্ণনীয় অভদ্র গন্ধে, আমার ভেতরে একটা প্রচণ্ড এলোমেলো অবস্থা ঘটে, ভেতরটি ভারী হয়ে ওঠে, আমি সুখ পাই। বেশি সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ আমি সহ্য করতে পারি না; বেশি সুগন্ধে ও দুর্গন্ধে অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমার জগত গন্ধেরও জগত, সেটি যেমন ভ'রে আছে শিউলির সুগন্ধে, তেমনি ধানের, বা ঘাসের, বা কারো শরীরের গন্ধে, এবং কোনো কোনো কবিতা থেকে ছড়িয়ে পড়া গন্ধে। দৃশ্যের জগতের মতো বিশাল নয় গন্ধের জগত, এ-ইন্দ্রিয়টি বেশি দূরকে আমার ভেতরে টেনে আনতে পারে না; কিন্তু আমি বেঁচে থেকে যে-সুখ পেয়েছি, তার অনেকটা সংগ্রহ করেছে এ-ইন্দ্রিয়টি।

কান সুখী করেছে আমাকে বিপুলভাবে; এটি পৃথিবীকে ধ্বনিরূপে ঢুকিয়েছে আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেতরে, আমার অভ্যন্তরকে ক'রে তুলেছে ধ্বনিময়, ভেতরে সব সময়ই ধ্বনির গুঞ্জন চলছে। নিঃশব্দতাই আমি বেশি পছন্দ করি আজকাল, সুখ পাই স্বরকোলাহল থেকে দূরে থাকতে পারলে, যদিও তা অসম্ভব হয়ে উঠেছে, কেননা পৃথিবী আজকাল উচ্চ কৃত্রিম ধ্বনি দ্বারা বড়ো বেশি আক্রান্ত; কিন্তু স্বরমালা যে বাল্যকাল থেকে সুখী ক'রে আসছে আমাকে, কোনো কোনো স্বরে আমি আজো সুখে কেঁপে উঠি, তা অস্বীকার করতে পারি না। সুখ পাই আমি প্রাকৃতিক শব্দে, দোয়েলের নিম্নস্বর বা বজ্রের প্রচণ্ড গর্জনে, গাভীর ডাকে, বৃষ্টির শব্দে, জলের প্রবাহে; বাঁশি বা বেহালার হাহাকারও সুখী করে আমাকে। একটি জলপ্রবাহের শব্দ আমি আজো শুনতে পাই। ঘুম থেকে জেগে এক বন্ধু আর আমি দেখতে পাই বর্ষা এসে গেছে, থইথই চারদিক, প্রচণ্ড শব্দে সরু নালা দিয়ে জল ঢুকছে পশ্চিম পুকুরে; আমরা দুজন ওই জলপ্রবাহে সারা সকাল ভ'রে ঝাঁপিয়ে পড়তে আর ভেসে যেতে থাকি, আবার ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকি। ওই শব্দ আজো আমাকে সুখ দেয়। মানুষের স্বর দিন দিন আবেদন হারিয়ে ফেলছে আমার কাছে, মানুষের বাচালতা এতো পীড়া দিচ্ছে যে মানুষ দেখলে আমি বধির হয়ে যেতে চাই; তবু ভুলতে পারি না যে আমার জন্যে সুখকর কিছু ধ্বনি উঠে এসেছিলো মানুষের কণ্ঠ থেকেই, হয়তো ভবিষ্যতেও আসবে।

শিশুর প্রধান ইন্দ্রিয় জিভ, পৃথিবীকে সে পরখ করতে চায় সম্ভবত জিভ দিয়ে, তাই মুঠোর কাছে যা পায় তাই মুখে দিয়ে দেখে, স্বাদ নেয় পৃথিবীর; তার কাছে সমান সুস্বাদু আবর্জনা আর আগুন। যখন শিশু ছিলাম, কিশোর হয়ে উঠেছি যখন, তখনও আমি সব কিছু চুষে দেখতে চেয়েছি; আজো অনেক কিছু চুষে আর চেখে দেখতে ইচ্ছে করে। ছেলেবেলা ভ'রে ইচ্ছে হতো চুলোর লাল আগুনের টুকরোগুলোকে চুষে দেখতে, ওগুলো লাল গোলাপের থেকেও লাল হয়ে জ্বলজ্বল করতো, সূর্যাস্তকেও চুষে স্বাদ নিতে ইচ্ছে হতো; কয়েক বছর আগে সারা সন্ধ্যা চুষতে চিবুতে ইচ্ছে হয়েছিলো চুয়িংগামের মতো এক তরুণীকে। চারপাশে ছড়িয়ে আছে যে-জগত, তার স্বাদ আছে, টক মিষ্টি ঝাল তেতো বিষাক্ত স্বাদ; আমি তার স্বাদ নিয়ে সুখী হয়েছি; শুধু মিষ্টি স্বাদ নয়, সব স্বাদই সুখকর, যদিও সব স্বাদ সমানভাবে সহ্য করতে পারি না; কিন্তু স্বাদের জগত আমাকে সুখী করে।

ছোঁয়া সবচেয়ে অন্তরঙ্গ অনুভূতি; আমাদের শরীর ছোঁয়া চায়, আমরা ছুঁতে চাই; আমিও ছুঁতে চেয়েছি, ছোঁয়া চেয়েছি, এবং ছোঁয়া পেয়ে ও ছুঁয়ে সুখী হয়েছি। আমার ত্বক সুখী হয়েছে অজস্র ধরনের ছোঁয়ায়; আমি যতো ছুঁতে চেয়েছি, তার চেয়ে বেশি ছোঁয়া চেয়েছি; ছোঁয়া অনেকটা শান্ত পুকুরে ছোঁড়া ঢিলের মতো, ছোঁয়া পেলে আমার ত্বক জলের মতো কেঁপে ওঠে, চারদিকে ঢেউ খেলে যায়, ঢেউ কেঁপে কেঁপে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আমি সাধারণত ছুঁয়েছি হাত দিয়ে, কিন্তু আমি ছোঁয়া চেয়েছি সারা শরীরে; এবং দুটি বস্তুই সম্ভবত আমাকে ছুঁয়েছে সারা শরীরে– একটি জল, আরেকটি বায়ু। জলের ছোঁয়ার তুলনা হয় না। ছেলেবেলায় পুকুরে নেমে যে উঠতে চাই নি, মাঘের ভোরেও লাফিয়ে পড়েছি জলে, কেননা জলই শুধু আমাকে সারা শরীরে নিবিড়ভাবে ছুঁয়েছে। বাতাসের সাথে জলের পার্থক্য হচ্ছে বাতাস তার ছোঁয়া বুঝতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেয় না, ত্বকে হাল্কা ছোঁয়া দিয়েই চ'লে যায় বা স্থির থাকে, কিন্তু জল নিবিড়ভাবে আবৃত ক'রে রাখে। জল কামনাময়। আমি ছুঁয়ে সুখ পেয়েছি। আকাশ আর আগুন ছুঁয়ে ফেলেছি কতোবার; ঘাস দেখলে এখনো ছুঁতে ইচ্ছে করে, পশু দেখলে ছুঁতে ইচ্ছে করে, কোনো কোনো নারী দেখলে ছুঁতে ইচ্ছে করে, কিন্তু ছুঁই না; সব কিছু ছোঁয়া অনুমোদিত নয়। ওষ্ঠ দিয়ে ছোঁয়া নিবিড়তম ছোঁয়া, আমি যা কিছু ওষ্ঠ দিয়ে ছুঁয়েছি, তারাই আমাকে সুখী করেছে সবচেয়ে বেশি। আমাদের সমাজে ছোঁয়া খুবই নিষিদ্ধ ব্যাপার; আমরা খুব কম মানুষকেই ছুঁতে পারি, খুব কম মানুষকেই ছোঁয়ার অধিকার আছে আমাদের। ছোঁয়া এখানে পাপ; কোনো নারী যদি কোনো পুরুষকে ছোঁয়, কোনো পুরুষ যদি কোনো নারীকে ছোঁয়, তাতে সূর্য খ'সে পড়ে না, আকাশে হুলস্থুল শুরু হয়ে যায় না; কিন্তু আমরা মনে করি মহাজগত তাতে খেপে উঠছে। শরীর খুবই আপত্তিকর আমাদের কাছে, একে অজস্র পাপের উৎস ভেবে আমরা ভয় পাই; পবিত্র বইগুলো সব সময় মনে করিয়ে দেয় যে আমরা পাপী, তাই আমাদের সুখ নয়, শাস্তি প্রাপ্য। কিন্তু আমি ছুঁয়েছি, ছোঁয়া পেয়েছি, তাতে চাঁদতারা খ'সে পড়ে নি। ছুঁয়ে ও ছোঁয়া পেয়ে আমি যে-সুখ পেয়েছি, তা আর কিছুতে পাই নি।

ইন্দ্রিয়গুলো, আমার মোহন ইন্দ্রিয়গুলো, সুখী করে আমাকে; কিন্তু আমি শুধু এগুলোর সুখেই সীমাবদ্ধ থাকি নি। আমি পাঁচ ইন্দ্রিয়ের সুখ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারি, সরিয়ে রেখে সুখ পাই, খুবই ভিন্ন রকমের সুখ; পাঁচ ইন্দ্রিয়ের টসটসে সুখের থেকে খুবই ভিন্ন ধরনের সুখ পাই। আমি আরেক জগতে, নিরিন্দ্রিয় ওই জগতকে, অন্য কোনো ভালো নামের অভাবে, বলতে পারি কল্পনা ও চিন্তার জগত। ইচ্ছে করলে আমি বাস্তব কাজ করতে পারি, এটা কঠিন নয় আমার জন্যে; কতো তুচ্ছ মানুষ পৃথিবীতে, বিশেষ ক'রে বাঙলাদেশে, কতো উচ্চ উচ্চ বাস্তব কাজ করছে, সমাজরাষ্ট্র ভাঙছে, গড়ছে, রাষ্ট্রকে চিৎ করছে, সমাজকে উপুড় করছে, কাৎ করছে, গর্ভবতী করছে, প্রচণ্ড বাস্তব কাজ ক'রে অমর হচ্ছে, আমি তার দু-একটি করতে পারতাম না তা নয়; তবে আমার মনে হয় সব কাজের মধ্যে সহজ হচ্ছে বাস্তব কাজ, আর কঠিন অবাস্তব কাজ। বছরের পর বছর ধ'রে আমরা যুদ্ধ করতে পারি, কিন্তু কারো পক্ষে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে স্বপ্ন দেখা সম্ভব নয়। আজ দল বেঁধে নেমে সারা শহর পুড়িয়ে দিতে পারি, অতোটা নিষ্ঠুর না হয়ে শহরকে সারাদিন ধ'রে বিকল ক'রে রাখতে পারি, কিন্তু আমরা দল বেঁধে এক হাজার উৎকৃষ্ট কবিতা লিখে উঠতে পারি না। কবিতার কথা ছেড়েই দিই, রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীকে গরু সম্পর্কে একটি রচনা লিখতে দিলে তাঁরা হয়তো তা লিখে উঠতে পারবেন না, কিন্তু হেলিকপ্টারে সারা দেশ ঘুরে দশখানা সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে পারবেন।

রাষ্ট্রের কাছে কবিতার কোনো মূল্য নেই– রাষ্ট্র কোথাও কবির জন্যে কোনো পদ রাখে না, কিন্তু দশতলা দালান খুবই মূল্যবান; তবে একটি দশতলা দালানের মালিক হওয়ার থেকে অনেক কঠিন 'অবসরের গান' লেখা। জীবনানন্দ অবশ্য ওই কবিতাটির বদলে একটি একতলা দালান বানাতে পারলে ট্রামলাইনের পাশে একটু সাবধানে হাঁটতেন। তবে জীবনানন্দ ছাড়া কেউ ওই কবিতাটি লিখতে পারতেন না; দশতলার মালিক অনেকেই হ'তে পারেন, যাঁদের ঠিক যোগাযোগটি আছে, কিন্তু কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যোগাযোগের ফলেই ওটি লেখা সম্ভব নয়। কে মূল্যবান– জীবনানন্দ না রাষ্ট্রপতি? আমি আনন্দ পাই কল্পনায় এবং চিন্তায়; কল্পনা ও চিন্তায় আমি জীবনের বড়ো অংশ ব্যয় করেছি– আনন্দে। আমি দশতলা আর পাজেরো করতে পারতাম, ফুলের মালায় নিজের গলদেশও ভ'রে তুলে অমর হ'তে পারতাম; আমি কি পারতাম না?– কিন্তু ওইসব আমাকে আনন্দ দেয় না, আনন্দ পাই আমি কল্পনা ও চিন্তায়, যাতে সমাজরাষ্ট্রের কোনো দরকার নেই। এই আনন্দ ইন্দ্রিয়ের সুখের থেকে অনেক ভিন্ন, উৎকৃষ্টও হয়তো, কিন্তু তা আমি বলতে চাই না, আমার ইন্দ্রিয়গুলোকে আমি কখনোই নিন্দিত করতে চাই না। ইন্দ্রিয়গুলোকে আমি ভালোবাসি, যেমন ভালোবাসি আমার মগজকে, যা আমি দেখি নি, যার ক্রিয়াকলাপ বুঝি না আমি, যা আমার কাছে কিংবদন্তির মতো।

তবে সব কিছুই নিরর্থক, জগত পরিপূর্ণ নিরর্থকতায়; রবীন্দ্রনাথও নিরর্থক, আইন্স্টাইনও নিরর্থক; ওই গোলাপও নিরর্থক, ভোরের শিশিরও নিরর্থক; তরুণীর চুম্বনও নিরর্থক, দীর্ঘ সুখকর সঙ্গমও নিরর্থক, রাষ্ট্রপতিও নিরর্থক। কেননা সব কিছুরই পরিণতি বিনাশ। বিস্ময়কর বিশ্ব, রঙিন ফুল বা মানুষ বা বন্যশুয়োর, সূর্য বা নক্ষত্র, গ্রহউপগ্রহ সব কিছুর জন্যেই অপেক্ষা ক'রে আছে তাদের পরিণতি– বিনাশ, যার থেকে কোনো উদ্ধার নেই। এ-মহানিরর্থকতায় ভয় পেয়ে কতোগুলো শিশুতোষ রূপকথা তৈরি করতে পারি আমরা, যেমন তৈরি করেছি ধর্মের রূপকথা, তৈরি করেছি স্রষ্টা, পাপ, পুণ্য, স্বর্গ আর নরক। এ হচ্ছে তাৎপর্যহীন জীবনকে তাৎপর্যপূর্ণ করার স্থূলতম প্রয়াস। জীবনের তাৎপর্যহীনতা ভাবুক মানুষকে পাগল ক'রে তুলতে পারে, তাই বিচিত্র ধরনের ভাবুক চেষ্টা করেছে একে বিচিত্ররূপে তাৎপর্যপূর্ণ ক'রে তুলতে; ধর্ম একে তাৎপর্যপূর্ণ করতে চেয়েছে সবচেয়ে নিকৃষ্টরূপে, এবং একে আরো নিরর্থক ক'রে তুলেছে। এই যে আমি বেঁচে আছি, বেঁচে থেকে সুখ পাচ্ছি, আমি ম'রে যাবো, এই হাস্যকর নিরর্থকতাকে কীভাবে অর্থপূর্ণ ক'রে তুলতে পারি আমি? আমার জীবনকে অর্থপূর্ণ ক'রে তোলার কোনো পূর্বনির্ধারিত উপায় নেই, কোনো পবিত্র বা অপবিত্র বই বা কোনো মহাপুরুষ বা প্রবর্তক আমাকে পথ দেখাতে পারেন না। তাঁরা খুঁজেছেন নিজেদের পথ, নিজেদের জীবনকে তাৎপর্যপূর্ণ করার পথ; আমি তাঁদের পথে চলতে পারি না, আমি খুঁজতে চাই আমার পথ, নিজের জীবনকে তাৎপর্যপূর্ণ করার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে আমার নিজের। বেশ আগে একটি কবিতা লিখেছিলাম, নাম 'ব্যাধিকে রূপান্তরিত করছি মুক্তোয়'। কবিতাটির কথা আমার মনে পড়ে; কবিতাটি একবার পড়তে চাই :

> একপাশে শূন্যতার খোলা, অন্য পাশে মৃত্যুর ঢাকনা,
> প'ড়ে আছে কালো জলে নিরর্থ ঝিনুক।
> অন্ধ ঝিনুকের মধ্যে অনিচ্ছায় ঢুকে গেছি রক্তমাংসময়
> আপাদমস্তক বন্দী ব্যাধিবীজ। তাৎপর্য নেই কোনো দিকে–
> না জলে না দেয়ালে– তাৎপর্যহীন অভ্যন্তরে ক্রমশ উঠছি বেড়ে
> শোণিতপ্লাবিত ব্যাধি। কখনো হল্লা ক'রে হাঙ্গরকুমিরসহ
> ঠেলে আসে হলদে পুঁজ, ছুটে আসে মরা রক্তের তুফান।
> আকস্মিক অগ্নি ঢেলে ধেয়ে আসে কালো বজ্রপাত।
> যেহেতু কিছুই নেই করণীয় ব্যাধিরূপে বেড়ে ওঠা ছাড়া,
> নিজেকে– ব্যাধিকে– যাদুরসায়নে রূপান্তরিত করছি শিল্পে–
> একরত্তি নিটোল মুক্তোয়!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝিনুক ও মুক্তোর রূপকে জীবনের তাৎপর্যশূন্যতার মর্মান্তিক সৌন্দর্য উপস্থাপন করতে চেয়েছিলাম কবিতাটিতে। মুক্তো সুন্দর, প্রিয়, মূল্যবান; কিন্তু ঝিনুকের জন্যে তা ব্যাধি, ঝিনুক তার ব্যাধিকে এমন রূপ দেয় যা মানুষের কাছে মুক্তো। এই মহাজগত এক বিশাল ঝিনুক, যার দুটি ঢাকনার একটি শূন্যতা, অন্যটি মৃত্যু; কোথাও কোনো তাৎপর্য নেই; ওই ঝিনুকের মধ্যে রোগবীজাণুর মতো ঢুকে গেছি আমি। আমরা সবাই। আমি কী করতে পারি ওই নিরর্থক শূন্যতায়? পারি শুধু ব্যাধিরূপে বেড়ে উঠতে, ব্যাধিতে বিশ্ব ভ'রে দিতে; কিন্তু আমি তা করছি না, ব্যাধিকে ঝিনুকের ব্যাধির মতো রূপান্তরিত করছি শিল্পকলায়। এ হচ্ছে চূড়ান্ত অর্থহীনতাকে অর্থপূর্ণ করার এক সুন্দর ব্যর্থ করুণ প্রয়াস।

এ-প্রয়াস সুন্দর, কিন্তু ব্যর্থ; এতে কি তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে জীবন? মনে পড়ে আলবেয়ার কামু ও তাঁর অ্যাবসার্ড বা নিরর্থকতাকে। আমি পুরাণ থেকে অনেক দূরে, পৌরাণিক উপাখ্যান ও চরিত্রগুলো আমার ভেতর ঢোকে না, পুরাণ আমার কাছে আদিম বিশ্বাস মনে হয় ব'লেই হয়তো, কিন্তু কামু বেছে নিয়েছিলেন গ্রিসীয় পুরাণের সিসিফাসকে। রাজা সিসিফাস মানুষ, নিয়তিদণ্ডিত, কিন্তু সে নিয়তিকে মানতে রাজি হয় নি, দাঁড়াতে চেয়েছে মূর্খ বর্বর অন্ধ অসুন্দর নিয়তির মুখোমুখি। স্বৈরাচারী দেবতাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে সে চায় নি; কিন্তু দেবতারা নিষ্ঠুর শক্তিধর প্রতিশোধস্পৃহ, তারা সিসিফাসকে বাধ্য করে একটি বিশাল পাথরখণ্ডকে ঠেলে ঠেলে পাহাড়ের চূড়োয় উঠোতে, কিন্তু উঠোনোর পরেই ওই পাথর গড়িয়ে পড়ে পাহাড়ের পাদদেশে, আবার সেটি ঠেলে ঠেলে উঠোতে হয় সিসিফাসকে। অনন্তকাল ধ'রে সে এই নিরর্থক পীড়াদায়ক দণ্ডে দণ্ডিত। একই ক্লান্তিকর কাজ সে ক'রে চলে চিরকাল, তার জীবন একই নিরর্থক পুনরাবৃত্তির সমষ্টি। আমরা এই নিরর্থক পুনরাবৃত্তি থেকে একটুও এগোই নি, কামু বলেছেন, আমাদের জীবন একই রোববারের পর সোমবার, সোমবারের পর মঙ্গলবার, মঙ্গলবারের পর বুধবারের, একই নিরর্থকতার পুনরাবৃত্তি। এই নিরর্থকতার মুখোমুখি কীভাবে দাঁড়াতে পারি? কামুর মতে একটিই সত্যিকার দার্শনিক সমস্যা রয়েছে, তা হচ্ছে আত্মহত্যা। জীবনের এই মহানিরর্থকতায় মানুষ একটি কাজই করতে পারে, তা হচ্ছে আত্মহত্যা। জীবন কি যাপন করার উপযুক্ত? বেঁচে থাকার কি কোনো মানে হয়? কোনো অর্থ কি অছে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' লেখার, বা মহাকাশে নভোযান পাঠানোর, বা নারীর নগ্ন স্তনে চুম্বনের, বা জন্মদানের?

বহু মানুষ বিশ্বাস করে বিধাতায়, পোষণ করে ধর্মীয় বিশ্বাস; তবে বিধাতা বা ধর্মীয় বিশ্বাস, যা মানুষের আদিম কল্পনার ফল, তা কোনো সাহায্য করতে পারে না, তাৎপর্যপূর্ণ ক'রে তুলতে পারে না জীবনকে; বরং জীবনকে ক'রে তোলে মিথ্যায় পূর্ণ। নির্বোধ/অন্ধ/ লোভী/কপট/ভীতরাই শুধু তাতে শান্তি পেতে পারে, ভাবতে পারে নিজেদের জীবনকে অর্থপূর্ণ ব'লে, কেননা পরলোকে তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে একটি দুর্দান্ত কামনাঘন বিলাসপূর্ণ জীবন; কিন্তু তা হাস্যকর। বিধাতা বা ধর্মের কাছে হাত পাততে পারি না আমরা, যদিও এগুলো প্রচণ্ডভাবে চলছে, তবে ওগুলোর প্রতারণার সময় শেষ হয়ে গেছে; ওগুলো মানুষকে কিছু দেয় নি, কিছু দিতে পারে না, বরং তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনকে ক'রে তুলেছে আরো নিরর্থক। কামুর ধারণা আমরা বাস করি অ্যাবসার্ড বা নিরর্থকতার কালে; ওই নিরর্থকতা আমাদের আক্রমণ করতে পারে যে-কোনো মুহূর্তে, রাস্তার যে-কোনো মোড়ে, যে-কোনো গলিতে; তখন নিজের কাছে নিজেকেই মনে হয় অচেনা, বহিরস্থিত। মানুষের প্রশ্নের শেষ নেই, হাজার হাজার প্রশ্ন তার, সেগুলোর কোনো উত্তর নেই; মানুষ চায় সমাধান, কিন্তু সমাধান চাইতে গিয়েই মানুষ জাগিয়ে তোলে নিরর্থকতা। মানুষ যখন জীবনের অর্থ খুঁজতে চায়, বুঝতে চায় জীবনের অর্থ কী, তখন সে মুখোমুখি হয় নিরর্থকতার। জীবনের কোনো অর্থ নেই, কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নেই; সুধীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন, তার সারকথা পিশাচের উপজীব্য হওয়া।

মানুষ অভিনয় ক'রে যেতে থাকে, কিন্তু একদিন মঞ্চ ভেঙে পড়ে। জীবনের ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তির চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন কামু এভাবে : 'জাগরণ, গাড়ি, চার ঘণ্টা কাজ, আহার, নিদ্রা, এবং সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, এবং শনিবার একই তালে পুনরাবৃত্ত– এই পথেই চলা অধিকাংশ সময়। কিন্তু একদিন দেখা দেয় 'কেনো'।' তখন সব কিছু মনে হ'তে থাকে অ্যাবসার্ড, নিরর্থক। এই নিরর্থকতার উদ্ভব ঘটে আমাদের চৈতন্য ও বিশ্বের মধ্যে যখন ঘটে সংঘর্ষ। মানুষ, কামু মনে করেন, এই নিরর্থকতাকে এড়াতে পারে না যতোদিন সে বেঁচে থাকে; তাই, তাঁর মতে, অস্তিত্ব হচ্ছে 'চূড়ান্ত আশাহীনতা'। মানুষ এই নিরর্থকতাকে অতিক্রম করার কোনো উপায় দেখে না, কেননা বেঁচে থাকাই হচ্ছে নিরর্থকতা। সুধীন্দ্রনাথ এ-পরিস্থিতির কথাই বলেছিলেন 'মৃত্যু কেবল মৃত্যুই ধ্রুবসখা/যাতনা কেবল যাতনা সুচির সাথী'র হাহাকারে। এই নিরর্থকতা থেকে মুক্তির এক উপায় মৃত্যু; মৃত্যু পারে নিরর্থকতার সমাপ্তি ঘটাতে। তাই আত্মহত্যা একটি উপায় নিরর্থকতা থেকে মুক্তির। তাহলে কি আমরা আত্মহত্যা করবো? কামু, এবং সবাই, বলবেন, না; আত্মহত্যা কোনো সমাধান নয়, আত্মহত্যা ক'রে নিরর্থক জীবনকে তাৎপর্যপূর্ণ করা সম্ভব নয়। তবে প্রত্যেক মানুষের জীবনেই কোনো কোনো মুহূর্ত আসে, যা তাকে আত্মহত্যা করার প্ররোচনা দেয়; কিন্তু সবাই আত্মহত্যা করে না, শুধু তারাই আত্মহত্যা করে বা সফল হয় আত্মহত্যায়, যারা হঠাৎ জেগে ওঠা নিরর্থকতার প্ররোচনা কাটাতে পারে না, যেমন পারে নি জীবনানন্দের 'আট বছর আগের একদিন'-এর তরুণ, যার জানালার পাশে দাঁড়িয়েছিলো উটের গ্রীবার মতো এক নিস্তব্ধতা। আমি কয়েকবার আত্মহত্যাকে সমাধান হিশেবে বিবেচনা করেছি, এবং বাতিল করেছি; একবার একটি কবিতা লিখেছি 'ছাদআরোহীর কাসিদা' নামে। রবীন্দ্রনাথ কি কখনো আত্মহত্যার কথা ভেবেছেন? অবশ্যই ভেবেছেন; তাঁর প্রথম দিকের কাব্যগুলোতে এর নানা দাগ দেখতে পাই। আত্মহত্যা কোনো সমাধান নয়, এটা একটি আস্তিত্বিক পাপ। মানুষ তার নিজের ইচ্ছায় মরবে না, বেছে নেবে না স্বেচ্ছামৃত্যু; মানুষকে মরতে হবে মিটমাট না ক'রে। জীবন, আমাদের সুন্দর জীবন, তার কোনো অর্থ নেই, অর্থের দরকার নেই; জীবনের অর্থ হচ্ছে জীবন, জীবনের অন্য অর্থ নেই ব'লেই জীবন সুন্দর। কোনো পূর্বনির্ধারিত পথ নেই মানুষের জন্যে; কোনো গ্রন্থ পথ দেখাতে পারে না তাকে, কোনো মহাপুরুষ বা প্রবর্তক তার জন্যে পথ প্রস্তুত করতে পারেন না; ওই মহাপুরুষেরা তৈরি করেছেন নিজেদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পথ, অন্যদের নয়। প্রত্যেককে খুঁজে বের করতে হয় নিজের পথ, তৈরি করতে হয় নিজের রাস্তা। অনেকের পথ আমাকে আলোড়িত করেছে, অনেক গ্রন্থ আমাকে আলো দিয়েছে; কিন্তু আমি ওইসব পথে চলি নি, ওই আলোতে পথ দেখি নি।

আশা। আমরা কি আশা করবো? আশা খুব প্রশংসিত, আশার প্রশংসায় পৃথিবী পঞ্চমুখ, কিন্তু আশার কিছু নেই পৃথিবীতে, আশা করার স্থান নয় জীবন। স্থূল জীবন যাপনের জন্যে স্থূল ছোটো ছোটো আশা আমরা ক'রে থাকি, ভুলে থাকি জীবনের বিশাল আশাহীনতাকে; কিন্তু যদি আশা করি যে জীবনের নিরর্থকতাকে অতিক্রম করতে পারবো, তাহলে জীবনকে অর্থপূর্ণ ক'রে তুলি না, বরং আত্মহত্যা করি দার্শনিকভাবে। আশার প্রলোভনে ভুললে কারো পক্ষে সৎ থাকা সম্ভব নয়, তখন সে পরিবৃত হয় মিথ্যে দিয়ে। কামুর অ্যাবসার্ড নায়ক সিসিফাসের মতো আমরাও ঘেন্না করি মৃত্যুকে, ভালোবাসি জীবনকে; এবং তার মতো আমরাও দণ্ডিত। তবে যতোই ঘেন্না করি মৃত্যুকে আর ভালোবাসি জীবনকে, মৃত্যুকেই বরণ করতে হবে অবশেষে, তার কাছেই আত্মসমর্পণ করতেই হবে। মৃত্যু ছাড়া আর কিছু সম্পর্কেই আমরা নিশ্চিত নই। আমরা ভয় পাই ওই চরম অন্ধকারকে; রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়ে,– যখন রোম্যান্টিকের চোখে দেখেছেন তখন প্রেমে পড়েছেন মৃত্যুর, কিন্তু বুড়ো বয়সে যখন সত্যিই মৃত্যু হানা দিতে থাকে তিনি ভয় পেতে থাকেন, তাঁর কবিতা মৃত্যুর ভয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। সিসিফাস নিয়তিকে মেনে নেয় শুধু নিয়তিকে অস্বীকার করার জন্যে, সে কখনো অসৎ নয়; সততা দিয়ে সে একরকমে তাৎপর্যপূর্ণ ক'রে তোলে তার জীবনকে। ওই তাৎপর্য নিরর্থকতাকে লুপ্ত করতে পারে না, তবে অস্বীকার করে তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে। আমরা নিরর্থকতার মধ্যে বন্দী হয়ে আছি, কিন্তু তা মেনে না নিয়ে, আপন পথ খুঁজে, পথ তৈরি ক'রে সার্থক করতে পারি নিজেদের। কোনো সার্থকতাই অবশ্য সার্থকতা নয়, সব কিছুই পরিশেষে নিরর্থক; অর্থপূর্ণ শুধু দুই অন্ধকারের মাঝখানের হঠাৎ ঝলকানিটুকু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ুন আজাদের
প্রবন্ধ, সমালোচনা, ভাষাবৈজ্ঞানিক গ্রন্থপঞ্জি

১৯৭৩ *রবীন্দ্রপ্রবন্ধ/রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৯৭৬ *লাল নীল দীপাবলি বা বাঙলা সাহিত্যের জীবনী*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। ২য় সংস্করণ ১৯৯২, ২য় মুদ্রণ ১৯৯৬ : আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।

১৯৮৩ *শামসুর রাহমান/নিঃসঙ্গ শেরপা*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। ২য় সংস্করণ ১৯৯৬; আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।

১৯৮৩ *Pronominalization in Bengali*. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১৯৮৩ *বাঙলা ভাষার শত্রুমিত্র*। বাংলাদেশ ভাষাবিজ্ঞান পরিষদ, ঢাকা।

১৯৮৪ *বাক্যতত্ত্ব*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। ২য় সংস্করণ ১৯৮৪ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১৯৮৪ *বাঙলা ভাষা*। প্রথম খণ্ড। প্রধান সম্পাদক। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৭ : আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।

১৯৮৫ *ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না*। শিশু একাডেমী, ঢাকা। ২য় সংস্করণ ১৯৯৫ : আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।

১৯৮৫ *বাঙলা ভাষা*। দ্বিতীয় খণ্ড। সম্পাদক। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৯৮৭ *কতো নদী সরোবর বা বাঙলা ভাষার জীবনী*। অনিন্দ্য প্রকাশন, ২৪৪ নবাবপুর রোড, ঢাকা। ২য় সংস্করণ ১৯৯২ : আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।

১৯৮৮ *তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। ২য় সংস্করণ ১৯৯৫ : আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।

১৯৮৮ *শিল্পকলার বিমানবিকীকরণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ*। ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১১৪ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

১৯৯০ *ভাষা-আন্দোলন : সাহিত্যিক পটভূমি*। ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১১৪ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

১৯৯২ *নারী*। ১ম, ২য় মুদ্রণ। নদী, ঢাকা। ২য় পরিবর্ধিত সংশোধিত সংস্করণ ১৯৯২ : আগামী প্রকাশনী; ২য়, ৩য় মুদ্রণ ১৯৯৩; ৪র্থ মুদ্রণ ১৯৯৪; ৫ম মুদ্রণ ১৯৯৫; পরিশুদ্ধ পরিবর্ধিত ৩য় সংস্করণ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫। প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয়তাবাদী দলীয় সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ : ১৯ নভেম্বর ১৯৯৫।

১৯৯২ *প্রতিক্রিয়াশীলতার দীর্ঘ ছায়ার নিচে*। আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।

১৯৯২ *নিবিড় নীলিমা*। বিউটি বুক হাউস, ৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা।

১৯৯২ *মাতাল তরণী*। কাকলী প্রকাশনী, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা।

১৯৯২ *নরকে অনন্ত ঋতু*। আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।

১৯৯২ *জলপাইরঙের অন্ধকার*। সময় প্রকাশন, ২০ শেখ সাহেব বাজার রোড, ঢাকা।

১৯৯৩ *সীমাবদ্ধতার সূত্র*। আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।

১৯৯৩ *আধার ও আধেয়*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১৯৯৭ *আমার অবিশ্বাস*। আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।

১৯৯৭ পার্বত্য চট্টগ্রাম : সবুজ পাহাড়ের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হিংসার ঝরনাধারা। আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।

১৯৯৮ *দ্বিতীয় লিঙ্গ*। আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~